ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ

আগরতলা, ত্রিপুরা

দশ কাও

সম্পাদনায়

ডঃ জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী নিধুভূষণ হাজরা
ও সুচিন্তা ভট্টাচার্য্য
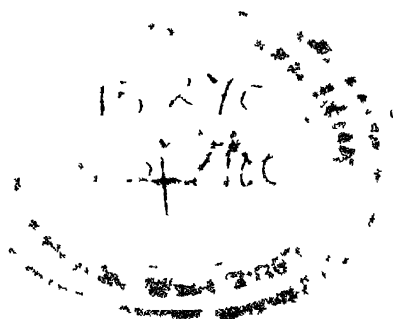
ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ
আগরতলা, ত্রিপুরা

DESH KAL

A Collection of Essays

Published by :
Tripura Bangla Sahitya
Sanskriti Samsad
Agartala, Tripura

প্রথম প্রকাশ ঃ
আগরতলা বইমেলা, ২০০৬ ইং

প্রকাশনা ও গ্রন্থস্বত্ত্ব ঃ
শ্রী সুবিমল রায়
সাধারণ সম্পাদক,
ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ
আগরতলা, ত্রিপুরা

সম্পাদনা সহযোগী ঃ
ডঃ আশিস কুমার বৈদ্য
শ্রী অমিত ভৌমিক

প্রচ্ছদ ঃ
শ্রী বিমল কর

অক্ষর বিন্যাসঃ-
প্রয়োজনী, জি.বি.বাজার,
আগরতলা

মুদ্রণ ঃ
অনিল লিথোগ্রাফিং
১৩,শশীভূষণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা- ১২

পরিবেশক/ যোগাযোগ ঃ
উত্তরণ, পুরাণ কালীবাড়ী লেন,
কৃষ্ণনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা

মুল্য ঃ ১২৫ টাকা

।। ভূমিকা ।।

সময়-যাযাবর পৃথিবীর এক একটি শহরে তাঁবু গাড়ে। আবার কিছুকাল পর সেখান থেকে তাঁবু উঠিয়ে অন্য এক জায়গায় চলে যায়। বঙ্গ-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কোলকাতা থেকে সেই যাযাবরেব তাঁবু চলে এসেছিল ত্রিপুরার তৎকালীন নতুন রাজধানী আগরতলায়। নতুন রাজধানীর পক্ষে এই সৌভাগ্য অভাবনীয়। তবে এটা এক প্রকারের ঐতিহাসিক নিয়তি। সময়টি ছিল ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৭ আষাঢ় (ইংরেজি ১৯০৫)। ঐ দিনটিতে রাজধানী আগরতলায় বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সাহিত্য বাসরে পৌরোহিত্য করেছিলেন ত্রিপুরার পরমাত্মীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। সেদিন কবিকে সভাপতিরূপে সাদরে বরণ করেছিলেন কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর মাণিক্য। ত্রিপুবা স্বীকৃতি লাভ করল বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি পীঠস্থান হিসেবে।

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের শতবর্ষ পরিক্রমার উজ্জ্বল দিকটিব কথা ভেবেই ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ 'আগরতলা বইমেলা, ২০০৬' উপলক্ষে তথ্যবহুল মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলন 'দেশ-কাল' প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়। সন্দেহ নেই সাহিত্যে জীবনের প্রতিফলন ঘটে বলেই জীবনের বহু সমস্যার সমাধান মানুষ সাহিত্যেব মধ্যে দেখতে চায়। এই দায়বদ্ধতার কথা মনে বেখেই সম্পাদনার প্রধান লক্ষ্য ত্রিপুরা, পূর্ব এবং উত্তর -পূর্ব ভারতের সার্বিক পরিচিতি বৃহৎ পাঠক সমাজের কাছে বস্তুনিষ্ঠএবং যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে তুলে ধরা। 'দেশ-কাল' এর মত একটি ভিন্ন মাত্রার বই প্রকাশের ঝুঁকি নিয়ে সামান্য অর্থ সম্বল করে পথচলা শুরু কবলেও রাজ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী নবীন-প্রবীণ বিশিষ্ট লেখক সমাজ তথ্যসমৃদ্ধ লেখা দিয়ে একাজে সংসদেব পাশে দাঁড়ানোর ফলেই একটি দুরূহ প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হল। আমাদের কর্মসূচীকে সার্থক কবে তোলাব জন্য তাদের সবাইকে আন্তবিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বলা বাহুল্য, যে আদর্শকে সামনে রেখে সংসদের মুখপত্র 'সাহিত্য-সংস্কৃতি' বার্ষিক যাত্রা শুরু করেছিল সেই আদর্শকেই প্রবন্ধ সংকলনে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করা হযেছে। আমরা অগণিত পাঠক-পাঠিকাব শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিকে পাথেয় করে বেশ কয়েকটি বছর অতিক্রম করে এসেছি। এটি শ্লাঘাব বিষয় যে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সংসদ হিংসাদীর্ণ আধুনিক ত্রিপুবায় মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সাহিত্য ও সংস্কতির মাধ্যমে একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার ভূমিকা পালন করে আসছে। আমরা আশা করছি বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে 'দেশ-কাল' এর আদর্শ আরও উজ্জ্বলতব এবং আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষে -
ডঃ সুচিন্ত্য ভট্টাচার্য

সুচীপত্র

সাহিত্য-সংস্কৃতি

ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব

শিক্ষা

বাংলার বাইরে বাংলা কবিতা ঃ প্রসঙ্গ ত্রিপুরা

ড. শিশির কুমার সিংহ

বাংলা কবিতা তা যেখান থেকেই লেখা হোক না কেন, তা বাংলা সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। তবু কেন বাংলাদেশের কবিতা, ত্রিপুরার বাংলা কবিতা, বহির্বঙ্গে বাংলা সাহিত্য চর্চা-এভাবে অঞ্চল ভিত্তিক শিরোনাম নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করা হচ্ছে, সে প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। কিন্তু যাঁরা প্রশ্ন করেন তাঁরা বোঝেন না যে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে- সারা ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে যে বিশাল সংখ্যক বাঙালি রয়েছেন তাঁরা দীর্ঘকাল থেকে এক গভীর বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত। এর প্রধান কারণ বাংলা সাহিত্য চর্চার মূলস্রোত থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন। আর এই বিচ্ছিন্নতার মূলে রয়েছে মূল স্রোতের কবি- সাহিত্যিক ও বিভিন্ন পত্রিকা-গোষ্ঠীর উন্নাসিক মনোভাব। আর সেজন্যই বাংলার বাইরে যাঁরা বাংলা সাহিত্য চর্চা করেন, তাঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের জন্যই আঞ্চলিক অভিধাটি সংযুক্ত করেন। অথচ একথা সবার জানা যে বাংলার বাইরে বহু প্রতিভাধর কবি সাহিত্যিকের আবর্ভাব ঘটেছে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেন, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ ভাদুড়ী, চাণক্য সেন, দেবেশ দাস প্রমুখ আরও বহু প্রবাসী লেখক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বঙ্গের মহিলা কবিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কন্যা। মহারাজা বীরচন্দ্র এবং তাঁর অন্যান্য পুত্রকন্যাদের বাংলা সাহিত্যে অবদান কম নয়। তাছাড়া এখানকার রাজা-অমাত্যদের, পন্ডিত ব্যক্তিদের এবং অন্যান্যদের বাংলা সাহিত্য চর্চার কথা আজ ইতিহাস। কিন্তু এসব ক'জন জানেন? ক'জন বাঙালি সাহিত্য পাঠক বাংলার বাইরের সাহিত্য চর্চা সম্বন্ধে আগ্রহী। এসব শুধু অভিমানের কথা নয়, এসব ঐতিহাসিক সত্য। ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মূল কারণ ত্রিপুরার রাজাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ। সুদীর্ঘকাল থেকে এ রাজ্যের রাজভাষা বাংলা ভাষা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ

"এই রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাংলা ভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুত সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন কর্তব্য প্রজাকে পালন করা, তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা। এই পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগ সুত্রে দীর্ঘতর হয়েছিল।" (১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১২ ফাল্গুন, সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে কবির ভাষণ)।

ত্রিপুরার ৩৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৯ শতাংশ বাঙালি। আর যাঁরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর, তাঁরাও মূলত বাংলা ভাষাতেই লেখালেখি করে আসছেন। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ 'রাজমালা'র প্রথম দুটি 'লহর' পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল

বলে মনে করা হয়ে থাকে। তবে 'রাজমালা' গ্রন্থটি হয়তো অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ হয়েছিল। রাজমালা' ছাড়াও 'কৃষ্ণমালা'(১৭৬০-৮৩),'চম্পকবিজয়' (১৬৯০-১৭০০),'গাজিনামা' (১৬৭৩-১৭১০) প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিক কাব্যগুলিও বাংলার সাহিত্য চর্চার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ইতিহাস-সম্পৃক্ত এইসব জীবনী কাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

দুই

ত্রিপুরায় সবদিক দিয়েই আধুনিকতার সূচনা হয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের (১৮৬২-৯৬) শাসনকালে। তিনি প্রশাসনিক বাংলা ভাষার যেমন সংস্কার সাধন করেন, সাহিত্য চর্চারও তেমনি যথোপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলেন। তিনিই সর্বপ্রথম 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবিকে সম্বর্ধিত করেছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন বিশিষ্ট কবি তথা সাহিত্য প্রেমিক। তিনি বেশ কয়েকটি কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যগুলি হোল ঃ 'প্রেম মরীচিকা' (১৮৯৬ খ্রিঃ এর পূর্বে রচিত ?), 'অকাল কুসুম' (১২৯৬ ত্রিং অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রিঃ), 'উচ্ছ্বাস' (১৮৮৬), 'সোহাগ' (১২৯৩ ত্রিং অর্থাৎ ১৮৮৩ খ্রিঃ), 'শ্রী শ্রী ঝুলনগীতি' (১২৮৮ ত্রিং রচিত কিন্তু ১৩০২ ত্রিং অর্থাৎ ১৮৯২-এ প্রকাশিত) ও 'হোরী'(১৮৯২খ্রিঃ)। বীরচন্দ্র ছিলেন একজন যথার্থ অনুভূতি -প্রবণ গীতিকার। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন বৈষ্ণবীয় ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে তেমনি প্রেমের গভীর দুঃখ-বেদনারও পরিচয় পাওয়া যায়।

বলা যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে ত্রিপুরার কবিরা বৈষ্ণবীয় ভক্তি-গীতির পরিমন্ডল থেকে বের হয়ে আধুনিক গীতি কবিতার জগতে প্রবেশের মানসিকতা লাভ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই উল্লেখ করতে হয় মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর কথা। অসাধারণ প্রতিভাময়ী এই রাজকুমারী খুব অল্প বয়সেই কবিতা চর্চা শুরু করেন পিতা মহারাজা বীরচন্দ্রের অনুপ্রেরণায়। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের কবিতাই ছিল তাঁর কাছে আদর্শ। তিনি যে তিনটি কাব্যরচনা করেন সেগুলি হোল ঃ 'কণিকা'(১৩১১ ত্রি পুরাব্দ অর্থাৎ ১৯০১ খ্রিঃ), 'শোকগাথা'(১৩১৬ ত্রিং অর্থাৎ ১৯০৬ খ্রিঃ) এবং ' প্রীতি'(১৩১৭ ত্রিং অর্থাৎ ১৯০৭ খ্রিঃ)। 'কণিকা' কাব্যটির প্রশংসা করেছেন রাজ সভাকবি মদন মোহন মিত্র। দ্বিতীয় কাব্য 'শোকগাথা' তাঁর প্রয়াত স্বামী উজির গোপীকৃষ্ণ দেববর্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত একটি যথার্থ শোকগীতিকাব্য। প্রখ্যাত কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই কাব্যটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কবির ব্যক্তিগত শোক সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। এই কাব্যের 'চিরস্মৃতি' কবিতাটিতে বাক্‌শক্তিহীন স্বামীর আসন্ন মৃত্যু-বেদনায় ব্যাকুল হৃদয়ের অপরূপ প্রকাশ ঘটেছে এভাবে ঃ

দিবস রজনী হৃদে জাগে নিতি নিতি,
কেবলি বিষাদময় সেই শেষ স্মৃতি।
জন্মশোধ বিদায়ের বিষাদ চুম্বন,

যাতনায় ক্লিষ্ট সেই বিবর্ণ বদন।
আকুল বিষাদভরে হাতে হাত রাখি,
চেয়েছিল অশ্রুপূর্ণ প্রভাহীন আঁখি।

....

সমস্ত জীবনে মম, প্রভাতে সন্ধ্যায়
শুধু সেই স্মৃতি-রেখা হৃদয়েতে ভায়!

বাংলা সাহিত্যে যে দু'জন কবি পত্নী-বিয়োগে শোক -কাব্য রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের একজন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (স্মরণ, ১৩০৯) এবং অন্যজন অক্ষয় কুমার বড়াল (এষা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' অনঙ্গমোহিনীর 'শোকগাথা'র চার বছর পূর্বে রচিত হলেও 'এষা' কাব্যটি 'শোকগাথা'র ছ'বছর পরে রচিত হয়। পতির প্রয়াণে রচিত শোক-গীতি কাব্য হিসেবে 'শোকগাথা' নিঃসন্দেহে অনন্য।

অনঙ্গমোহিনী'র 'প্রীতি' কাব্যের 'অশরীরী জাগরণ', 'আমার ঘর' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট। কবি- হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় ' প্রীতি' র বিভিন্ন কবিতায়। 'আমার ঘর' কবিতাটির কয়েকটি চরণ এরকম ঃ

সুখের কথায় চমকে উঠি, দুঃখ নিয়ে ঘর করি
দিনের আলো ঠেলে ফেলে, টেনে আনি শর্বরী
দুঃখ আমার নিজের সৃষ্টি
নিজের ধন যে বড় মিষ্টি
পরের দেওয়া সুখের ওপর কেন আমি ভর করি।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবি-প্রতিভার প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- ''কণিকা' ও 'শোকগাথা'র কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের একটি স্বাভাবিক সৌরভ অনুভব করি।'' যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত 'বঙ্গের মহিলা কবি' নামক, গ্রন্থে অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবি-প্রতিভার বিশিষ্টতার কথা বলেছেন।

কবি অনঙ্গমোহিন্যী দেবী ছাড়াও কুমুদিনী বসু ('লহরী' ১৮৮৭, 'আভা' ১৯০২), গিরীন্দ্রবালা দেবী, মৃণালিনী দেবী (স্মৃতি), চারুবালা দত্ত, হেমপ্রভা রায়, সুচারু দেবী, ক্ষীরোদবালা দেবী, উজ্জ্বলা দেবী, কমলপ্রভা দেবী(বৈজয়ন্তী) প্রভৃতি মহিলা কবিরা এরাজ্যে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। '

মহিলা কবিরা যেমন রবীন্দ্র-প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কবিতা লিখেও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দান করেছেন, তেমনি গিরীন্দ্র রঞ্জন ভট্টাচার্য ('প্রলয়'-১৯১০, 'মহ'সত্য'-১৯১০, 'অমর'-১৯১০), কামিনী কুমার সেন ('কোরক', 'স্নেহ', 'কিশোর কবিতা'), কবি দৌলত আহম্মদ ('জীবনমঙ্গল'-১৯০৪, 'রাজউৎসব'-১৯০৯, 'রাজশ্রী'-১৯১০) প্রভৃতি কবিরাও যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দান করেছেন। কামিনীকুমারের (১২৬৯-১৩১০) কবিতায় সমাজের অবহেলিত দরিদ্র

মানুষদের বেদনার কথা একান্ত বাস্তবতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে-

দারিদ্র্যের নিপীড়ন
সয়ে সয়ে এতদিন
পাঁজর হয়েছে শেষ
শরীর হয়েছে ক্ষীণ
ভগ্ন রুগ্ন দেহ
ছিন্ন বস্ত্র পরিধান। - (কোরক)

এমন স্পষ্টভাবে দারিদ্রের ছবি এর আগে কেউ এঁকেছেন কি? তখনো কিন্তু নজরুল কিম্বা সুকান্তের আর্বিভাব ঘটেনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরায় বাংলা কবিতার পালা বদলের ইঙ্গিত বিশ শতকের শুরুতেই পাওয়া গেছিল; রোমান্টিক ভাবালুতা থেকে ক্রমশই বাস্তব পটভুমিতে স্থাপিত হচ্ছিল। একদিকে প্রেম-প্রকৃতি, অন্যদিকে মানবিকতা-এই পর্বের কবিতার মূল অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। তবে বহু কবিই রবীন্দ্র- কাব্য ভাবনায় বিশেষ আপ্লুত থাকায় তাঁরা ববীন্দ্রানুকরণেই কবিতা রচনা করেছেন।

তিন

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও দেশ বিভাগ এবং ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্ন্তভুক্তির(১৫ই অক্টোবর) ফলে ত্রিপুরার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটে যায়। পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল বাঙালিরা জন্ম-জন্মান্তরের স্বদেশভূমি ছেড়ে দ্বিতীয় মাতৃভুমির সন্ধানে এখানে এসে নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করেন। তবে অত্যধিক জনস্রোত এখানকার শান্ত, মূলত জুম চাষ নির্ভব জীবনে, প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। এর ফলে পাহাড়-অরণ্য বেষ্টিত জনজাতিদের মৌলিক লোকজীবন এবং বাঙালি ও জনজাতিদের মিলিত-মিশ্রিত সংস্কৃতি অনেকখানি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই ক্রান্তিপর্বের সাহিত্যে তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠতে দেখা যায় অস্থির জীবনের দ্বন্দ্ব ও সমস্যার ছবি- যা আমরা লক্ষ্য করি 'কল্লোল', 'কালি ও কলম', 'প্রগতি' লেখক-গোষ্ঠীর রচনায়। তাই বলা যায় এখানে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার যথার্থ সূচনা হয়েছে স্বাধীনতা - উত্তরকালে। তবে একথা বলা যায় এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা-পূর্বকালেই। আধুনিকতার সলতে যাঁরা পাকিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ঃ অজিতবন্ধু দেববর্মন, সমাচার চক্রবর্তী, নকুল দুদা, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, মণিময় দেববর্মণ, আব্দুল মতিন, কমলপ্রভা দেবী প্রমুখ। এঁদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথে প্রভাব যেমন দেখা যায়, তেমনি আবার জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে'র প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়।এসব কবিদের মধ্যে বিধুভূষণ (১৮৯৭-১৯৬০) বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন কবি ছিলেন। তাঁর শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতা ও উপমা প্রয়োগের অনন্যতা সহজেই চোখে পড়ে। যেমন তিনি

'বনান্তর' নামক কবিতায় যুগসন্ধির সংশয় প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

বল্গাহরিণ নয় -
তুষার মরু - যানবাহী শ্বেতবেনেদের।
উত্তর-পুরুষ ওরা আশ্রয়মৃগের
লালিত সব নর্মহৃষ্টা সু-কুন্তলা শকুন্তলার।
রক্তে তাদের উজ্জীবিত স্নেহাঙ্ক তাপ, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদার
বিমনা সব, চারণ বিমুখ।

চোখে তাদের কুজ্‌জটিকা ধু ধু রোদের,
ধুধুতর অপ্রত্যয়ের,
হেথায় আবার ফলবে কী ভাই দূর্বাদল?
ফেলবে কী ভাই সবুজ ফসল, হরিৎ কোমল কিশলয়
রিক্তাঙ্গনে মেলবে কি আর নবাঙ্কুর?

বিধুভূষণ এভাবে প্রাচীন যুগের শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশের সঙ্গে বর্তমান বন্ধ্যাযুগের তুলনা মূলক ছবি এঁকে আমাদের সংশয়-ক্লান্ত মনের কথাটি প্রকাশ করে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দান করেছেন।

এই সময় পর্বের আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি আব্দুল মতিন (জন্মঃ ১৯২১)। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ -উভয়ের প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়। তবে রবীন্দ্রোত্তর কালের আধুনিকতার সুস্পষ্ট পবিচয় রয়েছে তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহারে ও উপমা প্রয়োগে। তাঁর 'রাত্রি'' শীর্ষক একটি কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধার করে তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয় দান করা যেতে পারে -

পার হয়ে গেছে কত নদ নদী-গিরি উপবন -
আকাশে উধাও হয়ে - রাতে দূর দুরান্তের পারে,
আপন আলয় খোঁজে - কোন গিবি গুহায় আঁধারে,
সিন্ধু সারসগুলি ঐ হয়ত নামিছে এখন। পাখার স্পন্দন
রহিয়াছে লেগে ইথারের গায়ে,
এখানে ঘনায় সন্ধ্যা পথে জনতারা গেছে ফিরে,
অসংখ্য তারা ফুটে ওঠে আকাশের বুক চিরে
আসিয়াছে দিবসের কলরব নগর ঝিমায়।

চার

ত্রিপুরাতে স্বাধীনতা-উত্তরকালে গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্য-চর্চার প্রথম সার্থক প্রয়াস শুরু হয়

'সাহিত্য বাসর'-এর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। এই সাহিত্য বাসরের কেন্দ্রমণি ছিলেন প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। 'সাহিত্য বাসর' প্রতিষ্ঠার কয়েকবছর পরে এই সাহিত্য গোষ্ঠীর দু'জন বিশিষ্ট কবি খগেশ দেববর্মন ও সলিলকৃষ্ণ দেববর্মনের সম্পাদনায় ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় ত্রিপুরার কবিদের প্রথম কবিতা সংকলন 'প্রান্তিক'। এই সংকলনে যাঁদের কবিতা স্থান পেয়েছিল, তাঁরা হলেন রণেন্দ্রনাথ দেব, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন, খগেশ দেববর্মন, সত্যব্রত চক্রবর্তী, প্রদীপ চৌধুরী, কিরণশংকর রায়, অশোক দাশগুপ্ত, প্রবীর দাস, অপরাজিতা রায় এবং করবী দেববর্মণ। এসব কবিদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে কবি হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। অনেকেরই এক বা একাধিক কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আবার অনেকে এখনও নিয়মিত লিখে চলেছেন। একথা আজ নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, ত্রিপুরায় আধুনিক কবিতার যথাযথ পথ নির্দেশের ক্ষেত্রে উল্লিখিত কবিদের মধ্যে কয়েকজনের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁর কথা উল্লেখ করতে হয়, তিনি হচ্ছেন কবি রণেন্দ্রনাথ দেব। বাংলা সাহিত্যের যশস্বী অধ্যাপক সুপন্ডিত কবি রণেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য সত্যিই প্রশংসনীয়। কী শব্দ চয়নে, কী ছন্দ নির্মাণে, কী প্রতীকী ব্যঞ্জনার ব্যবহারে তিনি যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তা এখানকার কবিদের কাছে ছিল অনুকরণের বিষয়। তাঁর প্রথম কাব্য 'প্রথম বৃষ্টির জল'(২৫শে বৈশাখ, ১৯৭০)-এ প্রকৃতির অনুষঙ্গে আধুনিক জীবন-পটভুমিটি যথাযথভাবে রূপলাভ করেছে। এ কাব্যের নাম কবিতা 'প্রথম বৃষ্টির জল' এ তিনি লিখেছেন ঃ

> চৈত্রের প্রথম বৃষ্টি, পথে পথে ভাঙ্গা ডালপালা,
> দু'একটি ফুলের পাপড়ি সিক্ত ঘাসে, মাটিতে নরম
> কীটের পায়ের চিহ্ন, ধূলিহীন সকালের রোদ
> কাঠবিড়ালীর সঙ্গে কিছুক্ষণ করে গেল খেলা।
> আজ তারা কেউ নেই। এ আলোয় কেউ নেই তারা,
> প্রথম বৃষ্টির জল নামেনি যে সব মৃত বীজে।

এই পর্বের আরও এক বিশিষ্ট কবি সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন। অকাল-প্রয়াত এই কবি ত্রিপুরার জল-মাটি-আকাশ-এর সঙ্গে জন্মসূত্রে আবদ্ধ। এখানকার মানুষ প্রকৃতি, বিশেষত মুল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন-সংস্কৃতির ছবি তাঁর রচনায় ফুটে ওঠা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর কবিতায় এখানকার মাটি ও মানুষের কথা তেমনভাবে ধরা পড়েনি। অবশ্য প্রত্যেক কবিই নিজস্ব জগৎ নির্মাণ করে থাকেন, তাই তিনি তাঁর পরিচিত পরিমন্ডলকে নিয়েই কবিতা লিখবেন-এমন কথা বলা যায় না। তবু তাঁর কাছ থেকে হয়তো এখানকার কবিতা-পাঠকরা সেইরকম প্রত্যাশা করেছিল। সলিলকৃষ্ণের প্রথম কাব্য 'জলের ভেতর বুকের ভেতর'(১৯৭৩) ত্রিপুরাতে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। বিশেষ করে তাঁর শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা ও উপমা নির্মাণের বিশিষ্টতা ছিল লক্ষণীয়। অবশ্য তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'মধ্যরাত স্বাধীনতা' (১৯৮৭) তাঁর পরিপূর্ণ প্রতিভার পরিচয়বাহী। অবশ্য অনেক কবিতায় জীবনানন্দের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর 'জলের ভেতর' কাব্যের একটি কবিতায় ক্ষয়িষ্ণু

সময়ের বিবর্ণতার ছবি এঁকেছেন এভাবে ঃ

সময়ের বিবর্ণতা ক্লান্ত ধোঁয়ার মতো
ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে কমিয়ে দিয়েছে
বাতাসের ধার, ফাল্গুনের কৃষ্ণচূড়া
যেন বিদীর্ণ পুরুষ আমার প্রত্যাশিত
জোয়ারের স্বপ্নে, রূপ, রঙ, রেখা যেন
বিলুপ্ত হয়েছে ক্রমাগত সংক্ষিপ্ত কদমে
অথচ উপায় কি তোমাদের অসংখ্য
রক্তাক্ত ক্ষুধা মুখে তুলে ধরি
আমার ফাল্গুনের কৃষ্ণচূড়ার ক্লান্ত উপহার।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় কবি বিজন চৌধুরীর কবিতায়। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় জীবনানন্দের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও তিনি ক্রমশ সব প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব পথ খুঁজে পেয়েছেন। ত্রিপুরার মানুষ ও প্রকৃতি, এখানকার, স্বতন্ত্র পরিবেশ-পটভূমি তার কবিতাতেই সবচেয়ে সার্থকভাবে নিজস্ব রূপ লাভ করেছে। শব্দ ব্যবহার ও প্রতীকী চিত্রকল্প নির্মাণে অসামান্য দক্ষতা এখানকার পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের কাছে অনুকরণযোগ্য হয়ে ওঠে। গত চারদশক ধরে তার কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তাঁর দুটি কাব্যই 'জলপ্রপাতের কাছে নতজানু' (প্রকাশিত হয় ১৪০০ বঙ্গাব্দে), 'সেতুবন্ধ ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৯৫) প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। তার প্রথম কাব্যটিতে ১৯৬২ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালের পর এবং অন্যান্য কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁব দ্বিতীয় কাব্যটিতে। ১৯৬২ সালে লেখা 'উপবনের হাওয়া' কবিতায় কবির অনুভূতির গভীরতা আশ্চর্য রূপ লাভ করেছে নীচের কয়েকটি পংক্তিতেঃ

তবুও স্মৃতিতে জ্বলি, অন্ধ হই প্রেমে
উপবন থেকে সবুজ বৃষ্টির গন্ধ
এলে, হাওয়ায় বুক ভরি, যাই নেমে
গানের নদীতে, দু'হাতে দাঁড়ের ছন্দ
তুলি, স্নিগ্ধ হই, ভাবি অস্মৃতির দান
পারে নাকি ভরে দিতে নিশীথের কান।।

আশি সালের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা কবি-চিত্তকে কতখানি ব্যথিত করেছিল তা '১৯৮০' শীর্ষক কবিতাটি পড়লে বোঝা যায় -

যাচ্ছ, যাও, কী রেখে দিয়ে গেলে
ফিরে তাকাবে কি?

ম্লানমুখ শিশু
হৃতসর্বস্ব পিতা
সন্তান হারা মা
ছিন্নমস্তা গৃহশ্রেণী
আর
হৃদয়ের ভিতরে ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠা কঙ্কাল,
যাচ্ছ, যাও কী রেখে দিয়ে গেলে
ফিরে তাকাবে কি?

সলিলকৃষ্ণ ও বিজনকৃষ্ণের সমসাময়িক আর দু'জন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন অপরাজিতা রায় ও করবী দেববর্মন। অপরাজিতা প্রথমে ছড়া দিয়ে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত কবিতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়েছেন। তাঁর প্রথম ছড়াব (ও কবিতার) বই 'বাইরে বাউল' (১৯৮৩)। তারপরেও ১৯৮৬ সালে আর একটি মূলত ছড়ার বই 'ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা' বের হয়। ২০০০ সালের প্রারম্ভে তাঁর কবিতার বই 'দ্বিতীয় শবীর' বের হয়। এতে ১৯৬১ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে লিখিত ৬৭টি কবিতা রয়েছে। এই সংকলনেব কবিতাগুলি পড়লেই দেখা যায় কবি কীভাবে চার দশকের পথ পরিক্রমার সৃষ্টির পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। ১৯৬২ সালে লেখা 'ত্রিপুবা' শীর্ষক কবিতায় ত্রিপুরার অপরূপ প্রকৃতির প্রতি কবির মুগ্ধতা ও ভালোবাসার পরিচয়টি চমৎকাব ভাবে প্রকাশিত হয়েছে -

নীল পাহাড়ের ছায়া পড়ে যেন দূর আকাশের গায
গেরুযা নদীব জলে
প্রান্তদেশের কাহিনী বুঝি হারায়।
কত ইতিহাস ধুয়ে ধুয়ে নেওয়া গোমতী মনুর ঢেউ,
বাঁকে বাঁকে উপকথা,
রেখা রং দেখে ভাবী কথাকার কেউ।

অপরাজিতা শব্দ, ছন্দ ও উপমা ব্যবহারে যে কতো নিপুণ তা তাব কবিতা অভিনিবেশ সহকারে পড়লেই বোঝা যায়। চার দশকের বেশি সময় ধরে কবিতা লিখে যিনি একটি নিজস্ব ভুবন গড়ে তুলেছেন অনায়াস দক্ষতায়, তিনি কবি করবী দেববর্মণ। তাঁব কবিতা সহজ সরলভাব ও রোমান্টিকতার আশ্চর্য স্পর্শের জন্য সবশ্রেণীর পাঠকের কাছেই আকর্ষণীয়। এ পর্যন্ত তাঁর পাঁচটি কাব্য- 'লুণ্ঠিত সময় সীতা' (১৯৮৫), 'মেরুদন্ড দাও' (১৯৮৬), 'কবিতা আমার সময় অসময়' (১৯৮৬), 'কিছু স্বগতোক্তি কিছু ব্যক্তিগত সংলাপ' এবং সৃজনে উৎসবে' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় অনুভূতির প্রগাঢ়তা যেমন অপরূপ রূপ লাভ করেছে ঠিক তেমনি আবার স্থানিক জীবন ছবি নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর 'সময় এসে' কবিতার কয়েকটি পংক্তি নীচে উদ্ধৃত করে তাঁর রচনা -নৈপুণ্যের পরিচয় দান করা হল ০

তুমি শুধুই বসে থাকো
সময় এসে আছড়ে পড়বে গায়ের ওপর
বুকের মাঝে পায়ের পাতায়
তুমি শুধুই বসে থাকো
পুতুল খেলার ঘরবাড়ি সব রঙিন ফানুস
প্রজাপতি ছুটির মাঠে গল্প গানে
আছড়ে পড়বে গায়ের ওপর
হাতছানিতে ডাকবে তোমায়।

ত্রিপুরার রাজপুত্র প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শচীন দেববর্মনকে নিয়ে লেখা তাঁর একটি অসাধারণ কবিতা- 'অলৌকিক ভ্রমণে রাজপুত্র'। ব্যক্তি শচীন দেববর্মন ব্যক্তিত্বের গন্ডী ছাড়িয়ে কীভাবে সার্বজনীন হয়ে উঠেছেন তা দেখা যাক ঃ

এক হিরন্ময় রাজপুত্র জলে ভেসে যায়
দেখ, আশ্চর্য ভ্রমণ তার জলে জলে সুরে সুরে
ভাটিয়ালি গায়
বাউল হৃদয় তার জলে ভেসে যায়।
জীবন দেখেছ তার?
রাজ্যপাট ছেড়ে যে জীবন
ঘাসে মাঠে নদী বুকে
তিতাসের ছায়া মেখে মেঘনা আদরে
ঘুঘু ডাকা বৈরাগীর বিষন্ন দুপুরে
সোনালী মাছের মত পাখা ছড়ায়
উদাস আকুল হাওয়া ভাটিয়ালি গায়
দেখ, রাজপুত্র একা একা সুরে ভেসে যায়।

ওপরে আলোচিত কবিরা ছাড়াও বিশ শতকের পাঁচ ও ছ'য়ের দশকে অন্য যেসব কবি কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন তাঁরা হলেন শক্তি হালদার, নিধু হাজরা, খগেশ দেববর্মন, মৃণালকান্তি কর, প্রদীপ চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৬৩ সালে 'এক আকাশ তারা' নামে একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়।

পাঁচ

বিশ শতকের সাতের দশক ত্রিপুরার কবিতা চর্চার এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। এই দশকে পূর্বে আলোচিত কবিরা যেমন কবিতা চর্চায় আরও গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়েছেন, তেমনি নতুন প্রজন্মের কবিরা নতুন ভাব-ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। ফলে এই দশকে অনেকগুলি কবিতার

বই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৯ - এই ষোল বছরে যেখানে মোট ১৫টি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৯ এই দশ বছরে প্রকাশিত হয়েছিল ৩৫টি কাব্য। ১৯৭৩ সালে স্বপন সেনগুপ্তের সম্পাদনায় 'দ্বাদশ অশ্বারোহী' নামে একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালেই প্রকাশিত হয় শিশির কুমার সিংহ ও জ্ঞানপ্রকাশ মন্ডলের যুগ্ম কবিতা সংকলন 'আকাঙ্খার মৃত্যু নেই'। ১৯৭৬ সালে রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও অজিতা চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পূর্বমেঘ - সুনির্বাচিত কবিতা সংকলন'। এই পর্বে ব্রততী, সমকাল, চন্দনা, পূর্বমেঘ, নান্দীমুখ, পৌণমী, আহুতি, প্রত্যয় ইত্যাদি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লিটিল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হওয়ায় লেখালেখির ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এই সময় পর্বে যাঁরা বিশিষ্টতার পরিচয় দান করেন, তাঁরা হলেন- কল্যানব্রত চক্রবর্তী, মিহির দেব, অনিল সরকার, রাখাল রায় চৌধুরী, প্রদীপ বিকাশ রায়, পীযূষ রাউত, জ্ঞানপ্রকাশ মন্ডল, সিরাজুদ্দীন আমেদ, শিশির কুমার সিংহ, মানস দেববর্মন, শংকর বসু, স্বপন সেনগুপ্ত, শঙ্খপল্লব আদিত্য, সুব্রত দেব, দিব্যেন্দু নাগ, নকুল রায়, অরুন্ধতী রায়, অসীম দত্তরায়, সুজিত রঞ্জন দাস, রাতুল দেববর্মণ, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, কিশোররঞ্জন দে, কল্যাণ গুপ্ত, সুব্রত দেব , উৎপল সাহা, পূর্ণেন্দু গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ চন্দ, প্রদীপ দত্ত চৌধুরী প্রমুখ।

এই পর্বের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট হলেন কল্যাণব্রত চত্রবর্তী। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'প্রান্তিক' কবিতা সংকলনে তাঁর কবিতা স্থান পেয়েছিল। তখন অবশ্য তিনি সত্যব্রত চক্রবর্তী নামে লিখতেন। সেইসময় থেকে আজও সমানে তিনি কবিতা লিখে চলেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর তিনটি কাব্য বের হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্য 'অন্ধকারে প্রণামের ইচ্ছা হয়' ১৯৭৬ সালে বের হয়েছিল। তারপর ১৯৯৪ এ বের হয়েছে 'লোকালয়ে উদ্ভাসিত মুখ', ২০০০ সালে 'অস্থির দোলনকাল' এবং ২০০১ এ 'যেখানে থামতে হবে'। তাছাড়াও স্বপন সেনগুপ্তের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন 'গঙ্গা-গোমতী' (১৯৮৩) নামক কাব্য সংকলনটি। শহুরে জীবনের বিবর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতা তাঁকে পীড়িত ও বিষন্ন করে। আর তাই তাঁর কবিতায় প্রতীকী ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে শহুরে জীবনের অসারতা -

> যারা কথা রাখে,
> তাদের সঙ্গে একদম দেখা হয় না,
> এমন দীর্ঘ, তামাটে শহরের কাছে।
> পাড় ভেঙে নদী লুকিয়ে রাখে লাশ,
> ফুলশয্যার বাসি-গন্ধ
> গুমঘর থেকে পুলিশ পদচ্যুত নূপুরের
> শব্দ তুলে আনে।

মিহির দেব এই পর্বের আর একজন কবি। 'বাংলাদেশ স্বদেশ ও আমি' নামে তাঁর কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় ছেড়ে আসা স্বদেশভূমির জন্য বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশ ভঙ্গির দৃঢ়তা

এবং শব্দ ব্যবহারে অনায়াস দক্ষতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ত্রিপুরার কবিদের মধ্যে পীযূষ রাউত, স্বপন সেনগুপ্ত ও শঙ্খপল্লব আদিত্য প্রমুখেরা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এঁরা তিনজনই ষাটের দশক থেকে আজও সমানতালে কবিতা লিখে চলেছেন। পীযূষ ও স্বপন এর কবিতা ত্রিপুরার বাইরের পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়ে আসছে। পীযূষের দু'টি কাব্য 'বিষন্ন উদ্যানে বৈশাখ' (১৩৯৬) এবং 'নষ্ট আশ্বিনের অবশিষ্ট মেঘ' (১৯৯৪) প্রকাশের বহু আগে থেকেই কবি হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা। গভীর অনুভূতিপ্রবণ পীযূষ উপমা ও শব্দ ব্যবহারে নিপুণ। এ যুগের মানুষর অসহায়তা ও হৃদয়ের গভীর শূন্যতা তাঁর 'নোঙ্গর' কবিতাটিতে চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে-

তাহলে বৃষ্টির শব্দ আততায়ীর মত
কড়া নাড়ে কেন?
কেন আজ দরোজা খুলতে ভয়?
উঠে গেলেই হয়
দোতলা পেরিয়ে ছাদের উপর
আকাশের বুড়ি ছুঁয়ে বসে না দাঁড়িয়ে।
অথবা দুরন্ত শিশুর মত
নিষেধ ভেঙে ছুটে গেলেই হয়
খো খো মাঠে।
মাঠে গাছ নেই
পাথর নেই
নদী নেই। বাড়ীও নেই।
এতো উদার। কিন্তু যেতে গিয়ে
বারংবার কেন চমকে ওঠে বুক।

স্বপন সেনগুপ্ত দীর্ঘদিন কবিতা লিখে আসছেন এবং 'নান্দীমুখ' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন দীর্ঘদিন। ১৯৬৪ সালে 'নীল আকাশ ঃ পাখি' নামে তার প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর বের হয়েছে আরও তিনটি কাব্যগ্রন্থ - 'লালঘাসে নীল ঘোড়া', 'এ আমার ভিখিরি হাত নয়' এবং সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকী' (জানুয়ারী, ২০০১)। সমকালীন সময়ের সঙ্কটকে তিনি অনায়াস দক্ষতায় তুলে ধরে পাঠকদেরকে চমৎকৃত করে দেন। তাঁর শেষকাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা 'ভুমিপুত্র হও'-এর কয়েকটি পংক্তি এরূপ -

ভি.এম-এ জন্ম নিয়েছে আমার সন্তান,
তাকেও বলেছি তুমি ভূমিপুত্র হও-
চেনো মাটি, শস্যদানা, ধান।
কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, অজ্ঞান-দুপুর নিয়ে
ওর ঘোরাফেরা,
চুল ফেলে যখন তখন সে

হয়ে যায় নাড়া।

শঙ্খপল্লব তাঁর রচনা বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। কবিতার গদ্যশৈলী নির্মাণে তিনি রীতিমতো স্বকীয়তার পরিচয় দান করেছেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতার পরিসর দীর্ঘ। গদ্য-পদ্যের অনায়াস মেলবন্ধনে তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে নতুন ভঙ্গিমায়। তাঁর 'মুক্তাগাছার মহারাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর রচনারীতির পরিচয় দান করা যেতে পারে -

আজকাল নববিবাহিত যুবকেরাও পূর্ণিমার
জ্যোৎস্না লুঠ করে কোন রমনীর কাছে বেশী দামে বিক্রী
করে না, চনমনে ঘোড়াগুলিরও নেই সেরকম জিন ও সহিস,
জ্যোৎস্না লুঠের পয়সায় নেশা করে হাওড়ার
পান্ডুর চাঁদ ও চাঁদপুরের ইলিশ
কিনে অযথা বউকে জাগায় ক'জন উজ্জ্বল যুবক?

অনিল সরকার ত্রিপুরার একজন বিশিষ্ট কবি। ছড়া রচনাতেও তাঁর নৈপুণ্য অসামান্য। প্রথমদিকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গমূলক ছড়া লিখেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। গত তিরিশ বছর ধরে লেখা তাঁর কবিতার সংখ্যা কম নয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বজনের মুখ' (১৯৮৩), তারপর বের হয় 'পুবের হাওয়া', 'প্রিজন ভ্যান' (১৯৯৪), 'শেষ পল্টন', 'ব্রাত্যজনের কবিতা' (১৯৯৫) প্রভৃতি। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর স্বনির্বাচিত কবিতা- যার মধ্যে রয়েছে ২০৮টি কবিতা ও ছড়া। তাঁর কবিতা শোষণ, নির্যাতন ও অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার। তাই তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে ক্ষোভ ও বেদনা। তাই 'কবিতা সম্পর্কিত কবিতা' -য় তিনি বলেনঃ

কবিতা একটি কবির প্রার্থনা নয়
কবিরা এখন যোদ্ধা
কলম ক্ষিপ্ত তরবারির মতো
যুদ্ধের প্রস্তুতি শুধু
কালি শুধু রঙ নয়
মেহনতের প্রেমে ও ঘামে লালিত
বুকে বুকে রক্তপাতের ভয়ানক দাগ।

তবে সংগ্রামী কবির হৃদয়েও জাগে প্রেম, ভালোবাসা। তাই 'বুকের ভিতর' তিনি অনুভব করেন-

ইদানীং তুমি আসো বারে বার
আমার সত্তায়
ঢেলে দাও আশ্চর্য অনুভব
প্রতি মুহূর্তের ভাবনায়

তুমি এলে, পায়ের নরম শব্দে
অকস্মাৎ কোন পাখি জেগে ওঠে
বুকের ভিতর,
কোন্ গান বেজে ওঠে,
যেন কোন্ ফাল্গুনে
প্রথম বসন্ত আসে
উচ্ছ্বাসিত প্রথম প্রণয়।

সত্তরের দশকের কবি হিসেবে যাঁরা বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দান করেছিলেন তাঁরা হলেন প্রদীপ বিকাশ রায়, জ্ঞানপ্রকাশ মন্ডল, শিশির কুমার সিংহ (আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু নেই', ১৯৭৩) , সিরাজুদ্দীন আমেদ ('অনুক্ষণ সংগ্রাম','বন্দী জেগে ওঠো', 'স্বপ্নের ক্ষেতে দ্বিখন্ডিত চাঁদ'), শংকর বসু, দিব্যেন্দু নাগ, অরুন্ধতী রায় ('শব্দ ও বর্ণেরা', 'চিলে কোঠার জানালায় ফেরা পাখি') নকুল রায়, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ। এই সব কবিদের মধ্যে অনেকেই এখনো কবিতা লিখে থাকেন। তবে আজও যে দু'জনের কলম বিশেষভাবে সচল রয়েছে তাঁরা হলেন নকুল রায় ও বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী। নকুলের প্রথম কবিতার বই 'হৃৎপিন্ডের হাট' বের হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। তারপর তাঁর আরও যে কয়েকটি কাব্য বের হয়েছে সেগুলি হল-'পাঁজরের এন্টেনা' (১৯৮৩), 'দ্রোহ জাগরণে' (১৯৮৮), 'শেকড় বাকলে' (১৯৯৮)প্রভৃতি। নকুল নিঃসন্দেহে একজন প্রতিভাবান কবি। তাঁর শব্দ ব্যবহারের অনায়াস দক্ষতা প্রশংসনীয়। বিমলেন্দ্র ছড়া লেখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তবে তিনি বিচিত্র ধরনের অজস্র ছড়া লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলেও কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন 'কাকতাড়ুয়া' (১৯৮৩) 'কানামাছি' (১৯৮৬), 'রাবন রাজা'(১৯৯২) প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে একজন অকালপ্রয়াত কবি সুজিতরঞ্জন দাশের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁর মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা লক্ষ্য করা গেছিল, কিন্তু তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা তাঁর পরিপূর্ণ প্রতিভার ফসল থেকে বঞ্চিত হলাম। তাঁর প্রথম কাব্য 'অন্তরাল' (১৯৭৪)। তারপর 'এবং পিংকু' (১৯৮৪), 'রিক্তা পিংকুদের গল্পো' (১৯৮৫) প্রভৃতি বইগুলো বেব হয়।

ছয়

সত্তর দশকের শেষ দিকে শুরু করে আশির দশকে যাঁরা পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছিলেন তাঁদর মধ্যে যাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন- সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম দত্ত রায়, কল্যাণ গুপ্ত (দুই সিঁড়ি, ১৯৮৪), সমরজিৎ সিংহ, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, কৃষ্ণধন নাথ, সন্‌জিৎ বণিক, কিশোর রঞ্জন দে, উৎপল সাহা, রাতুল দেববর্মন, সন্তোষ রায়, দিলীপ দাস, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, নন্দকুমার দেববর্মা, লক্ষ্মণ বণিক প্রমুখ। সদ্য প্রয়াত সত্যেন একজন খ্যাতিমান কবি।

তাঁর অনেকগুলি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্য 'লক্ষ চোখের সামনে'(১৯৭৩)। স্পন্দন' নামে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। অসীমের প্রথম কাব্য 'ব্যক্তিগত ডিজনিল্যান্ড'(১৯৩৬) -এ তার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া গেছিল। সমরজিতের প্রথম কাব্য 'মাধবীলতা' ১৯৭৯ তে বের হয়েছিল। এরপর ১৯৯৩-এ বের হয় 'নষ্ট বুদ্ধের আত্মা'। কিশোর খুব অল্প বয়সেই কবিতা লিখে কবিতা প্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর লেখার হাত খুব মিষ্টি। সহজ সরল ভাষায় ইমেজ সৃষ্টিতে তিনি নিপুণ। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'কবিকে পাথর ছুঁড়ে মারো' ১৯৮৬ তে বের হয়েছিল। সন্তোষ একজন নিষ্ঠাবান কবি। সন্তোষের প্রথম কাব্য 'কালো ঘোড়ার গান' (১৯৮৩) এবং তারপর বের হয়েছে 'নদীমাতৃক', 'ঘরে কেউ নেই'। রাতুল ছোট ছোট আঁচড়ে মনে ঘা দেন পাঠকদের। তাঁর কবিতার ভাবসংহতি অবশ্যই লক্ষণীয়। তাঁর প্রকাশিত কাব্য 'পাশাপাশি হাঁটি (১৯৮৫), 'শাখানটাঙের অবাক বালক' (১৯৯৮), 'খোঁয়াড়ের শব্দকল্প' (স্বপন নন্দীর সঙ্গে ১৯৮৩। রামেশ্বর, কল্যাণ, সন্জিৎ, উৎপল, লক্ষ্মণ প্রমুখ কবিবা রীতিমতো বিশিষ্টতার পরিচয় দান করেছেন। তাঁদের এক বা একাধিক কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। সন্জিতের 'কবর খোঁড়ার আওয়াজ'(১৯৮৫), 'প্রেম ও পুনর্জন্ম' (১৯৮৭), 'মানবতা' (১৯৮৭) প্রভৃতি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। দিলীপ দাস একজন সমাজ সচেতন নিষ্ঠাবান কবি। সামাজিক অসঙ্গতি ও অবিচারের কথা তিনি তাঁর কবিতায় সহজ ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'সময় ছুটছে' ১৯৮৬তে বের হয়েছিল। ২০০০ সালে বের হয়েছে 'মাস্তুলে মেঘের পতাকা'। এই কা্ব্যেব প্রথম কবিতা 'মেঘ শিকার'-এর কয়েকটি পংক্তি এরকম ঃ

কাল রাতে মেঘ ধরতে গিয়েছিল সে
তখন শিশিরের ভাষায়
রাত কথা বলে -- মেঘগুলো নুয়ে আসে
বাঁশবনের ডগায়। চাঁদের লন্ঠন জ্বেলে
সারারাত কচি বাঁশপাতা খেয়ে
ভোর হলে রোদ্দুরেব কাছে চলে যায়।

আর একজন অত্যন্ত সমাজ -সচেতন কবি কৃত্তিবাস। গত দু'দশকের বেশি সময় ধরে কবিতা লিখে আসছেন অনায়াস দক্ষতায়। ১৯৮৭ সালে তঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোড়ামাটির মানচিত্র ও অন্যান্য কবিতা' বের হয়েছিল। ১৯৯৪- এ বের হয়েছে 'উৎস -অন্তহীন পথে' এবং বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে যুগ্ম সংকলন 'নাও ভাসালাম জলে'। 'অতলান্তের দুদিক' ১৯৮৯ এ প্রকাশিত হয়েছে এবং 'দাগ' প্রকাশিত হয়েছে ২০০১-এ। তাঁর একটি বিশিষ্ট কবিতা 'হারাধন কুরি'র কয়েকটি পংক্তি উদ্বৃত করা যেতে পারে ঃ

আমরা দেখেছি তাঁকে,
পাঁজ ফাটিয়ে মাঠ কিভাবে উর্বরা করে ভাঙাচোরো হারাধন কুরি
কাদামাখা কোলে যাঁর অবাক পৃথিবীর এক উত্তরাধিকার

হোক ভুখা নাঙা তবু নিশ্চিত নিরুপদ্রব ভাবে পিতৃক্রোড়।

সাত

আশির দশক থেকে যেসব কবি বিশেষ প্রতিশ্রুতি নিয়ে কবিতা চর্চা শুরু করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন - কল্লোল দত্ত, অজিতা চৌধুরী, দীপঙ্কর সাহা, পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী, হিমাদ্রি দেব, তাপস দাস, শুভেশ চৌধুরী, নকুল দাস, সুবিনয় দাশ, পাঞ্চালী দেববর্মন, মৃন্ময় সেন, দেবাশিস ভট্টাচার্য, মলয় চক্রবর্তী, সেলিম মুস্তাফা, মাধব বণিক, সুনীল ভৌমিক, অশোক দেব, দেবাশিস্ চৌধুরী , সুভদ্রা সিংহ, প্রত্যুষ দেব, চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং, কৃষ্ণধন আচার্য, মণিকা বড়ুয়া, পল্লব ভট্টাচার্য প্রমুখ। এসব কবিদের মধ্যে কারও কারও এক বা একাধিককাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৫ তে 'উড়ে যায় স্বর্ণমেঘ' কবিতা সংকলনের সম্পাদনা ছাড়াও কল্লোলের নিজের কবিতার বই 'এইখানে রাখো হাত' (১৯৮৮) বের হয়। মহিলা কবিদের মধ্যে অজিতা, পাঞ্চালী ও মণিকার কবিতার বই বের হয়েছে। অজিতার 'কবির ভূখন্ড ও অন্যান্য ফেরী' (১৯৯৬) এবং 'নষ্ট পাহাড়' (২০০২), পাঞ্চালীর 'এ আমার জন্য নয়' (১৯৮৫), মণিকার 'প্রতিরোধ' (১৯৯৪) ও 'মেঘের আড়াল থেকে' (১৯৯২) কাব্যগ্রন্থগুলিতে রীতিমতো স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। অজিতা ও মণিকার বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্টতা ও ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্য প্রশংসার দাবী রাখে। দীপঙ্কর খুব অল্প সময়েই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছিলেন। যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিবান দীপঙ্করের অকাল প্রয়াণে আমরা তাঁর পরিপূর্ণ প্রতিভার সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হলাম। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগুলি হলো- 'নিষিদ্ধ এলাকা', 'মিলিত কান্নাকাটি ও দেব বাণী', 'উৎসবের ভিতর দীর্ঘ কফিন' এবং 'স্বনির্বাচিত কবিতা' (১৯৯২)। শুভেশ স্বল্প পরিসরে এক একটি বিষয় বা ভাবকে রূপ দেন কবিতায়। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগুলি হলো -'মুখাবয়বের ধারাপাত' (১৯৮৬) , 'বীথি ও কস্তুরী' (১৯৮৭),'কারায় ও ক্রান্তিতে(১৯৮৯), 'কর্কটক্রান্তিতে রোদ্দুর' (২০০১)। এছাড়া নকুলের 'আলো ছাড়া অন্য কিছু নেই',মৃন্ময়ের'অন্তর্যামী শব্দমালা'(১৯৮৭), 'শব্দ ভাসানে কে যায়' (১৯৮৯), 'অতএব কুরুক্ষেত্র' (১৯৯০), মলয়ের 'কল্লোল ধ্যান', 'অরণ্যেব উপমহাদেশ', 'আকাশে অনেক সূর্য'; মলযের 'কল্লোল ধ্যান', মাধবের 'প্রদত্ত বিন্দুসার' ও 'বনজ ঘোড়ার পায়ের শব্দ (২০০০), দেবাশিসের 'পোড়ে ফুল এঁটো আঙিনায়', প্রত্যুষের 'পৃথার জন্য প্রত্নকথন' (২০০১) এবং ছড়ার বই 'রূপকথা নয়, চুপকথা' (২০০১), চন্দ্রকান্তের দ্বিভাষিক (কক্‌বরক ও বাংলা) কাব্যগ্রন্থ - 'হলংকক সাতা বলঙ বিসিংগ' (পাথর কথা বলে বনের ভেতর, ১৯৯৫) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহজ সরল শব্দ ব্যবহারের দ্বারা চন্দ্রকান্ত মানুষের দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থার ছবি আঁকেন অনায়াস নৈপুণ্যে - 'হাচুকরাই, তুই যে মাটি ছুঁবি, শপথ নিবি/তোর তো মাটি নাই,/ শেষ হয়েছে বিকোতে বিকোতে/ অন্ধটার চোখ কাটাতে ভাই।' উল্লেখিত কবিরা ত্রিপুরায় আধুনিক কবিতার নতুন পথ তৈরি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্নশীল।

নব্বই-এর দশকে, অর্থাৎ গত দশ বছরে, যেসব কবি নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত

হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রবুদ্ধসুন্দর কর, স্বাতী ইন্দু, মধুমিতা নাথ, অশোক দেব, অর্পিতা আচার্য, মিত্রারুণ হালদার, অপাংশু লোধ, সুরঞ্জন কুন্ডুচৌধুরী, জাফর সাদেক প্রমুখের কথা। এঁদের মধ্যে কারও কারও এক বা একের অধিক কাব্যগ্রন্থ বের হয়েছে। প্রবুদ্ধ ও অশোকের সম্পাদনায় বের হচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'বাংলা কবিতা।' প্রবুদ্ধ' র 'ডার্ক‌রুম ও মঘানক্ষত্র', অশোকের 'মমির কাছাকাছি', স্বাতী ইন্দুর 'বিপদ সঙ্কুল মুগ্ধতা', জাফর সাদেকের 'নিহিত রাত্রির দরজা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি সবদিক দিয়েই নতুনত্বের স্বাদ এনেছে। সামাজিক সংকট, মূল্যহীনতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলি উল্লিখিত কবিদের কবিতায় যথাযথভাবে উপস্থাপিত। বর্তমান যুগের মানসিক সংকটকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তাঁরা যেভাবে তুলে ধরছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। উদাহরণস্বরূপ প্রবুদ্ধর 'অনিদ্রা বীজ' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে -

ঘুমন্ত মানুষকে কখনো শিশু মনে হ.য়
একটি কিশোরীও ফিরে পায় শৈশব মুদ্রা
মধ্য রাতের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে অনিদ্রা বীজ
শুধু ঘরময় এক বিপন্ন ঘাতকের পায়চারী,
যদি বিশালতা এমন সমুদ্রের মুখোমুখি
দাঁড়াল মুছে যায়নি গ্লানি, নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবি
মহাকাশের তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে পুড়ে যায়
ঘাতকের ছুরি

পল্লবের কবিতায় হতাশা, ক্ষোভ ও যন্ত্রণা প্রকাশিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিমায়-

আকাশ বাতাস ভরেছে খিদেয়, কান্‌ছি আমি কান্‌ছি মেয়ে
শূন্য খেয়ে ভরাচ্ছি পেট কাসছি আমি কাসছি মেয়ে
হং যং বং রং সব দিচ্ছি তোকে, পেট পুরে খা,
পেট পুরে খা মেয়ে আমার মাথায় রেখে ক্ষুধার্ত পা।
ছাইপাঁশ সব গিলছি আমি, রক্ত চুষেছি স্তন্যধারা
খেয়ে দেয়ে তাগরা হলে ঘুমিয়ে শরীব রাখব খাড়া
- (খেয়োখেয়ি)

আবার অর্পিতার কবিতায় ফুটে ওঠে প্রেমের যুগোচিত যন্ত্রণা, ক্ষোভ ও বেদনা এক অদ্ভুতবিষন্নতায়-

তুমি যদি পাখি হও পাখনা ছড়াও, রয়েছে বান্ধবী কত
সুদর্শনা অথবা সৈরিন্ধ্রী
আমি তো আমার মতো-
শ্মশানেতে ছড়িয়েছি চুল,

দুচোখে আমার দেখ কাজলের কোন চিহ্ন নেই।
ঠোঁট থেকে চাও যদি নাগকেশর পারি না ছড়াতে
এক মুঠো ধুলো আছে
সর্ষে কিছু ছড়ানো রাস্তায়
লক্ষ্মীছাড়া আঁচলেতে দুঃখ ছাড়া কিছু নেই আর।

আট

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে গত পঞ্চাশ বছরে এখানে বাংলা কবিতার যে চর্চা হয়ে আসছে তাতে বার বার গতি পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতা-পূর্বকালে এবং তারপরেও বেশ কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতির অনুকরণ ও অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। তবে পাঁচের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয় কবি জীবনানন্দের ব্যাপক অনুসরণ ও অনুকরণ। অবশ্য কবি বিষ্ণু দে ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবও অনেকের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের মতো ত্রিপুরাতেও ষাটের দশকে হাংরি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এবং ত্রিপুরার কাব্য-চর্চায় তারা ব্যাপক আলোড়নও সৃষ্টি করেছিলেন। এই হাংরি গোষ্ঠীর কয়েকজন বিশিষ্ট কবি হলেন ঃ তাপস শীল, প্রদীপ চৌধুরী, অজিত ভৌমিক, দিব্যেন্দু নাগ, মানিক চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিশ শতকের ষাটের দশকে এখানে কবিতা লেখার যে বিশেষ প্রচেষ্টা শুরু হয় তাই কবিতা-আন্দোলনের রূপ নেয় সত্তরের দশকে। এই দশকেই প্রকাশিত হয় এ রাজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন, যেগুলির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া অনেক কবির নিজস্ব কবিতার বই প্রকাশ ছাড়াও ত্রিপুরার কবিদের কবিতা -সংকলন ও প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৩ তে 'প্রান্তিক' নামে কবিতা সংকলন বের হয় মাত্র কয়েকজন কবির কবিতা নিয়ে। ১৯৬৩ তেই প্রবীর দাশ ও শ্রীবাস ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আর একটি কবিতা সংকলন 'এক আকাশ তারা'। ১৯৭৩ -এ স্বপন সেনগুপ্তের সম্পাদনায় ত্রিপুরার বারোজন কবির কবিতা নিয়ে বের হয় 'দ্বাদশ অশ্বারোহী'। এরপর একটি বৃহৎ কবিতা সংকলন 'নীল পাহাড় সোনালী ঢেউ' বের হয়। ১৯৭৬-এ আর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা সংকলন রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও অজিতা চৌধুরীর সম্পাদনায় 'পূর্বমেঘ - সুনির্বাচিত কবিতা সংকলন' বের হয়। এই সংকলনে ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য সমস্ত কবিদের কবিতা-ই সংকলিত হয়। কল্যাণব্রত চক্রবর্তী ও স্বপন সেনগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'গঙ্গা গোমতী' (১৯৮৩), কল্লোল দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'উড়ে যায় স্বর্ণ মেঘ' (১৯৮৫), বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী ও কল্যাণব্রত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বক্ষস্থলে নিবিড় জোনাকি', নিলিপ পোদ্দারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জেগে থাকে অনন্তকাল' (১৯৮৫), শিশিরকুমার সিংহের সম্পাদনায় একচল্লিশ জন কবির কবিতা নিয়ে প্রকাশিত 'ত্রিপুরার আধুনিক কবিদের স্বনির্বাচিত কবিতা' সংকলন, রূপক দেবনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত

'ত্রিপুরার প্রাচীনকাল থেকে অতি সাম্প্রতিককালে রচিত কবিদের কবিতা সংকলন 'ত্রিপুরায় বাংলা কবিতা ১৪০৭-১৯৯২' (১৯৯৩), জহর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'পূবের হাওয়া ঃ ত্রিপুরার আধুনিক কবিদের কবিতা সংকলন'(১৯৯৪) প্রভৃতি কবিতা সংকলনগুলি এরাজ্যের কবিদের উল্লেখযোগ্য কবিতা সংকলন। এই সংকলনগুলির কবিতাগুলি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই এরাজ্যের কবিতার ক্রম বিবর্তনের স্বরূপটি যেমন বোঝা যাবে, তেমনি এখানকার কবিদের বিশিষ্টতার পবিচয়ও পাওয়া যাবে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ত্রিপুরার বাংলা কবিতা পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশের আধুনিক কবিতা থেকে আলাদা গোত্রের কিছু নয়। তবে একথা অবশ্যই স্বীকাব কবতে হয় যে এখানকার জল-মাটি-হাওয়া ও বিচিত্র মানবগোষ্ঠী এবং প্রকৃতির অপরূপ রূপবৈচিত্রের অনুষঙ্গে রচিত কবিতা ভিন্ন স্বাদেব সৃটি করেছে। তাই ত্রিপুরার আধুনিক কবিতা বাংলা কবিতার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিশেষ কবে গত দশ বছর ধবে যেসব কবি সম্পূর্ণ নতুন চেতনা নিয়ে কবিতা রচনা কবেছেন তাঁরা ত্রিপুবার বাংলা কবিতাকে নতুন ধাবায় প্রবাহিত করতে যথেষ্ট যত্নবান হযেছেন। আমবা বিশ্বাস করি যে, অদূব ভবিষ্যতে এ বাজ্যের বাংলা কবিতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র ধারার মর্যাদা লাভে সমর্থ হবে।

ত্রিপুরার প্রথম বঙ্গ -সাহিত্য সম্মেলন শতবর্ষ পরিক্রমা (১৩১২-১৪১২)

ডঃ সুচিন্ত্য ভট্টাচার্য

বঙ্গ -সাহিত্য সম্মেলন সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গ-সংস্কৃতির পীঠস্থান ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়। সেদিনের ঐতিহাসিক সাহিত্যবাসরে পৌরোহিত্য করেছিলেন ত্রিপুরার পরমাত্মীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। সভাপতি রূপে কবিকে সাদবে বরণ করেন তাঁরই অন্তরঙ্গ বন্ধু ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর মাণিক্য । আলোচ্য অনুষ্ঠানের তারিখটি ছিল ১৭ আষাঢ়, ১৩১২ বঙ্গাব্দ (ইংরেজী ১৯০৫)। সম্মেলন স্থল উমাকান্ত একাডেমি, আগরতলা ।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিংশ শতকের গোড়াতেই বাংলার সংস্কৃতি-মনস্ক বিদগ্ধজনেরা যখন বঙ্গীয় - সাহিত্য সম্মেলন গড়ে তুলবার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তখন এই সময়টা ছিল ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, একটি ঐতিহাসিক প্রতিবেদনে দেখা যায় সম্মেলনেব প্রকাশ্য অধিবেশন হয়েছিল মুর্শিদাবাদেব কাশিমপুরে ১৩১৪ বঙ্গাব্দেব ১৭-১৮ কার্তিক। কিন্তু লক্ষ্যণীয বিষয হল ত্রিপুবাব বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন এবং তৎসঙ্গে আঞ্চলিক (ত্রিপুরা) সাহিত্য সম্মেলনীও গড়ে উঠেছিল কাশিমবাজার সম্মেলনেব দু-বছর আগে অর্থাৎ ১৩১২ বঙ্গাব্দে। অন্য একটি প্রতিবেদনে বাঙালিব সাংস্কৃতিক কীর্তি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা লগ্ন ১৩২৮ বঙ্গাব্দ এবং প্রথম অধিবেশন বসে বারাণসীতে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে। উভয স্থানেই সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সময়ের বিচারে প্রমাণিত হয় বাবাণসী বঙ্গ -সাহিত্য সম্মেলন হয় ত্রিপুরা বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনেব দীর্ঘ সতেরো বছর বাদে। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এটা সুস্পষ্ট বাংলার বাইবে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনটি হয় ত্রিপুরায়। আজ যা শতাব্দীর ইতিহাস।

ত্রিপুরায় বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রচর্চার প্রবীণ গবেষক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ বহুকাল হইতে স্থানিক সাহিত্য পরিষদ স্থাপনেব কথা সুপারিশ কবিযা আসিতেছিলেন কিন্তু তখন পর্যন্ত তাহা কোথাও কার্যে পবিণত হয নাই। ত্রিপুরাই অগ্রসর সঙ্গে রাধাকিশোর মাণিক্যেব বন্ধু প্রীতি অন্যতম কাবণ। এই বক্তব্যেব পবিপ্রেক্ষিতে কর্নেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববমার 'ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ' (১৩২৭ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধটি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। ঠাকুর মহিমচন্দ্র বলেন, 'বন্ধু -বল বলিতে তাঁহার (মহারাজ রাধাকিশোর) কিছুই ছিল না। তিনি বলিতেন, 'অর্থবল কিংবা যেকোন প্রকারের বলই বল না, বন্ধু বল সকলের অপেক্ষা মূল্যবান । তিনি (বাধাকিশাব) প্রথমে রবিবাবুকে টানিয়া লইলেন।'সুতরাং বলা যেতে পারে বন্ধুত্বের সূত্র ধরেই কবির প্রথম ত্রিপুরায় আগমন (১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। অনতিকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বন্ধু হিসেবে স্যার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, মহারাজ স্যার যতীন্দ্রনাথ,

নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাংলার খ্যাতনামা মহাপুরুষদের সঙ্গে ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। স্বল্পকাল পরে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিন্‌হা, স্যার রাজেন্দ্রলাল, স্যার টি পালিত, স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর মতো বিশাল মাপের ব্যক্তিরা গুণাকৃষ্ট হয়ে মহারাজের বন্ধু বল বৃদ্ধি করেন ।

মহারাজ রাধাকিশোরের চারিত্রিক মহানুভবতাও ছিল চোখে পড়ার মতো। 'সঞ্জীবনী' পাঠে মহারাজ যখন জানলেন কবিবর হেমচন্দ্র অন্ধ এবং অর্থাভাবে বিপন্ন, তখন তিনি নিজ তহবিল থেকে ত্রিশ টাকা বৃত্তি তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রতিদান স্বরূপ মঞ্জুর করেন। কবি হেমচন্দ্রের দুর্দশার জন্য তিনি ব্যথিত হৃদয়ে বলেছিলেন, 'আমি বাংলার ক্ষুদ্র রাজা হইলেও আমি বর্তমানে তাহাকে যদি কবি মাইকেল মধুসূদনের মত দাতব্য চিকিৎলয়ে পড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয়, তবে দেশের চরম দুর্ভাগ্য। ..... তোমরা আমার পারিষদরা নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে। আর আমাকে যে কতদূর যাইতে হইবে তাহা জানি না। তোমাদের চক্ষু, কর্ণ যেন এইরূপ ব্যাপারে বন্ধ না থাকে, মন যেন সদা-সর্বদা খোলা থাকে।" সুতরাং ইহা অতিশয়োক্তি নয় যে বাংলার বন্ধুবলের দ্বারা মহারাজ একদিকে যেমন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করেন আবার অন্যদিকে তাঁর দয়াদ্রচিত্ত দ্বারা তিনি বাংলার হৃদয় জয় করেন।

ত্রিপুরার বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ছয় বছর পূর্বে (১৩০৬ বঙ্গাব্দ) কবিবর আগবতলায় পদার্পণ করেছিলেন মহারাজ রাধাকিশোরের ব্যক্তিগত রাজ -অতিথি রূপে। তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল রাজধানী আগরতলার উত্তরে কুঞ্জবনের সু-উচ্চ টিলাভূমির এক মনোরম পরিবেশে। সেদিনটি ছিল শ্রী পঞ্চমীর বসন্তোৎসব। ত্রিপুরার আদিবাসীদের ঐতিহ্যমন্ডিত টং ঘরের আদলে সম্বর্ধনাসভার মঞ্চ সাজানো হয়েছিল। অদূরে ছোট বড় পাহাড়ের নয়নাভিরাম অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য। কবিগুরুর আশীর্বাদধন্য সত্যরঞ্জন বসুর ভাষায়, 'এই প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনকে আরও সম্বর্ধিত করিয়াছে দলে দলে নৃত্যগীতবত মণিপুরী শিল্পীবৃন্দ । নগ্নগাত্র, পরিধানে বাসন্তী রং-এর পাগড়ি, খোল, মন্দিরা, করতালের সমতালে পদবিক্ষেপ ও দেহভঙ্গিমা - দীর্ঘালয়ে কীর্তনের সুর এক মোহময় আবেশ রচনা করিতেছিল। দর্শক যাহারা, তাহারাও স্ত্রী-পুরুষ সেই বাসন্তী রং-এর পরিচ্ছদে ভূষিত। এই পরিবেশের মধ্যে কবি ও রাজা মঞ্চোপরি বন্ধু রাধাকিশোর আয়োজিত সম্বর্ধনায় কবি যেমন অপবিসীম আনন্দে আপ্লুত হয়েছিলেন ঠিক তেমনি মহারাজ রাধাকিশোরও এক বছর বাদে (১৩০৭ বঙ্গাব্দ) কবি বন্ধুর উদ্যোগে কলকাতার 'সঙ্গীত সমাজ' আয়োজিত অভূতপূর্ব সম্বর্ধনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন উদ্বোধনী সঙ্গীত-এ 'তব ভালে জয়মালা, ত্রিপুরা পুরলক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা।' সংগীতটি পরিবেশন করলেন নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ। পরে 'বিসর্জন' নাটক অভিনীত হল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্কস্ট্রিট-এর বিশাল বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ নাটকে রঘুপতি সেজে এমন অভিনয় করলেন যে তৎকালীন 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক মহোদয় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে কবির ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেদিনের 'বিসর্জন' নাটকে ত্রিপুরার মহারাজ[illegible] ব্রজেন্দ্রকিশোরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন,
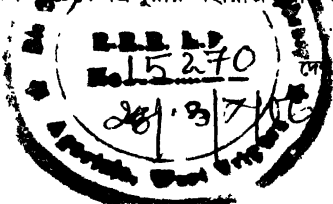
'কলিকাতার অভিজাত বনিয়াদ পরিবারের শিক্ষিত যুবকগণই এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেকেরই এমন কী নারীর ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী যুবকদের অভিনয় সর্বাংশে সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

শতবর্ষ আগে মহাসম্মেলনের ঐতিহাসিক ঘটনাটিও ছিল অভূতপূর্ব। বিদ্যালয়ের প্রশস্ত গৃহে সাহিত্য সভা উপলক্ষে মঞ্চোপরি দুটি আসন নির্দিষ্ট ছিল ।একটি আসন মহারাজ রাধাকিশোরের জন্য এবং অন্যটি সভার সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্য। কবি সভায় উপস্থিত হলে মহারাজ রাধাকিশোর সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে কবিকে বরণ করেন। ত্রিপুরাধিপতি কিন্তু মঞ্চের নির্দিষ্ট আসনে না বসে সর্বসাধারণের সঙ্গে একাসনে বসে পড়েন। অপ্রস্তুত রবীন্দ্রনাথ সংকোচে মহারাজকে নির্দিষ্ট আসনে বসতে অনুরোধ করেন। মহারাজ রাধাকিশোর বিনয় সহকারে বললেন, 'সাহিত্য ক্ষেত্রে আপনার স্থান সর্বোপরি। আপনি সাহিত্যের রাজা। আমি আপনার ভক্ত বন্ধুমাত্র। এ উচ্চ মঞ্চ আমার স্থান নহে।' সেদিনের এরূপ দুলর্ভ ঘটনায় উপস্থিত সমস্ত দর্শক এবং প্রজাবৃন্দ ত্রিপুরাধিপতির বিনয় -নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ এবং গৌরবান্বিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ এ দৃশ্য দেখে অনির্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন ছয় বছর পূর্বে কবি যখন প্রথমবার ত্রিপুরায় পদার্পণ করেন তখন তিনি এসেছিলেন ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোরের রাজ অতিথি হয়ে। সে অভ্যর্থনা ছিল রাজার, ত্রিপুরাবাসী জনসাধারণের নহে। কিন্তু ১৭ আষাঢ়, ১৩১২ বঙ্গাব্দের ত্রিপুরায় বঙ্গ-সাহিত্য মহাসম্মেলনের অভ্যর্থনাটি ছিল রাজা, প্রজা আপামর জনগণের। সভার উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ 'দেশীয় রাজ্য ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি কবির মমত্ববোধটি লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন, 'দেশীয় রাজ্যের ভুল ত্রুটি - মন্দগতির মধ্যে আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে। তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই কারণেই এখানকার রাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে সকল অভাব ও বিঘ্ন দেখিতে পাই, তাহাকে আমাদের সমস্ত বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি।' বৃটিশ ভারতের ঔপনিবেশিক 'কিল বিদুবীরতাং সারমেকং' - বীর্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য''। উপসংহার টেনে কবি ত্রিপুরার কাছে আশা প্রকাশ করেছেন। 'মা যেমন এখানেও কেবল কতগুলো ছাপমারা লেফাফার মধ্যে আচ্ছন্ন না থাকেন। দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃ বক্ষে আশ্রয় লাভ করে এবং দেশের শক্তি, মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে।'

ত্রিপুরার প্রতি কবির উৎকণ্ঠায় মহারাজ রাধাকিশোর যে কতটা সজাগ তার প্রমাণ পাওয়া যায় সরকারি কাজকর্ম বাংলাতে সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে তাঁর রাজমন্ত্রী শ্রী অন্নদাচরণ গুপ্তকে লিখিত পত্রে (তথ্যসূত্র ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারি বাংলা, ১৯৭৬, পৃ-১২৫)।

শ্রীহরি

অন্নদাবাবু,

এখানকার রাজভাষা বাংলা। বাংলাতেই সরকারী লিখাপড়া হওয়া সংগত। ইদানীং কোন কোন স্থলে সরকারী কার্য্যে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার হইতেছে ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি। যাহাতে এরূপ কার্য্য না হয় তাহার প্রতিবিধান করিয়া দিবেন। অবশ্য যে কার্য্যে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার অনিবার্য্য তথায় ইংরেজী ভাষা ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য হইবে। ঐরূপ স্থান ব্যতীত অনর্থক ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিয়া প্রচলিত ভাষাকে উপেক্ষা করা সংগত হইবে না।

মংগলাকাঙ্ক্ষীন

২.৯.১৮ ত্রিপুরাব্দ

শ্রীরাধাকিশোর বর্ম্মণ

মহারাজ রাধাকিশোরের কাছে বাংলা ভাষা যে একটি বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় মন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর আদেশলিপিতে। উদ্ধৃতিটি, 'বিশেষত অমি বঙ্গ ভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করি। ইংরেজী শিক্ষিত কর্মচারিবর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরপোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয়, সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।' (তথ্যসূত্র ঃ রবি, ১৩৩৫ ত্রিং)

একথা অনস্বীকার্য যে পঞ্চদশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের প্রযত্নে বিশেষ করে ধন্যমাণিক্যের আমলে 'উৎকল খন্ড', 'যাত্রা-রত্নাকরবিধি', গোবিন্দ মাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ' এবং বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোর মাণিক্যের উৎসাহে 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থ সমূহের বঙ্গানুবাদ এবং সর্বোপরি রাজন্যযুগের শেষ নৃপতি বীরবিক্রমের অর্থানুকুল্যে দীনেশ সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রকাশ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি নিঃসন্দেহে প্রীতির সাক্ষ্য বহন করে।

রাজগী ত্রিপুরা আজ অবলুপ্ত। শতবর্ষের পরিক্রমায় বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোর, বীরবিক্রম - ত্রিপুরার রাজকুলের চার স্বনামধন্য পুরুষ এবং তাঁদের পরমাত্মীয় বিশ্ববরেণ্য কবিগুরুর ভাবধারার সঞ্জীবনী স্পর্শে ত্রিপুরায় বঙ্গ-সংস্কৃতি ও ত্রিপুরা - সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব উদার মিশ্র সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। এই নব চেতনাবোধ সঞ্চারণে ত্রিপুবা রবীন্দ্র পরিষদ, ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের মতো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির অকুণ্ঠ প্রয়াস জাতি-উপজাতির মিশ্র সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধতর করার লক্ষ্যে নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। একই লক্ষ্যে, ভারতের নয়া সংবিধানের গণতান্ত্রিক আদর্শকে ভিত্তি করে নবীন ত্রিপুরার নেতৃত্বে আজ যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁরা শুধু কাগজি প্রস্তাবে সায় না দিয়ে কবি গুরুর সতর্কবাণী মাথায় রেখে মনে প্রাণে সাহসের সঙ্গে ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা করার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এলেই রাজ্যের সার্বিক কল্যাণ ভাবীকালের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই।

---- o ----

ত্রিপুরায় সংস্কৃতির ক্রম বিবর্তন

রবীন সেনগুপ্ত

সংস্কৃতি একটি জাতির অস্তিত্ব বাচক শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, কর্ম,নৃত্য-গীত, লোকাচার, খাদ্যাভ্যাস, বসবাস পদ্ধতির সমষ্টিগত বিশ্লেষণের আক্ষরিক উৎকর্ষতার পরিভাষা, যার ভিতর দিয়ে মার্জিত মানসিকতা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে প্রমুর্ত হয়ে বিকাশ ঘটে। প্রতিটি মানুষের Perfection of mind অর্থাৎ তাঁর মানসিক পূর্ণতার সাধনার অন্তঃ ও বহিঃ প্রকাশই সংস্কৃতির বাস্তব রূপায়ণ বলা যেতে পারে.। এই সংস্কৃতি বা কৃষ্টি আদিম যুগ থেকে তার লোকাচারের মধ্য দিয়েই জন্মসূত্র বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। একেই আমরা বলতে পারি লোক সংস্কৃতি-- "Folk lore."

আমাদের আলোচ্য বিষয় ত্রিপুরায় এই সংস্কৃতির বিকাশ,কি কি ভাবে কোন কোন পর্যায়ে সমাজের সংস্কৃতি মনস্ক ব্যাক্তিবর্গ কর্তৃক রূপায়িত হয়েছে। পৃথিবীর জন্মের পর যে মনুষ্য সমাজ 'আদি মানব' রূপে চিহ্নিত, পরবর্তী সময়ে এঁদের প্রতিদিনের কার্য্যকলাপ,আচার,ব্যবহার প্রভৃতির ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছিল সংস্কৃতি বিকাশের বিভিন্ন কাঠামোর প্রকৃত পরিশীলিত রুচি।

ত্রিপুরার চারদিকে নিবিড় ঘন অরণ্য। সর্বত্র পাহাড় ঘেরা সবুজের হাতছানি। পাখীর কলকাকলীতে সদা মুখর। ঝরণার বারিধারা পর্বতেব বুক চিরে সৃষ্টি করেছে পাহাড়ী নদী। এঁকে বেঁকে পথ করে স্রোতধারায় ধৌত হয়ে সমতল ভুমি হয়েছে উর্বরা। পাহাড়ে জুমের ফসলের পাকা ঘ্রাণে আদিবাসী পাহাডী পল্লীতে বইতে থাকে আনন্দের হিল্লোল। দূর থেকে ভেসে আসে জাদু কলিজার "স্বয়ম্ভু স্বরের" সুর লহরী। খুব সুক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে যদি এর তাত্বিক বিশ্লেষণ করা যায়,এতে খুঁজে পাওয়া যাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগরাগিনীর মিশ্রনের এক অননা ও অপূর্ব সুর মাধুরী। তেমনি ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদেও ভারতীয় শাস্ত্রীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের নিয়মিত চর্চা। কি অদ্ভুত মেল বন্ধন। একদিকে লোক সংস্কৃতি, অপরদিকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় মার্গ সঙ্গীতের চর্চা। প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতের স্রষ্টা ভরতমুনির যুগ থেকে এই 'নাদব্রহ্ম' ঘরানা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে ত্রিপুরার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার প্রকরণে এসেছে। ত্রিপুরার প্রতিটি ভূমি পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে সঙ্গীতের সুর বয়ে বেড়াত। এঁরা যেমন খুশী কণ্ঠে যে কোন সঙ্গীতের সুর ভাঁজতে থাকলে এক অপূর্ব সুরধ্বনি মধুরতম হয়ে চারদিকে মুখরিত হয়ে উঠতো। এঁদের রক্তেই যেন সৃজনী সুরের ধারা বইতো।

শুধু ত্রিপুরা নয়, সমগ্র ধরামণ্ডলের শাস্ত্রীয় তথা মার্গ সঙ্গীত, নৃত্য ,বাদ্য-বাদন সব কিছুর আদি 'লোক সংস্কৃতি' প্রত্যক্ষ,অনুমান,বোধদয় প্রভৃতি জ্ঞানলাভের পর যে অনুভূতি মনুষ্য সমাজকে চালিত করে, হয়ত এরই নাম "দর্শন"। দর্শন ধাতুটি এসেছে দশ ধাতু থেকে। অর্থাৎ জানা এবং এই দশ ধাতুর উত্তর 'অনট'প্রত্যয় করে দর্শন শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। ভারতীয় দর্শন জীবন নিষ্ঠ বলেই ঐকান্তিক ও সত্যনিষ্ঠ। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চা ও পরিবেশনে এক বিরাট অধ্যায় দখল করে আছে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা ও প্রসারে ত্রিপুরার রাজন্যকূল

আমাদের এই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা ও প্রসারে ত্রিপুরার রাজন্যকূল।" মহারাজ ধন্যমানিক্য (১০৯০-১৫২৯) সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্য "ত্রিহুত" দেশ (মিথিলা) ও বঙ্গদেশ থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ওস্তাদজীদের আমন্ত্রণ করে এনে তৎকালীন রাজপ্রাসাদ সঙ্গীতমুখর করে তুলতেন। ত্রিপুরার প্রাচীন রাজমালায় এর প্রামাণ্য তথ্য থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়:-

"ত্রিহুত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি
রাজ্যেতে শিখায় গীতি নৃত্য নৃপমণি।
ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়
ছাগ অন্তে(অন্ত্রে) তার যন্ত্রে ত্রিপুরে বাজায়।" ।

ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদমূখী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিভিন্ন সময়ে রাজপ্রাসাদ থেকে সাধারণ্যে কিভাবে পৌছত ও এর যথার্থ মূল্যায়ণ কিভাবে রাজন্যকুলের পৃষ্ঠপোষকতা পেতো এ সম্বন্ধে কিছু প্রামাণিক তথ্যভিত্তিক আলোচনা করার চেষ্টা করব । শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কথায় ও বাক্যে শুদ্ধ জৈনপুরী, উর্দু বা হিন্দুস্থানী ভাষা যেমন ব্যবহৃত হতো,তেমনি বঙ্গদেশের প্রাচীন 'ব্রজ ভাষা' পদের ব্যবহার হতো। যেমন

"বৈরিহু কে এক দোষ মরসিয় রাজ পণ্ডিত ভান
বারি কমলা কমল রসিয়া ধন্যমানিক্য জান।"

তৎযুগে বিভিন্ন সময়ে রাজধানী রাঙ্গমাটি,উদয়পুর,অমরপুর,কৈলাগড (কসবা), পুরাতন আগরতলা সহ বিভিন্ন স্থানে "দিল্লী ই সুবানী" মোগল রাজত্বের কৃষ্টির প্রভাব। এদের রাজদরবারে তৎকালীন যুগে ভারত বিখ্যাত এই হিন্দু কি মুসলমান শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চায় মগ্ন ওস্তাদদের সঙ্গে ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে ত্রিপুরার রাজদরবার এঁদের পাদস্পর্শে ধন্য হয়ে যেত।

উদয়পুর থেকে মহারাজ কৃষ্ণমানিক্য ১৭৬০ খ্রীঃ রাজ্যপাট পুরাতন আগরতলায়

স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসেন। নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ পর্ব শেষ করে এরই দরবার কক্ষে নিয়মিত ভারতীয় মার্গ ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর বসতো। ১৮৫০ খ্রীঃ মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য পুরাতন আগরতলার রাজধানীতে রাজ সিংহাসনে সমাসীন। রাজ্যের বাইরের তৎকালীন যুগের প্রখ্যাত গজল ও ধ্রুপদী এবং ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের ঠুংরী গায়কেরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন । ঐ সময়কার এক বিখ্যাত চিত্রকর আলম কারিগরের আঁকা একটি দুর্লভ চিত্র একদা "উজ্জয়ন্ত" রাজপ্রাসাদে শোভা বর্ধন করত। সেখনে দেখা যাচ্ছে পুরাতন রাজপ্রাসাদের নাচ দরবারে মহারাজ ঈশানচন্দ্র সভাসদ নিয়ে বসে আছেন ও জনৈকা নর্তকী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গজল গাইতে গাইতে নৃত্য করছেন। চিত্রটি খুবই সজীব ও এর ঐতিহাসিক মূল্য ছিল অসীম ।

ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ ও এঁদের পরিবার পরিজনবর্গ প্রত্যেকেই ছিলেন দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ও এর পৃষ্ঠপোষক। বেশী দিনের কথা নয়, আজ থেকে দেড়শত ও এর কয়েক বছর বেশী সময়ে তথা ১৮৬২-১৮৯৬ খ্রীঃ মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য ছিলেন অসাধারণ সঙ্গীত বিশারদ। ভাবতীয় শাস্ত্রীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতে ছিল এর অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি। এর সাহচর্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসে হয়েছেন ধন্য। মহারাজের কণ্ঠ থেকে যখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘরাণায় ব্রজবুলী "ছন্দে" সঙ্গীত গীত হত তখন কবি হতবাক হয়ে যেতেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজসভায় একদা শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলন্দর বক্স, যদু ভট্ট, কাশেম আলী,পঞ্চানন মিত্র,হায়দাব খাঁ, নবীনচাঁদ গোস্বামী, কেশব মিত্র, রামকুমার বসাক, ভোলানাথ চক্রবর্তী, নিশার হোসেন, মদন মিত্র প্রভৃতি শাস্ত্রীয় যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীদের সমাবেশ বিরল ঘটনা। এঁরা যে শুধু সঙ্গীত সভার শোভা বর্ধন করতেন তা নয়, এঁদের সান্নিধ্যে তৎকালীন সময়ে আগরতলার সঙ্গীত পিপাসু রসিকজন হতো ধন্য। পরবর্তী সময়ে উক্ত ব্যক্তি বর্গের সান্নিধ্যে এসে ত্রিপুরার মহারাজকুমার ও কুমারীগণও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘরাণার সঙ্গে হয়েছেন পরিচিত ও পরিচিতা। মহারাজ কুমার নবদ্বীপ চন্দ্র (শচীন দেববর্মণের পিতা) শাস্ত্রীয় কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী এক ব্যক্তি। যাঁর প্রভাব পুত্র শচীন চন্দ্রের (শচীনকর্তার) ও কিরণচন্দ্রের (অঙ্কুর দেববর্মার পিতা) উপর বর্তায়ে ছিল।

ত্রিপুরার রাজসভায় এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার সংবাদ সারা ভারতের রাজন্য বর্গের কাছে ছিল পরম শ্লাঘা। যদু ভট্ট ত্রিপুর রাজদরবারে সঙ্গীতজ্ঞ রূপে যোগদান করার পূর্বে তার "বিষ্ণুপুরী" ঘরাণায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য গিয়েছিলেন সুদূর কাশ্মীরে ও পঞ্চকোট রাজসভায়।সেখানকার মহারাজদ্বয় যদু ভট্টকে ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজ বীরচন্দ্রের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সভায় যোগদান করার উপদেশ দিয়েছিলেন।এই বাক্য শ্রবণে একদিকে যদু ভট্টকে যেমন লজ্জিত করেছিল তেমনি অপরদিকে ভারতের এক প্রত্যন্ত

অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের সঙ্গীত সাধনার জন্য একজন বাঙ্গালী হয়ে নিজেকে পরম ভাগ্যবান ও ধন্য মনে করেছিলেন। ইতিপূর্বে ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী রাজ্য ছিল মণিপুর তথা মেখ্‌লী রাজ্য।সেখানেও মৈতৈ ভাষায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুরারোপিত "সঙ্গীত" নৃত্য সহযোগে চর্চা হতো। ১৭৯৮ খ্রীঃ মহারাজ পামে হৈবার পৌত্র চিন-থান খম্বা তথা ভাগ্যচন্দ্র সিংহের কন্যা হরিশেশ্বরীর সঙ্গে তৎকালীন ত্রিপুরার মহারাজ দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্যের বিবাহের মধ্য দিয়ে পুরাতন রাজধানী আগরতলায় মণিপুরী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে শুরু করে। মণিপুরী সঙ্গীতে বেশীর ভাগ বৈষ্ণবীয় ব্রজবুলি ছন্দে রচিত সঙ্গীত "ভারতীয় শাস্ত্রীয়" সঙ্গীতের রসধারায় পরিপুষ্ট। আর এরই রসধারার সৃজনী প্রতিভা মহারাজ ঈশানচন্দ্র, বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোর ও সর্বশেষ বীরবিক্রমের উপর বর্তায়ে ছিল। এঁরা সবাই ছিলেন অসাধারণ শ্রুতধী শাস্ত্রীয় ও মার্গ সঙ্গীতের উপাসক ও প্রচারক এবং প্রসারে অগ্রণী। মহারাজ বীরচন্দ্রকে বলা হতো ত্রিপুরার বা আধুনিক ভারতের "বিক্রমাদিত্য"। তাই তাঁর সঙ্গীত সভাকে বলা হতো "নবরত্ন সভা" এবং এর রূপকারদের সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বিভিন্ন রাগরাগিনীর ব্যবহৃত "সুরানুসারে" এবং "বাদী স্বর অনুসারে" রাগের সময় নির্দ্ধারণ করা হয়। এই "রাগ" কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে চর্চা ও পরিবেশিত হতে দেখা যায়। আবার এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের "আক্ষিপ্তিকা" তথা ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল এর শৈলী (তাল, স্বর, শব্দ বা বাণী) বিভিন্ন ঠাট এর মাধ্যমে বিভিন্ন নামে পরিচিত। উত্তর ভারতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ১০টি ঠাট এবং দক্ষিণ ভারতে ৭২ টি ঠাট দৃষ্ট হয়। তালবদ্ধ "বিবাদী স্বর" যথা কেদার,হামীর,কামোদ,ছায়ানট,ভৈরব ইত্যাদি।তেমনি নিবন্ধ' তালে আবদ্ধ সঙ্গীত বা গানগুলিকে খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার, ভজন ইত্যাদি পর্যায়ে পরিগণিত হতে দেখা যায়। প্রাচীনকালে,প্রবন্ধ,বস্তু, ও রূপক এই তিনশ্রেণীর গান বা সঙ্গীতকে "নিবন্ধ" বলা হতো। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ এই দুই তালবন্ধ "বিবাদী" ও "নিবন্ধ" প্রয়োগে অত্যন্ত পারদর্শী ও পারঙ্গম ছিলেন ও সুচারু ভাবে পরিবেশন করতেন। এখানেই ছিল এঁদের পরিশীলিত স্বাতন্ত্রবোধ এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট।

ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ এই স্বরানুসার"বাদীস্বর,ঠাট,বিবাদী স্বর," নিবন্ধ প্রভৃতি সম্যকভাবে চর্চা করে তাঁদের পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত সৃজনী কণ্ঠে সুললিতভাবে পরিবেশন করতেন। ত্রিপুরারই রাজকুমার শচীন দেববর্মণ এই তথ্য ও তত্ত্বের প্রকৃত উত্তর সাধক ও প্রতিনিধি।পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে "মণিপুরী" সঙ্গীত ও নৃত্যের ধারা ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ ঘটে ১৭৯৮ খ্রীঃ। এরপর ত্রিপুরার তৎকালীন রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ সমস্ত সঙ্গীতের ভাব, রসধারা, সুরধ্বনি ত্রিপুরার মহারাজাদের চর্চিত ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মিলে মিশে অন্য এক ঘরাণার রূপ নেয়। এই অনুরণন ঘটে মূলতঃ মহারাজ

বীরচন্দ্র রচিত বিদ্যাপতি বা ব্রজবুলি ছন্দে রচিত গীতগুলির সুরারোপে। তাঁর সৃষ্ট গীতগুলি হোরি বা হোলি গানের উপরই শুধু সীমাবদ্ধ ছিলনা। বিভিন্ন কীর্তন, ভজন, নটসঙ্গীতে ছিল পরিপূর্ণ। মহারাজ বীরচন্দ্র রচিত বিশেষ কিছু কিছু গান বা সঙ্গীতের মুখরা এবং তা কোন রাগে গীত হত এর কিছুটা নীচে উল্লেখ করা হচ্ছেঃ-

(১) আজু মন্দ মন্দ বহত পবন,বিরহীজন হৃদয় দাহন--বসন্তবাহার

(২) জয় জগত বন্দিনী,হরি হৃদয় রঙ্গিনী- কীর্তনাঙ্গ--জয়জয়ন্তী

(৩) নৃত্যাদি সব সখি-তা তা দৃমি দৃমি থৈ থৈ দৃগী দৃগী-- বাংলা ও সংস্কৃত তারানা।

<u>মহারাজ রাধাকিশোর রচিত ও সুরারোপিত অনেকের মধ্যে একটি</u>

(ছদ্ম নাম বৃন্দাবন চন্দ্র)

(১) নীল নবাম্বুজ জিনি কালিয়া বরণখানি-- কীর্তন-লোফা

<u>মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর রচিত একটি গীত</u>

(১) সুন্দরী সজনী রাসবিহারিনী,সুন্দর নাচনী বেণীভুজংগিনী--বাসসঙ্গীত

<u>মহারাজ বীরচন্দ্র কন্যা অনঙ্গমোহিনী দেবী রচিত</u>

(১) মনপ্রাণ ভবি ডাকি ওহে হরি হইয়ো আপনহাবা--কীর্তন রাগ--সাহানা

<u>মহারাজকুমার মহেন্দ্র চন্দ্র রচিত একটি গান</u>

১) নমামি নমামি শম্ভো নমামি পিনাকধারী

২) জয় শঙ্কর,বিশ্বেশ্বর বিশ্ব পালনকারী-- স্তোত্র -- ইমন কল্যাণ

<u>মহারাণী তুলসীবতী রচিত একটি গীত</u>

১) ঘেরি ঘেরি সখী সবে পুলকে মাতিল যবে

তুলসীবতী যেন রাংগাপদ হেরে --রাসসঙ্গীত

মহারাজ বীরবিক্রম রচিত ও সুরারোপিত চাঁদ কুমুদিনী,রাধাকৃষ্ণ লীলাবিলাস নামক দুটি নৃত্যনাট্যেব শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারাকে গ্রহণ করে ব্যবহৃত হয়েছিল। এছাডা মহারাজের হোরি বা হোলী গানের বেশ কয়েকটি গানের মধ্যে

(১) চমকন লাগে তেরী বিন্দিয়া,সৈঁইয়া--মধুমাধবী সারং-- কাওয়ালী. ..

(২) হোরি খেলনক আশরি শিবরঞ্জনী-- কাওযালী

ত্রিপুরার মহারাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃজনী সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকার অনিল কৃষ্ণ

দেববর্মা ছিলেন এক অনন্য প্রতিভাধর। তাঁর রচিত "নাদলিপি" বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ রাগিনীর উপর রচিত (১ম খণ্ড)

'হেরিয়া বিলাস রসে খেলত কানাইয়া

ছোড়ত আবির কুমকুম রাইমুখ হেরিয়া --বাগেশ্রী

অনিল কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধীর কৃষ্ণ কর্তৃক অপর একটি হোরির গান

আজি ফাগুনে রঙ্গীন পরশে,উনমত নটবর নটরাজ অরুণ রাগে--নটনারায়ণ

ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় দেববর্মা ও বাঙ্গালীদের মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণের জন্য পুলিন দেববর্মা ও তারক রায় উত্তরপ্রদেশে লক্ষ্ণৌর মরিস সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক হয়ে পরবর্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এছাড়া মহারাজ কুমারগণ, যথা--মহেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, ব্রজবিহারী দেববর্মা (লেবু কর্তা), হেমন্তকিশোর দেববর্মা, নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা নিজ নিজ সঙ্গীত জগতে যথেষ্ট বুৎপত্তি সম্পন্ন মননশীলতার পরিচয় রেখে গেছেন। রাজন্যবর্গের যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রসারে ত্রিপুরার একদা প্রাতঃস্মরণীয় প্রবীর দেববর্মা (কর্তা),ঠাকুর বংশীয় কৃষ্ণজিৎ দেববর্মা, বারীন্দ্র দেববর্মা,হীরু দেববর্মা, জ্যোতিষ দেববর্মা, হিরণ দেববর্মা, নারায়ণ দেববর্মা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত রবি নাগ মূলত মহারাজ কুমার মহেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার আলয়ে থেকে ও শচীন দেববর্মার স্নেহ পরশে ভারতীয় মার্গ ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যথার্থ একজন জীবিত সার্থক শিল্পী। ত্রিপুরার সঙ্গীত সমাজ ভারতীয় শাস্ত্রীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের মুখ্য পরিচর্চা ও অনুশীলনকারী। বর্তমানে সমগ্র ত্রিপুরায় যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা সেটা একদা রাজন্যকুলের পৃষ্ঠপোষকতায় পেয়েই পল্লবিত হয়ে উঠেছে। এর এই প্রসারে শচীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা (শচীন কর্তা) ছিলেন ত্রিপুরার সঙ্গীত সমাজের যথার্থ প্রকৃত এ্যামবেসেডর (Ambassador)

আমাদের শৈশবকালে কুমার শচীন দেববর্মন এবং মহারাজ কুমার বিপিন ও বঙ্কিম দেববর্মা ভ্রাতৃ যুগলকে দেখেছি তৎকালীন সময়ে মঞ্চস্থ "নাটকে" শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘরাণার সুর সংযোজনা করতে। ত্রিপুরার সঙ্গীত শিল্পীগণের কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে একচ্ছত্র আধিপত্য রাজন্যকুলেরই অবদান। মহিলা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীগণের মধ্যে মহারাজকুমারী কমলপ্রভা দেবী, রাজকুমারী উজ্জ্বলা দেবী, ঝর্ণা দেববর্মা, আরতি কর (চৌধুরী) পথিকা দেববর্মা,কণিকা দেববর্মা রাজন্যযুগের শেষ শতকের সার্থক শাস্ত্রীয় কণ্ঠ শিল্পী। শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীতে লহরী দেববর্মা, ত্রৈম্বক শর্মা,উৎপল দেববর্মা, অনাথবন্ধু দেববর্মা,চিত্ত দেববর্মা, সুমেধা দেববর্মা,কালীকিঙ্কর দেববর্মা, অলকেন্দ্র দেববর্মা রাজন্যকুলেরই উত্তর সাধক, সার্থক প্রতিনিধি।

ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতির রূপরেখা

ত্রিপুরার বসবাসকারী বাঙ্গালী সমাজের লোকসংস্কৃতি কি ভাবে লোকাচারের মধ্যে দিয়ে বিরাজিত হয়ে আসছে। সুস্থ জীবন চেতনার দর্শনে লোকাচারের বাহ্যিক প্রকাশকেই "লোকসংস্কৃতি" রূপে পরিবেশিত হয়ে একে এক অসামান্য প্রাণসত্বা দিয়েছে। গ্রামীণ সংস্কৃতির নির্যাস ও সৌগন্ধই লোকসংস্কৃতির আদি রসমাধুরী। ত্রিপুরার বাঙ্গালী সমাজের এই লোকসংস্কৃতি কি ভাবে কখন থেকে শুরু হল এরও একটা পশ্চাৎ ইতিহাস আছে। পঞ্চদশ শতাব্দির মধ্য যুগে ১৪৬৪ খ্রীঃ থেকে যেদিন ত্রিপুরার মহারাজ রত্নমাণিক্যের মুদ্রা সর্ব প্রথম বঙ্গ ভাষায় খোদিত হয়ে আবিষ্কৃত হয়ে প্রত্নতত্ববিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তখন থেকেই অন্বেষণ শুরু হল নৃতত্ত্ববিদদের ত্রিপুরার বঙ্গভাষী সমাজের লোকসংস্কৃতির মূল আঁধার খুঁজতে কোথায় এর উৎস।

একদা ত্রিপুরা রাজ্য ছিল ত্রিহুত বা ত্রিবেগ রাজার দেশ। এর ভূমিপুত্রগণ ছিল আদিম জাতি। কিন্তু মানসিক পরিপূর্ণতার অভাবে এরা সার্বিক ভাবে শিলপ সংস্কৃতির প্রতি ছিল উদাসীন ও রূপায়নে পরাঙ্‌মুখ। এই ত্রিপুরার ১৪৫তম নৃপতি প্রথম রত্ন ফা তথা রত্নমাণিক্য তৎকালীন গৌড়দেশের তথা বারেন্দ্র ভূমির শাসক ফকুরুদ্দিন শা নামক নবাবের সাহায্যে চতুর্দশ শতাব্দির শেষ দিকে স্বজাতি শত্রুদের পরাস্ত করে রাজ্য অধিকার করেন। পরবর্তী সময়ে গৌড়ের নবাবের মত নিজ রাজ্যকে কৃষিকার্য,বাণিজ্য, ধর্ম, লোকাচার, সামাজিক রীতি নীতিকে প্রাণবন্ত ও বেগময়ী করতে নবাবের দ্বারস্থ হন।

গৌড়নবাব রুকউদ্দিন শাহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সর্ব প্রথম আনুমানিক চার হাজারের মত বাঙ্গালী পরিবারকে রাজা রত্নমাণিক্য তৎকালীন রাজধানী রাঙামাটি তথা উদয়পুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থায়ী বসবাসের জন্য নিয়ে এলেন। এই বাঙ্গালী সমাজে হিন্দু,মুসলিম,বৌদ্ধ সব সম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণ ও নিম্ন বর্ণের লোকজন ছিল। নিজ নিজ মেধা ও বৃত্তি অনুযায়ী এরা বিভিন্ন কাজ কর্মে নিপ্ত হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে এক বৃহৎ বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি নিজ নিজ লোকাচার ও লোক সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ করতে প্রবৃত্ত হয়ে পড়েন।

কথিত, একদা ত্রিপুরা রাজ্যে সীমা উত্তরে হিড়ম্ব রাজ্য তথা বর্তমান কাছাড় থেকে দক্ষিণে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল ।তিন দিক দিয়ে পূর্ববঙ্গে রাঢ় অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত। ত্রিপুরার বসবাসকারী বঙ্গসমাজ বিবাহ, লৌকিক আচার-আচরণ,কৃষিকার্য,ধর্মীয় অনুশাসন,শিল্প,সাহিত্য সব কিছুতেই অবিভক্ত বৃহৎ বঙ্গ দেশের অনুরূপ লোক সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। নদী মাতৃক দেশ হতে আগত বলে বাঙ্গালী সমাজ ত্রিপুরার পাহাড়ী নদীর সমতটেই নিজ নিজ আবাস গড়ে তুলে।তদানীন্তন চাকলা রোশনাবাদের বঙ্গ ভাষা ভাষী হিন্দু, মুসলমানগণও ছিল পার্বত্য ত্রিপুরার মহারাজদের পরোক্ষ প্রজা। এঁদের

জীবন ধারণের চেতনার বিকাশে, ধর্মীয় ও লোকসংস্কৃতিকে আরো সুদৃঢ় প্রসারে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ছিল বিশেষ সজাগ। এরই সুফল দেখতে পাওয়া যায় পর্যাপ্ত দীঘি খনন করে সুষ্ঠু পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে, মন্দির, মস্‌জিদ নির্মাণ করে ধর্মীয় আচরণ বিধি পালন করতে। সাহিত্য ও শিল্প বোধকে সদা জাগ্রত করতে রাজন্যবর্গ সদা ব্যস্ত থাকতেন।

ত্রিপুরার বঙ্গভাষী বৃহৎ জনগোষ্ঠী লোকসংস্কৃতি,যাকে ইংরাজি পরিভাষায় Folk lore বলে কেহ কেহ আখ্যায়িত করেছেন বা আধুনিক নৃতত্ত্ববিদগণ যাকে Culture অর্থাৎ Way of life কেই লোক সংস্কৃতির পরিসংখানে অধিকতর গ্রহনীয় বলে স্বীকার করেছেন। এই গ্রামীন সংস্কৃতি প্রচলিত সামাজিক উৎসব, নৃত্য-গীত, পূজা-পার্বন, খাদ্য, ভাষা, পোষাকপরিচ্ছদ, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতির বিষয়াবলীর উৎকর্ষতার আবর্তিত হয়ে বিভিন্ন ভাবে বিকশিত ও পরিবেশিত হয়ে আসছে।

ত্রিপুরার বাঙ্গালীদের লোক সংস্কৃতি মূলতঃ বৃহৎ বঙ্গের বা বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিবেশিত লোকসংস্কৃতির মতই লোকাচার থেকে উদ্ভুত। পারিপার্শ্বিক ভৌগোলিক পরিবেশের বৈচিত্র্যে প্রকাশ ভঙ্গী কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকতে পারে, কিন্তু মূল প্রকাশভঙ্গী একই ধারায় বাহিত। নদীকে দিয়েই ত্রিপুরার বাঙ্গালী সমাজের সংস্কৃতি বিকাশ হয়েছে। সমতলবাসী বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে একদা ত্রিপুবার রাজন্যবর্গ সর্বদা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে গেছেন। প্রকৃত পক্ষে ১৪৩১-১৪৬২ খ্রীঃ পর্যন্ত ত্রিপুরা মহারাজ প্রথম ধর্মমাণিক্য কর্তৃক চাকলারোশনাবাদের প্রধান কার্যালয় কুমিল্লায় 'ধর্মসাগর' খনন করে ও বিভিন্ন মন্দির মস্‌জিদ নির্মাণ করে গেছেন। পরবর্তী সময়ে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ পরগণায় ঠাকুববাডী গ্রামের অধিবাসী শুক্রেশ্বব ও বানেশ্বব চক্রবর্তী ভ্রাতৃ যুগল কর্তৃক 'রাজমালা' রচনার মধ্যে ত্রিপুরার বাঙ্গালী সমাজের লোকাচাবেব অনেক প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত সন্ধান পাওয়া যায়।

তৎকালীন যুগে ও পরবর্তী সময়ে মহাবাজ ধন্যমাণিক্য কর্তৃক ১৫৫১ খ্রীঃ উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির নির্মান এবং এর সেবাইত হিসাবে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালী সমাজের লোকাচার ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রমাণ রয়ে গেছে। এই রাজন্যের অপর কীর্তি গাথা আবর্ত্তিত হয়ে উদয়পুরে মহাদেব মন্দির,কমলা সাগরের তীরে কসবা কালী মন্দির, উদয়পুরে জগন্নাথ মন্দিব নির্মাণের ত্রিপুরার বঙ্গ সমাজের প্রকৌশলী ও স্থাপত্যবিদ্যার প্রামাণ্য ইতিহাস ঐ সব মন্দিরে আজও রয়ে গেছে। এই সমস্ত মন্দিরে বাঙলাব আটচালার আদলে গঠিত পোড়া মাটির কাজে বাঙ্গালী সমাজের কুম্ভকারদেরও মৃৎশিল্পীদেরদের হাতের পরশে রূপ পেয়েছে অনিন্দ্য সুন্দর শিল্প কলা। গ্রামীন লোকাচারের আদর্শে ঘিরে থাকত মেলার প্রধান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কথকথা, ঢপ, কবি গানে মুখব হয়ে উঠত দেবালয়ের আনন্দানুষ্ঠান। বাঙ্গালী গ্রাম্য

শিল্পীগণই এতে অংশ নিতেন। রাজন্যবর্গ এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন মাত্র। উদয়পুরের "দরগা" বিলোনিয়ার পুরাতত্ব আবিষ্কার,পিলাকের বৌদ্ধ বিহারে বঙ্গ সমাজের শৈল্পিক হাতের ছোঁয়াকে অস্বীকার করা যায় না। ত্রিপুরার বঙ্গ সমাজের লোকসংস্কৃতির প্রভুত নিদর্শন রয়েছে মন্দিরের নীচে প্রাপ্ত বিভিন্ন মূর্তির শিল্প কর্মে। বিশেষ করে ১৪০০-১৭০০ খ্রীঃ প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ,টেরাকোটা ও মুর্তিগুলোতে।

ত্রিপুরার গ্রামীন বাঙ্গালীদের লোকসংস্কৃতি বিভিন্নরূপে, বিভিন্নভাবে বিকাশ লাভ করেছে। লোকগীতি, লোকনৃত্য, বাদ্য, কথকথা, কবিগান, কীর্তন, ঢপ যাত্রা, পটচিত্র, পোষাক পরিচ্ছদ,রকমারী খাদ্য প্রস্তুত পিঠেপুলী, সাহিত্য,শিল্পকলা প্রভৃতি সব কিছুতেই একটা গ্রামীণ সংস্কৃতি প্রমূর্ত ও প্লাবিত হয়ে এদের একটা বিশেষ স্থান করে দিয়েছে।

১) লোকগীতি-ত্রিপুরার আদি বঙ্গ সমাজ বারেন্দ্র ও রাঢ় অঞ্চল হতে ১৪০০ খ্রীঃ থেকে এখানে এসে বসবাস করছে এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। প্রকৃতি দিয়েছে সহজাত সহজীবন, আউল, বাউলদের চিরাচরিত চারিত্রিক আধ্যাত্মিক জীবন চেতনার বহিঃ ও অন্তঃ প্রকাশের সুরমাধুরী। কণ্ঠে দিয়েছে অপূর্ব তান। এই লোক গীতির প্রকাশ ঘটেছে বাউল, সহজিয়া, ইসলামী, সুফী, মুর্শিদি, জারি, সারি, ভাটিয়ালী, পালা কীর্তন প্রভৃতি লোক সঙ্গীতের রূপ বৈচিত্র্যের প্রকাশ ভঙ্গীতে। প্রামাণিকভাবে লিখিত স্বভাব, কবিদের গীত রচনার সন্ধান পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দির প্রাক যুগে। এই সম্বন্ধে একটু আলোচনার অবকাশ রয়ে গেছে।

১৬০০-১৬২২ খ্রীঃ ত্রিপুরার মহারাজ যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকাল। ও দিকে রাঢ় ও বারেন্দ্র ভূমিতে মুঘল সাম্রাজ্য। দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীর জানতেন ত্রিপুরা রাজ্যে অগণিত হাতি পাওয়া যায়। মুঘল সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ ফতেজং এর নেতৃত্বে ও মির্জ্জা নুরউদ্দিন ও মির্জা উসকানদিয়া তিনদিক দিয়ে কসবা(কৈলাগড়) ও মেহের কুলের প্রান্ত থেকে ত্রিপুরা অক্রমণ করে। এদের মিলিত ৬৭০০ অশ্বারোহী ৯০০ গোলন্দাজ , ৭০টি রণহস্তীর শক্তির সম্মুখে মহারাজ যশোধরের বাহিনী পরাভূত হলো। মহারাজ এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে পালিয়ে বেডাচ্ছেন। অবশেষে মুঘলদের হাতে বন্দী হয়ে প্রথমে ঢাকা ও পরে দিল্লীতে নীত হন। যখন মহারাজ রাজ্যপাট ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন,তখন গ্রাম্য বাঙ্গালী কবির রচনা ও গানে এই বেদনা বিদুর কাহিনী মূর্ত হয়ে উঠে। এর কয়েকটি গানের কলি এইরূপ--

"রাজা কৈ গেলারে
তোমার সোনার উদয়পুর কারে দিলারে।
কতদূর গিয়া রাজা ফির‍্যা ফির‍্যা চায়

(আমার) সোনার মোরান পাল্কী

মোঙ্গলে দৌড়ায় ".....ইত্যাদি (গানের তথ্য রমা প্রসাদ দত্ত) ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত।

১৮৬০ খ্রীঃ মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে কুকি বিদ্রোহের দমনে চাকলা রোশনাবাদের অন্তর্গত খণ্ডলের ত্রিপুরার মহারাজার হিন্দু,মুসলমান প্রজাদের কুকিরা নির্মমভাবে হত্যা করে। সে হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত গ্রাম্য বাঙ্গালী লোকগীতিকার "রাধারমন" এক গান রচনা করেন - তার কিছুটা অংশ

"শুন সাধু ইহার নির্ণয়
যেন শতে খণ্ডলেতে কাটাকাটি হয়।
দেখ মাঘ মাসে শনিবারে শ্রীপঞ্চমী ছিল।
অকস্মাৎ তিপ্রা কুকি আসি দেখা দিল।
তারা দা ও শোল হাতে বন্দুক কান্ধে
দেখতে ভয়ঙ্কর
দেখে প্রাণ ভয়ে কাঁপে কালা ভুসঙ্গর
রুধির আরোসল আকাশেতে উড়িছে শকুন
ঘর জিনিষ লুট করি চালে দেয় আগুন"

......ইত্যাদি (ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত ঃ- রমা প্রসাদ দত্ত)

এই সমস্ত গীত রচনা মুখ্যতঃ ইতিহাস আশ্রিত। ত্রিপুরার যে সমস্ত নদী পাহাড হতে বাহিত হয়ে সমতলে প্রবিষ্ট হয়ে প্রবাহিত, ঐ সমস্ত নদীর বন্যায় তদানীন্তন গ্রামবাসীদের দুর্ভিক্ষ জানিয়ে বর্ণনা দিয়ে পল্লী কবি ছড়ায় গান গাইছেন -

"প্রথম আষাঢ় মাসে গাঙ্গে দিল টান
বড় বড়-গীয়ন্তে বেচিল 'ধান'।
আউস হইব কবে ভরসা আছিলখানি
আচম্বিতে আসিল ডাকাইত্যা বোনার পানি "।

......ইত্যাদি (তথা সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়)

দেহ তত্বের প্রকাশভঙ্গীতে উদাসী বাউল একতারা বাজিয়ে গান গাইছে-

"মন রে সেদিনের উপায় কি হবে
অ-আমার দেহ ছাইড়্যা
জীবন যখন যাবেরে।
ঘুচিবে সংসার জ্বালা ।।
মিটিবে কায়েমী জ্বালা ।।

সব অসাধ্য হবে তোমার
করবে নারে আমার আমার।''....ইত্যাদি
(তথ্য কমঃ বীরেন দত্ত রচিত বাউল ভাটিয়ালী সংগ্রহ থেকে)

আউল বাউল দের (আউল্যা বাউল্যা) দেহতত্ব ও বিচ্ছেদ গান দু ভাগে বিভক্ত এবং পরিবেশিত হয়ে আসছে। বিচ্ছেদ পর্বে মুখ্যত ভাটিয়ালী গানের সুর ও কথাকেই প্রাধান্য দিয়ে গীত হয়। এই বিচ্ছেদ ও প্রেমের গানের দু একটা উল্লেখ করছি।

''সেত আপন অইলো নাগো
জীবন সপিলাম যারে।
সখিগো সখি, প্রেম করি করিলাম
সুখের লাগি,
সুখ অইলো না দুখের ভাগী
চির দুখি অইলাম সংসারে।
আমার জাতি কুলমান মান অভিমান
সব দিলাম,জীবন সপিলাম যারে,..........''
ইত্যাদি (তথ্য কমঃ বীরেন দত্ত রচিত নির্ব্বাচিত রচনা)

ত্রিপুরায় বসবাসকারী বাঙ্গালী লোক সঙ্গীতের ভাটিয়ালী রচয়িতাগণ মূলতঃ পূর্ববঙ্গ হতে আগত। তাই তাঁদের রচনায় নদীমাতৃক বন্দনাই বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে। বিচ্ছেদ,দেহতত্ব,মুর্শিদি ,ভাটিয়ালী,জারী,সারি সব গানেই গ্রাম্য লোক সঙ্গীতের তত্ব ও সুরকে বজায় রাখতে এরা ছিলেন পারঙ্গম। একদা ত্রিপুরা রাজ্যের বৃদ্ধ বাউল অঞ্জর আলী মিঞার কণ্ঠে গীত হত এমন একটি গান-

''তিন বেড়ার এক বাগান আছে
তাহার মধ্যে আজব আছে
চন্দ্র সূর্য্য ফুল ফুটছে
ছয় ঋতুতে ঝলক দিচ্ছে
জন্ম মৃত্যুর মধ্যখানে
মানুষ তোমার একটা হাঠা..'' ইত্যাদি

ত্রিপুরার বিখ্যাত বাউল ও কবি গায়কদের মধ্যে রমেশ বাউল,অবিনাশ বাউল, বিপিন বাউল, মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রেম দাস ও গোপাল দাস, অনুকূল দাস, বগলানন্দ আচার্য, রহমত আলী, ছায়েব আলী, প্রবীণ রায়, মনোরঞ্জন সাহা, উমেশ দাস, উমেশ নাথ, সারথি ভৌমিক এবং বর্তমানে গৌরদাসী বৈষ্ণবী, সুবলদাস বৈষ্ণব প্রভৃতির নাম লোক সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারে অনন্য তথা অসাধারণ এক একটি ব্যক্তিত্ব।

ইসলামী ধর্মে দীক্ষিত মুসলমান এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী। গুরুবাদ তথা ঈশ্বর বা আল্লার যিনি মধ্যস্থতা করে,ভজন করে গান রচনা করে নিবেদন করেন এটাই মুর্শিদি গান বলে পরিচিত।

গীতগুলি মূলতঃ ধ্যান বিষয়ক দেহতত্ব। এই মুর্শিদি গায়কদের মধ্যে জয়নাল আবেদিন, হায়াৎ হামান, ঝনকো শেখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুর্শিদি গানের কয়েকটি কলি, ...যেমন,

"মানিক চিনতে কয়জন পারে
গুরু যারে কৃপা করে
চিনে দু একজন
সোনায় ময়লা পডলে
পাথরেতে ঘসলে পড়ে
সে সোনাটা জিলা ধরে। . ."ইত্যাদি

এ সমস্ত আউল,বাউলদের গীতের অজস্র উপমা আছে লোকাচার ও পূজা পার্বণকে কেন্দ্র করে। মনসা মঙ্গল ও মাঘ মণ্ডল ব্রতে সমবেত দল বদ্ধ হয়ে গীত হয়। মূখ্যত এই সব গান ত্রিপুরার সর্বত্র পালিত হয়ে আসছে। মাঘ মণ্ডল সাধারণত ১৬ বছর অব্দি কিশোরীগণ সূর্যোদয়ের পূর্বে মাঘ মাসের তীব্র শীত উপেক্ষা করে নদীতে,স্থানীয় পুকুর,জলাশয়ে গীত সহকারে সূর্য্য দেবকে বন্দনা করে থাকে। গীতেব দু একটি কলি.

"উঠ উঠ সূর্য্যি ঠাকুর
উঁকি,ঝুকি মাইর‍্যা.. বা
সোনার বাটি ঝুমুর ঝুমুর/মিষ্টি বাটির তৈল
তাই লইয়্যা সূর্য্যি ঠাকুর নাইতে গেলেন কৈল।
...... "ইত্যাদি

পুরো মাঘ মাস ব্রত পালন করে মাসের শেষে উৎযাপন অনুষ্ঠান হয়। উঠানে বৃহৎ আকারে গোলাকার বৃত্ত করে চাউলের গুডো রং করে আলপনা দেওয়া হয। এরপর সমবেত ব্রতপালনকারী কুমারী মেয়েরা হাত ধরে, কোমরে আঁচল বেঁধে গোলাকার হয়ে নৃত্য গীতের মাধ্যমে সারি নৃত্যের অনুকবণে নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎযাপন পর্বটি সমাধা করে। ৪০ দশকে আমাদের শৈশবে বাডীর দিদিরা ছোট বোনরা পাড়া প্রতিবেশী অন্যান্য কুমারী মেয়েদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ কবতো। সেই স্মৃতি এখনও হৃদয়ে জাগরুক আছে। এই ব্রতকে "আচার" নৃত্য রূপে কেহ কেহ অভিহিত করে থাকেন।

মনসা মঙ্গল ব্রত অনুষ্ঠান ত্রিপুরার সর্বত্র বহু যুগ যুগ ধরে পালিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় এর প্রচলন বেশী। বৈশ্য,বণিক,মালো

সম্প্রদায়ের ও সমাজের মধ্যে এর আধিক্য ও প্রাধান্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। পুরো শ্রাবণ মাস এই ব্রত নিষ্ঠা সহকারে পদ্মপুরাণ পাঠের মধ্যে গীত হয়ে পরিবেশিত হয়। মূলত বেহুলা লক্ষীন্দর ও চাঁদ সওদাগরের কাহিনী মূল গায়িকা(মহিলা) গাইলে দোহার ধরে বাদক ও সমবেত মহিলারা এতে অংশ নেন। এটা ব্রত হলেও লোকগীতি নাট্যের রূপে কোথায় কোথায় পরিবেশিত হয়ে আসছে।

বাংলা লোকনৃত্যের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষদের একসঙ্গে সারি নৃত্যে স্থান নেই। উত্তর ত্রিপুরার বহুল প্রচলিত "বউনাচ" তথা সারিনৃত্য প্রধানত বিবাহিতা মহিলাগণ লালপাড় শাড়ী পরে ঘোমটা মাথায় দিয়ে বৃত্তাকারে এই নৃত্য পরিবেশন করেন। উত্তর ত্রিপুরা কাছাড় সংলগ্ন বলে শ্রীহট্টের এই বউ নাচের সুর ও রচনা পারস্পরিক ঐতিহ্য বজায় রেখে চলছে। নৃত্য ও গীতের সুর প্রায় একই ।

"সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি
নাচত দেখি, বালা নাচত দেখি,
যেমনি নাচ শিবের কাছে
তেমনি নাচ রাই ...."ইত্যাদি।

ত্রিপুরার সর্বত্র গাজনের নাচ ও চড়ক পূজো এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। চৈত্র মাসের পুরো মাস পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সারাদিন উপোস করে গায়েন,বাদক,বেহারা বেতের নীলপাট" তেল সিঁদুর রঞ্জিত করে মাথায় করে বাড়ী বাড়ী ঢুকে মাগন মাঙ্গে। মূল গায়েন ছড়া করে গৌড় চন্দ্রিকায় শিব বন্দনা করবে।

"হরে গঙ্গা যার সারথি
আগুন বেত,কোরানে পনি ।
গঙ্গা বড় তীর্থ পানি।
জলে গমন করিয়া যতন
স্থূল শুদ্ধ শিবের আমন" ....ইত্যাদি।
"ঢাকি বাদ্যে বোল তুলবে-
ধিন্ তাকা তাকা ধিন্
ধিন্ তাকা তাকা ধিন্ "...........

ছোট বড় ছেলেরা শিরে জটা,দাঁড়ি গোফ ত্রিশূল হাতে গায়ে সাদা রং মেখে ও ছেলেরা মেয়ের সাজে হলুদ রং এ রাঙ্গা হাতে গৌড়ীর রূপ ধরে নাচতে থাকে। বিবেক গান ধরবে-

"কি আনন্দ হিমালয়ে
গিরি করে গৌরীদান

হলুদ মাখিয়া অঙ্গে
শিবেরে করে স্নান......''.ইত্যাদি

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গীত রচনার মাধ্যমে গাজনের উৎসব প্রতিপালিত হয়। এই গাজনের মূল তাত্বিক ব্যাখ্যা চৈত্রের খর দাহে শিবরূপী সূর্য্য গৌরীরূপী ধরিত্রীরমিলনে বসুমাতা রজঃশালা হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাতে ধৌত হয়ে,জমি উর্ব্বরা করবে। ফলে কৃষিকার্যে হবে প্রভূত শস্য উৎপাদন। এই লৌকিক আচার (ritual) বংশ পরম্পরায় বাঙ্গালী সমাজে পূজিত ও বন্দিত হয়ে আসছে। এই লৌকিক আচরণে কোন কোন ক্ষেত্রে শিব ঠাকুরকে নিষ্ক্রিয় রেখে কালীর সঙ্গে অসুরের বা দুর্গার সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গনেশ ও সিংহ অসুরের সঙ্গে অর্থাৎ শুভর সঙ্গে অশুভের নৃত্যানুষ্ঠান গান ও ঢাকের বাদ্যি সহকারে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এই গাজন চড়ক বা নীল পুজার মূল উদ্দেশ্য কৃষিজীবি আদিম সামাজিক ধর্ম বোধকে গড়ে তোলা। এই গাজনের উৎসব উপলক্ষে গ্রামীন সমতলে যে মেলা বসে এতে নানাহ্ প্রকার পোড়ামাটির তৈজষপত্র,খেলনা, নক্সাকাঁথা, পিঠেপুলির অপূর্ব সম্ভার দিয়ে গ্রামীন লোক সংস্কৃতির মেলবন্ধনে উচ্চনীচ ভেদাভেদ ভুলে এক মানসিক চিন্তা চেতনা একাত্ম হয়ে যায়।

লোক সংস্কৃতির আরো প্রকাশ ভঙ্গী পরিদৃষ্ট হয় নৌকা বাইচ,ঢাকিনৃত্য,ঢপ যাত্রা,পুতুল নাচ,পালাকীর্তন প্রভৃতি লৌকিক নৃত্যানুষ্ঠান ও গীত বন্দনার মাঝে। কীর্তন,বাউল,পাঁচালী গানের মধ্য দিয়ে একক নৃত্যের পরিবেশন হতে কোথাও কোথাও দেখা যায়। কীর্তন মূখ্যতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কৃষ্ণ ভজনার বহিঃপ্রকাশের আর এক রূপ। নগর সংকীর্তন দলবদ্ধ ভাবে গৌর নিতাই এর মূর্ত্তির অনুকরণে উর্দ্ধবাহু হরে রাম মাধুরী প্রচারে বৈষ্ণবীর সংস্কৃতির আঁর একরূপ। কীর্তন গান শাস্ত্রীয় পর্যায়ে পৌছে গেলেও নগর সংকীর্তন এখনও লৌকিক স্তরেই রয়ে গেছে।

ত্রিপুরার উত্তর ও দক্ষিণে যে সমস্ত এলাকা মুসলীম জনগোষ্ঠীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ঐ সব স্থানে ''জারী'' গানের প্রচলন ও পরিবেশন এখনো দেখা যায়। পুরুষগণ লুঙ্গী পরে,গায়ে গেঞ্জি বা শার্ট পরে, মাথায় টুপি, কাঁধে ছোট গামছা, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গোলাকার হয়ে গামছাকে রুমালের মত উর্দ্ধে তুলে নেচে নেচে গান গাইবে। গানগুলি মূখ্যত মহরমের বীর রসাত্মক ও বিষাদময় কাহিনীকে মূল গায়েন গাইবে,সঙ্গীরা ধূয়া তুলে প্রতিধ্বনি করে সাড়া দিবে।

''ধামাইল'' নৃত্য উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর ও এর আশে পাশে বহু পূর্ব থেকেই পরিবেশিত হয়ে আসছে। একদা হেড়ম্ব রাজ্য তথা বর্তমান কাছাড়ী জনগণ এই লোক

সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বংশ পরম্পরায় ত্রিপুরা ও কাছাড় পরম্পর এই সংস্কৃতি এখন বজায় রেখে চলছে। মূখ্যত এটা মেয়েলী নৃত্য গীত। বিশেষ করে বিয়ে ও অন্নপ্রাশনের পূর্বে রাত্রি থেকে ধামালী নৃত্য ও গান বয়স্কা ও বিবাহিতা মহিলাগণ পরিবেশন করে থাকেন। ধামাইল নৃত্য গীতে রঙ্গ রসিকতা করে অনুষ্ঠানকে প্রাণচঞ্চল ও প্রাণবন্ত করে রাখাই মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া কোল,ভীল,সাঁওতালদের "ঝুমুর" বা অন্যান্য লোক নৃত্য ও গীত উল্লেখ্য।

ত্রিপুরার আদিবাসী লোকসংস্কৃতি

যে কোন দেশের লোকসংস্কৃতি বা কৃষ্টি মূলতঃ নির্ভর করে তার অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যবস্থার উপর। এর চেয়ে বড় কথা লোকসংস্কৃতি সর্বদাই সমাজাশ্রয়ী, সমাজের সর্বমুখীন উন্নতি ও অবনতির সাথে লোকসংস্কৃতি নিবিড়ভাবে বাঁধা ও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ত্রিপুরার আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতি এই সত্যেরই ধারাকে বহন করছে।

যুগ যুগ ধরে সামন্ত শাসিত এই ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা বড়ই বিচিত্র। "ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত" বা "রাজমালা" (কালী প্রসন্ন সেন) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সুদূর গৌড়দেশে ও সুন্দরবনের কাছা কাছি পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজ্যসীমা বিস্তীর্ন ছিল যার জন্য "ত্রিবেগ" বা "ত্রিবেণী" বলে ত্রিপুরাকে আরো এক নামে অভিহিত করা হয় (রাজমালা ১ম ও ২য় লহর,ভূমিকা দ্রষ্টব্য)এবং সুন্দরবনের কাছাকাছি সেই অঞ্চলকে আজও কেউ কেউ জামাই জঙ্গল নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এছাড়া উত্তরে আসামের শ্রীহট্ট, কাছাড়, দক্ষিণে রাঙ্গামাটি বা চট্টগ্রাম পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজ্যসীমা বিস্তীর্ণ ছিল। কালক্রমে সে সব সীমা সংক্ষিপ্ত হতে সংক্ষিপ্ততর হয়ে বর্তমান সীমা রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে।

চারিদিকে পর্বতসঙ্কুল উচু নীচু টিলা, বন্ধুর ভূমির দেশ এই ত্রিপুরা মাঝে মাঝে ছোট দু একটা অল্প উঁচু টংঘর। এমনি ১০ থেকে ১৫টি ঘর নিয়ে এক একটি পল্লী বা পাড়া। ৪/৫টা পাহাড়কে নিয়ে এক একটি গ্রাম। বন্য শ্বাপদ সংস্কুল পরিবেষ্টিত হয়ে এঁরা যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম কবে বসবাস করে আসছে। ছোট ছোট ক্ষীণ স্রোতস্বিনী পাহাড়ী ছড়া রা এঁকে বেঁকে যাওয়া নদীর জলেই এঁরা তৃষ্ণা নিবারণ করে আসছে। বনের ফল মুল,সব্জি,বন্য বরাহ,হরিণ শিকার করে এঁরা আহার্য রূপে গ্রহণ করতো, বছরে একবারই চাষ আবাদ কবে আর এই চাষকেই জুম চাষ বলে। বৈশাখ মাসে যে কোন একটি পাহাড়কে চাষের উপযোগী নির্বাচন করে সমাজের পুরোহিত "ওচাই" প্রথমে পাহাড়কে উদ্দেশ্য করে "লাম্প্রা" পূজা দেয় অর্থাৎ চাষ আবাদ করলে যেন সুফলা হয়। অনেকে আবার "গড়াই" পূজাও দিয়ে থাকে,এরপর এক এক পাড়ার স্ত্রী পুরুষ দলবদ্ধভাবে

পাহাড়ের ঝোপ,জঙ্গল,বাঁশগাছ ও বড় বড় গাছ কেটে মাটির সাথে শুইয়ে দেয়। বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহে এগুলি শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে গেলে, তারপর একদিন আগুন লাগিয়ে এগুলোকে পুড়িয়ে দেয়, ঐ ছাইমাটিই জমিতে সারের কাজ করে।বৃষ্টি পডার সাথে সাথে কি নারী কি পুরুষ বৃদ্ধ সবাই এক সাথে ঐ পাহাডে ছোট ছোট "টাক্কাল" দিয়ে মাটিতে কোপ দিয়ে গর্ত করে পিঠের উপর ছোট "লাঙ্গা" থেকে কার্পাস তূলো, ধান, তিল, কুমড, লাউ, বিভিন্ন সব্জীর একত্রে মিশানো বীজ এক মুঠো ছড়িয়ে দিয়ে গর্ত বুজিয়ে দেয়। কালক্রমে এর থেকে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল ফলে উঠে এবং একেই বলে "জুম"চাষ। আর এই ফসলই সারা বছরের খোরাক হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

ত্রিপুরাব আদিবাসীদের অর্থনৈতিক দিকটা তেমন সচ্ছল নয়। পাহাডের জুমে-জাত খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কাছাকাছি কোন পাহাডী এলাকার "হাট" বা বাজার থেকে কেনা কাটা করতে হয়। এই সমস্ত সামগ্রী মূখ্যত লবন,কেরোসিন,তেল,তামাক মাখবার জন্য "রাব",সূতো রঙ করার জন্য বিভিন্ন রং, নানা প্রকার প্রসাধন সামগ্রী যেমন রূপার অলংকার ,পুঁতির মালা,ইত্যাদি। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, একদিকে যেমন হাটে বাজারে পাহাড থেকে নেমে আসে জিনিষ ক্রয় করতে তেমনি বিক্রয়ও যে কিছু করে না তা নয় এবং ঐ বিক্রীর দ্রব্য সামগ্রী মূলতঃ পাট,তিল,কার্পাস,বিভিন্ন সব্জি ইত্যাদি আর এই বিক্রয়ের পযসা দিয়েই ক্রয় কবে নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রাদি।

এঁদের সামাজিক জীবনবোধ সমস্ত প্রকার হিংসা দ্বেষ,থেকে কলুষমুক্ত। শৈশবে মা বাবা ভাই বোনের কোলে পিঠে ধীরে ধীরে নবদূর্বাদলের মত বেড়ে উঠে।

প্রকৃতি অফুরন্ত সৌন্দর্য্য দিয়ে যেন এঁদের তিল তিল কবে গডে তুলেছে। সুন্দর সুস্থ মৃণালের মত দেহ বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে ইস্পাতের মত কঠিন শক্ত সবল দেহ নিয়ে সংসারের শত সহস্র কাজের অংশীদার হয়ে পরিবারকে সর্বতো ভাবে সাহায্য করে। বাল্যকাল থেকে কৈশোর তারপর যৌবনে পা দেবার সাথে সাথে প্রতিটি আদিবাসী যুবক যুবতীর মনে লাগে বসন্তের ছোঁয়া। "জুমের"ক্ষেতে সমবেত ভাবে কাজ করার সময়ই অবিবাহিত যুবক,যুবতীর মনে জাগে এক অনির্বচনীয় অনুবাগ। একে অন্যেব প্রতি লক্ষ্য করে গানের কয়েকটি কলি ছুঁডে দেয়। প্রত্যক্ষ ভাবে অন্যজনও গানের মাধ্যমে তাব উত্তর দেয়-যথা

"অ যাদু হাপুং চলংগ তক্ছা পুংমানি
বাছাই হারুংগ খ্না ?
প্রাণ যাদু সংবাই কক্ সলায় মানি
বাহাই মাই অ সখ্না ?" ইত্যাদি

বাংলা অর্থ -

হে প্রিয় পর্বত শিখরে পাখীর কুজন
কেমনে গুহায় শোনা যায় ?
প্রেমিকের সাথে প্রেমালাপ
কেমনে মা-বাপ জানতে পায় ?
ইত্যাদি

এভাবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে অনুরাগের পালা। ঘরে ঘরে ফসল উঠার পর নিজ নিজ অভিভাবকগণ পরস্পারের মধ্যে ঐ মন দেয়া-নেয়া যুবক যুবতীদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলাপ আলোচনা করে। সম্বন্ধ পাকা হলে পাত্রকে এক বছরের জন্য পাত্রীর বাড়ীতে "জামাই খাটা" (দিন মজুর) হিসাবে খাটতে হয়। এই সময় যদি শত সহস্র কষ্ট স্বীকার করে পাত্র তাঁর ঈপ্সিত পাত্রী ও তার পরিবারের মন জয় করতে পারে তবেই লাভ করবে তার প্রণয়ীকে। এ সময়ে পাত্র পাত্রীর এক শয্যায় শয়ন,চলাফেরা সামাজিক দিক দিয়ে দোষণীয় নয়। অবশ্য আজকাল অনেক পাত্র "জামাই খাটা" না খেটে নিজেদের "ফালতু" রেখে দেয়।

সারা বছরে কাজ সারা হলে পর অর্থাৎ ঘরে ঘরে ফসল উঠার পর পাহাড়ে,পাহাড়ে বেজে উঠে বিয়ের বাজনা। বাঁশী বা "সুমুর" সুরে সমগ্র পাহাড় ধ্বনিত হয়ে উঠে। আদিবাসী পাত্র (চামারিছ) আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হয়ে উপস্থিত হয় পাত্রীর (হামযুগ) বাড়ী। পাত্রীর পিতা বা অভিভাবক অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে পাত্র পক্ষকে গ্রহণ করে। সমস্ত আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হয়ে বিশেষ ভাবে নির্মিত বিয়ের মঞ্চে এসে উপস্থিত হবে। বৃদ্ধ সর্দার বা "ওচাই" তাঁদের শপথ গ্রহণ করায় যে চিরজীবন এঁরা উভয়ের প্রতি অনুরক্ত থাকবে এবং একে অপরের সুখ দুঃখে সমভাগী হয়ে সারা জীবন নিজেদের দায় গ্রহণ করবে। এই সময় সমবেত সবাই পান ভোজন দ্বারা নিজেদের আপ্যায়িত করে।

এই আদিবাসীদের সন্তান সন্ততি হলে পর একরকম পূজা আর্চা দেয়। সেটা অনেকটা বাঙ্গালী সমাজের সূর্য্য দর্শনের মত। এই লোকাচার বা উৎসবে সাধারণত "ছেকাল" (ডাইনী) পূজা দিয়ে থাকে অর্থাৎ অশুভ দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখে যাহাতে নবজাত সন্তানের প্রতি তার কোন অশুভ দৃষ্টি না পড়ে।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে মোট ২২টি উপজাতি আছে।এদের মধ্যে ত্রিপুরা বা তিপ্রা ও রিয়াংগণই প্রধান। অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে মরশুম কলুই, হালাম, কাইপেং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, চাকমা, মগ, রাংখল,রুপিনী,কংচের, ছাইমাল, দাহুলা, কুকি প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজস্ব কৃষ্টি বা সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যেকের ধারাকে বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট। তবে মোটামুটি এঁদের চাষ আবাদ,ও সামাজিক জীবন

ধারা প্রণালী প্রায় এক। বৈদিক ভারতীয় দর্শনের ভাব ধারায় ধর্মাচরণ হতে দেখা যায়।

বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তি বা মহাবিষুব সংক্রান্তিতে "গড়াইয়া" পূজা ও পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গা পূজার (খমপুই বারুরই) সময় সমস্ত উপজাতিগণ প্রায় একত্র হয়ে এই উৎসব করে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে গড়াইয়া দেবতার প্রতিকৃতি একটি পাতাশুদ্ধ কাঁচা বাঁশের কঞ্চিতে একখণ্ড রঙ্গিন কাপড় বেঁধে একে মাটিতে পুঁতে সবাই চারিদিকে মিলিত হয়।"ওচাই" (পুরোহিত) এর সামনে মোরগ বা মহিষ বলি দিয়ে এর রক্ত ও চাল, কলা বিভিন্ন ফলাদির সাহায্যে আদিবাসী ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে পূজা সমাধান করে। পূজার পর ঐ বাঁশের গড়াইয়া দেবতা কাঁধে নিয়ে নারী পুরুষ সবাই বাড়ী বাড়ী গিয়ে নৃত্যগীত করে "সিংকি"মাগে ঠিক অনেকটা যেন বাঙ্গালী সমাজের পৌষ সংক্রান্তির কির্তনীয়াদের মত।

এছাড়া বিভিন্ন সমাজে "জুম" থেকে বিভিন্ন ফসল ঘরে উঠলে বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দিয়ে থাকে-যেমন ঘরে ঘরে ধান ও কার্পাস তুলা উঠলে পূজা দেয় "মাইলুমা"(লক্ষ্মী) বল্‌ম (বস্ত্রের দেবতা)।সর্ব পূজার আগে আরম্ভ তা হল "লাম্প্রা"(শুদ্ধি)পূজা, অনেকটা হিন্দুদের গণেশ পূজার মত। এরপর আছে মহাদেব (হর-পার্ব্বতী) শমিত (নবান্ন উৎসব), বূড়াছা নাগার পূজা, কের পূজা, যুনাইরগ, বুনাইরাগ, সুমতিহ, পুংতহ, বৃষহরি, ইত্যাদি।

প্রতি বৎসর গোমতী নদীর উৎস "ডম্বুর" জলপ্রপাত হতে উদ্ভুত "তীর্থমুখ" তীর্থের হাজার হাজার আদিবাসী মিলিত হয় পূজা দিতে। পৌষ সংক্রান্তিতে মূখ্যত এখানে এ পূজা হয়। তীর্থমুখের পূণ্য সলিলে অবগাহন করে শরীরের সমস্ত পাপ তাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করাই অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ছাড়া নিজেদের "মানত" পূজোও এখানে দিয়ে থাকে। শত শত ছাগ, মহিষ, মোরগ, পারাবত,হাঁস বলির রক্তে তীর্থ মুখের জল লালে লাল হয়ে যায়। এই তীর্থ মুখের উৎপত্তি সমন্ধে একটি সুখশ্রাব্য চলতি লোকগাথা এখন প্রচলিত আছে যা "যমপুঁইবারুক"নামে প্রসিদ্ধ। সংক্ষেপে কাহিনীটি এইরূপ- কোন এক আদিবাসী রাজার (সর্দ্দার) দুই কন্যা রাইমা ও শরমা জুমে ফসল কাটতে যাবার সময় এক চলশক্তিহীন বৃদ্ধ সাপ দেখতে পায়। বোনদের বড় বোনটির (রাইমা) সাপ টিকে দেখে মায়া হয়। সে রোজ জুমে আসার সময় সাপটির জন্য খাবার নিয়ে যেত। ক্রমে এদের মধ্যে প্রণয় জন্মে। বড় বোনটির সাথে সাপটির বিয়ে হয়। তাদের পিতা একদা জানতে পেরে সাপটিকে তিরস্কার করে ও তাকে হত্যা করে এবং নিকটের একটি ছোট গর্তের জলে সাপটির মাথা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কালক্রমে সেখান থেকে জন্ম নিল এক বিরাট গভীর জলাশয় এবং সহস্র সহস্র খুমপই (দোলন চাঁপা ফুলের গাছ)। বড় বোনটি স্বামীর দুঃখে ও তার সঙ্গে এখানে মিলিত হওয়ার জন্য চিরজীবনের জন্য এই জলাশয়ে

ডুব দেয় ও ছোট বোনটিকে (শরমা) স্বীয় পিতার এরূপ অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করার জন্য অনুরোধ করে যায়। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান ''তীর্থমুখের''জলাশয়ই সেই জলাশয় এবং ছোট বোনটি যেখানে বসে বড় বোন ও ভগ্নিপতির জন্য আকুল হয়ে কাঁদত এবং তাঁর চোখের জলে সৃষ্টি হল ''ডম্বুর প্রপাত''। কাহিনীটি যদিও কোন সাহিত্যের ভাষায় লিপিবদ্ধ নেই কিন্তু তবু এ কাহিনী ত্রিপুরার পাহাড়ে সর্বত্র এটি সত্য বলে প্রচলিত যে তার সত্যতা অনস্বীকার্য্য আর এই রূপকথা ত্রিপুরার লোকসাহিত্যের আদি কথা বলে হয়ত একদিন প্রচলিত হবে। এই রূপকথা ব্যতীত আরো অনেক রূপকথা আদিবাসী সমাজের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মুখে মুখে এখনো শোনা যায় যেমন-

মাইয়োং কুফুর (শ্বেতহস্তী)
রাঙ্গিয়া ভটিয়া,রাই-কাচাক,ইয়াম্ রক্ছা
ছিপিং তুই মাইরুংগ তুই,ছেকাল রগনি কথমা........ইত্যাদি

নিত্য ব্যবহার্য্য অঙ্গাভরণ ও ভৈষজপত্রে ত্রিপুরার আদিবাসীদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে ।এই সব আদিবাসীদের মধ্যে ত্রিপ্রা বা ত্রিপুরীগণ গলায় সাধারণতঃ পুঁতির মালা পরিধান করে থাকে । রিয়াং সম্প্রদায় গলায় টাকার মালা লহরীর পর লহরী তুলে ব্যবহার করে আসছে এবং এই মালা এক দিকে যেমন দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করছে, অন্য দিকে বক্ষাবরনের কাজও করছে। কোন উৎসব উপলক্ষে আদিবাসীগণ অনেকে হাটে বাজারে ও মেলায় একত্র হন ও তাঁদের সৌখীন অলংকার ক্রয় করতে দেখা যায়।

পোষাক পরিচ্ছদে এই সব আদিবাসীগণ এক স্বাতন্ত্রবোধ বজায় রেখে চলছে। পাহাড়ে ''জুমে'' জাত কার্পাস তুলা দ্বারা নিজেদের হাতে সূতা কেটে নিজেদের পরিচ্ছদ তৈরী করে। সাধারণত আদিবাসী মেয়েরাই এই সূতা থেকে নিজস্ব তাঁতে রিয়া(বক্ষবেষ্টনী) ও কোমর থেকে হাঁটু অব্দি এক ফালি কাপড়(পাছরা) তৈরী করে । এই দুই অঙ্গ বস্ত্রে বিচিত্র কারুকার্য্য চিত্রিত নক্সা থাকে এবং এতে তাঁদের সুষ্ঠু রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত এই ''রিয়া'' ও ''পাছরা''র মাপ হয় ৩ হাত x ১ হাত এবং ৪-১/২ হাত x ৩ হাত । বিভিন্ন উপজাতিদের এই একই প্রণালীতে অঙ্গাভরণ করতে দেখা যায়। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন নক্সা দ্বারা নিজেদের গোষ্ঠিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখে এবং তাঁদের পরিধেয়র নক্সা দেখে বোঝা যায় নিজেদের সম্প্রদায়গত গোত্র ভেদ। কুটির শিল্পের মধ্যে লাঙ্গা, (ঝাঁকি),চাটাই, রান্নার তৈজসপত্র,টাক্কাল প্রভৃতি রয়েছে।

ত্রিপুরার প্রতিটি আদিবাসী নৃত্য গান প্রিয়। ত্রিপুরার আদিবাসীদের লোক সংস্কৃতি তার লোক নৃত্য ও লোক সংগীতের বাণীই বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরার আদিবাসীদের

এই লোকনৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে তাদের সমাজের কথাই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা,পূজা পার্বণ,সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের কথাই খচিত হয়ে আছে। বৎসরের শেষে প্রকৃতিকে বিদায় জানিয়ে নতুন বর্ষকে আহ্বান করে "গড়াইয়া" নৃত্যানুষ্ঠানে ও সংগীতের মাধ্যমে - যেমন

গান- " গড়িয়ানি ছেংগারক,
আমা মাইলুমা,আমা খোলোমা,
গাডিয়া রাজা দেশ বেড়ায়
চাবঃ চাবাইয়্যা,নুং বঃ থুং বাইয়্যা"

কাব্য - বালার-বালার-বালার
বালার-বালার-বালা

ঢোলে তাল - "গান কি খাখান খিচন্ গান
চল্ গান্ গান্ খিচন্ খিচন
খিচন্ চুগাল খিচন গান্
চল্ গান্ গান্ খিচন্ খিচন্ ......"

এরপর দেখা যায় সারা বছরে হাড় ভাঙ্গা খাটুনীর পর "জুমের" পাহাড় থেকে যখন ফসল ঘরে উঠল তখন নারী পুরুষ সবারই মনে এক অনাবিল আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। খুশীতে ছেলে,যুবা বৃদ্ধ সবারই মুখ ঝলমলে হয়ে উঠে । এ সময় নতুন ফসলের দ্বারা "নবান্ন" বাঁধা হয় ও সমিতা দেবতার উদ্দ্যেশ্যে নিবেদন করে তারপর সকলে মিলে ঐ অন্ন গ্রহণ করে। এই নবান্ন "মামিতা" উৎসবে সাধারণত ছেলে মেয়ে সবাই দলবদ্ধভাবে নৃত্য-গীত করে থাকে। গীতের দুই কলি হচ্ছে

"রাজা বা কাইসং অশনি মতাই
কাঙ্গাল মামিতা মতাই।
সাগ্‌মি সাগ্ বাক্‌শা,দশ বায়ারক
কাঙ্গাল মামিতা মতাই ......।
কামিং কাচঃকক্ নক্ কুডি দক্
চৌধুরী খাখুল যাইছি
কাঙ্গাল মামিতা মতাই রমানি.....
চা-নামি কাদ্-নামি ফাইছি ..." .ইত্যাদি

অর্থাৎ-

রাজারা করে দুর্গোৎসব, কাঙ্গালেরা করে নবান্ন পূজা। সবাই সমান,গ্রামের লোক,কাঙ্গালের নবান্ন পূজা ছয় কুড়ি ঘর বড়পাড়া, সর্দার চৌধুরী দেখো কাঙ্গালের নবান্ন পূজার খাওয়া পরাতে এসো ......

এছাড়া অন্যান্য পূজাপার্বনে এঁদের নৃত্যগীত তো লেগেই আছে। অর্থাৎ নৃত্যগীত প্রতিটি আদিবাসীদের দৈনন্দিন কাজকর্মের মতই অন্য আর একটি অঙ্গ। কার্পাস তুলা থেকে সূতা কাটার সময় প্রতিটি গৃহে গুন গুণ করে গানের মিষ্টি সুরে সমগ্র পাহাড় গুঞ্জরিত হয়ে উঠে। নিজেদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কে কার থেকে চিকন্ সূতা কাটবে - আর সেই তালে তালে চলতে থাকে গান -

"এং এং কুকা হর রৌচব চখা
সাউঅ খুতুঙ লুব নানি ফায়দি
অবায় কতর অবায় চিকন্
ফায়দি চখা রিঙখনা ফায়দি
খুফাঙচুকখা বৌথাই থায়খা ...." ইত্যাদি।

ভাবার্থ হলো -

আমার চরকা ডাকছে,তোমরা সবাই এসো
চরকায় সূতা কাটবে- চিকন্ সূতা না কাটতে পারলে
রাজারাণী হবো কি করে ? .... ইত্যাদি

এছাড়া অন্যান্য নৃত্যগীতের মধ্যে দেখা যায় - লেবাং বুমানি,আথুকরন্নার, মশক্ বুমানি ও রিয়াং নৃত্য। নৃত্য গীতের সময় প্রতিটি আদিবাসী যুবতী রঙ্গীন রিয়া পাছরা পরবে, মাথায় বিভিন্ন ফুল দিয়ে সুন্দর করে কবরী বাঁধবে তারপর দল বেঁধে সমু,সাইগ্ঙা, চংপ্রেং, খাম্র,দাংহু প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের সাথে তাল রেখে নাচতে শুরু করে। আদিবাসীদের এই সব বাদ্যযন্ত্র নিজেদের হাতে তৈরী। এর মধ্যে সুমু বা বাঁশের বাঁশী ত্রিপুরা ফ্লুট নামে সমগ্র ভারতে সমাদৃত।

আদিবাসীদের মধ্যে আজকালের বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে মারাত্মক কুফল দেখা যাচ্ছে যে তারা নিজেদের লোক সংস্কৃতি প্রায় ভুলে গিয়ে আধুনিকতার, দিকে ঝুঁকছে। তাই এখন অনেকে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা রিয়া,পাছরা ত্যাগ করে শাড়ী ব্লাউজ, সার্ট প্যান্ট পরছে, এমন কি নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা বলতে পর্য্যন্ত সংকোচ বোধ করছে। আর নৃত্য গীতের কথা বলা নিস্প্রোয়জন।

ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা,নাট্য,যাত্রা,কবি গান,রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্য, আধুনিক সংগীতের লীলা ভূমি এই ত্রিপুরা

ভারতীয় শাস্ত্রীয় মার্গ সংগীতের আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। রাজন্য যুগ থেকেই শাস্ত্রীয় কথক, ভারত নাট্যম,নৃত্য গীতের চর্চা রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত ও চর্চা হতো। বিংশ শতাব্দীর ৪০ দশক থেকে সাধারণ্যে এর বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১৪ই চৈত্র ২৭ শে মার্চ ১৮৯৯ ইং দোল পূর্ণিমার দিন প্রথমবার আগমনে তার সম্মানে মনিপুরী শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ্ এর ব্যাপকতা লাভ করে।

বাঙ্গালী সংস্কৃতিমনস্ক সমাজে কথক, ভরতনাট্যম নৃত্য চর্চার যে প্রসারতার সূচনা একদা সূচিত হয়েছিল, বর্তমানে সমগ্র ত্রিপুরাতে এর অনুশীলন ও পরিবেশন এক সুস্থ সংস্কৃতির বার্ত্তা বহন করে চলছে। পরবর্তী সময়ে এই নৃত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনৃত্য এসে মনিকাঞ্চন যোগ সৃষ্টি করল।

একদা রাজন্য যুগে পৌরাণিক নাটকের যে চর্চা হতো বিশেষ করে "উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ" ও "পুস্পবন্ত নাট্যসমাজ" পরবর্ত্তী সময়ে ত্রিপুর শিল্পায়তন, পঞ্চপ্রদীপ, শিল্পায়ন, ঐ ধারাকে অনুসরণ করে আধুনিক নাট্যরসে দর্শকগণকে আপ্লুত করে তুলেছিল বিশেষ করে "রূপম"নাট্য গোষ্ঠির নাটকে এর সত্যতা প্রমাণিত।

"যাত্রা " সমাজ দর্পণের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ত্রিপুরায় এই সংস্কৃতির চর্চা দুইশত বছরের পুরাতন ।ঢপ যাত্রা দিয়ে একদা যার আত্মপ্রকাশ ,বর্তমান আধুনিকতায় এর চর্চা এক বিশেষ মাত্রা এনে দিয়েছে ।কবি গান, পুতুল নাচ,বিভিন্ন বিনোদন, সুস্থ সংস্কৃতিকে ঘিরে আবর্তিত ।

ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রকরনে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় সংগীত নৃত্য,আধুনিক গান,নৃত্য,আদিবাসী নৃত্যগীত লোক সংগীত সব কিছুই ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতির পরিচায়ক।

এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত সংস্কৃতি চর্চার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে'তা সর্ব্বতোমুখী ভাবে বিগত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে সূচনা কাল বলা যেতে পারে। যায় অনুরণন ১৯৮০ সন থেকে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই অনুসৃত হচ্ছে ।

প্রবন্ধকার ১০ বছর বয়স থেকে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর ৪০ দশক থেকে রাজন্য যুগের নগর সংস্কৃতি তথা শিল্প, সাহিত্য,সংগীত,নৃত্যকলার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে এক জন কর্মী রূপে সমগ্র ত্রিপুরা পরিক্রমা করছেন। বিশেষ করে ৫০ দশকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে এই সংস্কৃতি চর্চার শুরু যা আজও অব্যাহত ।

কিন্তু আজ বেশ কয়েক বছর ধরে এই প্রাণ চঞ্চল লোক সংস্কৃতি, কি আদিবাসী বা বাঙ্গালী উভয় সমাজে কোথা থেকে যেন বেনো জলে উক্ত সংস্কৃতি বিকাশে এক অপসংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের প্রচারে এই প্রকট ভাব সুস্পষ্ট ভাবে প্রচারিত ও প্রকাশিত । সংস্কৃতির নামে যে পশ্চিমী সমাজের বিকৃত জীবন

ধারা বিশেষ করে ধনতন্ত্রের ঔরসে স্বৈরিনী বুর্জোয়া বিলাসিনীর গর্ভজাত এই কুৎসিত অপসংস্কৃতি আজকের কিছু যুবক যুবতীদের করছে বিভ্রান্ত, বিশেষ করে আদিবাসীদের। রবীন্দ্রনৃত্য,রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চা, রবীন্দ্র সংস্কৃতি শাস্ত্রীয় নৃত্য গীত এদের কাছে ব্রাত্য। এর কুফল জাতি উপজাতিদের সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধকে করছে বিনষ্ট। কি আদিবাসী, কি বাঙ্গালী, লোক সংস্কৃতি পরিবেশনের মধ্যে পোশাক, বাদ্যযন্ত্রে , কণ্ঠ সংগীতে এসেছে পশ্চিমী ধারা, যা ভারতীয় সুস্থ সংস্কৃতি প্রকাশের পরিপন্থী। বংশ পরম্পরায় বাদ্য যন্ত্রের সুর লহরী ত্যাগ করে বিজাতীয় পাশ্চাত্য সুরের ধ্বনির সঙ্গে বেলাল্লাপূর্ণ যৌন উত্তেজক নৃত্য,গীত চর্চা কি সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে অন্তরায় নয় ?

প্রবন্ধের গান ও নৃত্যের তথ্য একদা ˚ মহেন্দ্র দেববর্মা ও˚ নগেন্দ্র দেববর্মার কাছে পাওয়া । লেখক।

----- o -----

ত্রিপুরার পান্ডুলিপি

ডঃ হরেকৃষ্ণ আচার্য

ত্রিপুরায় পান্ডুলিপির সম্ভাবনা বিষয়ে না জেনেই খোঁজার কাজ শুরু করেছিলুম। পাওয়া গেল পান্ডুলিপি। হলাম পাঠোদ্ধারের সামনা-সামনি। পাঠোদ্ধার করতে যে বিষয়গুলোর জ্ঞান থাকা দরকার তা হলো বাংলা লিপি বিকাশের জ্ঞান এবং অব্দ-নির্ণয় করার জ্ঞান। পান্ডুলিপি বিষয়ে পন্ডিতহীন ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে হলো মোঃ আবদুল কাইউম প্রণীত 'পান্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা' গ্রন্থের।

এই জ্ঞানের পরে পান্ডুলিপি পাঠ করে বোঝা গেল বিষয় বৈচিত্র্য এবং বিষয়ের গুরুত্ব। অনুভব করা গেলো, যত বেশী পান্ডুলিপি পাওয়া যাবে ততই সম্পাদকের মন্তব্য সঠিক হবার সম্ভাবনা। তাই শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষেত্রাশ্রিঅনুসন্ধান। অনুসন্ধান সূত্র ঘুরিয়েছে সমগ্র ত্রিপুরা, আসামের শিলচর, বদরপুর, বাংলা দেশের বার্মা সীমান্ত টেকনাফ হতে কক্স্ বাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, মৌলভীবাজার প্রভৃতি অঞ্চল। সূত্র টেনে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় রানাঘাটের অন্তর্গত বাঘাডাঙা গ্রামেও। সূত্র আছে উড়িষ্যায়ও, তবে যাওয়া হয়নি এখনো। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, প্রাপ্তিযোগ ত্রিপুরাতেই বেশী।

ত্রিপুরায় পান্ডুলিপির উৎস খুঁজতে গিয়ে বোঝা গেলো ঃ

১) ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব

২) ত্রিপুরার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস বিবর্তনের গুরুত্ব।

ত্রিপুরার গতি ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে। উত্তর থেকে সরতে সরতে ত্রিপুরার রাজধানী ক্রমশঃ উদয়পুরে আসে, কিন্তু কুকিদের জন্য পূবে এবং আরাকান রাজের প্রতিবন্ধকতায় পূর্ব-দক্ষিণে ত্রিপুরার অগ্রগতি বাধা পায়। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমে পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) মুখীন হয় ত্রিপুরা। বাইরের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগের পথও হয় এটি। এদিক ধরেই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেও ত্রিপুরার যোগাযোগ। এজন্যই ত্রিপুরার সঙ্গে বঙ্গ-সংস্কৃতির গভীর যোগ এবং এ যোগই ত্রিপুরায় পান্ডুলিপির প্রধান উৎস হয়ে ওঠে।

প্রাপ্ত ত্রিপুরার পান্ডুলিপি অনুসরণে ত্রিপুরার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চেতনাশ্রিত সমাজ বিবর্তনের ধারাগুলো স্পষ্ট অনুভূত হয়। ত্রিপুরার বিবর্তনের স্তরগুলো মোটামুটিভাবে এরূপ ঃ

I) প্রথম স্তর তথা প্রাচীনযুগ ঃ ত্রিপুরার ৯৮তম রাজা ডুঙ্গুরফা পর্যন্ত। সময় ঃ আনুমানিক ৬৫০ ত্রিপুরাব্দ ১২৪০ খৃষ্টাব্দ।

II) দ্বিতীয় স্তর তথা মধ্যযুগ ঃ ১০০ তম রাজা রত্নফা তথা রত্নমাণিক্যের কাল থেকে শুরু। সময় - ৬৯২ ত্রিপুরাব্দ ১২৮২ খৃষ্টাব্দ থেকে।

III) তৃতীয় স্তর তথা আধুনিক যুগ ঃ ১৯৪৯ ইং সনের ত্রিপুরার ভারতভুক্তি থেকে।

ত্রিপুরার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ স্তর হলো প্রথম স্তর তথা প্রাচীন যুগ। এই স্তরে হিন্দু-বাঙালী সংস্কৃতি বা ইসলাম বা বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব বা খৃষ্টান কোনো সংস্কৃতির সঙ্গেই ত্রিপুরার সংযোগ ঘটেনি। কিন্তু এস্তরের কোনো পাণ্ডুলিপি আজও হাতে আসেনি। তৃতীয় স্তর তথা আধুনিক যুগ পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে ভারতভূক্তির অনেক আগে থেকে ধরতে হবে। ছাপা যন্ত্রের আবিষ্কার এবং ত্রিপুরায় তা প্রতিষ্ঠা পাবার আগে পর্যন্ত। কারণ, ছাপার যন্ত্র হবার পরে তো আর পাণ্ডুলিপি রচনার প্রয়োজন পড়েনা। তাই ত্রিপুরায় আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপির সবই মধ্যযুগের।

মধ্যযুগে হিন্দু-বাঙালী এবং মুসলমানদের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ঘটে রাজনৈতিক কারণে এবং এসব সংস্কৃতিও প্রচার পায় ত্রিপুরাতে। এর মধ্যে হিন্দু-বাঙালীর সংস্কৃতিই ত্রিপুরার মূল সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এর কারণ, ত্রিপুরার মাণিক্য রাজাদের হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষণ। যুবরাজ রত্নফা রাজনৈতিক কারণে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে লক্ষণাবতী নগরে গিয়ে কিছুকাল আশ্রিত ছিলেন। পরে তুঘ্রল খাঁর সাহায্যে ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে লক্ষণাবতীর পূর্বপরিচিত তিনজন হিন্দু বাঙালিকে ত্রিপুরায় নিয়ে আসেন। এরা হলেন লিপি ব্যবসায়ী পণ্ডিতরাজ, চিকিৎসা ব্যবসায়ী জয়নারায়ণ সেন এবং দক্ষিণ রাঢ়ী ঘোষ বংশজাত খাণ্ডব ঘোষ। অনুমান করা হয় মহারাজ রত্ন মাণিক্যের আমলেই ত্রিপুরায় হিন্দু ব্রাহ্মণদেরও ডেকে আনা হয় এবং দেশীয় ত্রিপুরী ব্রাহ্মণদের রাজ-পৌরোহিত্য থেকে সরিয়ে ডেকে আনা হিন্দু ব্রাহ্মণদের ঐ কাজে বরণ করা হয়। শুরু হয় ত্রিপুরার মাণিক্য রাজাদের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অনুসরণ এবং পৃষ্ঠপোষণ। তাই মধ্যযুগের যত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার একটি বিশেষ অংশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আশ্রিত। ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আশ্রিত আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলো হলো বিভিন্ন রকম পূজাবিধির ও পূজার মন্তর-তন্ত্র বিষয়ক যেমন ঃ

১) সন্ধ্যাপদ্ধতি, ২) গন্ধবিধি ৩) হরিপূজন বিধি, ৪) শিব পূজা বিধি, ৫) অনন্ত ব্রতবিধি, ৬) যজূর্বেদীয় কুশন্তিকা হোমবিধি, ৭) মহিষোৎসর্গ বিধি, ৮) দোলপূজা বিধি, ৯) বলিদান বিধি, ১০) মন্ত্র পুনশ্চরণ বিধি, ১১) পিপিতক দ্বাদশী ব্রতবিধি, ১২) হরিহরের পূজা বিধি, প্রভৃতি। এছাড়া, এক্ষেত্রে আছে, ১৩) পুরপর্ব, ১৪) পাতাল পর্ব, ১৫) পৃথিবী পর্ব, ১৬) শিলাপর্ব নামের পাণ্ডুলিপি, ১৭) অন্তেষ্টি বিধি, ১৮) অশৌচ বিধি, ১৯) শ্রাদ্ধ বিধি, ২০) দশকর্ম বিধি প্রভৃতি নামের পাণ্ডুলিপি।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মন্ত্র শাখার মতো তন্ত্রশাখাও ত্রিপুরার জন জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো। এ শাখার আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলো হলো ঃ ১) শ্রী শ্রী চণ্ডী, ২) দুর্গাপূজা বিধি, ৩) ত্রিপুরাসুন্দরী পূজা বিধি, ৪) দূর্বাষষ্ঠী পূজাবিধি, ৫) শীতলা পূজাবিধি, ৬) চণ্ডিকা পূজাবিধি জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চাও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অঙ্গ। এ বিষয়ে দু'টি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিছাড়া ত্রিপুরায় ইসলাম এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতিরও আগমন ঘটে, কিন্তু ত্রিপুরার মূল সাংস্কৃতিক স্রোতের সঙ্গে ঐ সংস্কৃতিগুলি মেলেনি এবং এসব সংস্কৃতির কোনো পাণ্ডুলিপিও পাইনি। পরবর্তী কালে ত্রিপুরায় ক্রমশঃ প্রবেশ ঘটে বৈষ্ণব সংস্কৃতির। এক্ষেত্রেও ত্রিপুরার মাণিক্য

রাজাদের এবং বঙ্গীয় হিন্দু বাঙালিদের প্রভাব স্পষ্ট। ত্রিপুরার রাজাদের বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত মনিপুর রাজবংশের রাজকন্যা বিয়ে করার ফলে এবং সেই সঙ্গে হিন্দু বাঙালির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গ হয়ে ত্রিপুরায় বৈষ্ণব ধর্ম সংস্কৃতির আগমন ঘটেছে বলে মনে হয়। মণিপুরের রাজকুমারী বিয়ের পথপ্রদর্শক হলেন মহারাজ রাজধর মাণিক্য। ১১৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৭৮৫খৃঃ)তিনি মণিপুরের রাজা জয়সিংহের কন্যাকে বিয়ে করেন। ত্রিপুরায় মহারাজ রাজধরমাণিক্য অষ্ট ধাতুর বৃন্দাবন চন্দ্রের মূর্তি স্থাপন করেন। বৈষ্ণব সংস্কৃতি রাজপরিবার হতে শুরু করে ক্রমশঃ ত্রিপুরী এবং হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরে বসন্তোৎসব যে বেশ জাঁকের সঙ্গে পালিত হতো তা সবারই জানা কথা। বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাবেই ত্রিপুরায় বৈষ্ণব পদাবলী এবং বৈষ্ণব তত্ত্বাদির পাণ্ডুলিপি শাখা গড়ে ওঠে। এ শাখায় যেসব পাণ্ডুলিপি পেয়েছি ঃ ১) বৈষ্ণব পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা, ২) অষ্ট প্রকার শক্তি সঞ্চারণ, ৩) হরিনামের বিচার, ৪) সাধক চূড়ামণি, ৫) জ্ঞান-চৌতিষা, ৬) জ্ঞান প্রদীপ, ৭) জ্ঞানরত্নমালা, ৮) আশ্রয় তত্ত্ব,৯) বৃন্দাবন তত্ত্ব। এগুলির মধ্যে একখানা বিশেষ পাণ্ডুলিপি আছে। বিশেষত বৃন্দাবন তত্ত্ব লিখতে গিয়ে লিপিকর আরবী রীতির প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ কাহিনী শেষপৃষ্ঠা থেকে প্রথম পৃষ্ঠার দিকে এগিয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যাও এগিয়েছে বাঁ দিকে, কিন্তু পৃষ্ঠার চরণগুলো বাংলা ভাষার রীতিতেই বাম থেকে ডানে। শিক্ষা সংস্কার ধর্ম যতই থাক না কেন সমাজের তৃণমূলস্তরে তাবিজ কবচ, জলপড়া, তেলপড়া প্রভৃতির প্রচলন দেখা যায় সব সময়ই। ত্রিপুরাতে এরূপ দুখানা পাণ্ডুলিপি পেয়েছি।

মহারাজ রত্নমাণিক্যের কাল থেকেই ত্রিপুরায় সমাজ আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে ধর্মের আশ্রয়ে। আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলি তারই দলিল। ধর্মাশ্রিত পাণ্ডুলিপিতে মৌলিক সৃষ্টির পরিচয় নেই। এগুলো সাহিত্য নয়। বিধি-বিধান, তত্ত্ব-দর্শন। সাহিত্য বিষয়ক যেসব পাণ্ডুলিপি পেয়েছি সেগুলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের ঐতিহাসিক দলিল। সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডুলিপি পেয়েছি শৃঙ্গারতিলক এবং স্বপ্নাধ্যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপি পেয়েছি আখ্যাতবৃত্তি এবং কলাপ ব্যাকরণ।

যুগসন্ধিক্ষণে সাহিত্য নতুন পথের রসদ সংগ্রহ করে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শুরুতে বাংলা ভাষা রসদ সংগ্রহ করেছিল সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত এবং ভাগবত অনুবাদ করে। ত্রিপুরাতেও অনুরূপ অনুবাদ শাখার পবিচয় দেয আবিষ্কৃত কিছু পাণ্ডুলিপি। যেমন ঃ রামায়ণের অনুদিত পাণ্ডুলিপি এবং মহাভারতের দ্রোণপর্বের পাণ্ডুলিপি। অনুবাদের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মাণিক্য রাজাদেরও যে উৎসাহ ছিল তার প্রমাণ মহারাজ ধর্মমাণিক্য। ১১২৪ ত্রিপুরাব্দে (১৭১৪ খৃঃ) তিনি সিংহাসনারোহন করেন। তাই অনুমান করা যায় তিনি মহাভারতের যে পদ্যানুবাদ করিয়েছিলেন তার লিপিকাল হবে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ। এতে ত্রিপুরায় যে অনুবাদের কাজ উৎসাহিত হয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে আমতলীর (আগরতলা) কপালী বংশের লোকদের নিকট। তাঁদের অনুদিত রামায়ণ এবং মহাভারতের (দ্রোণপর্ব) পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে।

রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া অনুবাদমূলক আরেকখানা মূল্যবান পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে। নাম, 'বৈশাখ মাহাত্ম্য'। পান্ডুলিপিটির পুষ্পিকা এরূপ ঃ

নরসিংহ উৎকলেতে   বিরচিল পরাকৃতে
শ্রবণেতে অতি মনোহর।
ঠাকুর শ্রীদিগম্বর   শরণ তার অন্তর
হরিনাম গান নিরন্তর।।
তাহার হইল আজ্ঞা   না করিলাম অবজ্ঞা
ঐ বাণী দৃঢ় করি মানি।
বঙ্গবাকে বিরচিল   সেবি সাধু ধর্মশীল
লক্ষ্মণেরে যা কর আপনি।

পুষ্পিকাতে অনুলিপির কাল নেই। সূত্রটি আছে পুঁথির ওপরের পাতায়। লিপিকাল ১৩৩৬ বাং।

বোঝা যায়,'বৈশাখ মাহাত্ম্য' গ্রন্থ উৎকলের এবং প্রাকৃত ভাষার। দিগাম্বর ঠাকুরের নির্দেশে লক্ষ্মণ নামে লিপিকর গ্রন্থখানা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। উৎস সূত্রে বিষয় সূত্রে এবং সাহিত্যিক মূল্যে পান্ডুলিপিখানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিষয় অনুসরণ করলে গ্রন্থের সামাজিক গুরুত্ব অনুভব করা যায়। বৈশাখ মাসের প্রচন্ড গরমে খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়, আগত অতিথির প্রতি কর্তব্য নির্ণয়, প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া, গ্রীষ্মকালে পুকুর খনন, গাছ লাগানো, গাছের গোড়ায় জল দেয়া, জলসত্র স্থাপন করা প্রভৃতি কাজকে খুবই পূণ্য কাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মূল গল্পের সঙ্গে ছোট ছোট গল্প জুড়ে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্প বলার ঢং খুবই সাবলীল। সবটা কাহিনী প্রায় ষোলোটি ছোট গল্পের একটি মালা। পান্ডুলিপিখানা অবশ্যই গবেষণার অপেক্ষা রাখে। যাক, অনুবাদ সাহিত্যের যে সব পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে সেগুলোর সূত্র পরিচয় এরূপ ঃ

জেলা	ক্রম	স্থান	মালিকের নাম	পান্ডুলিপির নাম
পশ্চিম	১	আমতলী,আগরতলা	রামনাথ কপালী	১) রামায়ণ (খন্ডিত), ২) মহাভারত (দ্রোণপর্ব)
পশ্চিম	২	কৃষ্ণনগর, আগরতলা	কৃষ্ণকুমার দেববর্মা (নীলু ঠাকুর)	বৈশাখ মাহাত্ম্য
উত্তর	৩	কৃষ্ণনগর, কমলপুর	বামাপদ সূত্রধর	রামায়ণ

পাঠের সঙ্গে পালা গানের মাধ্যমেও রামায়ণ -মহাভারতের কথা সমাজে প্রচার হতো। রামায়ণের পালা গানের পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে পিতাপুত্র পরিচয়। মহাভারতের কথা-আশ্রিত পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে প্রহ্লাদ চরিত্র এবং নল দময়ন্তিকথা। বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত পালা কীর্তনের

পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে 'মানভঞ্জন' ও 'রাই উন্মাদিনী'।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে অনুবাদ শাখার পাশে গড়ে ওঠে লোকসাহিত্য শাখা। লোকসাহিত্য, যা জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য। এ সূত্রেই পাওয়া যায় পাঁচালি সাহিত্য। পাঁচালির আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি হলো ঃ ১) সত্যদেব নারায়ণের পাঁচালি, ২) শনির পাঁচালি, ৩) অনন্ত ব্রতকথা পাঁচালি, ৪) অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতকথা পাঁচালি, ৫) হরিহরের ব্রতকথা পাঁচালি, ৬) মাঘিব্রত পাঁচালি, ৭) গঙ্গামাহাত্ম্য পাঁচালি।

'Individual Product'-থেকে 'Group Product'-এর দিকে গতি হলো লোকসাহিত্যের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ সূত্রেই পাঁচালিকে বুকে ধরে মঙ্গলকাব্যের জন্ম। এক্ষেত্রে আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলোর সূত্র পরিচয় এরূপ ঃ

জেলা	ক্রম	স্থান	মালিকের নাম	পাণ্ডুলিপির নাম
পশ্চিম	১	চন্দনমুড়া, সোনামুড়া	নবদ্বীপ চন্দ্র দাস	পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মপুরাণ
উত্তর	২	হালাহালি, কমলপুর	কাশীনাথ পাল	পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মপুরাণ
উত্তর	৩	কৃষ্ণনগর, কমলপুর	বামাপদ সূত্রধর	পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মপুরাণ
উত্তর	৪	কৃষ্ণনগর, কমলপুর	মাখন দেবনাথ	নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ
উত্তর	৫	কৃষ্ণনগর, কমলপুর	হৃদয় নাথ	পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মপুরাণ
ধলাই	৬	করমছড়া	হরিমোহন শর্ম্মা	পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মপুরাণ
দক্ষিণ	৭	বদর মোকাম, উদয়পুর	যোগেশচন্দ্র দেব	পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মপুরাণ
দক্ষিণ	৮	ডাকবাংলা রোড, উদয়পুর	আরতি মজুমদার	দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল
দক্ষিণ	৯	কুশামারা, কাকড়াবন	বর্ণমালা ভৌমিক	পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মপুরাণ
দক্ষিণ	১০	কালীনগর, বিলোনীয়া	ভবরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	দ্বিজরাম দেবের অভয়ামঙ্গল

মঙ্গলকাব্যের পাণ্ডুলিপিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নানা বিষয়ে গবেষণার উপকরণে ভরা। এগুলোর মধ্যে পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মপুরাণ নিয়ে গবেষণা হয়েছে এবং এ কবি তিন বঙ্গের মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এর থেকে বাংলা সাহিত্যে

মনসা মঙ্গলের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ও যুক্ত হয়েছে।

মঙ্গল কাব্যের পান্ডুলিপির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তথ্য এই যে, মনসামঙ্গলের কবি নারায়ণ দেবের আবিষ্কৃত পান্ডুলিপিটির বয়স তিনশো বছরের ওপর হবে বলে মনে হয়। সন্দেহযুক্ত কথা বলার কারণ, পুঁথিটির পুষ্পিকা অংশ খন্ডিত। কিন্তু তুলোট কাগজের পাতাগুলো, পাতার আচ্ছাদন হরিণের চামটি এবং ওপরের মলাট হিসেবে ব্যবহৃত কাষ্ঠখন্ড দু'টি দেখে এর প্রাচীনত্ব অনুমিত হয়। রাসায়নিক পরীক্ষার দরকার। অনুমান সত্য হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত নারায়ণ দেবের সবচেয়ে পুরোনো পান্ডুলিপিটির সমসাময়িক হবে এটি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোক প্রতিলিপির লিপিকাল ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ।

পুরানো দিনের পান্ডুলিপি যেমন ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতির দলিল, তেমনই বিশেষ দলিল ভাষা বিকাশেরও। ভাষা বিকাশের দুটো ধারা হলো লিপি বিবর্তনের ধারা এবং ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা। আবিষ্কৃত পান্ডুলিপিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরানো হল ১১৯৯ বাংলা সনের (১৭৯২ খৃঃ)। ২০০৫ ইং সনে পান্ডুলিপিটির 'বয়স ২১৩ বছর। সবচেয়ে কম বয়সী পান্ডুলিপির অনুলিপি কাল হলো ১৩৩৬ বাংলা (১৯২৯ খৃঃ)। বর্তমান বয়স, ৭৬ বছর। এক্ষেত্রে বোঝা যায়, সংগৃহীত পান্ডুলিপিগুলো হলো আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ সময়ের । এ সময়ের মধ্যে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এবং শুরু হয় আধুনিক কাগজের প্রচলনও। কিন্তু কোলকাতার ছাপা যন্ত্রের সুবিধে প্রত্যন্ত বাংলা বা ত্রিপুরায় মানুষ পেতে আরো সময় লেগেছে। তাই বিশ শতকেও গ্রাম বাংলার মানুষ হাতে লিখেই জ্ঞান চর্চা করতো। এ সঙ্গে অবশ্য অনেকের হাতেই আধুনিক কাগজ পৌঁছে গেছে। তাই যেমন পাওয়া গেছে তালপাতা ও তুলোট কাগজের পুঁথি, তেমনিই পাওয়া গেছে আধুনিক কাগজের শুরুর দিকের মোটা কাগজের পান্ডুলিপি। এ সময় আস্তে আস্তে পান্ডুলিপি পুঁথির আকার ছেড়ে খাতার আকারও পেতে থাকে। মোট কথা, সংগৃহীত পান্ডুলিপির কাগজ বিকাশের দলিলও। কাগজ, তালপাতা, তুলোট কাগজও আধুনিক কাগজের পুঁথি আছে।

প্রাচীন কাল থেকে পান্ডুলিপি আশ্রয়ে বাংলা লিপি ক্রমবিবর্তিত হয়ে আধুনিক রূপে এসেছে। এ প্রসঙ্গে তালিকাটি পূর্বে দেয়া আছে। কিন্তু তবুও বলতে হয় আবিষ্কৃত পান্ডুলিপির হরফ দেখলে অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাই এগুলো গবেষণা করলে লিপি বিকাশের আরো বৈচিত্র্য দেখা যাবে।

ধ্বনি বিবর্তনের ক্ষেত্রেও পান্ডুলিপিগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। পন্ডিত জানকীনাথের পদ্ম পুরাণ থেকে কয়েকটি উদাহরণ নেয়া যাক ঃ

১) সপ্তদিন অচ্ছান্তরে ঋতুস্নান কৈল। (২৬/১-১৭ অর্থ = (২৬ নং পাতার প্রথম পৃষ্ঠের ১৭ নং চরণ)।

অছান্তর = অবস্থান্তর > অবথান্তর > আলথান্তর > আথান্তর > অছান্তর > আতান্তর প্রভৃতি।

অর্থ = অবস্থার পরিবর্তন, দুরবস্থা, দুর্ভোগ প্রভৃতি ।

২) আছৌক আনিব প্রাণ কদাপিয় নহে। (১১২/২-১১)

আছৌক = সং.√অস্ > লি.√আচ্ছ > প্রা.√অচ্ছ > বা আছ।

অর্থ = অপেক্ষা বা তুলনামূলক শব্দ।

৩) এইমতে পুনি- পুনি নিতি-আত্যাগতে (৯৩/২-১৯)

আত্যাগতে = আতি আগতে/ আতি= আতি < অতি। অর্থ = অতিশয়, অত্যন্ত, নিবিড়

আগতে = আসা-যাওয়ায়, প্রগাঢ় মমত্বসুত্রে আসা - যাওয়া প্রভৃতি।

আর উদাহরণ না বাড়িয়ে বা ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়গুলো আলোচনা না করেও এটুকু বলা যায় যে আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাণ্ডুলিপির কিছু বহিরঙ্গ সংবাদ থাকে। তাহলো কাগজ, কালি, কলম তৈরী পদ্ধতি এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি। তালপাতা নির্দিষ্ট আকৃতিতেকেটে সেদ্ধ করে নেয়া হতো । তারপর মাঝখানে ছিদ্র করে সূতো দ্বারা গেঁথে রক্ষা করা হতো। তালপাতার পুঁথিতে তালপাতার মলাটই থাকে। তুলোট কাগজ তৈরীর পদ্ধতি আরেক রকম। তুলোকে ধুনে নিয়ে আগুনে গলানো গন্ধকে ছেড়ে দিয়ে আটার মন্ডের মত করে বেলে নির্দিষ্ট আকারের পাতা তৈরী করা হতো। লেখা হয়ে গেলে ওপরে নীচে হরিণের চাম বা সুপুরীর খোল দিয়ে কাপড়ে মুড়ে আবার ওপরে নীচে কাঠের টুকরো দিযে লম্বা রসি দ্বারা পেঁচিয়ে বাঁধা হতো। গন্ধকের অন্য উপযোগিতা এই যে, তুলোট কাগজের পুঁথিকে পোকায় নষ্ট করতে পারে না। তাছাড়া, চোরের হাত থেকে পুঁথিকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিটি বেশ মজাদায়ক। যেমন ঃ পুঁথি অনুলিপির কাজ শেষ কবে, শেষ পাতায লেখা হয়েছে ঃ

"দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থঃ যঃ চোরে নিয়তে যদি
শুকরী তস্য মাতা চ পিতা চ তস্য গর্দভঃ
ইতি ঋষির্বচনং।।"

কালি তৈরী হতো গ্রাম্য পদ্ধতিতে। কালি তৈবীর উপাদান ও পদ্ধতিকে শ্লোকেব মাধ্যমে স্থায়ী করে রাখা হতো। যেমন ঃ

তিন ত্রিফলা শিমূল ছালা।
ছাগদুগ্ধে দিয়ে তেলা।।
লোহা দিয়া লাহাই ঘষি।
মসী বলে আকাট বসি।।

মধ্যযুগে প্রধানতঃ বাঁশের কঞ্চির কলম বা খাগের কলম ব্যবহৃত হতো। অনুলিপির কাজে বিভিন্ন রকমের কলম ব্যবহৃত হতো। অর্থাৎ মোটা , মাঝারি এবং সরু। একই পৃষ্ঠায় মূল লেখায় হয়তো মোটা কলম ব্যবহৃত হলো তো অর্থের জন্য মাঝারি কলম এবং টীকা টিপ্পনীর

জন্য ব্যবহৃত হতো সরু কলম।

সুরুচি মানুষের সৌন্দর্য বোধের উৎস ।সৌন্দর্য বোধ থেকেই শিল্পের প্রকাশ। পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায় এমন কি ওপর নীচের কাষ্ঠখন্ড দু'টো তেও সুন্দর সুন্দর ছবি দেখা যায়।

পাণ্ডুলিপির এসব বহিরঙ্গ বিষয় আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সংক্ষেপে এগুলোর ইঙ্গিত এ জন্য দেয়া ভাল যে আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলো এসব দিক থেকেও গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'পুষ্পিকা' অংশ। এ অংশে কবি বা লিপিকারের নাম ঠিকানা, অনুলিপির কাল এবং আরো নানারকম তথ্য সূত্র থাকে। কাল নির্ণয়, বিষয়ের ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব প্রভৃতি সহজে অনুধাবনের জন্য এ অংশটি তাই সম্পাদকের মূল আশ্রয়। পন্ডিত জানকীনাথের আদর্শ পুঁথির পুষ্পিকা অংশটি এরূপ ঃ

"শুঅক্ষর লিখিতং শ্রীঅনন্তরাম দেবদাসস্য
নিজ পুস্থক শ্রী হলাসরাম দেব সাকীন পরগনে
কীসমত সাতগাও মৌজে ভূনবীব। । ৪।
শ্রীরগুনাথ পাল সাং ভুনবীর খরিচসন ১২৭২ বাং
দাম ৪ মতালা কটীলে সরকার শ্রীহট্ট। ৪।
ইতিসন ১২৩২ সাল বাংলা মাহে ২৭ শ্রাবণ
রোজ বৃহস্পতিবারমাত্র।"

এই পুষ্পিকা দেখে বোঝা যায় ঃ

পুঁথিটির লিপিকার	ঃ	শ্রী হলাসরাম দেবদাস
পুঁথিটির মালিক	ঃ	শ্রী অনন্তরাম দেব
ঠিকানা	ঃ	সাতগাঁও মৌজার ভূনবীর গ্রাম, শ্রীহট্ট।
পুঁথিটির লিপিকাল	ঃ	১২৩২ বাং
লিপির কাজ শেষ হয়েছে	ঃ	২৭শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।
পুঁথিটি খরিদ করেছেন	ঃ	শ্রী রঘুনাথ পাল।
খরিদ সন	ঃ	১২৭২ বাং
দাম	ঃ	৪ (চার) টাকা মাত্র।

আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলো ভাষার দিক থেকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত -সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার

পাণ্ডুলিপি। পুষ্পিকা প্রমাণে লিপিস্থানের দিক থেকেও দেখা যায় দুটো ধারা - ত্রিপুরার নিজস্ব এবং বহিরাগত পাণ্ডুলিপি। ত্রিপুরার পাণ্ডুলিপি ভান্ডার এ দু'ধারাতেই পুষ্ট।

সবশেষে বলতে হয়, শুরুতে ত্রিপুরায় পাণ্ডুলিপির ঐশ্বর্য বিষয়ে জানা না থাকলেও অনুসন্ধানে তার সন্ধান পেয়েছি। পেয়েছি অনেক পাণ্ডুলিপি। আনতে পারিনি কিন্তু দেখেছি এরূপও আছে অনেক পাণ্ডুলিপি। অনুভব করেছি যে, ত্রিপুরাতে এখনো অনাবিষ্কৃত অনেক পাণ্ডুলিপি আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সংগ্রহ আছে। ব্যক্তিচেষ্টায় সামগ্রিক সংগ্রহ- অভিযান সম্ভব নয়। সংগ্রহ বিষয়ে মূল দায়িত্ব হতে পারে মহাফেজখানা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের। সরকারের কর্তব্য পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে আন্তরিক ও উদার হওয়া।

সংগ্রহ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। নতুন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে অন্ততঃ পঁচিশ নম্বরের হলেও পাঠ্যক্রম যুক্ত করা দরকার। তাহলে শিক্ষার্থীরা বুঝবে। বুঝলে খুঁজবে। আসলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এই যে, সারা ত্রিপুরার শিক্ষার্থী পাওয়া যায় এবং তাদের উৎসাহিত করতে পারলে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের তথ্যসূত্রও সহজে পাওয়া যায়। আমি বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মাধ্যমে অনেক সন্ধান পেয়েছি এবং সংগ্রহ করতেও পেরেছি অনেক। সমবেত চেষ্টা হলে ত্রিপুরার অনেক অনালোকিত ইতিহাস আলোর মুখ দেখবে। তাই পাণ্ডুলিপি খোঁজার পবিত্র কাজে অন্যমনস্কতা দেখাবার কোনো কারণ থাকতে পারেনা।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১) পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা ঃ- মোঃ আবদুল কাইউম।

২) রাজমালা (১ম খন্ড) ঃ- কৈলাস চন্দ্র সিংহ।

---- o -----

বাংলা সাহিত্যে বৈপ্লবিক চেতনা

ডঃ ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য

'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।'

....

কবিশ্রী মধুসূদন দত্তের উল্লিখিত আক্ষেপ উক্তি বঙ্গভাষা ভাণ্ডারের বিভিন্ন চেতনায় সমৃদ্ধির কথাই সুপষ্টভাবে ঘোষণা করে। এ সংবেদনশীল সজীব প্রাণবন্ত ভাষায় রচিত গ্রন্থে মানুষের বিচিত্র অনুভুতি ও স্বভাবসিদ্ধ চেতনার কোন দিকই উপেক্ষিত হয়নি, বাদ পড়েনি। যে কোন চেতনা যা মানুষের মর্য্যাদাকে অক্ষুণ রাখে, মানুষের মনুষ্যত্বকে রক্ষা করে, মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার পথ প্রশস্ত করে তার উপাদান বাংলাভাষার প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকের সকল লেখনীতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দেদীপ্যমান।

একথা অস্বীকার করা যাবেনা যে, কোন একটা বিশেষ পটভূমিতে কোন একটি বিশেষ চেতনা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেহেতু সাহিত্য বাস্তবের প্রতিফলন, একমাত্র সাহিত্যই চেতনার বাস্তব রূপায়ণকে সম্ভব করে তোলে।

বিপ্লব হ'ল মানসিক পরিবর্তন যা মানুষ সাধন করে। আর যে বিবর্তন মানুষের সৃষ্ট নয় তা প্রাকৃতিক নিয়মেই ক্রমশঃ ঘটে থাকে। এখানেই বিপ্লবের সাথে বিবর্তনের পার্থক্য। প্রতিবাদী মানসিকতাই বৈপ্লবিক চেতনার জনক। বাঙালী চিরকালই প্রতিবাদমুখর। অন্যায়, অবিচার, শোষন, পদদলন, মানবিকতার অমর্য্যাদা প্রভৃতি 'অশুভ' লক্ষণ প্রতিবাদী মানসিকতার সৃষ্টি করে যা জন্ম দেয় বৈপ্লবিক চেতনার। বাংলায় এ ধরনের পরিস্থিতি বা পটভূমির কোন অভাব ছিল না, এখনও নেই। পরাধীন ভারতবর্ষ, অত্যাচারিত শোষিত ভারতবর্ষ এবং নানা বৈষম্যের ভারতবর্ষ কোন এক বিশেষ সময়ে বিভিন্ন অবস্থার প্রতিচ্ছবি অনুসারে বৈপ্লবিক চেতনা সাহিত্যের মাধ্যমে জনগণের দ্বারে পৌঁছে দেবে এটাতো স্বাভাবিক।

স্বভাবপ্রতিবাদী বাঙালীর সাহিত্যে বৈপ্লবিক চেতনা সর্বকালে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে

রেখেছে। এ সাহিত্যের পরিসর এত বেশী ব্যাপক এবং বৈপ্লবিক চেতনার স্ফুলিঙ্গ এত বেশী বিস্তৃত যে অতি স্বল্প পরিসরে এর বিশদ ও তথ্যবহুল আলোচনা মোটেই সম্ভব নয়। তাছাড়া বৈপ্লবিক চেতনার তাপ শুধু রাজনীতিকে নয়, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি এমনকি সাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়াকেও স্পর্শ করেছে।

সাহিত্যের অঙ্গনে নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, প্রভৃতির অবস্থান। সাহিত্যের যে শাখা বৈপ্লবিক চেতনাকে সরাসরি জনসমক্ষে হাজির করে, আমজনতাকে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করেছে তা হ'ল নাটক। কাজেই এ রচনায় আলোচ্য বিষয়ের সিংহভাগ নাটককে ঘিরেই আবর্তিত হবে, যদিও অন্যান্য শাখাগুলি আলোচনার প্রসাদ থেকে একেবারই বঞ্চিত হবে না।

দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটকে বৈপ্লবিক চেতনা একটা মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা দখল করে আছে। নাটক জাতীয় জীবনের প্রতিশ্রুতি। দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক নাটক শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহের পরে। উদ্বোধন করেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিরচিত নাটক 'নীলদর্পণ' দিয়ে। সিপাহী বিদ্রোহ শেষে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যখন শাসনভার গ্রহণ করে এবং ইংরেজ এদেশে ভালভাবে জাঁকিয়ে বসে তখন বৈপ্লবিক চেতনাপুষ্ট এই নীলদর্পণ নাটক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুদৃঢ়মূলে কুঠারাঘাত হানে। তারপরেই উল্লেখ করা যেতে পারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের কথা। অবশ্য একটি 'দর্পণে'র মধ্যেই নাট্যকারদের প্রচেষ্টা সীমায়িত ছিল না। দর্পণ নাম ভূমিকায় আরও কয়েকটি নাটক ঐ সময়ে রচিত হয়েছিল। যেমন অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত হয়েছিল জেলেদের উপর 'জেল-দর্পণ', চা- কুলিদের উপর 'চা-দর্পণ'। কৃষক বিদ্রোহকে উপজীব্য করে মীর মোশারফ হোসেন লিখেছিলেন 'জমিদার দর্পণ'। এঁরা সবাই সেদিনের জাতীয় জীবনের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে মুক্ত মঞ্চে তুলে ধরেন এবং দেশাত্মবোধের সুপ্ত চেতনাকে তীব্রভাবে জাগিয়ে তোলেন। দেশাত্মবোধের উদ্বোধন হলো এঁদেরই হাতে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে নুতন জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটলো। এটা হিন্দু জাতীয়তাবাদ। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি মহান ব্যক্তিত্বের রচনা ও বাগ্মিতার অনুপ্রেরণায় এ জাতীয়তাবাদ এক নুতন রূপ গ্রহণ করে। এ নব হিন্দুবাদই ছিল এ দেশের জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। এ জাতীয়তাবাদের উষ্ণতাপে গিরীশচন্দ্রকেও লিখতে হয়েছিল বৃটিশ বিরোধী সংলাপ সম্বলিত নাটক, 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম','ছত্রপতি শিবাজী' ইত্যাদি।

প্রায় সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয় যে নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক ঘটনাকে যথাযথভাবে আঁকড়ে

থাকেননি। ইংরেজকে সোজাসুজি আক্রমণের অসুবিধা বিধায় কেউ কেউ রাজপুত-মোগল বা রাজপুত-মারাঠা সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এক বক্রপথে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করার সফল প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যেসব ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে ঐসব নাটকে জাতীয় বীর হিসেবে যাঁরা চিত্রিত হয়েছেন তাঁরা হলেন রাণা প্রতাপ সিংহ, রণজিৎ সিংহ, হায়দার আলী, টিপু সুলতান, ছত্রপতি শিবাজী, নবাব সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, নবকুমার প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। এটা সহজেই অনুমেয় কি চেতনা ও অনুপ্রেরণায় এ নাটকনিচয় ছিল দেদীপ্যমান।

জাতীয় চেতনার ভিত্তি রচিত হয়েছিল 'হিন্দু মেলায়'। বাঙালীর স্বদেশানুরাগের সংহতি ও সংবর্ধনের উদ্দেশ্য নিয়ে এ হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের বিঘোষিত আদর্শ ছিল, "আমাদের মিলন ধর্মকর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ভারতভুমির জন্য।" সভায় দেশাত্মবোধক গান এবং কবিতা পাঠ প্রভৃতির সাহায্যে সার্বিক দেশাত্মবোধ জাগ্রত করাই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা বিখ্যাত গানের কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। 'মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।' গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের রচিত গান, 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কবিতা, 'জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান, মাকে ভুল কতকাল রহিবে শয়ান' রচিত হয়েছিল হিন্দুমেলাকে উপলক্ষ করেই। এ স্বদেশী বা জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গ স্বভাবতঃই এসে লাগে রঙ্গালয়ে। নাট্যকাররা দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করে রঙ্গমঞ্চ থেকে দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করেন। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নাটক 'ভারতমাতা', যে নাটকে ভারতমাতা নিদ্রিত সন্তানদের জাগিয়ে তোলার জন্য গেয়ে উঠেছেন 'উঠ উঠ যাদুমনী কতকাল ঘুমোবে আর?' উক্ত নাট্যকারের আর একটি নাট্য রচনা, 'ভারতে যবন' যার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, - ভারতমাতার দুঃখে উদ্বেলিত হয়ে কিরূপে তাঁর সন্তানরা স্বাধীনতা লাভের চেষ্ট করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক, 'পুরুষ বিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী', 'স্বপ্নময়ী' দেশপ্রেম প্রচারের জ্বলন্ত নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশক থেকে। শৈশব থেকেই জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হিন্দুমেলাব অধিবেশনে তিনি স্বরচিত দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করতেন। তিনি সঞ্জীবনী সভারও সভ্য ছিলেন। সঞ্জীবনী সভার উদ্দেশ্য সমন্ধে তিনি বলতেন, " এই সভার প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো"। তাঁর নাটক 'রাজা ও রাণী' নাটকে বিদেশী শাসনের প্রতি বার বার কটাক্ষ করা হয়েছে। তাঁর মুক্তধারা নাটকে মুক্তি আন্দোলনের এক প্রকৃষ্ট স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। ঐতিহাসিক নাটকের রচয়িতা হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল

রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত নাটক 'তারাবাঈ', 'প্রতাপ সিংহ', 'দুর্গাদাশ' এবং 'মেবার পতন' দেশাত্মবোধের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

মন্মথরায়ের 'দেবাসুর' ও 'কারাগার 'নাটক পৌরাণিক নাটকের ছদ্মাবরণে দু'টি দেশাত্মবোধক নাটক, যার মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা কাজ করেছে। তাছাড়া তাঁর রচিত ঐতিহাসিব নাটক 'মীরকাশিম' বৈপ্লবিক চেতনাসমৃদ্ধ।

যে সময়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনে এবং স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হয় ঠিক সে সময়েই স্বদেশী যাত্রার আবির্ভাব। এ যাত্রার অন্যতম প্রবর্তক হলেন মুকুন্দ দাস। স্বাধীনতার স্বপ্নে যাঁরা বাংলার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন, চারণ কবি মুকুন্দ দাস তাঁদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছেন। এ নব ভগীরথের দ্বারা মঞ্চস্থ যাত্রাতেই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়। যাত্রা গান আবার এক নতুন সুরে নতুন ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে।

বৃটিশ শাসনের পটভুমিকায় নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক রচিত হয়, 'রণজিৎ সিং' 'মহারাজ নন্দকুমার', 'হায়দর আলী', 'টিপু সুলতান' ও 'শতবর্ষ আগে' নাটক সমুহ। এটা সর্বজনবিদিত যে পরাধীন ভারতে বৃটিশ শাসন নিয়ে নাটক রচনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। এ'র মূল কারনই ছিল নাটকে বৈপ্লবিক চেতনার উপস্থিতি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য্যের বিখ্যাত নাটক 'নবান্ন' এক নতুন আন্দোলনের গর্ভে জন্ম নিয়েছে যার নাম গণনাট্য আন্দোলন।

লক্ষ্যণীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বারবার আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় জনসাধারণ শুধু প্রতিবাদে সোচ্চার হয়নি প্রাত্যহিক জীবনযাপনে এমন কি নাটকেও তাদের কণ্ঠমুখর হয়েছিল। সবচেয়ে বেশী দেশাত্মবোধক নাটক রচিত হয়েছিল ১৯০৩ ইং থেকে ১৯১১ ইং পর্য্যন্ত। অবশ্য বিশ ত্রিশ দশক কিংবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল তখনও বেশ সংখ্যক নাটক রচিত হয়েছিল। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক নাটকের প্রেরণাটাই এসেছিল দেশাত্মবোধ থেকে এবং দেশাত্মবোধ প্রচারই ছিল নাটকের মূল লক্ষ্য।

নাটক ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় উপন্যাসেও পরাধীনতার সচেতনতা একটু বেশী করে পরিস্ফুট হয়েছে। কারণ উপন্যাসের জীবন সংলগ্নতা অধিকতর ব্যাপক। যে বৈপ্লবিক চেতনা স্বাধীনতা লাভের জন্য অবশ্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সে চেতনাই উপন্যাসের মাধ্যমে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

উপন্যাসের জনক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ধারণার মুখপাত্র হল তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ'। 'আনন্দমঠ' এ 'বন্দেমাতরম','সন্ত্রাসবাদ ও জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র' যা আরও অনেক পরে বিভক্ত ভারতের সর্বাপেক্ষা উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক সঙ্গীতরূপে বিবেচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব সৃষ্টি 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসও বৈপ্লবিক চেতনার এক অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য রচনা 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাস বৈপ্লবিক চেতনায় ভরপুর। শরৎচন্দ্রের রচিত উপন্যাস বিশেষ করে 'পথের দাবী' বৈপ্লবিক চেতনার এর জ্বলন্ত নিদর্শন।

রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিক সাফল্যের সাম্যবাদী চিন্তার প্রভাব নানা সাহিত্যিকের উপর সক্রিয় হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁর রচিত 'গণদেবতা', 'ধাত্রীদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'চৈতালি', 'ঘূর্ণি' প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাস বৈপ্লবিক চেতনার প্রবল স্রোতকে নীরবে ধারণ করে আছে। বৈপ্লবিক চেতনার সুষ্ঠু প্রতিফলন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপন্যাস যথা 'সহরতলী', 'প্রতিবিম্ব' ইত্যাদিতে সংঘটিত হয়েছে। কারণ রুশ বিপ্লবের প্রভাব তাঁর উপরও ক্রিয়াশীল ছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস 'পাঁক' এও এ চেতনা সমুজ্জ্বল।

পুরানো ও সাম্প্রতিককালের নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এ স্বল্প পরিসরে সব বৃত্তান্ত উপস্থাপন করা কল্পনাতীত বললেও অত্যুক্তি হবে না।

বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্যে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে আমাদের সামনে হাজির হয়, তাঁরা হলেন নিঃসন্দেহে বিশ্ববিনন্দিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, এবং নতুন যুগের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, যাঁদের প্রত্যেকের লেখনীতে ব্যক্ত হয়েছে বিপ্লবের সুর, বিদ্রোহের সুর। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও উপন্যাসে শুধু বৈপ্লবিক চেতনার সন্ধান মেলেনি, তাঁর রচিত গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় এ চেতনার উপস্থিতি কারও দৃষ্টি এড়াবে না। কবিগুরুর 'জাগিয়ে দেরে চমক মেরে আছে আছে যারা অর্ধচেতন', বাণী নিয়ে নজরুল বের করেন অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু'। স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে এবং দেশবাসীর সুপ্ত শক্তিকে প্রবল আঘাত দিয়ে জাগিয়ে তোলার জন্যে 'ধূমকেতুর' মাধ্যমে তিনি লেখতে শুরু করেন রোমহর্ষক কবিতা ও রচনা। ধূমকেতুতে লিখিত অধিকাংশ কবিতা ও রচনাবলী বিশেষ করে ম্যায় ভূখা হুঁ'প্রবন্ধ ও 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার মাধ্যমে অনলবর্ষী ভাষায় সংগ্রামমুখী শক্তিকে জাগিয়ে তুলে তিনি বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর রচিত ''ম্যায়

ভূখাই'' প্রবন্ধটি ও 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাজবন্দী হিসেবে জবাব তাঁর বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' বৈপ্লবিক চেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে সমস্ত অনবদ্য রচনার মাধ্যমে তিনি বিদ্রোহাত্মক প্রাণবন্যায় দেশকে প্লাবিত করেছিলেন সেগুলি হ'ল 'অগ্নীবীণা', বিষের বাঁশী', 'প্রলয়শিখা', 'সর্বহারা', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি বিদ্রোহাত্মক কাব্য। কবি সুকান্তের বৈপ্লবিক সত্তার এক বহিঃপ্রকাশ তাঁরই রচিত কবিতাগুচ্ছ, 'ছাড়পত্র'।

বৈপ্লবিক চেতনার অনির্বাণ শিখা বাংলা সাহিত্যে দেদীপ্যমান। এ চেতনার অভাব হলে শুধু বাংলা সাহিত্য কেন সমস্ত সাহিত্যেরই অপমৃত্যু ঘটবে, মানবতা হবে বিপন্ন।

----- o -----

বিশ্বসাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগ এবং এর অনুঘটক হিসাবে ইংরেজী প্রাচীন সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সুরেন্দ্র তলাপাত্র

সাহিত্যের অর্থই হচ্ছে সম্মিলন। একের ভাব অন্যের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়া। একের সহিত অন্যের মিলন। সহিত শব্দ থেকেই সাহিত্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিভেদ থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যে এদের মিলন হতে পারে। এরকম মিলন অতীতে হয়েছে এখনও হচ্ছে। সোপেন হওয়ার উপনিষদের ভাবধারায় স্নাত হয়ে জীবনের সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোনদিন মিলতে পারবে না। কিপলিং নাকি এমন কথা বলেছিলেন। কিন্তু এ কথাটা বিভ্রান্তিমূলক। তিনি যতই সাম্রাজ্যবাদী হোন না কেন, অন্তরে তিনি ছিলেন কবি ও কথা সাহিত্যিক। তাই তার পক্ষে এমনটি বলা অস্বাভাবিক। তার বিখ্যাত কবিতা Ballad of East and West এর প্রথম পংক্তিটি বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করা হয় বলেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তার কবিতার প্রায় স্তবকের সব কটি পংক্তি একত্রে বিচার করলে সেই বিভ্রান্তির সহজেই নিরসন হয়।

"Oh East is East and West is West, and never the twain shall meet
Till earth and sky stand presently at God's great judgement seat
But there is neither East nor West, Border nor Bread nor Birth
When two strong men stand face to face, tho' they come from the ends of the earth."

এধরনের উক্তি বা পংক্তি বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করলে যে কত রকমের বিকৃতি ও মালিন্যের সৃষ্টি হয় এর যথেষ্ট উদাহরণ সাহিত্যে রয়েছে।

যাইহোক, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কথা প্রসঙ্গে গেটে বলেছেন জাতীয় সাহিত্য একথা আজ অর্থহীন। বিশ্বসাহিত্যের যুগ আগত প্রায়। গ্যেটের ইঙ্গিতেই তুলনামূলক সাহিত্যের সুত্রপাত বলা যায়। যুগে যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারা অধ্যাত্ম বিদ্যা জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। সংস্কৃত, গ্রীক, জার্মান ও লাটিন ও ইংরেজী এই ভাষাগুলি Indo-Aryan বা Indo-Germanic মূল ভাষাগুলি থেকে উদ্ভূত। পরবর্তীকালে এদের থেকেই প্রাদেশিক ভাষাসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ তার East and West in Religion গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে এশিয়া এবং ইউরোপ যেন দুই ভাই। এশিয়া প্রকাশ করে আধ্যাত্মিক দিক আর ইউরোপ প্রকাশ করে মননশীলতার দিক। এ দুটি ধারার মিলন ও ঘটেছে যুগে যুগে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন কিভাবে ভারতীয় মিশরীয় কালডিয় চিন্তাধারা পিথাগোরাস ও প্লেটোর মত গ্রীক দার্শনিকদের প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া খ্রীষ্টজন্মের তিনশত বৎসর আগে আলেকজান্ডার যখন পশ্চিম এশিয়া আক্রমণ করেন, বৌদ্ধ প্রচারকগণ সিরিয়া প্যালেস্টাইন

অভিমুখে যাত্রা করেন ধর্ম্ম প্রচারের কামনায়। আরো জানা যায় টলেমির রাজদরবারে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারকদের দূত হিসাবে আলেকজান্ড্রিয়ায় পাঠানো হয়েছিল ভারত থেকে।

এভাবে যুগে যুগে সংঘাত ও সংহতির ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক প্রভাব ও মিলন সংঘটিত হয়েছিল সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। মিশ্র সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নব উন্মেষনার সুযোগও দেখা দেয়। বাল্মিকী রামায়ণ ও হোমারের ইলিয়াড পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

যাইহোক, বর্ত্তমান যুগে বিবিধ কারণে ইংরেজী ও বাংলা ভাষা পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশেষত বাংলা ভাষা তার উন্নতির জন্য ইংরেজীর কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে গেলেও ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে ব্যর্থকাম হতে হবে। সাহিত্য রসিক ও পাঠকবর্গ ইংরেজী সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও পরিণতির মূল ঐতিহাসিক ধারাগুলি অনুধাবন করতে পারলে ইংরেজী দিকপাল লেখকদের সাহিত্য চর্চ্চার বিষয়গুলি ধারনা করতে পারবেন। এছাড়া ইংরাজী ভাষার অনুবাদের মাধ্যমে পাঠকরা ইউরোপীয় উন্নত সাহিত্যের রসাস্বাদন করার সুযোগ পাবেন।

আজকে পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলি অবলম্বন করেই ইংরেজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বাংলা ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। ইংরেজী সাহিত্য বিরাট এবং জটিল। এর আসাধারণ প্রসার ও ঐশ্বর্য্যের কোন তুলনা হয় না। বিভিন্ন সময়ে যুগোত্তীর্ণ কবি ও সাহিত্যিকগণ এ ভাষাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। সাহিতিকদের লেখার মর্মার্থ উদ্ঘাটন করে বিশ্লেষনাত্মক রূপ রেখায় সঞ্জীবিত করা অনেকটা আয়াসসাধ্য। তবে সাহিত্যের ইতিহাস সাধারণ রাজনৈতিক ইতিহাস নয়। মনে হয় যেন ঘন বনানীর অভ্যন্তরে পথ কেটে কেটে চলার দিশা বের করতে হয়। ইংরেজী সাহিত্যের ক্রমবর্দ্ধমান সমৃদ্ধির ধারা এবং তার দিকপাল সাহিত্যিকদের রস সৃষ্টির মর্মার্থ যথার্থ অনুধাবন করলে বাংলা সাহিত্য আরো সমৃদ্ধি লাভ করবে।

যাইহোক, এবার বহমান ধারায় অনুবর্ত্তন করে ইতিহাসের কাহিনীতে আমরা প্রবেশ করব। পঞ্চম শতাব্দীতে Angle Saxon ও Jut নামক তিনটি জাতি England অধিকার করে বসতি স্থাপন করে এবং নিজেদের বেউলফ্ নামক এক মহাকাব্য রচনা করে। এতে তাদের জার্মানি পূর্ব্ব পুরুষদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত করা হয়েছে। এ কাহিনীর মধ্যে আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ মহাকাব্যের যেসকল গুণ থাকে বেউলফ্ কাব্যে প্রায় সবই পাওয়া যায়। অবশ্য রামায়ণ মহাভারত বা হোমারের ইলিয়াডের মত ইহার বিশালতা নেই। এ মহাকাব্যে ভগবানের উপর আত্মসমর্পনের পরিবর্ত্তে আত্মনির্ভবশীলতার জয়গান করা হয়েছে। এবং এ কাব্যটিতে খৃষ্টপূর্ব যুগের লোকের মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে যেমন জলদস্যুদের দুঃসাহসিক জীবনের আদর্শের প্ররোচনা। বেউলফ্ কাব্যের রচনার শেষে Anglo Saxon যুগ আরো প্রায় ৪০০ বৎসর স্থায়ী ছিল। এ যুগেই ইংরেজ জাতি খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলে সাহিত্যে ও জাতীয় চরিত্রে রুক্ষ ভাবের পরিবর্ত্তে কোমল স্নেহশীল মনোভাব ও

ভগবদ্ভক্তির আবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন যীশুখৃষ্টের - প্রশস্তি, বাইবেলের সৃষ্টিকথা Genesis মিশর থেকে প্রত্যাবর্ত্তন (Exodus) ও ক্রুশবিদ্ধ যীশুর যন্ত্রনাবিদ্ধ কাহিনী ইত্যাদি সম্পর্কে কবিতা ও গদ্যকাব্য রচিত হয়। রাজা আলফ্রেড্ (৮৭১-৯০১) সর্বপ্রথম Anglo Saxon ভাষায় গদ্যের সূচনা করেন। এর পূর্ব পর্য্যন্ত ল্যাটিন ভাষার প্রচলন ছিল। ধর্ম্মযাজকগণ বাইবেলের অনুবাদ, ধর্ম্মোপদেশ জাতীয় রচনা ও সংকলন করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৫১৭ খৃষ্টাব্দে সন্ত অগাষ্টিন ও অন্যান্য খীষ্ট সন্ন্যাসীগণ ইংলন্ডে আগমন করেন এবং এতৎকারণে বহু ইংরেজ খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

১০৬৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর ইউরোপ থেকে নর্ম্মানদের আগমন ঘটল। এরা হেস্টিংসের যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করে সমগ্র ইংলন্ড দখল করে নেয়। এর ফলে পরাধীনতার কারণে Anglo Saxon যুগের সাহিত্য বিধ্বস্ত ও বিকৃত হতে লাগল। পরাধীনতার জ্বালা ও অপমান ইংরাজরা মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগল। স্কটের Ivanhoe নামক উপন্যাসে তখনকার পরাধীন ইংরেজদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী উজ্জ্বলভাবে লিখিত আছে। নর্মানরা হচ্ছে ইংরেজদের প্রভু। সমস্ত ক্ষমতা ও আরাম বিলাস ব্যসন শুধু তাদের জন্য। আর ইংরেজরা হচ্ছে তাদের দাস। লাঞ্ছনা, অপমান ও চাকর বাকরের কাজ তাদের দিয়েই করানো হত। এ পরাধীনতার গ্লানির মধ্য দিয়েই এক সমৃদ্ধ ইংরেজ জাতি গড়ে উঠল। আশ্চর্যের ব্যাপার ক্রমে ক্রমে ইংরেজ ও নর্মান জাতি পরস্পরের সহিত মিলে মিশে একাত্ম হয়ে গেল। নর্ম্মানিরা ইংলন্ডকে স্বদেশ বলে স্বীকার করে দেশাত্মবোধে প্রাণিত হল। তারা সকলে সম্মিলিত হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে অত্যাচারী রাজা জনের নিকট থেকে স্বাধীনতার স্বত্তাধিকার (Magna Charta) জোর করে আদায় করল। এভাবে ক্রমে ক্রমে নানা ক্ষুদ্র জনসমষ্টি দুর্বার পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হল।

নর্মানদের মাতৃভাষা ছিল ফরাসী। তারা ইংরাজী ভাষাকে দূরে ঠেলে রেখেছিল। সরকারে, বিচারালয়ে, সভা সমিতিতে আইন সভায় সর্ব্বত্র ছিল ফরাসীর জয়জয়কর। ইংরেজী ভাষা সমস্ত গৌরব হারিয়ে পল্লীগাথার ন্যায় অবস্থান করছিল। রাজসভা ও অভিজাতবর্গ ইংরাজী ভাষা সহ্য করতে পারত না। কিন্তু ভাষার এ চরম দুরবস্থায় শতাব্দীকাল পরে ইংরেজী ভাষার সুদিন ফিরে এল ফরাসী ভাষার শব্দ ভান্ডার, ভাব ও চিত্রকল্প ইংরাজী ভাষা আত্মসাৎ করে নিল। এতে ফরাসী ভাষার সহযোগে ইউরোপের ভাবধারা ও সংস্কৃতি সঞ্চারিত হয়ে ইংরাজী ভাষা নবজীবন লাভ করল। ইংরেজী ফরাসী ভাষার মিলনের পরিণামে ইংরেজী অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। বলতে গেলে নূতন ভাষার সৃষ্টি হল।

যাইহোক, চসারের আবির্ভাবের পূর্বে ত্রয়োদশ শতকে এ নূতন ভাষায় কতক কবিতার সৃষ্টি হল। এর প্রায় ৫০ বছর পরে ফরাসী রোমান্সের অনুকরণে হ্যাভেলক এবং হর্ণ নামে দুটি কাব্য রচিত হল। তখন কতগুলি লোকসংগীত ও রাজনৈতিক প্রেরণামুলক গীত ও সৃষ্টি হয়। এই গীতগুলিই ইংরেজী গীতি কবিতার সূচনা। তবে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইংরেজীর যে মিশ্র ভাষা সৃষ্টি হল, তাকে সাহিত্যিক রূপ দিলেন মহাকবি চসার (১৩৪০-১৪০০)। তিনিই বলতে গেলে আধুনিক

ইংরেজী কবিতার স্রষ্টা। তার প্রথম বয়সের লেখার মধ্যে মোটামুটি মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ ফরাসী ও ইটালীয় লেখকদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তার রচনা সমূহের মধ্যে House of Fame, Parliament of Fowls সমধিক প্রসিদ্ধ। তার শেষ বয়সে লিখিত Caterbury Tales নামক অমর আখ্যায়িকা তাকে প্রভূত সম্মানের অধিকারী করে তুলে। সেই যুগে তৎকালীন সংস্কারকে অতিক্রম করে স্বাধীন চিন্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তিনিই নূতন ইংরেজী ভাষার সাহিত্যে গৌরব দান করেন এবং বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে ইংরেজী সাহিত্যকে সগৌরবে তুলে ধরেন। যেসব কাব্য গ্রন্থ সে যুগে লিখা হয়েছিল তার মধ্যে 'gawain and the green knight এবং Pearl উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এগুলির লেখক কে তা এখনও জানা যায় নি।

Pearl নামক কবিতাটিতেবাইবেলের Apocalypse অধ্যায়ের কাব্যরূপ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে এক শোকাতুর পিতা তার কন্যার সমাধিস্থলে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সে স্বপ্ন দেখছে যে সে এক অতি সুন্দর জ্যোতির্ময় দেশে হাজির হয়েছে। সেখানে স্ফটিকের পাহাড়, গাছের পাতাগুলি উজ্জ্বল ও রত্নরচিত কংকর ভুমি দেখা যাচ্ছে। পাখীদের আনন্দ সঙ্গীত শুনতে শুনতে সে এক নদীর ধারে এসে পৌছল। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে নদীর পরপারেই স্বর্গলোক। এমন সময়ে নদীর অপর পার থেকে তার মৃতা কন্যা মাথায় প্রবাল ও রত্ন মুকুট পরিহিতা হয়ে পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে শোক করতে নিষেধ করল। পিতাও স্বর্গ রাজ্যে কন্যাকে প্রত্যক্ষ করল। খৃষ্টকে ঘিরে তখন সংগীতরত সুসজ্জিত কুমারী মেয়েদের যে শোভাযাত্রা চলছিল, তার মধ্যে কন্যাকে দেখতে পেয়ে পিতা শোক নিবারণ করল। মধ্য যুগীয় কাব্যজগতে Pearl কবিতাটি ছন্দের পরীক্ষায় অসাধারণ বলা চলে। মধ্যযুগে রক্ষনশীলতার জন্য প্রাচীনপন্থাকে আকড়ে ধরার প্রবৃত্তি লোকের মধ্যে বেশী ছিল। এহেন অন্ধকার এবং বন্ধ্যা অবস্থায় আমরা Ballad বা লোকগাথার আবির্ভাব লক্ষ্য করি। বীরের ক্ষাত্র তেজে উচ্চতর অভিজাত আদর্শ নিম্নস্তরের লোকের মনে যে রস সঞ্চার করেছে, Ballad সেই রসেরই সৃষ্টি।

চসারের মৃত্যুর পর প্রায় দেড়শত বৎসর ইংরেজী সাহিত্যে কোন অবদান পরিলক্ষিত হয় নি। চসারের পরবর্ত্তী ইংরেজ কবিদের মৌলিকতা বিশেষ ছিল না। তারা চসারের অক্ষম অনুকরণের চেষ্টা করতেন। ইংলন্ডের এই যুগে War of Roses বা গোলাপের যুদ্ধ নামে দীর্ঘদিন যাবৎ গৃহযুদ্ধ চলেছিল। রাজ পরিবারের দুই শাখা সিংহাসনের অধিকার নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হল। যাইহোক, চসারের পরবর্ত্তী যুগের দৈন্যের পর ইউরোপ ও ইংলন্ডে মানস ক্ষেত্রে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। ইউরোপের Renoissence এর ফলে মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ও ধর্ম্মের শৃঙ্খল মোচন ও মানুষের মনে স্বাধীন ও মানবিক চিন্তার স্ফুরণ ঘটল। এ নবজাগরণ Italy ও France থেকে Europe এর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল। ইংরাজী সাহিত্য তখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি- তাদের রক্ষনশীলতার জন্য। প্রাচীনত্বকে আঁকড়ে ধরে নবীনাকে বরণ করবার মত উদারতা বা সাহস তখনো এদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি।

অষ্টাদশ শতকে যুবরাজ Charles এর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা ও তার করুণ

পরিনতি মানুষের সমবেদনার ঢেউ তুলে জনচিত্তে নূতন গাথার প্রেরণা যোগায়। কিন্তু Ballad এর অগ্রগতি শুধু Renoissence এর যুগেই সীমাবদ্ধ না থেকে উনবিংশ শতক পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতেও কিপলিং, নিউবোল্ড প্রভৃতি কবিগণ Ballad রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। সেই যুগে গদ্য সাহিত্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ধর্ম্ম বিষয়ক মতামত ও বাদ বিতন্ডা যা জনমনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, গদ্যের মাধ্যমে সেগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার সাহিত্য জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের শুভারম্ভ হয়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা স্যার টমাস ম্যালরির মর্টে ডি আর্থার। এযুগেই ইংলন্ডে নাটকের সূচনা হয়। মধ্যযুগের ধর্ম্মচেতনার ফলেই এদের সৃষ্টি। ধর্ম্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে এদের নৈতিক মূল্য ছিল। যেমন আমাদের দেশেও নাটমন্দিরে সঙ্গীত নৃত্যাদি ও যাত্রা পালা গান অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় ধর্ম্মীয় উপাসনা সবই লাটিন ভাষায় হত। জনগণকে Native বলা হত। এরা এ ভাষা কিছুই বুঝতেন না। কাজেই বাধ্য হয়ে তখন একাধিক পুরোহিত মিলে বাইবেলের ঘটনার নকল করে তাদের সামনে দেখাতেন। পরবর্ত্তীকালে নানা দৃশ্যের সাহায্যে যীশুখৃষ্টের জীবনের ঘটনাবলী ও সাধুসন্তদের অলৌকিক জীবন কাহিনীগুলি ইংরজী ভাষায় জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা হত। The Second sheepherds play এবং Noah নামক দুটি নাটক বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। জনগণ এগুলি শুনবার জন্য ভীড় করে দাঁড়াত। এ প্রচেষ্টাকে এলিজাবেথীয় যুগের tragi-comedy এর পূর্ব্বসূচনা বলে সাহিত্যিকগণ মনে করেন। পরবর্ত্তী যুগে Morality নামে এক নূতন নাটকের আর্বিভাব হয়। এদের বিশেষ্যত্ব হচ্ছে নাট্যকার বাইবেলের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে স্বাধীন উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ দেখিয়েছেন। Everyman নাটিকাটি এ ধরনের নাটকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাতে মৃত্যুর আসন্ন অবস্থায় মানুষের অসহায় ও দুর্ব্বল অবস্থা বর্ণনা করে দেখান হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত The pilgrims Progress একটি অসাধারন নাট্যকর্ম। এটি রূপক হলেও জীবন্ত।

এরপর ১৫৫০ এ গ্রীক্ ট্রাজেডি ও রোমান কমেডির সংস্পর্শে ইংরাজী পূর্ণাঙ্গ নাটক গড়ে উঠে। কমেডির মধ্যে Ralph Roister Daister এবং Gammer Gurtons Neddle নাটক দুখানি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ নাটকের মধ্য দিয়ে ইংরাজী পারিবারিক অবস্থার সহিত লঘু হাস্যরসের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। চসারের পরবর্ত্তী সাহিত্যযুগের কথা এখানেই শেষ হল প্রথম পর্ব হিসাবে। পাঠকের আগ্রহ থাকলে এর পরবর্ত্তী দ্বিতীয় পর্বে আমরা এলিজাবেথীয় যুগে প্রবেশ করব। এবং যদি সম্ভব হয় পর্যায় ক্রমে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করব। ইতিহাস রচনা একটা বুদ্ধিগত ব্যাপার। অতীতে যা ঘটেছিল তার ফটোকপি ঐতিহাসিক করেন না। তাকে বরং পুনরায় সুকৌশলে নির্ম্মান করেন। পরিশেষে বলি Edward Albert ও শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের নিকট আমি ঋণী। তাদের বই আমাকে বাংলায় সংক্ষিপ্ত ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে প্রেরণা যুগিয়েছে। এদের বই থেকেও সহায়তা গ্রহণ করেছি। এজন্য তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

অধিকন্তু দু একটা কথা এখানে লেখাব আগ্রহ প্রকাশ করছি।'ঘটে যা তা সব সত্য নহে' কবি এমন কথা বলতে পারেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বলতে পারেননা। আবার যা ঘটে সবই সত্য এমন সরলীকরণ দ্বারা ইতিহাস হয় না। কারণ ঘটনাকে ঐতিহাসিক fact হতে হবে।।ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেন একটা ঘটনা প্রবাহেব। আগাথা কৃষ্টি তার The Moving Fingers নামক উপন্যাসে একটি চমৎকার কথা লিখেছেন- একটি ছোট্ট মেয়ে তার স্কুলের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে বলছে "এত রকম বাজে জিনিষও স্কুলে শেখানো হয। ধব, ইতিহাস। প্রত্যেক বইতে আলাদা বর্ণনা"। উত্তরে অভিভাবক বললেন That is the real interest

ঘটনা প্রবাহের ব্যাখ্যা নিয়েই যত মতভেদ। মার্ক্সবাদীরা কম কিসে? আলবেয়াব কামুর The Rebel বইতে দেখা যায় মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে গিয়ে মানুষ কিভাবে আপন কাবাগাবই রচনা করে চলেছে।

----- o -----

আমাদের সংস্কৃতি

অমরেন্দ্র শর্মা

সাম্প্রতিক কাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক বিশেষ সমুন্নতির কাল। পুরোণো বহু ধ্যানধারণাকে ভেঙে দিয়ে মানুষের মেধাবিকাশের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি এক উল্লেখ্য স্থান অধিকার করে বসেছে। প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের ফলে আমাদের দৈনন্দিন পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অবশ্য আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগমনের পরিমাপ এসব প্রযুক্তিক কলাকৌশলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কি না, তা বোধ হয় এক কথায় বলে দেওয়া যায়না। আসলে এসব দিক সভ্যতা-সংস্কৃতিতে কোন ধরনের প্রভাব ফেলেনা, একথা বলা সম্ভব নয়। তবু যে মুহূর্তে সভ্যতার পরিমাপের কথা উল্লেখ করা যায়, সে মুহূর্তেই আমাদের মনে হয় যে মানুষ তার পশুত্বকে কতখানি জয় করে সত্যিকার মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পেরেছে। যে কোন মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতি তার সভ্য হওয়ার পরিমাপ বলে দিতে পারে।

উন্নত সভ্যতার প্রথম আর্বিভাব ঘটেছিল নদীর অববাহিকা অঞ্চলে। প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া বা হরপ্পা সভ্যতাগুলির বিকাশ ক্ষেত্রের কথা ভাবলেই সামনে চলে আসে নীল, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস এবং সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলগুলি। উৎপাদন, সম্পদ-সংগ্রহ এবং দক্ষতার সঙ্গে সৃষ্টি - কল্পনা মিলিত হলে একটি সভ্যতা যেমন উন্নত হয়, তেমনি বিস্তৃতি লাভ করে। প্রাচীন সভ্যতাগুলির ধ্বংস চিহ্নসমূহ জানিয়ে দেয় যে এরা এক একটি উন্নত সংস্কৃতির ধারক ছিল এবং সভ্যতা ধ্বংসের কারণ যাই থাকুকনা কেন, সংস্কৃতির দিক চিহ্নগুলি পরবর্তী সমাজ-সভ্যতায় অনেকখানি পরিবাহিত হয়ে নতুন সভ্যতা -সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লেষণের মাধ্যমে সংস্কৃতির রূপ বদল করেছে। ভারতে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর (সিন্ধু সভ্যতা) সংস্কৃতি পরবর্তী সময়ের আর্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশিষ্টরূপ আমাদের জন্য সৃষ্টি করে গিয়েছে। ফলে ঋগ্বেদের দেবমন্ডলী প্রায় অন্তর্হিত, নতুন দেবমন্ডলীতে প্রাগার্য দেবদেবীর আগমন এবং ঐ সঙ্গে সাংস্কৃতিক বহুকর্মকান্ডের গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এক রূপান্তরের বার্তা ধ্বনিত হয়।

পরবর্তী সময়ে বুদ্ধদেবের আমলেও বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে নতুন কিছু ধারণা ঢুকে যেতে থাকে। শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্র নয় যে সমস্ত "শিল্পী বা কারু স্বীয় কৌলিক বৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলিত, তারা ঐ বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত গণ, পূগ অথবা শ্রেণীর শাসন মানিয়া চলিত।" (হিন্দু সমাজের গড়ণ- নির্মলসুমার বসু) আর এর ফলে গ্রাম, মেলা, নগর ও তীর্থস্থানগুলোকে আশ্রয় করে সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের গড়ে উঠা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলে। উৎপাদিত শিল্প সম্ভার যবদ্বীপ, আনাম, চীন, ব্যাবিলন এবং রোম সাম্রাজ্যের নানা স্থানে রপ্তানীও হত। প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলি তার বাণিজ্যিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আসলে সে সময়কার প্রযুক্তি এই বিকাশের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে এবং এ অবস্থার অনুকরণ

পরবর্তী সময়েও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। ফলে বহু অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রয়োজনীয় আদান-প্রদানের মাধ্যমে এ দেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও একটা নিশ্চিত রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমে নাগরিক জীবনে ভোগের আদর্শও এক বিশাল আকার ধারণ করে; স্বরূপ অর্থনৈতিক বিভেদ সামাজিক স্তরকে আরো বেশি প্রভাবিত করে এবং এই বিভেদ সংস্কৃতির রূপ ও কর্মকান্ডের মধ্যে নানা পরিবর্তনের স্রোতকে প্রবাহিত করে। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে নানা শৈথিল্যও এথেকে ছড়িয়ে পড়ে বলেই মনে হয়। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে লোকায়াতিকদের মত উল্লেখ করে বলেন যে লোকায়তিকদের মতে "আগামীকল্যকার ময়ূর লাভ অপেক্ষা অদ্যকার পারাবত লাভ মন্দের মধ্যে ভাল। সংশয় সংকুল হেমশত লাভ অপেক্ষা এক কার্ষাপণ ও মন্দের ভাল।" তিনি এই মতের খন্ডন করে ধর্মের মর্যাদা রক্ষার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁর গ্রন্থে ভোগবিলাসের এক অনিবার্য চিত্র তিনি তুলে ধরলেন। এটাই তখনকার এক বাস্তব চিত্র। তাঁর মতে, " যে স্থানে গৃহ করিবে, তার নিকটে জল ও বৃক্ষবটিকা থাকা আবশ্যক। .... বাহিরের বাসগৃহে সুন্দর দুই টি বালিশ ও তাহার মধে শুভ্র চাদর পাতা শয্যা থাকিবে। তাহার শিরোভাগে তৈলচিত্রযুক্ত কূর্চ্চাসন (ব্রাকেট) এবং পাদদেশে কাষ্টময়ী বেদিকা (টেবিল) থাকিবে।" ঐ সঙ্গে স্নান, উৎসাদন-উদ্বর্তন (তৈল চন্দনাদি দ্বারা পরিষ্করণ), ফেণক (ফেনাসৃষ্টিকারী স্নেহময় দ্রব্য দ্বারা ঘর্ষণ) ইত্যাদি ইত্যাদি নানা বেশভূষা ও সজ্জা, সঙ্গীত, পানব্যবস্থা, বারবধূর গৃহ পরিবেশ, অন্যতম নাগরিকদের অবস্থান ইত্যাদি নানা বিষয় বর্ণনায় ভার ইতিহাসের· একটা বিশেষ যুগ (প্রথমদিককার) রূপায়িত হয়েছে। বলতে গেলে, সে সময়কার সংস্কৃতি বর্ণ ব্যবস্থা এবং সম্পদ ভেদে বিভক্ত ধারাতে এগিয়ে চলেছে।

মধ্যযুগে ভারত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ক্রমাগত আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু লক্ষণীয় যে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন অনেকখানি অপরিবর্তিত থেকে গেল। শহরে নবাব-বাদশাহের আনুকূল্যে বাইরে থেকে আসা নানা নতুন শিল্পের প্রচলন দেখা গেল। চীনামাটির কাজ, মীনার কাজ, নানা ধরণের চর্ম শিল্প ইত্যাদি ভারতে প্রসারিত হয়। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন আসা সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলেও পরবর্তী সময়ে সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে উভয় সংস্কৃতি প্রবাহিত হয় ।৫৮, এভাবে দীর্ঘপথ অতিক্রমণের মাধ্যমে কখন যেন ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গনে অবস্থিত বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে নতুন আসা সংস্কৃতির ধারাও সংযোজিত হয়ে গেল।

পরবর্তী ইংরেজ আমলে ইউরোপের নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রামে ও শহরে ভারতের প্রাচীন উৎপাদন ব্যবস্থাকে অনেকখানি ওলটপালট করে দিল। রেলপথ সম্প্রসারণ, ইংরেজী শিক্ষার প্রসার এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক মূলধনের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রেও নতুন মূলধনের সৃষ্টি সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ফলে সংস্কৃতির রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। গ্রামীণ সংস্কৃতি অনেকটা তার প্রাচীন রূপ বজায় রাখার চেষ্টা করলেও নতুন গড়ে ওঠা শহরে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল এবং এর

প্রভাব কোনভাবেই গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হয়নি একথাও ঠিক নয়। এভাবে বিভিন্ন দিক থেকে আগত উপাদানসমূহ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠিত উপাদানগুলির সঙ্গে সংশ্লেষণের মাধ্যমে এক মিশ্র সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

আসলে মিশ্র সংস্কৃতি মানে এই নয় যে শুধু একটি মাত্র সংস্কৃতিই এখানে বহমান এবং এই সংস্কৃতির বিশাল ধারায় সমস্ত সংস্কৃতিগুলি আত্মাৎসর্জন করেছে। বিভিন্ন জাতি-উপজাতি গোষ্ঠীর বিচিত্র সমারোহে। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের স্বাধীন অবস্থানে বর্ণবিচিত্র ধারায় সংস্কৃতি আপন আপন দিগন্তে বিকশিত। প্রতিটি ধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পাশাপাশি বসবাসের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির নানা উপাদান প্রতিটি সংস্কৃতিতে আত্মস্থ, এবং এই সমস্ত ধারাগুলির একটা সমন্বিত বা সম্মিলিত রূপকেই ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতি বলে আমরা চিহ্নিত করতে চাই।

এবার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে একটু নজর ফেরাতে হয়। শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বৈভবে ত্রিপুরা রাজণ্যা আমলেও ছিল সমৃদ্ধ, যদিও উপজাতি জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ণের ক্ষেত্রে একটা ঔদাসীন্য বর্তমান ছিল বলে অনেকেই মনে করে থাকেন। ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতি সহ মণিপুরী-মিজো এবং বিষ্ণুপ্রিয়া, হিন্দুস্তানী, নেপালি এবং বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ অবশ্যই লক্ষণীয়। এই বিচিত্র ধারাগুলির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বহমানতা এক মিশ্র জনববসতির মিশ্র সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে।

ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীকে তিনটি ভাগে কেউ কেউ ভাগ করেছেন যেমন - নিগ্রোবটু, দাক্ষিণিক এবং মঙ্গোল (ডঃ অনাদি ভট্টাচার্য - অন্বেষায় প্রকাশিত প্রবন্ধে)। এবং এদের ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুরেন দেববর্মণ মহাশয় তাঁর ' ত্রিপুরার আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি গ্রন্থে উল্লখ করেন, "ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন উপজাতির ভাষাসমূহ যথা, কক্‌বরক্, গারো, লুসাই-কুকি, হালাম ভাষা ... আসাম বর্মী উপভাষারই শাখা প্রশাখা। কক্‌বরক্ ও গারো ভাষাকে বৃহত্তর বোডো ভাষার প্রশাখা এবং লুসাই কুকি-হালামদের ভাষাকে আসাম-বর্মীর সরাসরি প্রশাখা বলা হয়েছে। এই রাজ্যের হালাম সম্প্রদায় মূলতঃ কুকি জাতির একটি শাখা হলেও ভাষাগত পার্থক্য ধরা পড়ে।" আসলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে অষ্ট্রিক, ভোট - চীনীয়, ভোটবর্মীজ, মঙ্গোলয়েড, মন্ - খমের ইত্যাদি নরগোষ্ঠীর প্রবেশ অত্যন্ত প্রাচীন কালেই ঘটেছিল, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য নিয়েই উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে তারা বসবাস করে আসছে। আমাদের ত্রিপুরা র‍্যাজ্য মঙ্গোলয়েড, ভোট-চীনীয় ভোট-বর্মীজ ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সময়ে আগমন ও দীর্ঘকালীন বসবাসের ফলে উপজাতি ভাষা ও সংস্কৃতিসমূহ বিকাশ লাভ করেছে। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরী, জমাতিয়া , রিয়াং, উচই, গারো, চাক্‌মা, মগ, লাসাই, কুকি, হালাম ইত্যাদি এবং পরবর্তীস্তরে চা বাগানে কাজের সূত্রে সাঁওতাল, কোল, ভীল, ওরাঁও মুন্ডাদের আমরা পাচ্ছি, কয়েকটি অঞ্চলে খাসিয়াদের পাওয়া যাচ্ছে। এসমস্ত উপজাতি অংশের জনসমষ্টির মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বিভিন্ন সময়ে সঞ্চারিত হয়েছে তা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। পরবর্তী সময়ে কোন কোন উপজাতি জনসমষ্টির অনেকেই খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ধর্মের

বিভিন্নতা তাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দিতে পারেনি বরং কোন কোন ক্ষেত্রে একটা সামঞ্জস্য রক্ষার দিকও নজরে পড়ে। তবে এটা ঠিক যে ধর্মাশ্রিত সংস্কৃতির কোন কোন দিক পুরোনো সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে সংস্কৃতির রূপান্তরের একটা পর্যায় চিহ্নিত করেছে।

রাজন্য শাসন কালে বাংলা ভাষার পৃষ্টপোষকতা এবং এই ভাষাকে রাজ ভাষার(official language)মর্যাদা দানের ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতি জনগোষ্ঠী ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে একে যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করে আসছে। ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশীয় জীবন যাত্রার প্রভাব বাড়তে থাকে

এবং ঐ সঙ্গে ধর্মীয় জীবনে বঙ্গদেশীয় হিন্দু দেবদেবীও অনুপ্রবিষ্ঠ হন। রাজবংশীয়দের সংস্কৃতি চর্চাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী এবং হিন্দু সংস্কৃতির মিলন মিশ্রণের ফলে এক "মিশ্র সংস্কৃতির বর্ণচ্ছটা" (সুরেন দেববর্মণ) প্রত্যক্ষ করা গেল। চতুর্দশ দেবতারা হিন্দু দেব দেবী, সঙ্গে দুর্গাপুজা সহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির সংশ্লেষণ ঘটল। ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপজাতি জনসমষ্টি অনুসৃত সর্বপ্রাণবাদ (animism) তার মূলরূপ থেকে সরে এসে হিন্দু ধর্মাশ্রিত দেবদেবীদের গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে নতুন রূপাশ্রিত এক বিশিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়ে গেল। ফলে আদিবাসী ও বঙ্গ সংস্কৃতির এক সমন্বিত রূপকে ত্রিপুরায় আমরা প্রতক্ষ্য করতে পারলাম। অবশ্য সংস্কৃতি শব্দটিকে শুধুমাত্র সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, শিল্পকর্ম ইত্যাদির মধ্যেও আটকে রাখতে পারিনা, জীবন বিকাশের অন্যান্য দিকও যেমন আচার আচরণ, ভাষা প্রয়োগ, পোষাক-আষাক ইত্যাদি সহ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি নানা দিক শব্দটির মধ্যে নিহিত। ত্রিপুরায় পারস্পরিক আদান প্রদানের ধারায় বঙ্গসংস্কৃতির উন্নত ধারা বলে আমরা যাকে মনে করি, তাও আরো বিকশিত হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী ও উপজাতি জনগণের সংস্কৃতি তাদের বিকাশ ধারা অব্যাহত রেখে গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন উপাদান অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করেছে। ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপ ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতিতে যেন এক অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর।

ত্রিপুরা রাজ্যে বহমান সংস্কৃতিসমূহের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোন আলোচনায় যাচ্ছি না। মিলন মিশ্রণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির জনগণ মিশ্র সংস্কৃতির স্বরূপকে উপলব্ধি কবে ত্রিপুরাকে নতুন করে সাজিয়ে তুলবেন এই ভাবনা নিয়েই কিছু কথা বলা হয়েছে। সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব তো আমাদেরে প্রগতি ও উন্নয়নের দ্বার রুদ্ধ করে রাখে। সভ্যতার অগ্রগতির পথেও তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা তো হানটিংটন সাহেবের সভ্যতার দ্বন্দ্বের তত্ত্বে বিশ্বাসী নই ; এই ভদ্রলোকের মতে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত এবং এর মধ্যে পশ্চিমী সভ্যতা সব থেকে উন্নত, ফলে এই সভ্যতার নেতৃত্ব সবাইকে মেনে নিতে হবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণ এবং বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের প্রতি আক্রমণের হুমকির মধ্যেই পশ্চিমী -সভ্যতার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত হানটিংটন সাহেবেরা পেতে পারেন। কিন্তু আমরা মনে করি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ এ ধরনের কোন সংঘাতের মধ্য দিয়ে ঘটতে পারেনা। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে সমস্ত সংস্কৃতি বিকশিত হতে পারে। শুধু বিশ্বের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কেই নয়, এই ক্ষুদ্র

ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কেও তা সত্য।

সাম্প্রতিক ত্রিপুরার সংস্কৃতি চর্চার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারলে আমরা দেখব যে ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী জনগণের সাংস্কৃতিক জীবন উন্নয়নের একটা বলিষ্ঠ প্রয়াস আছে। সরকারী এবং বেসরকারী স্তরে ত্রিপুরার প্রতিটি সংস্কৃতির প্রদর্শনমূলক দিকগুলি যেমন জনগণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, তেমনি সংস্কৃতি বিনিময়ের অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরার বাইরে অন্যান্য রাজ্যে, এবং বিদেশেও আমাদের সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে তুলে ধরার প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি গবেষণা এবং বিকাশের একটা প্রয়াসও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আলোচনার শুরুতে বিজ্ঞান -প্রযুক্তির কথা কিছুটা এসেছে। প্রযুক্তিগত বহু উপাদান আজ সংস্কৃতি ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করছে, এটা বোধহয় অস্বীকার করা চলে না। তবে ত্রিপুরার জনসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই প্রভাব প্রচন্ডভাবে কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করছে - একথা এখনই বলা যাবে না। ফলে প্রযুক্তির শাসন সংস্কৃতি রূপান্তরের ক্ষেত্র তৈরী করতে পারেনি। লক্ষ্য করা যায় যে ইলেকট্রনিক মাধ্যম বারে বারে যখন কৈশোর ও যৌবনের এমন কি শৈশবের দ্বারপ্রান্তে নতুন অনেকদিক নিয়ে হাজির হয়, তখন জীবনের এই পর্যায়গুলি সহজেই অনেকে গ্রহণ করে, অনেকে আবার আত্মস্থ করারও প্রয়াস পায়। এ অবস্থায় পরবর্তী স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক দিকচিহ্নগুলির অদল বদল ঘটবেনা - এটা বলা সম্ভব নয়। যদিও আমরা জানি সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠিত উপাদানগুলির মধ্যে যে প্রাণশক্তি থাকে, তার প্রভাব সহজে মোচন করা যায় না। ফলে রূপান্তরের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত উপাদানকে খুঁজে বের করা যায়। গ্রহণ-বর্জনের ধারায় সংস্কৃতি রূপান্তরিত হলেও তার কাঠামো কিন্তু অনেকখানি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন বাঙ্গালী জীবনে মহিলাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নানা ব্রত, পূজা ইত্যাদি, কৃষিকর্ম সংক্রান্ত নানাবিধ সংস্কার ও কর্মধারা, যে কোন সংস্কৃতিতে প্রাপ্ত লোকবিশ্বাস, সংস্কার, নানা নিষেধ ইত্যাদির মধ্যে সুপ্রাচীনকালের সংস্কৃতির পরিবর্তিত এবং অপরিবর্তিত কিছু কিছু দিক খুঁজে পাওয়া যায়। মিশ্র সংস্কৃতির অব্যাহত ধারায় সমস্ত সংস্কৃতিগুলি তাদের বিকাশের পথ খুঁজে নেবে- এটাই আজকের মুখ্য বিষয়।

আমাদের জীবন বোধের পরিচয় নিহিত থাকে আমাদের সংস্কৃতিতে। সুতরাং অন্য সংস্কৃতি বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম থেকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাছাই কারার ব্যাপারটা অবশ্যই থাকতে হবে। এই বাছাই এককভাবে নয়, সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে আমাদের সামাজিক ভাবনার প্রতিফলন অবশ্যই প্রয়োজন। এবং এটা করতে গেলে সমাজ - সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে। সে ক্ষেত্র কখনো অনেকটা স্বর্তস্ফুর্তভাবেই গড়ে ওঠে, কখনো সংগঠিত একটা রূপরেখার মধ্য দিয়েই আমরা তাকে তৈরী করে নেই। স্বতস্ফূর্ততার আয়ু অল্প সময়ব্যাপী, অথচ সাংগঠনিক ক্ষেত্রকে ইচ্ছে করলে অনেক সময়ব্যাপী ধরে রাখা যায়। আমাদের ত্রিপুরার প্রতিটি সংস্কৃতির বিকাশকে নিয়ে কাজ করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই তার একটা সঠিক ক্ষেত্রকে তৈরী করেই এগিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উপাদানসমূহকে শাসন করবে মানুষ মানে তার সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি এক সহায়ক বন্ধু হিসাবে কাজ করবে।

আত্মকেন্দ্রিকতার উর্দ্ধে এক সমাজ সচেতন জীবনবোধ পরিব্যাপ্ত হবে।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ-

১. হিন্দুসমাজের গড়ন ঃ- নির্মল কুমার বসু

২. ত্রিপুরার আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি ঃ- সুরেন দেববর্মণ

৩. হরপ্পার অনার্য গরিমা ঃ- প্রশান্ত প্রামাণিক

৪. লোকায়ত দর্শন ঃ- দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৫. তিন প্রসঙ্গ (মৌলবাদ ঃ সন্ত্রাসবাদ ঃ জাতপাত) ঃ- শ্যামল চক্রবর্তী

৬. ত্রিপুরার উপজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ- ডঃ অনাদি ভট্টাচার্য
(অন্বেষায় প্রকাশিত প্রবন্ধ)

----- ০ -----

রবীন্দ্র সাহিত্যে মহাযানী বৌদ্ধ - সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণ-বিভা

ড. আশিস্ কুমার বৈদ্য

বিশ্বমানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৌভাগ্যবশতঃ এমন একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম সম্পদে সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার পরিবেশ , সারস্বত পরিমন্ডল বেদ-বেদান্ত-উপনিষদীয় চিন্তা ও চেতনার পাশাপাশি বৌদ্ধ ভাব ধারাতেও পরিপুষ্ট ছিল। ফলশ্রুতি স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ আশৈশব বৌদ্ধ ভাবসম্পদ হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পান।

রবীন্দ্রনাথের পুণ্যাবির্ভাবের আগেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ভগবান বুদ্ধের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয় এবং বুদ্ধদেবের মঙ্গলময় আদর্শ ও বৌদ্ধ জ্ঞানরাশির আলোকশিখা অনির্বাণ রাখে। কবিগুরুর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের পুণ্যভূমি সিংহল তথা শ্রীলঙ্কা দর্শনে অপার আনন্দ লাভ করেন তখন তাঁর মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষির সফরসঙ্গী ছিলেন। শ্রীলঙ্কায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির মাধুর্য রস আস্বাদনে তৃপ্ত হয়ে দেশে ফিরলেন। একবছর পর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁর জগদ্বিখ্যাত পুত্র রবীন্দ্রনাথের শুভাবির্ভাব ঘটে । রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সাহিত্য চর্চা এবং সেতার বাদনের জন্য খ্যাতিলাভ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর বৌদ্ধ দর্শনের উপলব্ধি ''আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত'' শীর্ষক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করলেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধতীর্থ সিংহল ভ্রমনান্তে লন্ডনে গেলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো ভারত - তত্ত্ব বিশারদ ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে। উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ পরিবেশে অলোচনা হল। দেশে ফিরে এসে সত্যেন্দ্রনাথ (১৯০১ খৃষ্টাব্দে) 'বৌদ্ধ ধর্ম' নামক বইটি লিখে সাড়া জাগান।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, পারিবারিক পরিধির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার সূত্রে বৌদ্ধধর্ম- সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অনুকুল পরিবেশ পেয়েছিলেন । যৌবনে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হন। রবীন্দ্রনাথ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের 'The Buddhist Sanskrit of Nepal' নামক বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত হন। ড. সুকুমার সেন তাঁর 'পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ' বইটিতে (১৩৬৯বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) লিখেছেন- ''বৌদ্ধ সাহিত্যে রাজা রাজেন্দ্রলালের প্রকৃত শিষ্য বলতে যদি কেউ থাকেন তো রবীন্দ্রনাথ। .... বৌদ্ধগ্রন্থে যে সাহিত্যরস আছে তার নিষ্কর্ষ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করতে পারেননি, না এদেশে, না বিদেশে।''

অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন ''ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ'' বইটিতে লিখেছেন -''আমরা জানি, সেই যুগেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পুত্র রথীন্দ্রনাথ সহ অন্যান্য ছাত্রদের বৌদ্ধ শাস্ত্র

অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন।"

ড. আশা দাশ লিখেছেন "বৌদ্ধ শাস্ত্রের অঙ্গ "ধর্ম্মপদ" গ্রন্থটির প্রতি তাঁহার এতই অনুরাগ ছিল যে, কবি নিজেই গ্রন্থটির সরল বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন।" রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক শরৎচন্দ্র রায় "বৌদ্ধ ভারত" এবং সতীশচন্দ্র রায় "চন্ডালী"শীর্ষক কবিতা দুটি রচনা করেন। কবিগুরু শান্তিনিকেতনে বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্য পাঠের ব্যবস্থার পাশাপাশি ভগবান বুদ্ধের জন্মদিনটি 'বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব 'রূপে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করলেন।

বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অজিত কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে কবিগুরুর অপরিসীম বুদ্ধ-প্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'সাহিত্যের স্বরূপ' নিবন্ধে বৌদ্ধ সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে লিখেছেন- "এক সময় আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলো জানলুম, তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল।"

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তৎকালে উদ্ভূত অশান্তি কর অবস্থায় মানসিক শান্তির অন্বেষণে বুদ্ধগয়া দর্শনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হলেন ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, স্বামী সদানন্দ, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার প্রমুখ। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন -
"সেখানে প্রতিদিন তাঁহারা ওয়ারেনের "Budhism in Translations", এডুইন আর্ণল্ডের "Light of Asia" হইতে পাঠ করিতেন।" রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী'তে (পত্র নং ৮৬) লিখেছেন - "মফঃস্বলে যখন যাই, তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়। আমার সঙ্গে নেপালীজ বুদ্ধিস্ট লিটারেচার থেকে আরম্ভ করে সেক্সপীয়র পর্যন্ত কত রকমের যে বই আছে তার ঠিকানা নেই।"

এক সময় বৌদ্ধ ধর্মের, বিশেষতঃ মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের পরিব্যাপ্ত ভাবতরঙ্গ সমগ্র ভারত তথা গোটা পৃথিবীকেই পরিপ্লাবিত করেছিল। সেই তরঙ্গের আত্যান্তিক প্রবাহকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তিল তিল সঞ্চয় করে নিলেন আপন মনের মণিকোঠায়। নিজের অনন্ত প্রতিভার মণি-কাঞ্চনে অধিকতর সমৃদ্ধি ঘটিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পরিবেশন করলেন নতুন স্বাদে-গন্ধে এবং অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় তাঁর সুলিখিত কাব্যে, কবিতায়, নাটকে, নিবন্ধে, গল্পে ও উপন্যাসে।

মানবিকতাগুণে বিভূষিত, জনকল্যাণমুখী চিন্তায় ও শিল্প-শৈলীতে বিচিত্র ছন্দোবন্ধে বৌদ্ধ -বিভাকে রবীন্দ্রনাথ বিকশিত করেছেন তাঁর শাণিত কলমে, যত্নসিদ্ধ অনুশীলনে, যথার্থ উপলব্ধিতে।

বৌদ্ধ কাহিনী ও বৌদ্ধতত্ত্ব যেন নতুন রূপে - রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো হীরক দীপ্তির ঔজ্জ্বল্য নিয়ে । কবিগুরুর নিত্য -নব সৃষ্টির আনন্দ এবং প্রজ্ঞাসমুজ্জ্বল ভাব-সম্পদ বৌদ্ধ সাহিত্যালোকের বিচিত্র বর্ণ বিভাকে প্রতিফলিত করলো বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে। বলা বাহুল্য, যাঁর শৈশব - কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছে বৌদ্ধচর্চার মাধুর্যমন্ডিত পরিবেশে, যাঁর যৌবন প্রত্যক্ষ করেছে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন প্রবর্তিত ''শাক্য সমাগম উৎসব'' (১৮৮০ খৃষ্টাব্দ) তাঁর মানসপটে বুদ্ধানুরাগের স্বর্ণচ্ছটা বিকিরিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বিশ্বমানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বুদ্ধদেবের একান্ত ভক্তরূপে অভিহিত করলেন। তারও বহুকাল আগে ভক্তকবি জয়দেব 'গীত গোবিন্দ' কাব্যে বুদ্ধ বন্দনা করেছেন। হিন্দুশাস্ত্রে বুদ্ধদেবকে ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম অবতার রূপে বর্ণনার পর বহু সংখ্যক বৌদ্ধ দেব-দেবী হিন্দু দেবায়তনে স্থায়ী আসন লাভ করেন। বুদ্ধদেবের প্রতি কবির অবিচল ভক্তির মূল কারণ তাঁর অহিংসার বাণী, সাম্য -মৈত্রী, প্রগতির মহতি আদর্শ, বিশ্বমানবতার মহামন্ত্র!

বুদ্ধভক্ত হলেও গৌতম বুদ্ধের নির্দেশিত পন্থার কিছু অংশ বিশ্বকবির পছন্দের তালিকায় ছিলনা। যেমন, বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটকে এবং পালিসাহিত্যে উল্লেখিত হীনযানী বৌদ্ধমতের নঞর্থক নির্বাণে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন না। বুদ্ধদেব স্বয়ং নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। পক্ষান্তরে কবিগুরু ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্ত। বুদ্ধদেব নৈরাত্মবাদ ও শূন্যতাবাদে বিশ্বাস করতেন। কবিগুরু আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন । বৌদ্ধ শূন্যতাবাদে তাঁর কোন আস্থা ছিল না। বুদ্ধদেব স্বয়ং সংসার ত্যাগী মুক্ত পুরুষ। রবীন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগের মধ্যে কোন মহিমা -মন্ডিত মুক্তির আনন্দ খুঁজে পাননি। তাই লিখলেন ঃ

> ''বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ।
> অসংখ্য বন্ধন মাঝে, মহানন্দময়-
> লভিব মুক্তির স্বাদ ।''

রবীন্দ্র - রচনায় ও বক্তব্যে হীনযানী বৌদ্ধ ধর্ম - সংস্কৃতির তুলনায় মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম - সংস্কৃতির প্রতি অধিক আস্থা ও আকর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে । হীনযানী- মতে, গৌতম বুদ্ধ মহান শিক্ষক হলেও ঈশ্বর নন। কিন্তু মহাযানী ভক্তিবাদে গৌতম বুদ্ধ হলেন ঈশ্বরের প্রতিভূ। তিনি সকল দেবদেবীর উপর আধিপত্যকারী ঈশ্বর । জীবলোকের মঙ্গল সাধনার্থে তিনি যুগে যুগে নানা রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। মহাযানী বৌদ্ধ মতের বোধিসত্ত্ববাদও কবি গুরুকে আকৃষ্ট করেছিল। বোধিসত্ত্বগণ জীবলোকের কল্যাণে বারে বারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী মুক্তি ও শান্তি লাভ না করা পর্যন্ত কোন বোধিসত্ত্ব নিজের মুক্তি কামনা করেন না । বোধিসত্ত্ববাদের এই সর্বতোমুখী কল্যাণভাবনা রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিল। 'অবদান' সাহিত্য

এবং জাতকের কাহিনীগুলোতে বিশ্বানুভূতির চমৎকারিত্ব প্রকাশিত হয়েছে বলে এগুলো কবিকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে । বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্য পাঠে সমৃদ্ধ কবি উপলব্ধি করলেন যে, অবদান, নবধাসূত্র ও জাতকের মূল শিক্ষাই হলো সর্বজীবে সমদর্শন । এখানে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, ধনী-দরিদ্র ভেদের কোন মূল্য নেই। ভগবান বুদ্ধের মধ্যে বিশ্বকবি দেখলেন মানবপ্রেমের চরম প্রকাশের স্বর্ণচ্ছটা!

রবীন্দ্রনাথের লেখা "বুদ্ধদেব" গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য অবদানরূপে সবর্জন স্বীকৃত। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য বুদ্ধদেবের প্রতি বিনম্র চিত্তে নিবেদন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, গৌতম বুদ্ধ শাশ্বত ভারতের শ্রেষ্ঠ মহামানব । এই শ্রেষ্ঠ মহামানবের কাছে নতজানু হয়ে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ায় প্রার্থনা করলেন হিংসামুক্ত পৃথিবীর মানব সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল, শান্তি ও সমৃদ্ধি । বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক মুখপত্রে - (১৯৪৩ খৃঃ, এপ্রিল সংখ্যা) লেখা হয়েছিল " .....only once in his life, said Rabindranath, did he feel like prostrating himself before an image and that was when he saw the Buddha at Gaya."

"বুদ্ধদেব" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ভগবান বুদ্ধের মূল্যায়ন করে লিখেছেন -"আজ ভগবান বুদ্ধকে দেখছি যথাস্থানে, মানব মনের রত্ন সিংহাসনে, মহাযোগের বেদীতে, যার মধ্যে অতীত কালের মহৎ প্রকাশ বর্তমানকে অতিক্রম করে চলেছে। আপনার চিত্তবিকারে, আপন চরিত্রের অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ আজো তাঁরই কাছে বলতে আসছে -"বুদ্ধের শরণ কামনা করি!"

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লেখা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের প্রনিধানযোগ্য মন্তব্য,- "বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজান্ডার করেননি।" এই উক্তির মধ্যে পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের একটি শ্লোকের ছায়াপাত ঘটেছে। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে -ক্রোধের দ্বারা, হিংসার দ্বারা জয় করা যায় না। জয় করা যায় অহিংসা ও মৈত্রীব দ্বারা। 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে লেখা), 'যাত্রী', 'কালান্তর' প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ শিক্ষাদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় বৌদ্ধ শিক্ষায়তনের যথা -নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব অনস্বীকার্য। শান্তিনিকেতনের ও বিশ্ব ভারতীর পরিকল্পনায় বৌদ্ধ ভাবাদর্শে গঠিত গৌরবময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নিগ্ধ প্রশান্তি ও প্রজ্ঞা প্রদীপের ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধম্মপদ' প্রবন্ধে লিখেছেন "ভারত ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ অধ্যায় বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যেই লুক্কায়িত।" এই উপলব্ধি মূলেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শে বৌদ্ধ দর্শন গুরুত্ব পেয়েছে।

ভগবান বুদ্ধের মৈত্রী, করুণা ও অহিংসার বাণী বারে বারে কবি- হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে। অহিংসা মন্ত্রের প্রতি কবির প্রগাঢ় অনুরাগের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে "রাজর্ষি" উপন্যাসে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি রচনা করেন। ত্রিপুরার ধর্মপরায়ণ প্রজাবৎসল মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যের অহিংসা প্রীতি ও ভুবনেশ্বরী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রঘুপতির পশুবলি প্রীতির কারণে মহারাজের সঙ্গে পুরোহিতের সংঘাতের কাহিনী রাজর্ষী উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। এই কাহিনীর সঙ্গে অহিংসার বাণী যোগ করে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে একই উপাদানে রচিত হয় 'বিসর্জন' নাটক। এই নাটকে হৃদয়ধর্মের সঙ্গে প্রেম ও অহিংসামন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। নাটকের ১ম অঙ্কে, ২য় দৃশ্যে গোবিন্দ মাণিক্য বললেন -

''বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন
জীব রক্ত সহে না তাহার!''

বুদ্ধদেব জাতি -বর্ণভেদে বিশ্বাসী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ 'চন্ডালিকা' (১৯৩৭খৃঃ), 'কালের যাত্রা', 'রথের রশি', 'মালিনী' প্রভৃতি নাটকেও অস্পৃশ্যতার অন্ধকার দূরীকরণে লেখনি চালনা করেছেন। আচারসর্বস্বতা, মানবতাবিরোধী ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ সমদর্শনের মহতাদর্শকেই পরিপুষ্ট করলেন। 'চন্ডালিকা' নাটিকায় চন্ডাল কন্যা প্রকৃতির হাতে উচ্চবংশজাত বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দ পরম তৃপ্তিতে জলপান করেছেন। রাজকন্যা মালিনী ব্রাহ্মণদের লোলুপ দৃষ্টিতে বিরক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পরিহার করে বুদ্ধানুরাগিণী হয়েছেন। বুদ্ধাদর্শে দীক্ষিতা মালিনী বৌদ্ধ ভিক্ষুর দেশনা পেয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন। সেই তৃপ্তির কথা রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটকে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

'চন্ডালিকা' নাটিকাটির কাহিনী 'দিব্যাবদান' এর অন্তর্গত 'শার্দুল কর্ণাবদান' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। শার্দুল কর্ণাবদানে পাই. বুদ্ধদেবের স্নেহধন্য ভিক্ষু আনন্দ চন্ডালকন্যা প্রকৃতিকে তৃষ্ণার্ত হয়ে বলেছেন-

''দেহি মে ভগিনী পানীয়ম্ পাস্যামি।''
(হে ভগিনী, আমাকে (পানীয়) জল দাও!)
প্রকৃতি বলেছে ঃ মাতঙ্গদারিকাহমস্মিভদন্ত আনন্দ।''
(হে আনন্দ, আমি অস্পৃশ্য কন্যা।

আনন্দ তদুত্তরে বললেন- ঃ নাহংতে ভগিনী কুলং বা জাতিং বা পৃচ্ছাম। অপি তু সচেত্তে পরিত্যক্তং পানীয়ম্। দেহি, পাস্যামি।''

(হে ভগিনী আমি তোমার কুল, জাতি সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি । তুমি আমায় জল দান করে তৃষ্ণা নিবারণ কর।)

আনন্দের সুমিষ্ট বাক্যে প্রকৃতি চমকিত, আনন্দিত এবং বিমুগ্ধ ! দ্বিধামুক্ত প্রকৃতির হাতে ভিক্ষু আনন্দ জল পান করে তৃপ্তি লাভ করলেন। ভিক্ষু আনন্দের কালে ভারতীয় সমাজে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ এখনকার তুলনায় অধিক ভয়ঙ্কর ছিল। সেকালে চন্ডাল সম্প্রদায় উচ্চবর্ণের মানুষের

কাছে অপাঙক্তেয় রূপে সমাজ বহির্ভূত গন্ডিতে বন্দী ছিল। তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ তাদের হাতে জাত যাবার ভয়ে জল পান করতো না। 'অবদান' শাস্ত্রে বা সাহিত্যে বর্ণিত সাম্যের আদর্শে ভিক্ষু আনন্দ মহৎ হয়ে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রকৃতিকে কামনা-বাসনার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ভিক্ষুনী সংঘে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। বর্ণ বৈষম্যের দীর্ঘ প্রাচীর তিনি ভেঙ্গে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধাদর্শের এই দিকটিতেও বিমোহিত। তাঁর 'চন্ডালিকা' নৃত্যানাটিকায় ভিক্ষু আনন্দের পানীয় জল প্রার্থনায় চমকিত চন্ডাল কন্যা প্রকৃতি বলে-

"ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে,
আমি চন্ডাল কন্যা,
মোর কূপের বারি অশুচি।
তোমারে দেব জল হেন পুণ্যের আমি
নহি অধিকারিণী।"

ভিক্ষু আনন্দ একথা শুনে মধুর হেসে বলেন-

"যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা
সেই বারি তীর্থবারি
যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে
যাহা তাপিত শ্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে
সেই তো পবিত্র বারি,
জল দাও, আমায় জল দাও!"

'চন্ডালিকা' নৃত্য নাটিকাটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal" বই থেকেও বহু উপাদান গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের উৎস হলো- বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত মহাবস্তু অবদানের 'মালিন্যাবস্তু' কাহিনী। 'রাজা, 'অরূপ রতন', 'শাপমোচন' নাটকের সঙ্গেও জাতকমালার অন্তর্ভুক্ত 'কুশজাতক' এর এবং বৌদ্ধ -সংস্কৃতে লেখা মহাবস্তু অবদান-এর কাহিনীগত সাদৃশ্য লক্ষ্মণীয়। উপরোক্ত নাটকগুলোতে রবীন্দ্রনাথ পাত্র-পাত্রীদের নাম বদলে দিয়েছেন। যেমন, কুশ জাতকের নায়ক মল্লরাজ ইক্ষাকু তনয় কুশকুমারের মায়ের নাম ছিল শীলাবতী এবং কুশকুমাব -পত্নী হলেন মদ্র রাজকন্যা প্রভাবতী। রবীন্দ্র নাটকে তাদের নামকরণ হয়েছে যথাক্রমে অলিন্দা ও সুদর্শনা। মূল নাটকে কুশকুমারের সঙ্গে প্রভাবতীর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল আগুনের আলোয়। রবীন্দ্রনাথের শাপমোচন নাটকে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটেছে জলকুন্ডে স্নানের সময়। তবে নাটকের মূল সুরটি অক্ষুন্নই আছে। রবীন্দ্র নাটকে শেষ পর্যন্ত রূপের নয়, জয় হয়েছে প্রেমধর্মের। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে বৌদ্ধ -প্রেম ধর্মের আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছেন। ফলে এখানে বীর ধর্ম গৌণ হয়ে পড়েছে।

বৌদ্ধ গ্রন্থ "চূড়াপক্ষ অবদান" গ্রন্থের ছায়ায় কবিগুরু 'অচলায়তন " ও "গুরু'নাটক দুটি রচনা করেন। তবে বৌদ্ধ কাহিনী বর্ণিত পন্থক ও মহাপন্থক চরিত্র দুটি সামান্য পরিবর্তনের ক্ষীণস্রোতে রবীন্দ্র-নাটকে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক-এ পরিণত। এই নাটকে নিষ্প্রাণ আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে, সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই নাটকে দেখতে পাই প্রেমধর্মে পরিপূর্ণ এক মানবতাবাদী পুরুষ ধর্মের নামে যান্ত্রিক আচার সর্বস্বতা, সঙ্কীর্ণতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে অবরুদ্ধ মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে।

জীবন প্রভাত থেকে রবীন্দ্রনাথ যে বুদ্ধাদর্শ ও বৌদ্ধ সাহিত্যের রসধারায় মগ্ন হয়েছিলেন তার প্রথম প্রকাশ ঘটে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও বিস্ময়কর অনুভব সমৃদ্ধ কাব্যে, কবিতায়। এডুইন আর্ণল্ডের লেখা " Light of Asia" কাব্যে দেখতে পাই, বিশ্বের সকল প্রাণীর বেদনাময় কান্না করুণাময় বুদ্ধের কোমল হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। এডুইনের মর্মস্পর্শী বর্ণনায় লিপিবদ্ধ হয়েছে-

"This will I do because the woeful cry of life
and all flesh living cometh up into my ears
and all my soul is full of pity
for the sickness of this world."

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীর দুঃখ -বেদনায় কাতর করুণাময় বুদ্ধের কোমল হৃদয়ের স্পর্শ অন্তরে অনুভব করেই তাঁর লেখা 'নটীর পূজা' নাটকে বুদ্ধজন্মোৎসবের গানে লিখেছেন,

"নতুন তব জন্মলাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃত বাণী,
বিকশিত করো প্রেমপদ্ম, চির মধু নিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্ক শূণ্য।"

মহাযানী বৌদ্ধমতে সর্বজীবের কল্যাণে ভগবান বুদ্ধ বারে বারে পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করেছেন বোধিসত্বরূপে। এখানে জন্মান্তরবাদ ও আত্মার অবিনশ্বরত্বের বাণী স্বীকৃত। বৌদ্ধ জাতকের আলোয় দেখা যায়, মানব কল্যাণে তথাগত বুদ্ধ বোধিসত্বরূপে পাঁচশবার নানা প্রাণীর বেশে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও বোধিসত্বানুরাগের প্রাবল্যে লেখেন,

"বারে বারে বনে বনে জন্ম লই
নব নব বেশে , নব নব দেশে,
যুগে যুগে রূপে রূপান্তরে ।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১৩০৪ বঙ্গাব্দে লেখা 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'কবিতাটি 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতাটির মূল উপাদান মহাযান বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত অবদান শতকের 'বস্ত্রাবদান' উপাখ্যান থেকে সংগৃহীত। কাহিনীটি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা "The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal" বইটিতেও সন্নিবেশিত হয়েছে। কবিগুরু দানের মাহাত্ম্যকীর্তনের উদ্দেশ্যে কাহিনীটি গ্রহণ করেছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় দানের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। ড. আশা দাশ সম্পাদিত "পঞ্চগতি দীপনং" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে -

"সলজো রূপবাহোতি সুছায়ো জন তাপিয়ো।
সো ভবে বৎখলভী চ যো বৎখ পয়চ্ছতি।"
আবাসং যো দদাতি হ পিপসন্নেন চেতসা।
পসাদা সব কামিদ্ধা জায়ন্তে তস্ম দেহিনো।।

(যে লজ্জা শীল ও রূপবান সে অন্যের আশ্রয়স্থল ও জনপ্রিয় হয়। যে বস্ত্রদান করে, সে বস্ত্র লাভ করে।) বস্ত্রাবদানে বুদ্ধ শিষ্য ভিক্ষু অনাথ পিন্ডদের ভিক্ষা সংগ্রহনার্থে পুরবাসীগণের দ্বারস্থ হবার কাহিনী বিধৃত আছে। পুরবাসীগণ তাঁর ভিক্ষাপাত্রে সাধ্যমত খাদ্য, অলঙ্কারাদি দান করলেন। জনৈকা দীনা রমণীর মনেও দানের ইচ্ছা জাগ্রত হলো। কিন্তু এই দরিদ্র পুরবধুর নিজের পরিধেয় বস্ত্রখন্ড ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অথচ ভিক্ষু অনাথ পিন্ডদের হাতে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে কিছু দিতে না পারায় তিনি মনে কোন শান্তি পাচ্ছিলেন না। তাই তিনি একটি গাছের অন্তরালে দাঁড়িয়ে নিজের একমাত্র বস্ত্রখন্ড অনাথ পিন্ডদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বইতে লেখা হয়েছে -

"A Poor woman who had an only cloth, threw it.... from behind a hadge .... she went to the lord Buddha and received knowledge of truth from him."

রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে,

"দীনা নারী এক ভূতল শয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ
সে আসি নামিল সাধুর চরণ কমলে।
অরণ্যের আড়ালে রহি কোনমতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে ভূতলে।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা "মূল্যপ্রাপ্তি"(১৩০৬ বঙ্গাব্দে রচিত)কবিতাটি 'পদ্মাবদান' এর কাহিনীমূলে রচিত। কবিগুরু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনুপম ভাষা- মাধুর্য এবং বিশ্বনন্দিত প্রতিভার

সংমিশ্রণে বিষয়াবলীর মূলভাব অক্ষুণ্ন রেখে বুদ্ধভক্তির অপূর্ব মহিমার প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন। তবে এই কবিতায় দুটি ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। মূল কাহিনীতে অর্থাৎ পদ্মাবদানে অকালের প্রস্ফুটিত পদ্মটি নিয়ে অনাথ পিন্ডদ জনৈক মালির সঙ্গে দর কষাকষি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মালির মনে বুদ্ধভক্তির প্রাবল্য দেখা দেওয়ায় অর্থকষ্টের কথা ভুলে অকালের পদ্মটি তিনি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ বুদ্ধদেবের চরণপদ্মে নিবেদন করলেন। বুদ্ধ মহিমায় এই পদ্ম অলৌকিকভাবে হঠাৎ বিশালাকার ধারণ করে বুদ্ধদেবের মাথার উপর চক্রাকারে শোভা পেল। রবীন্দ্রনাথের 'মুল্যপ্রপ্তি' কবিতায় বর্ণিত মালি 'সুদাস 'নামে আখ্যাত হলেন, আর তার সঙ্গে পদ্মের মূল্য নিয়ে দর কষাকষি করেছেন বুদ্ধভক্ত রাজা প্রসেন্‌জিৎ। এই কবিতায় বুদ্ধ ভক্তির ঐশ্বর্য ও মধুরিমা থাকলেও অলৌকিকত্বের মহিমা অনুপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথের 'নগরলক্ষ্মী' কবিতাটি বৌদ্ধ অবদান শাস্ত্রের অন্তগর্ত 'কল্পদ্রুমাবদান' অবলম্বনে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে রচিত। বৌদ্ধ ধর্মে আর্তজনের সেবায় উৎসর্গীকৃত সেবকের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। 'নগরলক্ষ্মী' কবিতায় উল্লেখিত অনাথপিন্ডদ কন্যা সুপ্রিয়া ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন যোগাবার ভার স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধের দেশনায় অনুপ্রাণিত সুপ্রিয়ার মূল আদর্শই হল বিপন্নের সেবা। আর্তজনের সেবাই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কাশীরাজ অনন্তের সভাকবি ক্ষেমেন্দ্রের "বোধিসত্বাবদান কল্পলতা" এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা "Buddhist Sanskrit Leterature of Nepal" বইটি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মূল কাহিনীর খানিকটা কাট ছাঁট করে রবীন্দ্রনাথ "অভিসার"নামক কবিতাটি রচনা করেন। অবদান শতকের অন্তর্ভুক্ত 'শ্রীমতী' আখ্যান অবলম্বনে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কবিগুরু "পূজারিণী" কবিতাটি লিখেছেন। অবদানে লেখা হয়েছে-

"রাজ্ঞা বিম্বিসারেণ মহতা সৎকারেনান্তঃপুর সহায়েন তথাগতস্য কেশ নখস্তূপোহন্তপুর মধ্যে প্রতিষ্ঠাপিতঃ। তত্র চান্তঃপুরেহন্তঃপুরিকা দীপ ধূপ পুষ্পগন্ধ মাল্য বিলেপনৈরভ্যর্চং কুর্বন্তি।"

রবীন্দ্রনাথও'পূজারিণী" কবিতায় নৃপতি বিম্বিসার কর্তৃক ভগবান বুদ্ধের পাদ -নখ চেয়ে এনে রাজোদ্যানে বৌদ্ধ স্তুপ রচনার কথা বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ

"সন্ধ্যা বেলায় শুচিবসন পরি
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তুপ পদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনক প্রদীপ মালা।"

মগধাপতি অজাত শত্রুর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শ্রীমতি বুদ্ধস্তুপপাদমূলে দীপ-ধূপ জ্বালিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে রাজপ্রহরীর খড়গাঘাতে আত্মাহুতি দিয়েছেন। এখানে সশস্ত্র হিংসা ও রক্তপাতের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র এক ভক্তিময়ী নারী ভগবান বুদ্ধের অহিংসার আদর্শকেই জয়ী করেছেন। মর্মস্পর্শী হলেও নব ধর্ম প্রচারে অহিংসামন্ত্রের মহিমা কীর্তনে শ্রীমতীর এই

আত্মাহুতি ব্যর্থ হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের অপর একটি বিখ্যাত কবিতা 'মস্তক বিক্রয়'' ১৩০৪ বঙ্গাব্দে লেখা। এই কবিতাটি মহাবস্তু অবদানের কাহিনী অবলম্বনে বিরচিত। এই কবিতায় পাই, দুঃস্থজনের সেবায় রাজ্যহারা কোশলরাজ নিজের জীবন বিপন্ন করতেও পিছপা হননি। পরম করুণাময় বুদ্ধের মানব কল্যাণমুখী ভাবাদর্শের মাহাত্ম্যবর্ণনার চমৎকারিত্বে 'মস্তক বিক্রয়' কবিতাটি রসোত্তীর্ণ এবং কালজয়ী। ''মহাবস্তু অবদান''-এ কোশল নরপতি দানশীলতার জন্য বিখ্যাত। 'মস্তক বিক্রয়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথও কোশলরাজের দানশীলতার মাহাত্ম্য কীর্তন করে লিখেছেন -

''কোশল নৃপতির তুলনা নাই।
জগৎ জুড়ি যশোগাথা,
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ ঠাঁই,
দীনের তিনি পিতামাতা।''

মহাবস্তু অবদানে বর্ণিত হয়েছে ঃ -

''তস্য চ রাজ্ঞো দেশে দেশে কল্যাণকীর্তি
শব্দ শ্লোকো দায়ক দান প্রতিসৎকৃতঃ
পরানুগ্রহ প্রবৃত্তো পরলোকদর্শী।''

রবীন্দ্রনাথ 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটির উপাদান সংগ্রহ করেছেন 'মাকন্দিকা অবদান' থেকে। মাকন্দিকা অবদান- এ আছে বৎসরাজ উদয়নের প্রধানা মহিষী শ্যামাবতী জলক্রীড়াকালে শীত কম্পিতা হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাধন কুটীরে অগ্নিসংযোগের আদেশ দেওয়ার শাস্তি স্বরূপ পরজন্মে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। 'সামান্য ক্ষতি' কবিতায় কবিগুরু বর্ণিত কাশীরাজ মহিষী জলক্রীড়ান্তে শীতার্তহয়ে উষ্ণতার সন্ধানে দরিদ্র প্রজার পর্ণকুটীরে আগুন দেবার আদেশ দিয়েছেন। মাকন্দিকা অবদানে (দিব্যাবদানের অন্ত ভুক্ত) মহারাণী সখীদের প্রতি আদেশ করেছেন,

''দারিকে, শীতেনাতীব বাধ্যামহে'
গচ্ছ এতস্যাং কুটিকায়ামগ্নিং প্রজ্জ্বলয়েতি ''

'সামান্য ক্ষতি' কবিতায় পাই, কাশীরাজ মহিষী জলক্রীড়ান্তে শীর্তাত হয়ে সখীদের বলেছেন,

''উহু, শীতে মরি।
সকল শরীর উঠিছে শিহরি;
জ্বেলে দে আগুন ওলো সহচরী;
শীত নিবারিতে অনলে ।''

'পরিশেষ' কাব্যের অন্তর্গত 'বোরোবোদুর মন্দির' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভক্তিনম্রচিত্তে শৈলেন্দ্রবংশীয় নরপতির অক্ষয় কীর্তিকে স্মরণ করেছেন । যবদ্বীপের বোরোবোদুর মন্দিরে মন্ত্রযানী মঞ্জুশ্রী মূর্তির পদপ্রান্তে প্রণাম জানিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে কবিগুরু উচ্চারণ করলেন ভক্তিমার্গের পূণ্যবাণী -

''অমেয় প্রেমের মন্ত্র বুদ্ধের শরণ লইলাম।''

সারনাথে সিংহলী ভিক্ষু দেবপ্রিয় ধর্মপাল কর্তৃক মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ

'বুদ্ধদেবের প্রতি' কবিতাটি লিখেছেন।

'পরিশেষ' কাব্যের এটি একটি সুখপাঠ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কবিতা। এই কবিতায় কবিগুরু বিনম্রচিত্তে বুদ্ধদেবের প্রতি প্রার্থনা জানিয়েছেন,

"অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু
আয়ু কর দান ।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।"

বুদ্ধদেব বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে সাম্যের বাণী প্রচার করেছেন। অথচ এই দেশে ভেদ-বুদ্ধির বিষবাষ্পে বহু সংখ্যক মানুষ বিভক্ত এবং পরিণামে দুর্বল। ফলে এই সব মানুষ অল্পায়ু। বস্তুত্বের মধ্যে বিশ্বমৈত্রীর সন্ধানী কবির এই প্রার্থনার মূল উদ্দেশ্য বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের উদ্বোধন এবং মানবতাবাদের দীপশিখায় সার্থক পথ পরিক্রমা। এই নিবন্ধে অলোচিত কবিতা, উপন্যাস, নাটক, নিবন্ধাদি ছাড়াও আরো বেশ কিছু সঙ্গীতে, কবিতায়, নাটকে, নিবন্ধে কবিগুরুর বুদ্ধভক্তি, বুদ্ধাদর্শ, মহাযানী বৌদ্ধ সাহিত্য -সংস্কৃতির স্বর্ণবিভা সার্থকরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যরসের অমিয়ধারার বহুলাংশই যখন তলিয়ে যাচ্ছিল বিস্মৃতির অতল তলে, কবিগুরু উত্তরপুরুষের দায়ভার সার্থকরূপে বহন পূর্বক স্বীয় প্রতিভার হীরকদীপ্তিতে পরম আস্বাদনীয় করে সেই সকল সম্পদ আমাদের কাছে পরিবেশন করলেন। অন্তরলোকের বিচিত্রভাব সম্পদ তাঁর বহু কালজয়ী সঙ্গীত, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই ভাব-সম্পদ মূলতঃ মানবকল্যাণমুখী, সার্বজনীন, বিশ্বপ্রেমে মাধুর্যমন্ডিত। মৌলিক চিন্তা ও চেতনার অলোকশিখায় রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল! বিশ্বের অন্যতম বিষ্ময় রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য -পাশ্চাত্য, প্রাচীণ ও নতুনের অপূর্ব সঙ্গমস্থল। ঔপনিষদীয় প্রার্থনা সঙ্গীতের মধুময় সুরমূর্চ্ছনার পাশাপাশি আধুনিক সভ্যতা ও প্রাচীণ সভ্যতার প্রজ্ঞাময় মন্ত্রোচ্চারণে তিনি ঋষিপ্রতীম, অতুলনীয় স্বাতন্ত্র্যে চিরবরণীয়। ভগবান বুদ্ধের বিশ্বপ্রেম, অহিংসামন্ত্র, মানবমৈত্রীবোধ ও শান্তিরবার্তা রবীন্দ্রমানসে বৌদ্ধধর্ম- সংস্কৃতির অনুষঙ্গে পরিবাহিত হয়ে এসে তাঁর জীবনাদর্শকে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধানুরক্তির কারণ, বুদ্ধদেব সত্যাদর্শকে, অহিংসার মহিমা এবং সেবাধর্মকে বিশ্বমানবের বৃহত্তর কল্যাণে নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলার জন্য তপস্যা করেছেন। সেই মঙ্গলমুখী তপস্যার সোনালী আভা এসে রবীন্দ্রমানসকেও আলোকিত করলো। আর তারই প্রতিফলন ঘটলো রবীন্দ্রমনীষার অসাধারণ সৃষ্টি বৈচিত্র্যে, বিস্তারে ও প্রজ্ঞাসিদ্ধ অনুভবে।

বলাবাহুল্য, কেবল রবীন্দ্র সাহিত্যেই নয়, প্রাচীণ বাংলা সাহিত্যে, তথা চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নাথ- সাহিত্য, খনার বচন, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত- গীতি, মঙ্গলকাব্য, শূণ্য পুরাণ, শিবায়ন, লোকগীতি প্রভৃতি নানা গ্রন্থে ও গানে বুদ্ধাদর্শ ও বৌদ্ধ সাহিত্য -সংস্কৃতির ছায়াপাত ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় বুদ্ধদেবোচ্চারিত কল্যাণমন্ত্রের নানা সুর নানাভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কেবল বাংলা সাহিত্যেই নয়, বহু ভাষায় সমৃদ্ধ সমগ্র ভারতীয়

সাহিত্য, তথা বিশ্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি ভগবান বুদ্ধের ত্যাগ তিতিক্ষা, মৈত্রী, প্রেম, সৌভ্রাতৃত্ব, সেবা, দান, শান্তি ও অহিংসামন্ত্রের স্নিগ্ধ প্রশান্তি বহন করে কল্যাণমুখী চিন্তা ও চেতনার অনুসরী। একইভাবে বলা যায়, রবীন্দ্র -প্রতিভার অমলিন আলোকে, তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টির বিপুল ধারায় পরবর্তী বাংলা সাহিত্যাঙ্গন নিত্য আলোকিত। কবিগুরু আমাদের মঙ্গল প্রদীপ, একান্ত আশ্রয় এবং জীবনাদর্শময় ধ্রুবতারা।

উল্লেখপঞ্জী

- Indian Buddhis Iconography :-B.Bhattacharjja, Firma K.L.Mukharjee, 1958
- The Sanskrit Budhist Literature of Nepal :-Rajendra Lal Mitra, Cal, 1882
- The Light of Asia :-Adwin Arnold,Trench Trubpner & Co.Ltd., London, 1921
- Avadana Kalpalata :-Vol-I - II, Ed. P.L.Vaidya, Mithila Institute, 1958
- A history of Indian Literature, :- Vol -II, Winternitz, Cal. University, 1933
- Jataka, Ed. Fausboll, Vol-I - VI, Published by :-Trubner & Co, Ltd., London
- রবীন্দ্র রচনাবলী :- বিশ্বভারতী প্রকাশিত, ১৩৫৪
- রবীন্দ্র জীবনী :- প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ১৩৯৫
- পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ :- ড. সুকুমার সেন, কলকাতা, ১৩৬৯
- রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা :- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৯৫৮
- সদ্ধর্ম সহচর :- অধ্যাপক প্রজ্ঞাজ্যোতি ভিক্ষু, বিনয় বিশারদ, কলি, ১৩৮০
- রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ ধর্ম :- ড. সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, কলি, ১৩৭৪
- পঞ্চগতি দীপনং :- ড. আশা দাশ সম্পাদিত, কলি, ১৯৯৪
- মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস :- এ.মুখার্জী এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৬৪
- চর্যাগীতি কোষ :- সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, কলিকাতা
- রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সাহিত্যের স্বর্ণবিভা :- ড. আশিস্ কুমার বৈদ্য, আগরতলা, দৈনিক সংবাদ (সংবাদ-সাহিত্য) ১৩ই জুলাই, ২০০৩ ইং

----- o -----

ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য

ডঃ কমল কুমার সিংহ

ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যকে আজ আর কোন ভারতীয় সাহিত্য থেকে পৃথক করে দেখা চলে না। কারণ ইংরেজীতে আজ যারা লেখেন তারা শুধু ভারতীয়ত্ব বজায় রাখাকেই তাদের উদ্দেশ্য বলে মনে করে না। তারা আজ আর নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিদেশী পাঠকের মুখ চেয়েও বসে থাকেন না। তাঁদের সাহিত্য কৃতী আজ ভারতীয় সাহিত্যের একটা অংশ হিসেবেই বিবেচিত হয়। M.K.Naik বলেছেন, Indian English literature may be defined as literature written originally in English by authors Indian by birth, ancestry or nationality. ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্য এখন স্বপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত।

(A History of Indian English Literature, P-3)

একথা সত্য যে, ইংরেজীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বা পরোক্ষ প্রভাবে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য সমূহের বিকাশ এবং জন্মও বলা যেতে পারে।

১৭৮৩ কে ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যের জন্মকাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই বছরেই প্রসিদ্ধ প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ কবি স্যার উইলিয়াম জোনস ভারতে আসেন। তখনো ভারতে ইংরেজী সাহিত্য বলতে কিছু ছিল না। সাংবাদিকতাওনা। প্রথম বাংলা সংবাদ পত্র হিকির "বেঙ্গল গেজেট" সবে প্রকাশিত হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হয়ে এসে জোনস ভারতীয় বিষয়বস্তু যথা ইন্দ্র, সূর্য, লক্ষ্মী, নারায়ণ, সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি নিয়ে অনেকগুলো কবিতা লেখেন। অবশ্য কবির চাইতে প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ ও ভাষা তাত্ত্বিক হিসেবেই জোনস বেশি পরিচিত। ইংগ-ভারতীয় কবি জন লেডেন ভারতে আসেন ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর শক্তিমান কবি হিসেবে আসেন স্যার এডউইন আর্নল্ড, রুডিয়ার্ড, কিপলিং, পাদ্রী হেবার, হেনরী ডিরোজিও, হেনরী মেরিডিথ পার্কার, ডেভিড লেস্টার, রিচার্ডসন, স্যার আলফ্রেড লায়ালের নাম স্মরণীয়। 'লাইট অব এশিয়ার' কবি আর্ণল্ড এবং লায়ল ছিলেন প্রাচ্য -পাশ্চাত্যের মৈত্রীর উপাসক। কিপলিং ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্তাবক। ডেরোজিও শুধু তৎকালীন নব্য বাংলায় শুধু নন, শক্তিশালী কবিও বটে। এর কাহিনী কবিতা Fakir of Fungheera-য় আবেগের গভীরতা বা কল্পনার বিশালতা না থাকলেও ভাষা ও ছন্দের উপর কবির দখলের স্বাক্ষর সুপরিস্ফুট। এক হিসেবে ডিরোজিওকে ভারতের অন্যতম জাতীয়তাবাদী কবিও বলা চলে। একাধিক দেশপ্রেমমূলক কবিতার রচয়িতা ইনি। কারো কারো মতে কীটসের অকাল বিয়োগে ইংরেজী সাহিত্যের যে ক্ষতি হয়েছে, ডিরোজিওর অকাল বিয়োগে তার চাইতেও বেশি ক্ষতি হয়েছে, ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যের।

ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত বার বার ভারতের জনগণ বিদ্রোহ করেছে, বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে কৃষক অভ্যুত্থান। এ সময়কার ভারতীয় ইংরেজী

সাহিত্যে এ সমস্ত ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ ও সংঘর্ষের চিত্র আঁকা হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ নিয়েও বহু কবিতা ও উপন্যাস রচিত হয়েছে। এমনি অকবি কাব্যগ্রন্থ চার্লস আর্থার কেলির Delhi and other Poems সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। মেকেলের প্রস্তাব অনুসারে তদানীন্তন গর্ভনর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। যদিও এর ফলে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা ভারতীয় সমাজে থেকেই একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বয়ম্ভু এক সমাজ সংস্কৃতি গড়ে তোলেন। এটা এক আন্ধকার গিক হলেও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতির ফলে ভারতের ভাবজগতে প্রায় বৈপ্লবিক এক যুগান্তর ঘটে যায়। ভারতের নবজাগৃতির পটভুমি তৈরী করে এই ভাব বিপ্লবে। এবং যথারীতি তার কেন্দ্রভূমি হয় বাংলা। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অগ্রদুত যেমন বাংলা, ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যের স্রষ্টাও তেমনি বাঙালী।

বেন্টিঙের নতুন শিক্ষা নীতি যখন প্রবর্তিত হয়, ইংরেজী সাহিত্য তখন রোমান্টিক কাব্য পুনরুজ্জীবন অন্দোলনের যুগ। এ এক মণিকাঞ্চন যোগ। ভারতীয় লেখকরা শুধু যে পরোক্ষভারে তার দ্বারা অনুপ্রাণিতও হলেন তাই না, ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যতো বটেই, ভারতের নিজস্ব ভাষার সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করলেন তার দ্বারা। ডিরোজিওব ইংরেজী কবিতা লেখা শুরু করার তিন বছর পর কালীপ্রসাদ ঘোষের ' The Shair or Minstrel and other poems (১৮৩০) প্রকাশিত হয়। এরপর রাজনারায়ণ দত্তের ' Osmyn, An Arbian Tale (১৮৪১) কাব্য গ্রন্থটি এবং ১৮৪৯ এ আত্মপ্রকাশ করে The Captive Ladie।

এরপরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৭০ এ লন্ডন থেকে থেকে প্রকাশিত The Dutta Family Album। একই পরিবারভুক্ত বারীন চন্দ্র, হরচন্দ্র, উমেশচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র এই চারজনের কবিতার সংকলন এই গ্রন্থ। ঐতিহাসিক কাহিনী ও উপকথা, দেবদেবী ইত্যাদি নিয়ে সাতানব্বইটি কবিতার সংকলন এই কাব্য গ্রন্থ । হরকিশোর ঘোষ (রাম শর্ম্মা) আধ্যাত্ম ভাবধারার যে কবিতা লেখা শুরু করেন পরবর্তীকালে তার প্রভাব শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার মধ্যে দেখা যায়। অন্যান্য কাব্য লেখকদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, টি.রামকৃষ্ণ, নিজামত জং প্রমুখ আছেন। তবে ইংরেজীতে তিনি প্রথম সার্থক কাব্যরচনা করেন তার নাম তরু দত্ত। ভারতীয় ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের স্রষ্টা তরু দত্ত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন ঠাকুর পরিবার, ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যের তেমনি দত্ত পরিবার।

তরুর জন্ম ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। ছেলে বেলা থেকেই দু র্বল স্বাস্থ্য। পরে দত্ত পরিবার খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেও তরুর জন্ম হয়েছিল হিন্দু পরিবারে। হিন্দু পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। স্বভাবতই হিন্দু ধর্ম গ্রন্থাদির প্রতি শৈশব থেকেই অকৃত্রিম একটা অনুরাগ জন্মে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ধর্মান্তর গ্রহণ সত্ত্বেও সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। তার সমগ্র কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে তা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আজীবন তিনি মনে প্রাণে ভারতীয় ছিলেন।

আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় তরুর মন গড়ে উঠেছিল। এবং সে শিক্ষা ঘটেছিল খোদ ইংলন্ড ও ফ্রান্সে। তবু ভারতীয় ধ্যানধারণাকে তিনি মিথ্যা কুসংস্কার বলে ঘোষণা করেননি। দেশের ঐতিহ্যের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধের কাছে বার বার পরাজিত হয়েছে তার যুক্তিবাদী মন।

মাত্র তেরো বছর বয়সে তরু পিতা মাতার সঙ্গে ইংলন্ড যান। ১৮৭২ এ কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৭৭ এ তার জীবনাবসান ঘটে। মাত্র একুশ বছরের জীবনে তরু দত্ত যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়।

তরুর ফরাসি উপন্যাস 'ল জার্নাল দ মাদ্‌মোয়াজেল দ' আরভ্যার (Le Journal de Mademoisolle d'Arvere) ও ইংরেজিতে রচিত মৌলিক কাব্য সংকলন 'এন্‌সিয়েন্ট ব্যালাডস এ্যান্ড লিজেনডস অব হিন্দুস্থান' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৭৯ ও ১৮৮২ তে। শেষোক্ত গ্রন্থের 'সাবিত্রী, লক্ষ্মণ, ধ্রুব, যোগাদ্যার উমা আদি কাহিনী কাব্য এবং সনেট ও গীতি কবিতাবলী দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে অভিনব, আলঙ্ককারিক বিচারে, আশ্চর্যরকম শিল্পোত্তীর্ন। ভারতের ভাব সৌন্দর্য ইংরেজি কবিতায় তরু দত্তই প্রথম মূর্ত করে তোলেন। সংস্কৃত থেকে কয়েকটি গল্প ও তরু দত্ত অনুবাদ করেন। ' Bianca or the young Spanish Maiden নামে একটি ইংরেজি রোমান্স্‌ও লিখতে শুরু করেন। কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি।

শশীচন্দ্রের কবিতায় ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের প্রভাব খুব বেশি। রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙালী পাঠকদের কাছে পরিচিত নাম। ইংরেজী সাহিত্যে তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ। তাঁর এই অনুবাদ আজও শ্রেষ্ঠ বলে পরিগনিত। রমেশচন্দ্রের অনুবাদ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মূলানুগ। কাব্য মাধুর্যও অব্যাহত রয়েছে। এমনকি মূল গ্রন্থের উপমাদি পর্যন্ত অনেকক্ষেত্রে যথাযথ।

ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণ করেন তরু দত্ত। পরবর্তী যুগে মনমোহন ও অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ এবং সরোজিনী নাইডু, কে. এস ভেংকটরমনী ও হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাধনায় সে সাহিত্য আজ রীতিমত সমৃদ্ধ। রবীন্দ্র প্রতিভা এক্ষেত্রেও অনেক অনুকারকের সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে কলকাতার আলিপুর জেলে থাকাকালীন সময়ে অরবিন্দ ঘোষের এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়। তারপরই তিনি পান্ডিচেরী চলে যান এবং একজন ফ্রান্সের ভদ্রমহিলা ম্যাডাম মিরা রিচার্ড (পরে যিনি 'মাদার'নামে খ্যাত হয়েছিলেন) এর সঙ্গে যোগ সাধনা শুরু করেন। অরবিন্দ ছিলেন মীরার গুরু। একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনা ও সাহিত্য সৃষ্টি করে যান শ্রীঅরবিন্দ। ১৯৫০ এর ৫ই ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিখ্যাত 'সাবিত্রী'। মহাভারতে কথিত সাবিত্রী ও সত্যবানের আখ্যানটিকে ঠিক রেখে শ্রী অরবিন্দ তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকে অপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে বিধৃত করেছেন। বারোটি অধ্যায়ে তিনটি খন্ডে ও পাঁচ হাজার পংক্তির মহাকাব্য এটি । সব মিলিয়ে সাবিত্রী একটি অপূর্ব কাব্য, নতুন ধরণের মহাচিন্তামূলক মহাকাব্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোন একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন," With all its (Savitri) limitations and they are many-it remains a landmark in Indian English poetry. The first major poetic voice in

the annals of Indian English verse. Sri Aurobindo is a poet of varied achievement in lyric, narrative and epic modes." (P-58, A.H.E.L.-Nayar)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব আকস্মিকভাবে ১৯১২ তে ইংরেজী সাহিত্যে আসেন। ১৯১২তে 'গীতাঞ্জলী' ইংরেজীতে প্রকাশিত হবার পর 'দি গার্ডেনার'(১৯১৩) 'দি ক্রিসেন্ট মুন' (১৯১৩), এবং নোবেল পুরস্কার পাবার পর আরো অনেক পুস্তক হয় কবির নিজস্ব লেখা অথবা অনুবাদ একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে। 'দি চাইল্ড' ইংরেজীতে রচিত রবীন্দ্রনাথের বড় কবিতাগুলির মধ্যে একটি।

এরপরই সরোজিনী নাইডুর (চট্টোপাধ্যায়) (১৮৭৯-১৯৪৯) নাম করতে হয়। হায়দ্রাবাদে থাকাকালীন সময়েই তার ইংরেজী লেখা শুরু হয়। তা আরো বৃদ্ধি পায় ষোল বছর বয়সে ইংল্যান্ড যাবার পর। ১৮৯৮তে দেশে ফিরে তিনি পারিবারিক বিরোধীতা সত্ত্বেও ডঃ গোবিন্দ রাজালু নাইডুকে বিয়ে করেন। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দি গোল্ডেন থ্রেশহোল্ড (১৯০৫) তারপর 'দি বার্থ অব টাইম' (১৯১২),দি ব্রোকেন উইং (১৯১৭)। কাব্য সংগ্রহ 'দি স্কেপট্রেড ফ্লুট'(১৯৪৬), ১৯২৭ এ 'ফিদার অব দি ডন'।

সরোজিনী নাইডুর ছোট ভাই হরিশ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ও একজন কবি ছিলেন। অনেকগুলো কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তিনি। ভারতীয় ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের নামও উল্লেখযোগ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গান্ধীজীর উত্থান পর্ব সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের মত ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় ইংরেজী কাব্য সাহিত্যে, গান্ধীজীর প্রভাব খুব একটা দাগ কাটতে পারেনি। যদিও গান্ধীজী সম্পর্কে কবিতা লেখা হয়েছে অনেক। ইংরেজী কবিতার ধারা প্রধানত দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। একটি ধর্ম, অধ্যাত্ম, দর্শন ইত্যাদি যার মধ্যে শ্রী অরবিন্দের উত্তর সূরীরাও ছিলেন। অন্যেরা রোমান্টিক ভিক্টোরিয়ান ঐতিহ্যানুসারে আধুনিকতার সঙ্গে পরীক্ষা।

শ্রীঅরবিন্দ ঐতিহ্যানুসারী কবি সমাজের মধ্যে কে.ডি. সেয়না (দি সিক্রেট স্প্রেলন্ডর ১৯৪৯), (Secret splendour) পুজ্জা হালাল (লোটাশ পেটালস ১৯৪৩), নলিনীকান্ত গুপ্তা (টু দি হাইটস ১৯৪৪), নীরোদবরণ (সান-ব্লসমস ১৯৪৭) নিশিকান্ত (ড্রিম ক্যাডেন্স ১৯৪৭) প্রধান। ধর্ম-দার্শনিকতামূলক কাব্য রচনার ক্ষেত্রে জে.কৃষ্ণমূর্তির নাম উল্লেখযোগ্য। তার 'দি মার্চ' (১৯২৭) এবং 'দি ইমোরটা ফ্রেন্ড' (১৯২৮) কাব্য গ্রন্থ দুটির মধ্যে বক্তব্য বিষয়ই প্রধান্য পেয়েছে। একই কথা বলা যায় স্বামী পরমানন্দের 'দ ভিজিল ' (১৯২৩), স্বামী রামতীর্থের 'পয়েমস অব রামা' (১৯২৪) এবং টি. এল.বসওয়ানির 'কোয়েস্ট' সম্পর্কে। রাজেন্দ্রনাথ শীলের 'দি কোয়েস্ট এটারনাল' (১৯৩৬) এ দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে কাব্যরূপ দেওয়া হয়েছে। তেমনি আরেকটি কাব্যগ্রন্থ কে. এস. ভেংকটরমনীর 'অন দি স্যান্ড -ডিউস' (১৯২৩) অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত উচ্চ

দার্শনিক চিন্তার কাব্য রূপ।

ইংরেজী রোমান্টিসিজমের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন জি.কে. চেত্তুর (১৮৯৮-১৯৩৬), তার পাঁচটি কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে, প্রধানত 'সাউন্ডস এন্ড ইমেজস'(১৯২১), দি টেম্পল ট্যাংক এন্ড আদার পয়েমস'(১৯৩২) এবং 'দি শ্যাডো অব গড' (১৯৩৪)। সনেট রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তার ভ্রাতা এস.কে.বেত্তুর (১৯০৫-১৯৭৩) তার অদ্বিতীয় কাব্য সংগ্রহ 'গোল্ডেন স্কেয়ার এ নড্ আদার পয়েমস'(১৯৬৭) জন্য খ্যাত। আরমান্ডো মেনজেস (১৯০২) তাঁর বিদ্রোপাত্মক মহাকাব্য 'দি ফান্ড' (১৯২৩) রচনা করেন। তাছাড়াও 'দি এমিগ্রান্ট (১৯৩৩), কর্ডস এন্ড ডিসকর্ডস (১৯৩৬), 'কেয়স এন্ড জেসিং স্টার' (১৯৪৬) এবং 'দি এনসেস্ট্রাল ফেস' (১৯৫১) কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ এ। ভি.এন.ভুষণ (১৯০৯-৫১) কাব্য জগতের লোক হলেও কতগুলো সংকলনের জন্য বিখ্যাত। মনজেরী এস.ঈশ্বরণ (১৯১০-৬৮) 'সাফরন এনজ গোল্ড এনভ আদার পয়েমস' (১৯৩২), 'দি নীম ইজ এ লেডি' (১৯৫৭) লিখলেও তার ছোট গল্পের জন্য বেশি বিখ্যাত। পি.আর.কৈর্কিনি (১৯১২) কাব্য সংকলন 'ফ্লাওয়ার অফারিংস, প্রোজ পয়েমস অব ট্রুথ, বিউটি এন্ড ন্যাচার (১৯২৮) এবং 'পয়েমস অব দি প্যাসনেট ইষ্ট' (১৯৪৭) সৌন্দর্যের উৎস সন্ধানে উৎসর্গিত।

হুমায়ুন কবিরের 'পয়েমস'(১৯৩২) এবং 'মহাত্মা এন্ড আদার পয়েমস'(১৯৪৪) কাব্য গ্রন্থের জন্য তার সময়ে বিখ্যাত।

এ সময়ের অন্যান্য কবিদের মধ্যে কে.এস.আর. শাস্ত্রী (দি এপিক অব ইন্ডিয়ান ওমেনহুড (১৯২১ দি লাইট অব লাইফ ১৯৩৯), এন.এম.চ্যাটার্জি (পার্বতী ১৯২২, ইন্ডিয়া এন্ড আদার সনেটস ১৯২৩), এ ক্রিস্টিনা এ্যালবারস (এনসিয়েন্ট টেলস অব হিন্দুস্তান ১৯২২, 'হিমালয়ান হুইসপারস ১৯২৬), ডি. মহাদেও রাও (মাধবীলতা ১৯২৩), এস.এল.কোরডিয়া (সীদিরে এন্ড আদার পয়েমস, ১৯২৮), চিতোর এন্ড আদার পয়েমস ১৯২৮), এম ইউ.মালকানি এবং টি.এইচ.আদবানী (দি লংগিং লুট ১৯২৫), এম.কৃষ্ণমূর্তি (সংস অব রোজলীভস) ১৯২৭, লভ সনেটস এন্ড আদার পয়েমস ১৯৩৭) উমা এস মহেশ্বর (এমংস দি সাইলেন্স ১৯২৮, সাউদার্ন ইডিলস ১৯৩৯) জে.আর পি.মোদী (গোল্ডন হার্ভেস্ট ১৯৩২,ভার্সেস, গ্রেভ এনড গে ১৯৩৮), নিলীমা দেবী (দি হিডেন ফেস ১৯৩৬), সুভো ঠাকুর (পীকক প্লুমস্ ১৯৩৬, মে ডে এনভআদার পয়েমস ১৯৪৫), বালধুন ধীংড়া(সিমফনি অব লভ ১৯৩৮), কামস এভার দি ডন ১৯৪১), এস.আর.ডোংগার কেরি (দি আইভরি টাওয়ার, ১৯৪৬, প্রেদুন কব্রাজি (এ মাইনর জার্জিয়ানস সোয়ান সং ১৯৪৪), এইচ.ডি.সেথানা (স্ট্রাগলিং হাইটস ১৯৪৪), সেরাপিয়া দেব (এ বুক অব বেনো ফিসেন্ট গ্রীফ এন্ড আদার পয়েমস ১৯৪৫, র‍্যাপিড ভিশনস ১৯৪৭) প্রধান।

স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী সময়েই শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'(১৯৫০-৫১) পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় 'লাস্ট পয়েমস (১৯৫২), মোর পয়েমস (১৯৫৩)

এবং মহাকাব্য 'ইলিয়ন' (১৯৫৭) প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্য ধারাকে উত্তরকালে ছড়িয়ে দেবার জন্য তার উত্তরসূরীরা সবসময়ই সক্রিয় ছিলেন। এদের মধ্যে দিলীপকুমার রায় (আইস অব লাইট ১৯৪৮), থেমিস (পয়েমস ১৯৫২), রোমেন (দি গোল্ডেন অ্যাপকালিপস ১৯৫৩), সৃথ্বি সিংনাহার (দি উইন্ডস অব সাইলেন্স ১৯৫৪), সৃথ্বিন্দ্র এন. মুখার্জি (এ রোজ বাভ সং ১৯৫৯) এবং ডি. মধুসূদন রেড্ডী (সাফাদৃয়াবস অব সলিটুড ১৯৬০) প্রধান। তাছাড়া কে.আর.শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারেব 'ট্রাইষ্ট উইদ দি ডিভাইন'(১৯৭৪), ভি.কে গোককের'সংস অব লাইফ এন্ড আদার পায়েমস' (১৯৪৭), 'ইন লাইফস টেম্পল' (১৯৬৫) এবং 'কাশ্মীর এন্ড ব্লাইন্ডম্যান' (১৯৭৭) গ্রন্থে শ্রী অরবিন্দের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট।

এ সময় ভাবতীয় ইংরেজী কাব্যে তো বটেই, সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে টি.এস.এলিয়টের এবং বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ এবং আমেরিকান নতুন কাব্য ধারার প্রভার উৎকট রূপে বিদ্যমান ছিল।

পঞ্চাশের দশকেই পি.লালের নেতৃত্বে নতুন ভারতীয় ইংবেজী কাব্যধারার প্রবর্ত্তনা হয়। ১৯৫৮ তে পি.লাল কলকাতায় 'রাইটার্স ওয়ার্কশপ' প্রতিষ্ঠা করেন । এই কাব্যধারার প্রথম সংকলন গ্রন্থটি 'মডার্ণ ইন্ডো-এ্যাংলিয়ান পয়েট্রি' (১৯৫৮) পি.লাল এবং কে.রাঘবেন্দ্র রাও - এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

এই নতুন কবিদের মধ্যে নিসিক এজেকিয়েল (১৯২৪) প্রথম তার কাব্যগ্রন্থ 'এ টাইম টু চেম্বার' (১৯৫২) প্রকাশ করেন। তারপর 'সিক্সটি পয়েমস (১৯৫৩), দি থার্ড (১৯৫৯), দি আনফিনিশড ম্যান (১৯৬০), দি এ্যাকজ্যাক্ট্ নেম (১৯৬৫), এবং 'হাইমেন ইন ডার্কনেস' (১৯৭৬) প্রকাশিত হয় পর পর। ইজরায়েলি পরিবারভূক্ত এজেকিয়েল বহু পুরুষ আগে ভারতে এসে বিচিত্র জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রূপে তার জীবনের স্থায়িত্ব খুঁজে পান।

এই ধারার দ্বিতীয় কবি ডোম মরেস (১৯৩৮) তার কাব্যের জন্য প্রথম ইংলন্ডের স্বীকৃতি পান। তিনি নিজে ভারতীয় একথা তিনি স্বীকার করতেন না, কারণ বাল্যকাল থেকে ইংলন্ডই তার সবকিছু ছিল। কিন্তু স্বভাবগত দিক দিয়েই তিনি ভারতীয় কবি ছিলেন। তার কাব্য গ্রন্থের মধ্যে প্রধান 'এ বিগেনিং' (১৯৫৭), 'পয়েমস' (১৯৬০), 'জন নোবডি' (১৯৬৮) প্রধান । তাঁর 'কালেকটেড পয়েমস' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ এ ।

ষাটের দশকের এই ধারার আরো অনেক কবির আত্ম প্রকাশ ঘটে। যার মধ্যে পি.লাল পুরো নাম পুরোষোত্তম লাল পাঞ্জাবে জন্ম গ্রহণ করলেও কলকাতার অধিবাসী ছিলেন। তার কাব্য গ্রন্থের মধ্যে 'দি পেরোটস ডেথ এন্ড আদার পয়েমস' (১৯৬০), 'চেঞ্জই দে সেইড' (১৯৬৬), দ্রৌপদী, জয়দ্রথ এন্ড অদার পয়েমস' (১৯৬৭), 'যক্ষী ফ্রম দি দারগম্ভহ এন্ড আদার পয়েমস (১৯৬৯), 'দি ম্যান অব ধর্ম এন্ড দি বসঅ ব সাইলেন্স' (১৯৭৪), এবং 'ক্যালকাটা এ লং পয়েম (১৯৭৭) প্রধান । তিনি 'দি ভগবত গীতা (১৯৬৫), 'দি ধম্মপদ' (১৯৬৭) ইত্যাদিরও মর্মানুবাদ প্রকাশ করেছেন।

আদিল জসওয়ালার (১৯৪০) প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ল্যানডস ইনড' (১৯৬২)। তিনিও প্রথমে ইউরোপ প্রবাসী ছিলেন।

এ.কে রামানুজন (১৯২৯) চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রাবিড়িয়ান লিংগুইস্টিক পড়ান। তার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'দি স্ট্রাইডারস' (১৯৬৬) ও 'রিলেশনস' (১৯৭১) বিখ্যাত। তিনি 'দি ইন্টেরিয়র ল্যানড স্ক্যাপ (১৯৬৭) এবং 'স্মিকিং অব শিবা' (১৯৭২) নামে তামিল ও কানাড়া কবিতার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেন।

আরেকজন তামিল লেখক আর পার্থসারথী (১৯৩৪-)। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাফ প্যাসাজ' (১৯৭৭) প্রকাশিত হয়। একজন পার্সী সম্প্রদায়ভুক্ত জিয়েভ প্যাটেল (১৯৪০-) এর 'পয়েমস' (১৯৬৬) এবং 'হাউ ডু ইউ উইদ ষ্ট্যান্ড, বডি' (১৯৭৬)এ প্রকাশিত হয়।

অরবিন্দ কৃষ্ণ মেহরোত্রা(১৯৪৭-) এর কবিতা গ্রন্থ 'ভারতমাতা, এ প্রেয়ার(১৯৬৬), উডকাটস অন পেপার (১৯৬৭) 'পমস/পয়েমাস/ (১৯৭১) প্রকাশিত হয়। এ সময়কার আরেকজন উল্লেখযোগ্য লেখক প্রীতিশ নন্দীর (১৯৪৭-) অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে 'অব গডস এনড অলিভস' (১৯৬৭), ' দি পয়েট্রি অব প্রীতিশ নন্দী' (১৯৭৩), 'টু নাইট দিস স্যারভাজ রাইট' (১৯৭৭) প্রধান।

কেকি এন দারুওয়ালা (১৯৩৭-) একজন পুলিশ অফিসার হয়েও আধুনিক ভারতীয় ইংরেজী কবিদের মধে অগ্রগণ্য। তার এই মানসিকতার ছাপ তার কাব্য গ্রন্থ 'আন্ডার অরিয়ন' (১৯৭০), 'এপারিকান ইন এপ্রিল' (১৯৭১), এবং 'ক্রসিং অব রিভার্স' (১৯৭৬) এ প্রকাশিত হয়।

শিব. কে কুমার (১৯২১) বিদ্রুপাত্মক ছলে আরটিকুলেট সাইলেন্স (১৯৭০), কবওয়েবস ইন দি সান (১৯৭৪), সাবটারফুজেস (১৯৭৬) এবং উজপকারস (১৯৭৯) প্রভৃতি কাব্য লিখেছেন।

জয়ন্ত মহাপাত্র (১৯২৮-) তার কাব্য জীবন শুরু করেন "ক্লোজ দি স্কাই টেন" বাই টেন (১৯৭১) দিয়ে। "রিলেশনশিপ" (১৯৮০) সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পায়। মহাপাত্রের কাব্যে জন্মভূমি উড়িষ্যার পটভূমি বারবার ফিরে এসেছে।

অরুণ কোলাতকার (১৯৩২-) দ্বি-ভাষিক কবি। তিনি একই সঙ্গে ইংরেজী ও মারাঠি ভাষায় রচনা করেছেন । তার প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী কবিতা 'জেজুরী' (১৯৭৬) এ প্রকাশিত হয়ে কমনওয়েলথ কাব্য পুরস্কার পায়।

এই সময়কার মহিলা কবিদের মধ্যে প্রথমেই কমলা দাসের (১৯৩৪) নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনিও দ্বি-ভাষিক কবি, মাতৃভাষা মালয়ালম ও ইংরেজী। ইংরেজীতে তার তিনটি কাব্যগ্রন্থ আছে - সামার ইন ক্যালকাটা (১৯৬৫) দি ডিসেন্ডেটস (১৯৬৭ এবং দি ওল্ড প্লে হাউস এন্ড আদার পয়েমস (১৯৭৩)।

অন্যান্যদের মধ্যে মনিকা ভার্মা (১৯১৬-), গৌরী দেশপান্ডে (১৯৪২-) মমতা কালিয়া (১৯৪২-), সুনীতি নামযোশী (১৯৪১-) ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে ।

কথাসাহিত্য / উপন্যাস

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত কথাসাহিত্য, মূলতঃ উপন্যাসের বিকাশের মূলগত কারণ গান্ধীজীর আন্দোলন ও অন্যান্য রাজনৈতিক আদর্শবাদ ও ঘটনা প্রবাহ, সামাজিক ও আদর্শগত প্রভাব। শুধুমাত্র ভারতীয় ইংরেজী উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয় সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তবে ইংরেজী সাহিত্যেই সমধিক। তার কারণ বোধ হয় ভারতীয় ইংরেজী উপন্যাস সাহিত্য সমস্ত ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যিককে আত্মস্থ করেছে বলে। ক্রমানুসারে, বিচার করলে কে. এস ভেংকটরমনী (১৮৯১-১৯৫১) এ সময়কার প্রথম উপন্যাসিক। তার সবকটি উপন্যাস বিচার করলে এ সত্যটি প্রকট হয়ে ওঠে।

তার প্রথম উপন্যাস 'মুরুগান দি টিলার (১৯২৭)। দুই দক্ষিণ ভারতীয় যুবক - কেদারী, একজন বস্তুবাদী যে তার নিজের প্রতারণায় শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্থ এবং রামু, একজন মানবতাবাদী, যার কল্যাণ ভাবনা জন সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শেষ পর্যন্ত, রামু গান্ধীজীর আদর্শে গ্রামীন কলোনী স্থাপন করে এবং সেখানেই বন্ধুদের সঙ্গে পরবর্তী জীবনযাপন করে। উপন্যাসটি উপন্যাসের চাইতে একটি নির্দিষ্ট আদর্শের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। শিল্পগত কোন উৎকর্ষ নেই।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'কন্দন দি প্যাট্রিয়ট ঃ এ নভেল অব নিউ ইন্ডিয়া ইন দি মেকিং (১৯৩২) এ ভেংকটরমনী গান্ধী আদর্শের অনেক নিকটবর্তী। প্রেক্ষাপট উনিশ শো ত্রিশের আইন অমান্য আন্দোলন। অক্সফোর্ডে শিক্ষিত একটি যুবকের সিভিল সার্ভিসের চাকুরী ছেড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার কাহিনী। এখানেও উপন্যাসের চাইতে আদর্শ প্রচারটা বড়। পুলিশের গুলীতে আহত নায়ক মৃত্যু শয্যায় এক দীর্ঘ স্বদেশ চেতনামূলক বক্তৃতা অনাবশ্যক ছিল।

নাট্যকার এ.এস.পি আয়ার, একজন আই.সি এস খুব কুশলতার সঙ্গে তার উপন্যাসে গান্ধী ভাবাদর্শের স্থান করে দিয়েছেন। বালাদিত্য (১৯৩০) উপন্যাসে হূণ আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে বালাদিত্যের বীর্যবত্তা বর্ণনা করেছেন। "থ্রিমেন অব ডেস্টিনি" উপন্যাসটিতে সমসাময়িক ঘটনাবলীকে তিনি ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কৃষ্ণস্বামী নাগরাজন (১৮৯৩-) দুটি উপন্যাস লিখেছেন - "অথবার হাউস" (১৯৩৭) এবং ক্রনিকলস অব কেদারাম (১৯৬১) দ্বিতীয় উপন্যাসটি উনিশো ত্রিশের করমন্ডল তীরবর্তী জনজীবনের একটি বর্ণনা। গান্ধী আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা এখানে সর্বত্র।

ভারতীয় ইংরেজী উপন্যাস সাহিত্যের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ত্রয়ী-র আবির্ভাব। মুলকরাজ আনন্দ, আর, কে নারায়ণ এবং রাজা রাও -যাদের প্রথম উপন্যাস যথাক্রমে ১৯৩৫, ১৯৩৫,১৯৩৮ এ প্রকাশিত হয়। ইংরেজী উপন্যাসের সমৃদ্ধিকে এরা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান।

মুলকরাজ আনন্দের প্রথম উপন্যাস এ্যাপলজি ফর হিরোইজম (১৯৪৬) আত্মজীবনীমূলক। আনন্দ নিজেই বলেছেন ই উরোপের আলপস এবং ভারতের হিমালয় উভয়েই তাঁকে আকর্ষণ করে। উপন্যাস হিসেবে প্রথম 'আনটাচেবল' (১৯৩৫)। বাকা নায়ক এর হরিজন

বালকের জীবন কাহিনী। উপন্যাসে গান্ধীজিও আছেন এবং আছেন বাকার প্রেরণার উৎস হিসেবে। কুলি শ্রমিকের জীবন কাহিনী নিয়ে তার দুটো উপন্যাস - কুলী (১৯৩৬) এবং টু লীভস এনড এ বাড(১৯৩৭)। অনুন্নত শোষিত শ্রেণীর জীবন সংগ্রাম মহাকাব্য। কানাড়া এলাকার থেকে আসা মুনু নামে এক বালকের সংগ্রাম কাহিনী কুলী। গাঙসু আসামের চা বাগানের শ্রমিকের জীবন কাহিনী।

একজন পাঞ্জাবী কৃষকের - একটি ট্রিলজি "দি ভিলেজ" (১৯৩৯), এ্যাক্রস দি ব্ল্যাক ওয়াটারস (১৯৮১), এবং দি শোর্ড দি ফিকল (১৯৪২)ঃ প্রথমটি লাল সিং নামক একজন পাঞ্জাবী যুবকেব কাহিনী যে আত্মরক্ষার জন্য দেশত্যাগ করে। দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে যে ইউরোপে গিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। তৃতীয় উপন্যাসটিতে লাল সিং দেশে ফিরে এসে জার্মান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে এবং কমুনিষ্ঠ বলে পরিচিত হয়ে পুনরায় কারাগারে প্রেরিত হয়। উপন্যাস তিনটি কমুনিজমকে [illegible] এবং গান্ধীবাদকে খুব গুরুত্ব দিয়ে রূপ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে "এ্যাক্রস দি ব্ল্যাক [illegible]" ভারতীয় সাহিত্যে বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে একমাত্র বড় ধরণের উপন্যাস এবং "অল কোয়েস্ট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট" ও "দি রেড ব্যাজ অব কারেজে"র সঙ্গে তুলনীয়।

'দি বিগ হার্ট' (১৯৪৫) স্বাধীনতার পূর্বে আনন্দের শেষতম উপন্যাস। আনটাচেবল এর মতো একদিনের কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাসটি। অনন্ত নামক একজন তাম্র শিল্পীর কাহিনী। আনন্দ নিজেও ছিলেন এই সম্প্রদায়ের লোক। নিজের সমাজ নিয়ে লেখা এটাই তার একমাত্র উপন্যাস। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত প্রথম তার বাল্যজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস 'সেভেন সামারস' (১৯৫১) উপন্যাস। দুবছর পর প্রকাশিত হয় "দি প্রাইভেট লাইফ অব এন ইন্ডিয়ান প্রিন্স"(১৯৫৩)।

'দি ওল্ড ওইমেন এন্ড দি কাউ' (১৯৬০) গ্রামীণ পরিবেশে গৌরী নামে একটি গাবীর কাহিনী। পরবর্তী দুটি উপন্যাস দি রোড' (১৯৬৩) এবং ' দি ডেথ অব হিরো' (১৯৬৪)। প্রথমটি আনটাচেবলের বক্তব্য এবং দ্বিতীয়টি কাশ্মীরের স্বাধীনতা নিয়ে। 'মর্নিং ফেস' (১৯৭০) এবং 'কনফেশন অব এ লাভার' (১৯৭৬) আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস।

রশি পুরম কৃষ্ণস্বামী নারায়ণ (১৯০৬-) জীবনের বেশিরভাগ সময় মহীশূরের শান্ত পরিবেশে কাটিয়েছেন। ছিলেন স্কুল মাস্টারের ছেলে ও স্কুল মাষ্টার। পরে সংবাদপত্রে কাজ করেন। ছোট শহর মালগুড়ির মধ্যবিত্ত জীবন তাকে আকর্ষণ করে সব চাইতে বেশি । মূলত মালগুড়ির স্মৃতিচারণাই তাকে বিখ্যাত করেছে সবচাইতে বিশি। তার প্রথম উপন্যাস 'স্বামী এনড ফ্রেন্ডস' (১৯৩৫) স্বামীনাথন নামে একটি স্কুল বালকের কাহিনী - নারায়ণের নিজস্ব ভঙ্গীতে বর্ণিত। দ্বিতীয় উপন্যাস ' দি ব্যাচেলর অব আর্টস' (১৯৩৭) চন্দ্রন নামক একটি যুবকের কাহিনী, প্রথমটির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। দি ডার্করুম' (১৯৩৮) উপন্যাসটি নারায়ণের স্বাভাব বিরোধী। অনেকটাই "দি ডলস হাউস" "দি ইংলিশ টীচার" ইত্যাদি উপন্যাসের ভারতীয়

সংস্করণ।

স্বাধীনতার পর নারায়ণ লেখেন এ''দি ফাইনান্সিয়াল বক্সপার্ট ''(১৯৫২) 'দি গাইড' (১৯৫৮) এবং ''দি ম্যান ইটার অব মালগুড়ি''। প্রথম উপন্যাসটি বড় লোক হওয়ার জন্য লক্ষ্মীর আরাধনা এবং শেষটি পর্ণোগ্রাফির বই বিক্রি করে মারগ্যা নামে একজন লোকের বড় লোক হবার কাহিনী।

''দি গাইড' বইটি সাহিত্য একডেমী পুরস্কার পায়। রাজু নামক একটি টুরিস্ট গাইডের বিভিন্ন জীবন সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পরমাত্মার উপলব্ধি উপন্যাসটির বিষয়বস্তু।

''দি ম্যান ইটার অব মালগুড়ি'' (১৯৬২) উপন্যাসে আধুনিক যুগোপযোগী করে পৌরানিক ভস্মাসুরের কাহিনীটিকে লেখক নুতন করে বলেছেন।

গান্ধী ভাবাদর্শ নিয়ে তার প্রথম উপন্যাস ''ওয়েটিং ফর দি মহাত্মা'' (১৯৫৫) এর জন্য নারায়ণ সর্বাধিক আলোচিত। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শ্রীরাম ও ভারতীর প্রেমকথা। উপন্যাসে গান্ধীজীও চরিত্র হিসেবে আছেন। গান্ধীজীর উপস্থিতিকে যেদিন তাদের বিয়ে হবার কথা, তার আগের দিন আততায়ীর গুলীতে গান্ধীজীর মৃত্যু বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

''দি ভেন্ডর অব সুইটস'' (১৯৬৭) গান্ধী আদর্শকে অক্ষুন্ন রেখেছে। মিষ্টি বিক্রেতা জগন একজন প্রকৃত গান্ধীবাদী। তার ছেলে মালী বিদেশে আমেরিকায় গিয়ে একটি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু তাকে বিয়ে করেনি। দেশে ফিরে এসে সে একটি উপন্যাস লেখার যন্ত্র তৈরীর পরিকল্পনা করে। লেখক উপন্যাসটিতে একটি নৈরাজ্য প্রকাশের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা কার ব্যর্থতার তা স্পষ্ট নয়। এর দশ বছর পর প্রকাশিত হয় ''দি পেইন্টার অব সাইনস (১৯৭৬) রকম ও ডেইজের জীবন বর্ণনা।

রাজা রাও (১৯০৮-) দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। কিন্তু তার জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে ফ্রান্স ও আমেরিকায়। রাজা রাও মাত্র চারটি উপন্যাস লিখেছেন। তার মধ্যে অন্যতম 'কান্থাপুরা' (১৯৩৮) সম্ভবত ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যে গান্ধী আদর্শের সব চাইতে উজ্জ্বলতম রূপ। কান্থাপুরা নামক কোন একটি গ্রামে হরিকথার রূপকে মূর্তি নামক একটি যুবকের গান্ধী-পন্থা অনুসরণে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনেব কাহিনী। পুরো উপন্যাসটি লোক কথার আবয়বে দিদিমার মুখে বিবৃত।

'দি সারপেন্ট এন্ড দি রোপ' (১৯৬০) উপন্যাসটি ভারতীয় মানসিকতা, ভাবাবেগ, বিশিষ্টতা ও শক্তির যে আশ্চর্য রুপায়ণ তা খুব কম ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যের উপন্যাসে দেখা পায়। রামস্বামী নামক এক হিন্দু যুবক ফ্রান্সে ইতিহাসের গবেষণা করতে গিয়ে ভালবাসায় পড়ে বুঝতে পারে প্রেম, বিবাহ ও সংসার সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণার মধ্যে কত পার্থক্য। জীবন সম্পর্কে প্রবৃত্তি আছে। আত্মানন্দ গুরু বলেন সমুদ্রের ঢেউ হলো জীব, সমুদ্র হলো শিব। মুলতঃ লেখকের নিজস্ব জীবনের আধারে বিবৃত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার খোঁজই উপন্যাসের বিষয়বস্তু যা পরবতী উপন্যাস ''দি ক্যাট এন্ড শেকসপিয়র'' (১৯৬৫)

উপন্যাসেও দেখা যায়। একটি বিড়ালকে কেন্দ্র করে রেশন অফিসের দুইজন কেরানীবাবু রামকৃষ্ণ পাই ও গোবিন্দ নায়ায়ের কাহিনী। রামকৃষ্ণ গল্পের কথক। সবটাই কৌতুকের ভঙ্গীতে লেখা। উপন্যাসটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের দপ্তর" এর সাদৃশ্য দেখা যায়।

কমরেড কিরিলভ (১৯৭৬) রাজা রাওয়ের সাম্প্রতিক উপন্যাস। ফ্রান্সে প্রথম প্রকাশিত ১৯৬৫ তে। কিরিলভ নামক একজন কম্যুনিষ্টের জীবনকথা। যার কাছে "অজানা আমার নাম, যুক্তি আমার ধর্ম, কমুনিজম আমার মাতৃভূমি।"

এ সময়কার মুসলিম উপন্যাসিকদের মধ্যে আহমেদ আলির 'টুআইলাইট ইন দিল্লী' (১৯৪০) ওমেন এনড নাইট (১৯৬৪), ইকবালুন্নিসিয়া হুসেনের 'পুরোধা এনড পলিগামিঃ, লাইফ ইন এন ইন্ডিয়ান মুসলিম হাউস হোল্ড (১৯৪৪) এবং হুমায়ুন কবীরের ' ম্যান এন্ড রিভারস' (১৯৪৫)। আমীর আলী এবং কে. এ. আববাস হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় থেকে তাদের উপন্যাসের চরিত্র সংগ্রহ করেছেন। আমীর আলীর 'কনফ্লিক্ট'(১৯৪৭) 'ভায়া জেনেভা' (১৯৬৭), এ্যাসাইনমেন্ট ইন কাশ্মীর (১৯৭৩) এবং আবাসের 'টুমরো ইজ আওয়ারসঃ- এ ভেল অব ইন্ডিয়া অব টু ডে' (১৯৪৩), 'ইনক্লাব এনভেল অব দি ইন্ডিয়ান রেভুলেশন' (১৯৫৫। শেষেরটি বিরাটাকার উপন্যাস - আনোয়ার নামক একটি যুবকের জীবন উপলব্ধির কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের গোরা'র সঙ্গে এর মিল দেখা যায়।

ধনগোপাল মুখার্জী (১৮৯০-১৯৩৬) জঙ্গল জীবন নিয়ে লেখা তার কাহিনী সমুহ একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল।

ইংরেজী উপন্যাস সাহিত্যে মুলকরাজ আনন্দ সমাজ বাস্তবতার যে ধারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভবানী ভট্টাচার্য, মনোহর মালগোংকার এবং খুশবন্ত সিংয়ের মত উপন্যাসিকরা এবং রাজা রাওয়ের পরীক্ষামুলক ধারাকে সুধীন ঘোষ, জি.ভি.দেশানী এবং এম. অনন্ত নারায়ণ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অব্যাহত রেখেছিলেন।

এ সময় মহিলা উপন্যাসিকদের সংখ্যাও খুব কম নয় : রুথ প্রয়ার মভালা, কমলা মার্কন্ডেয়, নয়নতারা সাযগল এবং অনিতা দেশাইর নাম উল্লেখযোগ্য।

আনন্দের সমাজ বাস্তবতার ধারাকে অব্যাহত রাখলেও ভবানী ভট্টাচার্য মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তার উপন্যাসগুলোর মধ্যে "সো মেনি হাংগারস" (১৯৪৭), মিউজিক ফর মোহিনী(৫২), হিন্দু রাইডস এ টাইগার (৫২), এ গডেশ নেমড গোল্ড (১৯৬০), শেডো ফ্রম লাদাক (১৯৬৬), এ ড্রীম ইন হাওয়াই (১৯৭৮)। এর মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত 'শেডো ফ্রম লাদাক'- স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গান্ধী আদর্শে স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকারের শিল্পনীতির পার্থক্য ও উপযোগিতা নিয়ে ভাস্কর নামক একটি যুবকের জীবন কাহিনী। সবকটি উপন্যাসেই গান্ধী আদর্শের প্রতিভুর উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

মনোহর মলগোংকরও (১৯১৩) এই ধারার একজন লেখক। তিনি বিশ্বাস করেন শিল্প চিত্তবিনোদনের মাধ্যম। মলগোংকর একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার। নিজের জীবনের ছায়া

অবলম্বনে লেখা তার প্রথম উপন্যাস'ড্রিস্টেন্ট ড্রাম'(১৯৬০)। কমব্যাট অব শ্যাডো' (১৯৬২) আসামের চা বাগানের কাহিনী নিয়ে রচিত। দি প্রিন্সেস' (১৯৬৩) মলগোংকারেব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত। লেখক নিজেই গল্পের কথক। তার পিতা কোন দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাস্তব গল্প বলা লেখকের কোন অসুবিধা হয় নি। এটি বর্তমান যুগের একটি সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস। ' এ বেন্ড ইন গান্সেজ (১৯৬৪) দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা। দি ডেভিলস উইন্ড (১৯৭২) সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে লেখা ।

খুশবন্ত সিংয়ের বাস্তবতা পৃথিবীর বৈচিত্রকে তুলে ধরেছে। 'ট্রেইন টু পাকিস্তান' (১৯৫৬) তার প্রথম ও বিখ্যাত উপন্যাস। দেশ বিভাগের ফলে সীমান্তবর্তী একটি গ্রামের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী। 'আই শেল নট হিয়ার দি নাইটেঙ্গল' (১৯৫৯) একটি শিখ যুক্ত পরিবারের ওপর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিঘাতের ছবি।

খুশবন্ত সিং পাঞ্জাবের খাটির চিত্র তুলে ধরেছেন যেমন, এস. মেনন মারাথ (১৯০৬- তেমনি কেরালার। 'উন্ড অব সিগ্রং'(১৯৬০) নায়ার পরিবারের কাহিনী। গান্ধীবাদী আন্দোলনের প্রতি বিদ্রোপাত্মক চিত্রও আছে। তার পরবর্তী উপন্যাস'দি সেল অব এন আইসল্যান্ড (১৯৬৮)।

বালচন্দ্ররাজন (১৯২০-) এর দি ডার্ক ডেন্সর (১৯৫৯) এবং 'টু লং ইন দি ওয়েস্ট (১৯৬১)।

সুধীন্দ্রনাথ ঘোষের (১৮৯৯- ১৯৬৫) উপন্যাস 'এন্ড গেজেলস লীপিং'(১৯৪৯), ক্র্যাডেল অব দি ক্লাউডস (১৯৫১), 'দি ভারমিশিয়ন বোট (৫৩), দি ফ্রেম অব দি ফবেস্ট (১৯৫৫)।

জি. ভি. দেশানীর 'অল একাউট জি. হাট্টার'(১৯৪৮)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সংমিশ্রণ ঘোষ ও দেশানীর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এম. অনন্তনারায়ণের (১৯০৭) দি সিলভার পিলগ্রিমেজ (১৯৬১) সম্পূর্ণ ভারতীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে লেখা ষোড়শ শতাব্দীর ভারত ও শ্রীলংকাব কাহিনী। অরুণ যোশীর (১৯৩৯-) দি ফরেনাব (১৯৬৮), দি স্ট্রেচাজ কেস অফ বিলি বিশ্বাস' (১৯৭১), দি এ্য প্রেন্টি স (১৯৭৪)। চমন নাহালের (১৯২৭-) মাই ট্রু ফেসেস (১৯৭৩), আজাদী (১৯৭৫), ইন্টু এনাদার ডন (১৯৭৭), দি ইংলিশ কুইন (১৯৭৯)।

মহিলা লেখিকাদের মধ্যে রুথ প্রায়ার সুবালা (১৯২৭-) দু ধরণের সমস্যা নিয়ে তার উপন্যাস লিখেছেন। ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের চিত্র নিয়ে 'টু হুম শি উইল' (১৯৫৫), দি নেচার অব প্যাশন (১৯৫৬) দি হাউস হোল্ডার (১৯৬০) এবং গেট রেডী ফর ব্যাটল (১৯৬২। দ্বিতীয় ধরণের বিষয়বস্তু হলো অধিভক্ত হিন্দু পরিবার ও প্রাচ্য পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব। এই উপন্যাসগুলোব মধ্যে এসমন্ড ইন ইন্ডিয়া (১৯৫৮) এ ব্যাকওয়ার্ড প্লেস (১৯৬৫), এ নিউ ডোমিনিয়ন (১৯৭৩) এবং হিট এন্ড ডাস্ট (১৯৭৫)।

কমলা মারকানডায়া (পূর্নইয়া টেলর, ১৯২৪-) র উপন্যাসের বিষযবস্তুও দুভাগে বিভক্ত। এক ভারতীয় ও ব্রিটিশ চরিত্রের মধ্যে মিলন। দ্বিতীয় চিরাচরিত ভারতীয় ঐতিহ্যণনুগ আধুনিক

শহর-জীবনের সংস্কৃতিতে ব্রিটিশ শাসকের প্রভাব। তার প্রথম উপন্যাস নেকটর অন এ সিয়েভ' (১৯৫৪) এ দুয়েরই প্রভাব বিদ্যমান। ' সম ইনার ফুরী' (১৯৫৫) এবং 'পসেসন' (১৯৬৩) প্রথম ধারার উপন্যাস।

এ সাইলেন্স অব ডিজায়ার (১৯৬০), এ হ্যান্ডফুল ফুস অব রাইস (১৯৬৬), দি কফার ড্যামস (১৯৬৯), দি নোহোয়ার ম্যান (১৯৭২), টু ভার্জিনস (১৯৭৩) দি গোল্ডেন হ্যানিকম্ব (১৯৭৭)। শেষেরটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

নেহরু পরিবারের বিজয় লক্ষ্মী পন্ডিতের মেয়ে নয়নতারা সায়গল (১৯২৭-) রাজনৈতিক পরিবেশে আজন্ম লালিতা। সুতরাং তার উপন্যাসে রাজনীতির আধিক্য থাকবেই। তিনি নিজেই বলেছেন তার প্রত্যেকটি উপন্যাস সমসাময়িক রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত। এই বক্তব্যদ্বারাই সায়গলের উপন্যাসসমুহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। তার উপন্যাস সমূহের মধ্যে এ টাইম টু বি হ্যাপি (১৯৫৮) দিস টাইম অব মর্নিং (১৯৬৮),স্টর্ম ইন চন্ডীগড় (১৯৬৯), দি ডেইন শ্যাডো (১৯৭১), এ সিচুয়েশন ইন নিউ দিল্লী (১৯৭৭)।

অনিতা দেশাই (১৯৩৭-) রাজনৈতিক ও সামাজিক বক্তব্যকে বাদ দিয়ে মানুষের মানসিক চিত্রকে পরিস্ফুট করার ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত। 'ক্রাই দি পীকক' (১৯৬৩), ভয়েস ইন দি সিটি (১৯৬৫), বাই বাই ব্ল্যাকবার্ড (১৯৭১), হোয়ার শ্যাল উই গো দিস সামার (১৯৭৫), ফায়ার অন দি মাউন্টেন (১৯৭৭) ক্লীয়ার লাউট অব ডে (১৯৮০), তার উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রধান।

ভারতীয় ইংরেজী ভাষার উপন্যাসে একটি জিনিষ লক্ষ্যণীয়। মহিলা উপন্যাসিকেরাও ভারতবর্ষের জীবন ধারায় বিশৃংখল পাশ্চাত্য প্রভাবকে লক্ষ্য করেছেন এবং তাকেই তাদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু করেছেন। মহিলা লেখিকাদের মধ্যে এই চিহ্ন সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমানে উচ্চারিত।

শান্তা রমা রাও এর উপন্যাস 'রিমেম্বার দি হাউস' (১৯৫৬) দি এ্যাডভেঞ্চারস (১৯৭০), মিনারী (১৯৬৭) টু সিস্টারস (১৯৭৩), দি গার্লস ফ্রম ওভার সীজ (১৯৭৯)।

বেনু চিতলে (শ্রীমতি লীলা খাড়ে) র উপন্যাস ''ইন ট্রানজিট''(১৯৫০) পুনার ব্রাহ্মণ পরিবারের অবিভক্ত একটি ছবি বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধের ?

আমার জীবন রাখি কি মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস। জীনাত ফতেহলীর উপন্যাস 'জোহরা' (১৯৫১) হায়দ্রাবাদের গান্ধী সময়কালীন মুসলিম পরিবারের অতিহা হুসেন এর সার্স লাইট অন এ ব্রোকেন কলম (১৯৬১) স্বাধীনতা পূর্ববর্তী লক্ষ্ণৌর অভিজাত জীবনযাত্রা এবং পেরিন বারুচার ''দি ফায়ার ওয়ারশিপারস'' (১৯৬৮) পারসী জীবনযাত্রার বিবরণ।

বিমলা রায় নার ''আম্রপালি''(১৯৬২) বৌদ্ধযুগের মনোরমা মোদকের 'সিঙ্গল ইন দি হুইল' (৭৮) মহারাষ্ট্রের শেষ পেশোয়াব পতন কাহিনী। শকুন্তলা শ্রীনারায়ণের উপন্যাস ''দি লিটল ব্ল্যাক বক্স'' (১৯৫৫) সাধারণ মনস্তাত্বিক কাহিনী।

ষাট ও সত্তর দশকের অনান্য দশকের অন্যান্য মহিলা উপন্যাসকারদের মধ্যে লাতিকা

ঘোষ (হোয়াইট ডনস এণ্ড স্কোনিং (১৯৫০), মৃণালিনী সারাভাই (দিস এলোন ইজ টু, ৫২), বানী রায় (শ্রীলতা এনড শঙ্কা,৫৩), কাম্লী অথোগিয়া (গোল্ড অন দি ডাস্ট, ৬৬), ত পতী মুখার্জি মার্ডার নীডস এ স্টেয়ার সোস, ৬২), মিক্স ফেসেন অব ইভ, ৬৩), পদ্মিনী সেনগুপ্তা (রেড হিবিব কোস, ৬২), মুরিয়েল ওয়াশি (টুও হাই ফর রিভারলি, ৬৭), হিলদা রাজ (দি হাউস অব রামিয়া,৬৭), সীতা রত্নামল (বিয়ন্ড দি জাংগল, ৬৮), মীনাক্ষীপুরী (পে অন দি ফাস্ট, ৬৮), বীনা পাহনতাল (সেরেনিটি ইন স্টর্ম, ৬৬), রাজী নরসিমহার (দি হার্ব অব স্টান্ডিং অব ইউ ক্যাননট ফ্লাই ,৭৩), ভারতী মুখার্জির (টাইগারস ডটার, ৭৩ এবং ওয়াইফ, ৭৬), বীনা নাগপাল (কর্মযোগী ৭৪, কমপালসন, ৭৫), জন নিম্বাকার (টেম্পারারি আনসারস, ৭৪), শান্তা রামেশ্বর রাও (চিলড্রেন অব গড, ৭৬),কমলা দাস (এলফারেট অব লাস্ট,৭৬),রমা মেহতা (ইনসাইড দি হাভেলী,৭৭), শৌরী ডানিয়েল (দি সল্ট ডল,৭৭), জ্যোতি জাফা (নূরজাহান, ৭৮), উমা বাসুদেব (দি সং অব অনুসূয়া, ৭৮) এবং অনিতা কুমার (দি নাইট অব দি সেভেন ডন, ৭৯)

ছোটগল্প

উপন্যাসকারগণই প্রধানত ছোট গল্পের প্রধান রূপকার। তবু কিছু সংখ্যক লেখক আছেন যারা শুধুমাত্র ছোট গল্পই লিখেছেন। প্রথম গল্পকার হিসেবে পি. এল নটেশনের নাম করা যেতে পারে। শংকর রাম ছদ্মনামে তিনি লেখা শুরু করেন। তার গল্প সংকলনেব নাম 'দি ওয়েজ অব ম্যান' (১৯৬৮)। সবচাইতে আশ্চর্যেই ব্যাপার একমাত্র মূলকরাজ আনন্দ ছাড়া ভারতীয় ইংরেজী ছোটগল্পের প্রায় সমস্ত রচয়িতা দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছেন। এ. এস.পি. আয়ার, এস. কে বেত্তুর, কে. এস ভেংকা রমনী, কে. নাগরাজন, মবেহরী ঈশ্বরণ, আর কে নারায়ণ, রাজা রাও এবং কে. এ আব্বাস। এছাড়া শান্তা-ও সীতা চ্যাটার্জি, এম.ভি. বেংকটস্বামী, পি. পদ্মনাভ আয়ার, মোহম্মদ হাবিব, রামাবাই ত্রিকানন্দ, এ. ভি. রাও, টি. কে. ভেনুগোপাল।

স্বাধীনতা পরবর্তী গল্পকারদের মধ্যে ভবানী ভট্টাচার্য, খুশবন্ত সিং, মলগোংকর, নাহাল ও যোশীর নাম করা যায়। প্রবন্ধের লেখক বর্তমান প্রয়াত

----- o -----

ত্রিপুরার উপজাতি সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ

দেবব্রত দেবরায়

জাতি উপজাতি সম্প্রীতির তীর্থভূমি ত্রিপুরার ইতিহাস সু প্রাচীন। প্রাচীন কাল থেকেই এই পার্বত্য ত্রিপুরার উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। শান্তি সম্প্রীতির আর ভালোবাসার ভিত্তিতেই এই রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষরা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন। ত্রিপুরার ইতিহাস সম্প্রীতির ইতিহাস, মৈত্রীর ইতিহাস। সূদুর অতীত কাল থেকে পার্বত্য ত্রিপুরায় বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছেন। আসলে সম্প্রদায় ভেদে এদের ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন। পোশাক অলঙ্কার,গান,বাজনায় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অল্পবিস্তর বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এসব ভিন্নতার মধ্যে একটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য জনগোষ্ঠীর সদভাবের ভাঁটা পড়েনি কোনদিন। যুগ যুগ ধরে সকল সম্প্রদায়ের ভেতর ভ্রাতৃত্বের অন্তর প্রবাহ সাবলিল ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে অন্য একটি সম্প্রদায় সম্পূর্ন অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার মূল কারণ অশিক্ষা এবং একে অপরকে জানার উদাসীনতা এবং অনাগ্রহ। তৃতীয় কারণ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে উপজাতীয় জীবন পরিচয় বিষয়ে লিখিত পুস্তকের দুস্প্রাপ্যতা।

ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়গুলির জীবন যাত্রার বৈচিত্রের নিরিখে যদি আমরা এই সম্প্রদায়গুলিকে বিচার বিশ্লেষন করি তাহলে দেখবো এদেরকে মূলত উনিশটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়। এই উনিশটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে আবার কিছু কিছু উপ গোষ্ঠী।

যে উনিশটি জনজাতি গোষ্ঠীকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি সে গুলি হল ত্রিপুরী,রিয়াং, জমাতিয়া, চাকমা, হালাম,নোয়াতিয়া,মগ,লুসাই, উচুঁই, কুকি,গারো,মুন্ডা,ওরাং,সাঁওতাল,খাসিয়া,ভীল, ছাইমন, ভূটিয়া, লেপচা। এছাড়া রয়েছে কিছু উপগোষ্ঠী। যেমন রূপিনী,কাইপেং,কলাই, মুড়াসিং,মলসম,ডার্লং ইত্যাদি। অর্থাৎ আমাদেব রাজ্যে উপজাতি জনগোষ্ঠীব প্রধান উনিশটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরো কয়েকটি উপজনগোষ্ঠী রয়েছে। যারা শান্তি সম্প্রীতির ভিত্তিতে বহুকাল ধরে আমাদের রাজ্যে বসবাস করে আসছে।

সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে সকল উপজাতি জনগোষ্ঠী ত্রিপুরায় বসবাস করে আসলে তাবা মূলত: শান্তিপূর্ন ভাবেই বসবাস করে আসছে।

তাদের খুব একটা হিংসাত্মক জীবন যাত্রা পরিলক্ষিত হয়নি। হিংসার কোন স্থান তাদের মধ্যে খুব একটা না থাকলেও ইতিহাসে কিছু কিছু বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায়। যা পরবর্তীকালে আলোচিত হবে। একটা সময় পর্য্যন্ত দেখানো হয়েছে যে, ত্রিপুরার ইতিহাস শুধুমাত্র রাজা রাজদের ইতিহাস, কিন্তু আধুনিক গবেষকরা ত্রিপুরার ইতিহাস বলতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিহাসকেই বোঝাতে চেয়েছেন। ফলে বর্তমানে ত্রিপুরার মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস পরিস্ফুট হচ্ছে। যদিও ইতিহাসের উপাদান হিসেবে রাজাদের কাহিনী বিশেষ একটা স্থান দখল করে আছে। এই ইতিহাসে রয়েছে লোকায়ত মানুষের জীবনচর্চা । রয়েছে সংগ্রামের কাহিনী। এছাড়া রয়েছে সাংস্কৃতিক দিক, বিশেষ করে সংগীত, নৃত্যকলা,কথকথা,রূপকথা ইত্যাদি। এই সমস্ত গবেষণা থেকেই ত্রিপুরার প্রায় পঁচিশটি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান আমরা পাই।

ধীবে ধীরে ক্রমবিবর্তনের ধারায় এই নিজস্ব বা বিশুদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে অন্যানা সম্প্রদায়ের সংমিশ্রনে গড়ে উঠেছে মিশ্র সংস্কৃতি, যা গবেষণার অন্য আরেকটি বিষয়। যে সমস্ত সম্প্রদায়ের কথা আমরা উল্লেখ করলাম তারা ত্রিপুবার রাজবংশের আকড় ইতিহাস গ্রন্থ রাজমালা অনুযায়ী কমপক্ষে হাজার দেড়েক বছর ধরে বসবাস করে আসছে। যদিও এ নিয়ে বিতর্ক আছে। কেননা আধুনিক ইতিহাসের গবেষণায় এর সবটার সত্যতা খুঁজে না পাওয়া গেলেও এটা ঠিক যে মানুষের ইতিহাস দীর্ঘদিনের আব স্বাধীনতার আগে পার্বত্য ত্রিপুরার জনগণ বলতেও মোটামুটি উপজাতি জনসাধারণকেই বোঝায় ।

ত্রিপুরার এই ছোট বড় পঁচিশটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জীবন সংগ্রামের মধ্যে যেমন একটা অসাধারণ সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে একটা উন্নত সাংস্কৃতিক জীবন। গবেষণায় এটা প্রমানিত হয়েছে যে,তাদের সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ থাকা সত্ত্বেও রয়েছে একটা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। তবে এটা ঠিক যে, সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি মূলত একই রকমের। যারা একসময় এই রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিলেন তারা হঠাৎ করে ঐতিহাসিক কারণে পূর্ব বাংলা থেকে বাঙালী জনস্রোতের আগমনের ফলে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে যায়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে একধরনের নিরাপত্তার অভাব যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনি তাদের মধ্যে অস্তিত্বের সংকট বা হীনমন্যতাবোধও দেখা দেয় যা ধীরে ধীরে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে বিনষ্ট করে দেয় ।সমাজ বিজ্ঞানের এই বিশেষ দিকটিও আমাদের মনে রাখতে হবে। এই জাতিগত সমস্যাকে (এথনিক) অগ্রাহ্য করে উপজাতি সংস্কৃতিব বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন কিছুতেই করা যাবেনা।

বিশেষ করে শান্তিপ্রিয় উপজাতি জনগণের একটা ক্ষুদ্র অংশ কেন অস্ত্র হাতে নেয় সেই গবেষণাতে এই দিকটিও এসে যায় । ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার আগে আমাদেরকে অবশ্যই ত্রিপুরার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হবে। ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান খুবই অদ্ভুত ধরনের। এর তিন দিকেই রয়েছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত, অর্থাৎ বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত। এক দিকে আসাম এবং মিজোরামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। উত্তর পূর্ব ভারতের একটি ছোট রাজ্য ত্রিপুরা জনসংখ্যায় যদিও উত্তর পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম। সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও দ্বিতীয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমানা প্রায় ৮৩৯ কিলোমিটার। ত্রিপুরার বর্তমান আয়তন মূলত ১০.৮৭৭ বর্গ কিলোমিটার।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট যেদিন সারা দেশ স্বাধীন হয়েছিল সেই সময়টাতে ত্রিপুরাতে ছিল রাজন্য শাসন। মূলত ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে যোগ দেয়।ঐ সময় ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নাবালক পুত্র কিরীট বিক্রমের পক্ষে রিজেন্ট মহারাণী কাঞ্চন প্রভা চুক্তি করে রাজ্যটিকে ভারত সরকারের হাতে অর্পন করেন। প্রথম দিকে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হিসাবে ছিলনা। ছিল 'গ' শ্রেনী ভুক্ত রাজ্য। ১৯৫৬ সালে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। যার সদস্য সংখ্যা ছিল ৩২ । এর মধ্যে ৩০ জন সদস্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং দুজন সদস্য ছিলেন সরকার কর্তৃক মনোনীত। যাই হোক ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়।

ত্রিপুরায় যে উনিশটি প্রধান উপজাতি জনগোষ্ঠী রয়েছে তার মধ্যে সবচাইতে বড় জনগোষ্ঠী হল ত্রিপুরী জনগোষ্ঠী। এই ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীই ত্রিপুরার সবচাইতে উন্নত জনগোষ্ঠী। আমরা বর্তমান ত্রিপুরার যে আয়তন দেখছি, অতীতে কিন্তু সেরকম ছিলনা। ত্রিপুরা রাজ্য সুবিস্তৃত ছিল একেবারে ব্রহ্মদেশ সীমান্ত পর্যন্ত । পশ্চিম দিকে মেঘনা নদী আর উত্তরে একেবারে ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত । ফলে ত্রিপুরীরা একটা বিরাট অংশ জুড়ে বসবাস করতো। যেমন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম,চাঁদপুর,মৈমনসিং,ইত্যাদি এলাকাতে ত্রিপুরীরা বসবাস করতো। সেই কারণেই ত্রিপুরীরা ত্রিপুরা রাজ্যের সবচাইতে বড় জনগোষ্ঠী । যদিও ঐতিহাসিক কারণে দেশভাগের ফলে ত্রিপুরার যে অংশ ভারতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়, তার মধ্যে ত্রিপুরীরাই হল সবচাইতে বড় জনগোষ্ঠী। স্বাভাবিক কারণেই ত্রিপুরীদের একটা অংশ ত্রিপুরার বাইরে উল্লেখিত অঞ্চল গুলিতে থেকে যায়।

ত্রিপুরী জনগোষ্ঠী ভাষা মূলত ককবরক। ত্রিপুরীরা তাদের নামের পাশে যে দেববর্মা বা দেববর্মন ব্যবহার করেন তা বেশীদিন ধরে নয়। ত্রিপুরার রাজারাও নির্দিষ্ট

কোন পদবী ব্যবহার করেন না। তারা মানিক্য উপাধি ব্যবহার করেন বহুদিন ধরে। আবার কোথাও কোথাও চৌধুরী শব্দটি ব্যবহার করা হত। যদিও চৌধুরী শব্দটি একটি খেতাবকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হত। কেও কেও আবার এটাও বলেছেন যে, যারা নিজেদেরকে Superior বা অন্যদের চেয়ে নিজেদের উন্নত ভাবত তারা দেববর্মা শব্দটি ব্যবহার করতেন। বিশেষ করে আরেকটা অনুভূতিও এই ব্যাপারে কাজ করতো যে,রাজাদের সঙ্গে এদের বংশগত পরিচয় দেবার তাগিদ। এই তাগিদ থেকেই তারা দেববর্মা শব্দটি ব্যবহার করতেন ।

যাই হোক এটা অন্তত আমরা বলতে পারি যে, ত্রিপুরার আধুনিক যুগের স্রষ্টা বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরের সময় থেকেই দেববর্মা শব্দটি ত্রিপুরীরা ব্যবহার করে আসছে। গবেষকরা অবশ্য বলেছন, এর পেছনে অবশ্য রাজধানী অঞ্চলে বসবাসের সুযোগ, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, এবং নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় বলে প্রকাশ করার জন্যেও ত্রিপুরীরা দেববর্মা বা দেববর্মন শব্দটি ব্যবহার করতেন। কেও কেও আবার ঠাকুর শব্দটিও ব্যবহার করতেন । ত্রিপুরীদের উৎস বা ব্যুৎপত্তিগত দিক যদি আমরা বিশ্লেষণ করি বা তাদের গোষ্ঠীগত পরিচয় যদি জানার চেষ্টা করি তাহলে এটা নিশ্চয়ই বলবো যে, শত শত বছরে বহু সংমিশ্রন ঘটেছে ত্রিপুরীদের সঙ্গে। তবে এটা ঠিক যে, আধুনিক গবেষকরা বিশুদ্ধ মঙ্গোলীয় জাতি খুঁজে পাবার চেষ্টা করেন না। কেননা মিশ্রন ঘটেছে বহু ভাবে বহু দিক থেকে।

আমাদের রাজ্যেব প্রধান উপজাতি জনগোষ্ঠী ত্রিপুরীই শুধু নয়, রাজ্যেব প্রায় প্রতিটি উপজাতি জনগোষ্ঠীর আদি উৎস হচ্ছে মঙ্গোলীয়। তারা সবাই যে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত হয়েছে, মঙ্গোলীয়ানরাই যে তাদের আদি উৎস এই ব্যাপারে কেওই দ্বিমত পোষণ, করেন না । তবে ত্রিপুরীরা যে বৃহত্তর বড়ো জনগোষ্ঠীরই অংশ এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ভাষায় দিক থেকেও তারা বড়ো জাতিব ভাষার অন্তর্গত । কেননা ত্রিপুরীরা বরক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত । বরক শব্দের অর্থ মানুষ। এই শব্দটি আসলে একটি জাতিবাচক শব্দ। তাই আমরা ধরে নিতেই পারি যে, বরক শব্দের উৎপত্তি বড়ো শব্দ থেকেই।

ধর্মের ক্ষেত্রে যদি আমরা বিচার করি, তাহলে বলবো যে, ত্রিপুরীরা মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বী । এর মূল কারণ হল ত্রিপুরীরা বহুদিন ধরে পূর্ব বাংলার হিন্দু বাঙালীদের সঙ্গে ধর্মীয় মেল বন্ধনে আবদ্ধ। শুধু মৈত্রী বা সম্প্রীতিই যে তাদেরকে হিন্দু ধর্মাচরণে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে তাই নয়, ভৌগোলিক ভাবে যেহেতু তারা শত শত বছর ধরে হিন্দু বাঙালীদের কাছাকাছি ছিলেন সেজন্যও তারা হিন্দু ধর্মের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন বলা যেতে পারে। অন্য ধর্ম বা অন্য ভাষার সংস্পর্শ কিভাবে প্রভাব বিস্তার

করে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল আগরতলা শহরের ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ককবরক বলতে পারার অক্ষমতা এবং হিন্দু বাঙালীদের বিভিন্ন সংস্কৃতিকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করা। বাংলা সংস্কৃতি দারুনভাবে ত্রিপুরীদেরকে প্রভাবিত করেছে। শুধু বাংলার সংস্কৃতিই নয়, বাংলা ভাষা নানা ভাবে ককবরক ভাষাকেও প্রভাবিত করেছে । ত্রিপুরী সমাজের নানা রকম হিন্দু আচার আচরণেরীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

বহু যুগ ধরে সমতলবাসীদের সঙ্গে আদান প্রদান, ব্যবসা বানিজ্য ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদির ফলে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা যেমন তারা আয়ত্ব করেছে, তেমনি পোষাক, খাদ্যরীতি, কুশল বিনিময় বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সর্বত্র তারা প্রভাবিত হয়েছেন। শুধু প্রভাবিতই নয়, নানাভাবে বিকশিত হয়েছেন। ধর্মের ক্ষেত্রেও একটা দারুন সাদৃশ্য দেখা যায় ত্রিপুরীদের সঙ্গে সমতলবাসী বাঙ্গালীদের। ধর্মের ক্ষেত্রেও তারা প্রভাবিত হয়েছেন নানাভাবে ।বিশেষ করে মূর্তি পূজা থেকে শুরু করে তারা দেবদেবীর আরাধনা ইত্যাদিও তারা তাদের জীবন চর্যায় অনুশীলন করেন। বিশেষ করে "সর্ব প্রাণবাদ " দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়েছেন । হিন্দুদের মত তারাও রক্ষাকালী,কালীমাতার আরাধনা করেন। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরীদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ যারা বৈষ্ণব। অর্থাৎ বৈষ্ণব ধ্যান ধারনাতেও তারা প্রভাবিত হয়েছেন মূলত হিন্দু ধর্মের প্রভাবে।

এটা আমরা·সবাই জানি যে, ত্রিপুরায় উপজাতীয় জনসংখ্যায় ত্রিপুরীরা প্রথম স্থানে রয়েছেন। শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয়,শিক্ষার দিক থেকেও তারা প্রথম স্থানে রয়েছেন। ত্রিপুরীদের পরেই দ্বিতীয় যে জনগোষ্ঠী রয়েছেন তারা হলেন রিয়াং সম্প্রদায়। যাদের একটা উন্নত সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে। রিয়াংদের হজাগিরি নৃত্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে। ভাষাগত দিক থেকে যদিও ত্রিপুরীদের সঙ্গে রিয়াংদের একটা অসাধারণ সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করি, কিন্তু অন্যান্য বহু দিক থেকে আমরা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করি। রিয়াং জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যে নানাবিধ গবেষণা হয়েছে তা থেকে আমরা প্রথমেই এটা বলবো যে, রিয়াং জনগোষ্ঠী এই রাজ্যে বহুকাল ধরে বসবাস করলেও তারাও যে অন্যান্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর মতো বহিরাগত এটা নি:সন্দেহে বলা যেতে পা.র। রাজমালায় যে কথাটা রিয়াংদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তার মূল কথা হল মূলত গোবিন্দমানিক্যের আমলে ১৬৬০ খ্রী: থেকে ১৬৬৭ খ্রী পর্য্যন্ত সময় কালের মধ্যেই রিয়াংরা প্রথমে এই রাজ্যে আসেন।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে ত্রিপুরীদের সঙ্গে রিয়াংদের বৈসাদৃশ্য প্রকট।ত্রিপুরীদের সঙ্গে সামাজিক রীতি নীতি,বিবাহ প্রথা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অমিল আমাদের চোখে পড়ে। যেমন ত্রিপুরীদের মূল উৎসব হচ্ছে খারচি পূজা, কের পূজা,উনকোটি উৎসব,তীর্থমুখ মেলা, হরিবিষ্ণু,মহাবিষ্ণু,তুইমা বা গঙ্গা পূজা,মতাই কুতরমা, হজাগিরি মেলা ইত্যাদি।

অন্যদিকে রিয়াংদের উৎসব হচ্ছে কুইডোমা পূজা,গড়িয়া পূজা,কের পূজা,বৈষু পূজা,মাইকলুমু উৎসব,হজাগিরি উৎসব, ইত্যাদি। ত্রিপুরীদের নৃত্যের মধ্যে রয়েছে ।ড়িয়া নৃত্য, লেবাংবুমানি্‌ নৃত্য,মামিতা নৃত্য,মসকসুলমান, ইত্যাদি, অন্যদিকে রিয়াংদের নৃত্যের মধ্যে রয়েছে হজাগিরি নৃত্য,যে নৃত্যটি পৃথিবীর বহুদেশে সমাদৃত হয়েছে। এই হজাগিরি নৃত্য ছাড়াও আছে দাইলো নৃত্য,তাতই ঘাংমো নৃত্য। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ত্রিপুরীদের সঙ্গে রিয়াংদের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য বা মিল থাকলেও এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য ও যথেষ্ট রয়েছে।

আবার রিয়াং রমণীদের সৌন্দর্য্য বোধ,অলংকারপ্রিয়তা বা সাজগোজের সঙ্গে ত্রিপুরী রমণীদের সৌন্দর্য্য বোধ বা অলংকারপ্রিয়তার একটা মিলও আমরা দেখতে পাই। ভাষার ক্ষেত্রেও ত্রিপুরী ও রিয়াংদের একটা সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করি। যদিও ককবরক এখন রিয়াংদের মাতৃভাষা কিন্তু আসলে সুপ্রাচীন কালে ককবরক রিয়াংদের মাতৃভাষা ছিলনা। এক্ষেত্রে দুটি মত আমরা লক্ষ্য করি। যেমন প্রখ্যাত ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ককবরক ভাষার আদি হিসেবে বড়ো ভাষাকেই চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ত্রিপুরার এম.বি.বি. কলেজের অধ্যাপক ড: সন্তোষ চক্রবর্তী গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, ককবরক ভাষা আসলে অষ্ট্রো এশীয় ভাষার অন্তর্ভূক্ত।

ত্রিপুরী এবং রিয়াংদেব মধ্যে শারীরিক গঠন এবং দেহের শক্তি এবং অবয়বের মধ্যেও একটা সাদৃশ্য আমরা খুঁজে পাই। তবে তারা যথেষ্ট অতিথি পরায়ণ, বন্ধু বৎসল এবং সহজ সরল স্বভাবের। রিয়াংদের সংগীত জীবনকে যদি আমরা বিচার বিশ্লেষন করি তাহলে দেখবো যে, অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মতই কৃষি এবং উৎপাদনকে কেন্দ্র করে অথবা জীবিকাকে কেন্দ্র করে তাদের সংগীত জীবন গড়ে উঠেছে। জুম চাষকে কেন্দ্র করে সংগীত জীবন পরিচালিত হলেও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংগীত তারা গেয়ে থাঁকেন। এই সংগীত বীজবপণকে কেন্দ্র করে যেমন হতে পারে জুমের ফসল রক্ষা করা বা পাহারা দেওয়া, ফসলকে ঘরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানারকম পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে তারা গান তৈরী করেন গানের সুর দেন অথবা গান গেয়ে থাকেন। মূলত বাঁশি এবং মাদলই এরা এদের সংগীতে ব্যবহার করেন। কিন্তু আজকের দিনে অন্যান্য সংগীতের মতই নানারকম আধুনিক বাদ্যযন্ত্র এরা ব্যবহার করেন।

রিয়াংদের নৃত্য বলতে আমরা মূলত বুঝবো গড়িয়া নৃত্য এবং হজাগিরি নৃত্যকে। এছাড়াও আরো দুটে নৃত্য আমরা দেখতে পাই রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে। একটি হল ডাইলো নৃত্য এবং অন্যটি হল তাতোই ঘাংমো নৃত্য। গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করে গড়িয়া নৃত্য পরিবেশিত হয় এবং হজাগিরি নৃত্য বলতে মূলত লক্ষ্মীর উপাসনা এবং

সম্পদের উপাসনাকে বোঝায়। অন্যদিকে ডাইলো নৃত্য হলো তাদের সম্প্রদায়গত অনুভূতি নির্ভর। এছাড়া তাতোই ঘাংমো নৃত্য মূলত বৈসি উৎসবকে কেন্দ্র করেই হয়। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে রিয়াংদের যেকোন নৃত্যই হয় দলগত। ব্যক্তিগত নৃত্য খুব একটা নেই। যেহেতু রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠীতে উচ্চবর্ণ বা নিম্ন বর্ণ বলে কিছু নেই তাই সমাজভিত্তিক চিন্তা বেশী বেশী তাদের সংস্কৃতিতে দেখা যায়। যা তাদের নৃত্যের মধ্যেও প্রতিফলিত।

রিয়াংদের পরেই আমরা আমাদের রাজ্যের আরেকটি গুরুত্বপূণ সম্প্রদায় নোয়াতিয়াদের সংস্কৃতির স্বাদ পেতে চাই। নোয়াতিয়ারা ত্রিপুরীদের একটা শাখা। তবে যারা পূর্ব বাংলার আদিবাসী ছিল তারাই নোয়াতিয়া নামে পরিচিত। বর্তমানে আমাদের রাজ্যে নোয়াতিয়ারা বাস করছেন সাব্রুম, বিলোনীয়া, অমরপুর, গন্ডাছড়া, লংতরাইভেলি, কমলপুর, সোনামুড়া মহকুমাতে। এদের উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লামপ্রা পূজা,তুইমা পূজা,কের পূজা,গড়িয়া পূজা, ইত্যাদি। নোয়াতিয়াদের নৃত্য বলতে মূলত গড়িয়া পূজা,লেবাং বুমানি এবং মসক সুমানি নৃত্য।

রাজ্যের আরেকটি উপজাতি জনগোষ্ঠী হল জমাতিয়া। জমাতিয়ারা আমাদের রাজ্যে তৃতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী।এরা মূলত উদয়পুর,বিলোনীয়া,অমরপুর,গন্ডাছড়া, খোয়াই,বিশালগড মহকুমাতে বাস করেন। কৃষিক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমী এই জনজাতি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অপরিসীম। রাজমালার লেখক কৈলাশচন্দ্র দেখিয়েছেন এই সম্প্রদায় মূলত রাজার সৈন্যবাহিনীতে সবচাইতে বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। এরাও মূলত ককবরক ভাষী।

জমাতিয়াদের উৎসব মূলত ধর্ম ভিত্তিক। এরা মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলেই হিন্দু দেবদেবীর পূজায় এরা প্রচলিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নকসু পূজা,বুড়ামা পূজা,বুরইরগ পুজা,মহাদেব পূজা, গড়িয়া পূজা, কের পূজা ইত্যাদি। এই সমস্ত উৎসবকে বা পূজাকে কেন্দ্র করে গড়িয়া নৃত্য ইত্যাদিতে তারা অংশ গ্রহণ করে।

এর পরেই যে জনগোষ্ঠীর কথা আমরা আলোচনা করব তা হল উচই জনগোষ্ঠী। উচই জনগোষ্ঠী খুবই সংখ্যালঘু উপজাতীয় জনগোষ্ঠী। উচইরা বর্তমানে সারা রাজ্যে এক লক্ষেরও কম হবে। এরা মূলত বিলোনীয়া,অমরপুর, এবং ধর্মনগরে বাস করে। ১৮৬৯ সালে একজন ইংরেজ গবেষক তার গবেষণাতে দেখান যে উচই জনগোষ্ঠী বৃহত্তর ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীরই একটি অন্যতম শাখা। বাঙালী জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে উচইরা তাদের সংস্কৃতি এবং উৎপাদন ব্যবস্থাতে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর মতই এরা রনতক পুজা, কের পূজা,গঙ্গা পূজা, নকসুমতাই বা গৃহদেবতা পূজা ইত্যাদি করতো।

ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্প্রদায় হল চাকমা সম্প্রদায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই চাকমারা ত্রিপুরাতে বাস করে আসছে। এদের লোক সংগীত,লোকগীতি বা লোকসাহিত্য ইত্যাদি বহু বছর ধরে শ্রুতি নির্ভর হয়ে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চলে আসছে। চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানাধরনের সংগীতের প্রচলন আছে। যেমন তাদের বারমাসী গান, পালা গান,প্রণয় মূলক সংগীত, ঘুমপাড়ানি সংগীত, ছেলে ভুলানো গান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। চাকমাদের আরেকটি পালা কীর্তন বা দীর্ঘ কাব্য রয়েছে, রাধারমন ও ধনপতী পালা। এছাড়া রয়েছে বারমাসী সংগীত, মন দেওয়া নেওয়া, ভালোবাসা,ছেলেমেয়েদের বিরহ বেদনা, মিলন আকাঙ্খার উপর রচিত এই কাব্য মালা চাকমাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ন দিক। অন্যান্য উপজাতীয় গোষ্ঠীর মতই চাকমারাও সহজ সরল জীবনে অভ্যস্থ ।

চাকমারা মূলত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী । এরা বৌদ্ধধর্মের আচার অনুষ্ঠান মেনে চলেন। চাকমাদের মূল উৎসব হচ্ছে বিজু এবং বৈশাখী পূর্নিমা। বিজু হল চাকমাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় উৎসব। এই বিজু উৎসবকে কেন্দ্র করে বিজু নৃত্য খুবই বিখ্যাত নৃত্য বলে পরিচিতি লাভ করেছে। বাংলাতে ক্যালেন্ডাবের শেষ দিনে বিজু শুরু হয়। এবং তিন দিন ধরে চলে। যেহেতু ভগবান বুদ্ধ বৈশাখী পূনির্মাতে জন্ম গ্রহণ করেন ফলে বৈশাখী পূর্ণিমা চাকমাদের একটি বড় উৎসব।'থালমালা' চাকমাদের একটি বড উৎসব । চাকমাদের বিজু নৃত্য বিশ্বজোডা খ্যাতি পেয়েছে । এছাড়া আছে জুম নৃত্য,গেংখুলি সংগীত ও নৃত্য, ছাদিগং ছড়াপালা,গাজোনা লামা ইত্যাদি সংগীত ও নৃত্য। এছাডা আছে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য আগরতারা।

ত্রিপুরার উপজাতিয় আরেকটি অন্যতম গোষ্ঠী হল মগ। দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলাতেই মগরা মূলত বাস করেন। বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মগরা মুলত আরাকান,বার্মা এবং চীনদেশীয় মানবগোষ্ঠীর প্রশাখা। আর সেই কারণেই তাদেরকে মিশ্র জনজাতি বলা হচ্ছে। মগরা মুলত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।তাদের জীবন যাত্রায় অনেকগুলি উৎসব আছে । যেমন নৌকা খেলার উৎসব,জল উৎসব,ব্যূহচক্র উৎসব ইত্যাদি। এছাড়া তারা আশ্বিন মাসের পূর্নিমাতে ওয়া উৎসব পালন করে। এই উৎসবে তারা বুদ্ধদেবকে প্রার্থনা করে। দোল পূর্নিমাতে তারা সংগ্রাই উৎসব পালন করে। মহাভারতের অনুসরণে তারা ব্যূহচক্র বা বাঁশ দিয়ে চক্র তৈরী করে উৎসব পালন করে। তাদের নৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সংগ্রাই নৃত্য যা চৈত্রের শেষের দিন পালিত হয়। এছাড়া আছে জল বা স্নান উৎসব, বুদ্ধ বৃক্ষ রোপন। নৃত্য করতে করতে তারা এই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে।

ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে গারো আরেকটি জনজাতি। গবেষকরা বলেছেন গারোরা মূলত তিব্বত থেকে এখানে এসেছেন। মেঘালয়ের গারো পাহাড়েই এই সম্প্রদায় বেশী সংখ্যায় বাস করছে। গারোদের মধ্যে হিন্দু যেমন আছে তেমনি আছে খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী । তাদের উৎসবের মধ্যে রয়েছে হাবা-ছু রাধা উৎসব, গডিয়া উৎসব,রাংচুংলা উৎসব,ওয়াংগালা ইত্যাদি উৎসব । এছাড়া আছে কের পূজা,রাংদিক সাইট পূজা । এদের প্রতিটি পূজাতেই মদ এবং মুরগী লাগে। নৃত্যের মধ্যে আছে গাল্লা নৃত্য,ডকরো-সোয়া নৃত্য,আসবারি রুষোয়া নৃত্য, কিলপোয়া নৃত্য ইত্যাদি । প্রতিটি নৃত্যই নারী পুরুষ একসংগে সম্পাদিত করে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি সম্প্রদায় হল লুসাই । লুসাইরা মূলত মিজো উপজাতিদের অন্যতম শাখা । লুসাইরা অন্যদের মতই সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তবে এরা মূলত খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী । লুসাইদের একটা বড় উৎসব হচ্ছে চইলাম উৎসব, যা বসন্ত উৎসব বলে পরিচিত। চইলাম নৃত্য লুসাইদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৃত্য। ছেলে এবং মেয়ে উভয়ে মিলে এই নৃত্য পরিবেশন করে। লুসাইদের একটি প্রাচীন নৃত্য হল খোয়ালাম। অতিথিকে বরণ করার জন্যই এই নৃত্য ও সংগীত গাওয়া হত। এছাড়া আছে মোলাকিয়া নৃত্য ,তলাংলাম নৃত্য ,চেরোকান নৃত্য ইত্যাদি । চের বা বাঁশ নৃত্য এদের একটি বিখ্যাত নৃত্য । খোয়ালাম নৃত্য মূলত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় করা হয় । মোলাকিয়া নৃত্য মূলত করা হয় কোন প্রাণীকে হত্যা করে নিয়ে আসার পর আনন্দের বহি:প্রকাশ হিসাবে । তলাংলাম নৃত্যটি একটি জাতীয় বা গণ নৃত্য ।

এছাডা রয়েছে কুকি, হালাম, খাসিয়া, ভূটিয়া, লেপচা, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাং, ভিল,ইত্যাদি জনগোষ্ঠী । তাদের রয়েছে প্রত্যেকের নিজস্ব সংস্কৃতি । নিজস্ব নৃত্য সংগীত । যেমন কুকিরা বাচ্চার জন্মকে কেন্দ্র করে নানারকম নৃত্যগীত করে । আবার হালামদের আকর্ষণীয় নৃত্য হল হাই-হক নৃত্য । যা মূলত নদীর আরাধনা । এইসব মিলেই ত্রিপুরার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি । পশ্চিমী সংস্কৃতির আগ্রাসী আক্রমনে আমাদের চিরাচরিত উপজাতি সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে । যা অত্যন্ত উদ্বেগের । তাই আমাদের রাজ্যের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধরে রাখা,উন্নত করা,সাহায্য করা আমাদেব সাংস্কৃতিক,রাজনৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব । আশার কথা ত্রিপুরা সরকার উপজাতি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলিকে ধরে রাখা, উন্নত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই তা সার্থক হবে বলে বিশ্বাস রাখি ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

তথ্য সূত্র : ত্রিপুরার আদিবাসী জীবনও সংস্কৃতি ঃ সুরেন দেববর্মন।

----- ০ -----

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রবীন্দ্রনাথ

ডঃ ব্রজগোপাল রায়

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। তিনি সত্য শিব ও সুন্দরের পূজারী। তাঁর আপন কথায় -

"আমি পৃথিবীর কবি
যেথা তার, যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে
সাড়া তার জাগিবে তখনই -"

সাম্রাজ্যবাদ যখন ধীরে ধীরে তার উদ্ধত থাবাকে অন্যায়ভাবে বিশ্বের অসহায়, দুর্বল মানুষের দিকে প্রসারিত করেছে তখনই রবীন্দ্রনাথ এসব অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। নির্যাতিত মানুষের হয়ে কথা বলবার জন্যে তিনি বারবার কবি কুঞ্জ থেকে মসি হাতে বেরিয়ে এসেছেন রাজনীতির আঙ্গিনায়। দ্বিধাশূণ্য চিত্তে তিনি সাম্রাজ্যলোভী বল দর্পীদের অন্যায় আচরণেব তীব্র নিন্দা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ যে তিলে তিলে গড়ে উঠা মানব সভ্যতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে সারা বিশ্বের ক্ষতি সাধন করবে, এ ধারণা তাঁর মনের গভীরে প্রোথিত ছিল। ইম্পীরিয়ালিজম নামক এক নিবন্ধে কবি লিখেছেন- "যাঁহারা ইম্পীরিয়লিজমের খেয়ালে আছেন তাঁহারা দূর্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন রাশিয়া ফিনল্যান্ড ও পোল্যান্ডকে নিজের বিপুল কলেবরের সঙ্গে বেমালুম মিশিয়ে নেবার জন্যে একদা প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। রাশিয়া ভেবেছিল অধীন দেশের স্বাভাবিক বৈষম্যগুলি জবরদস্তির সাথে দূর করে দিলেই ইম্পীরিয়লিজম নামক একটা সর্বাঙ্গীন বৃহৎ স্বার্থপূরণ হবে। রাশিয়ার এ স্বার্থকেই তারা পোল্যান্ড -ফিলল্যান্ডের স্বার্থ বলে গণ্য করে। এ নিবন্ধেই উল্লেখ আছে সেসিল রোডস একজন ইম্পীরিয়ল বায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন। সে জন্যেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বোয়ারদের স্বাতন্ত্র্য লোপ করা ছিল তার লক্ষ্য। কবির অভিমত,- "ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে সকল কাজকে চৌর্য, মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল খুন ডাকাতি নাম দেয়, একটা ইজম প্রত্যয় যুক্ত শব্দে - তাহাকে শোধন করিয়া কতদূর গৌরবের বিযয করিয়া তোলে, বিলাতি ইতিহাসের মান্য ব্যক্তিদের চরিত্র হইতে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়।"

ভারতে লর্ড কার্জনও একইভাবে বলেছিলেন জাতীয়তার কথা ভুলে এম্মপায়ারের স্বার্থকে ভারত যেন নিজেদের স্বার্থ বলেই মনে করে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুমেলাব প্রতিষ্ঠা হয় নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায়। সেখানে সঞ্জীবনী সভার সদস্য ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিন্দু মেলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম' গানটি গেয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কোলকাতা অধিবেশনে। হিন্দু মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল স্বাদেশিকতার জাগরণ। দেশকে শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করে তোলাই ছিল এসব- অধিবেশনের লক্ষ্য। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাক্ স্বাধীনতা আমলের ইতিহাস ১৮৮৫-১৯০৪ নরমপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর্ব, ১৯০৫-১৯২০ চরমপন্থীদের উত্থান, স্বদেশী ও হোমরুল আন্দোলন, রৌলট আইন ও সত্যাগ্রহ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ইত্যাদি পর্ব, ১৯২০-১৯২৯ গান্ধীজীর নেতৃত্বে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ্যদলের উত্থান,এবং পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহন, ১৯৩০-১৯৪৭ আইন আমান্য আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ ও ভারত ছাড় আন্দোলন।। এসময়ের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন (১৯৩৯) আপোস বিরোধী সম্মেলন , সুভাষচন্দ্রের গৃহ ত্যাগ, সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে বৃটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে' যুদ্ধ ঘোষণা। শান্তিনিকেতনের নিভৃতে বসে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সমস্ত পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জেগে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি মানুষের ঘৃণা তখন থেকেই উচ্চারিত হতে শুরু করে।

লর্ড কার্জন ভারতে বড়লাট হয়ে.এসেই কংগ্রেসকে দুর্বল করে এদেশের মানুষের মধ্যে ঐক্য যাতে দানা বাঁধতে না পারে সে লক্ষ্যে কাজ করতে থাকেন। বাংলা দেশকে ভাগ করার পরিকল্পনা তারই। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ক্যালকাটা গেজেটে বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করার সরকারি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। এ ঘটনাটি বাঙ্গালী মাত্রকেই উত্তেজিত করে তোলে। তাতে বাংলার ঐক্য বোধ দৃঢ়তর হয়। বাঙ্গালীরা সেদিন সমস্ত ভীতি বিহ্বলতা কাটিয়ে বীরের মত প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে বললেন, "পূর্বে জড় ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতন ভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ ।" কবি বুঝেছিলেন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত এদেশে দ্রুত প্রসারিত হবে, তাই মানুষের মনে ভরসা জাগাবার জন্যে তিনি সরাসরি রাজনীতির আঙ্গিনায় এসে উপস্থিত হন।১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে পূর্ব ও পশ্চিম - এ দুভাগে বিভক্ত করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এ ঘটনায় বাঙ্গালী মাত্ররই মনে হয়েছে- এ বিষয় জবরদস্তি, মাতৃভূমির অপমান। দেশবাসীর মতামত কে অগ্রাহ্য করে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ায় রবীন্দ্রনাথ ভীষণ ক্ষুদ্ধ হয়ে নিজেই প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেন - নেতৃত্ব দিলেন বাংলাকে। ১৯০৫ এর ৭ই আগষ্ট থেকে শুরু হল স্বদেশী আন্দোলন। কোলকাতা প্রতিবাদে মুখর হল। পালিত হল রাখিবন্ধন ও হরতাল। বিডন উদ্যানে ও ফেডারেশন হলের সভায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ঘোষণা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ - বাংলার মাটি, বাংলার জল, গানটি গেয়ে গেয়ে মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় সদলবলে গিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের হাতে ঐক্যের রাখি পরিয়ে দিলেন। সে দিন সারা বাংলায় অরন্ধন ঘোষিত হয়েছিল। কবি কোলকাতার অগনিত জনসভায় বক্তৃতা করলেন। তিনি রচনা করে চললেন একের পর এক স্বদেশী সঙ্গীত। শোভাযাত্রার পুরোভাগে রবীন্দ্রনাথ, সবার কণ্ঠে তার গান 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।' 'ও আমার দেশের মাটি, 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' , 'আমার সোনার বাংলা' প্রভৃতি গানে বাংলার অন্তরাত্মা জেগে উঠেছিল। বলাবাহুল্য এ সব গানই ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি।

এখানেই রবীন্দ্রনাথ থেমে থাকেন নি। সমাজ সংস্কার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা বিস্তার এবং জাতিকে আত্ম নির্ভরশীল করে তোলার আহ্বান জানালেন রবীন্দ্রনাথ। সাম্রাজ্যবাদের কাছে আবেদন নিবেদন নয়, আত্মশক্তিতে জেগে উঠার পথই দেখিয়ে ছিলেন কবি।

১৯১৪ সালে ইয়ুরোপে যুদ্ধ বাঁধল। এমনটা যে হবে রবীন্দ্রনাথ আগে থেকেই তা অনুমান করতে পেরেছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে কবির 'বলাকা' কাব্যটি রচিত হয়। এ কাব্যের কয়েকটি কবিতায় বিশেষ করে 'ঝড়ের খেয়া'য় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মারণে মরণে আলিঙ্গন কবি চিত্তকে কীভাবে ব্যথিত করেছে তারই নিদর্শন ফুটে উঠেছে।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের এক জনসভায় জেনারেল ও ডায়ারের নির্দেশে নিরস্ত্র জনতার উপর বর্বরোচিত ভাবে গুলি চালানো হল। ফলে কয়েক শ লোক প্রাণ হারালো, মারাত্মক ভাবে আহত হল তার চেয়ে বেশি লোক। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করা হল। সংবাদদাতাদের কণ্ঠরোধ করে ঘটনাটাকে চাপা দেবার চেষ্টা হল। রবীন্দ্রনাথ এ ঘটনায় ক্রোধে ও ঘৃণায় অধীর হয়ে উঠলেন। রাজনৈতিক নেতারা সাহস দেখাতে পারলেন না বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একাই প্রতিবাদ করলেন এ বর্বরতার। তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগের ঘটনাটি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

১৯৩৫ সালে ইতালি আফ্রিকার সুপ্রাচীন দেশ আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। রবীন্দ্রনাথ এ আক্রমনের নিন্দা করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি অন্তরে অন্তরে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। আগ্রাসী জার্মানির আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য বেলজিয়ানরা যে উদ্যোগ নিয়েছিল প্রতি আক্রমণের মাধ্যমে তাতে রবীন্দ্রনাথ বেলজিয়ানদের বীরত্বের প্রশংসা করেছিলেন। এ সময়েরই তাঁর বিখ্যাত 'বাধা দিলে বাধঁবে লড়াই, মরতে হবে' গানটি রচিত হয়। চীনের উপর ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনী রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল। ইংরেজরা চীনের সর্বস্ব লুট করবার জন্য ঐ দেশের মানুষকে আফিমের নেশায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। তাই ববীন্দ্রনাথ ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যলিপ্সু ইংরেজদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। আবার জাপান যখন চীনকে গ্রাস করবার জন্য উদ্যত তখন কবি সাম্রাজ্য লো লুপ জাপানের কড়া সমালোচনা করেন। এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের স্পষ্ট বক্তব্য,"যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইতস্ততঃ করবে, দ্বিধাগ্রস্ত হবে- সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার মনোভাব যাদের মধ্যে দেখা যাবে, - তারা কোনও ক্রমেই বামপন্থী হতে পারে না" কবিকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র নির্বাচিত হওয়ার পর কবিগুরু রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেন। কবির ভাষায় "বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ নায়কের পদে করণ করি। .... দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর করে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে নববসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলায়িত করবার সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করো তুমি।"

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে। তারপর ইউরোপের প্রায় সব রাষ্ট্রই চলে আসে হিটলারের হাতের মুঠোয়। হিটলার

বাহিনীর পররাজ্য গ্রাস এবং জান্তব হিংস্রতা দেখে কবি বিস্মিত হন। প্রতিদিন রেডিওতে যুদ্ধের নৃশংসতর খবর শুনে কবি স্তম্ভিত - কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এসব খবর তাঁকে মর্মাহত করেছে। গভীর বেদনা নিয়েই তিনি লিখেছিলেন - 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব' কবিতাটি। বেদনাদীর্ণ হৃদয়ে তাঁকে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লিখতে হয়েছে সেদিন। হিটলারকে বিদ্রুপ করেই লেখা হয়েছিল- "ঐ শোনা যায় রেডিওতে/বোঁচা গোঁফের হুমকি,/দেশ বিদেশে শহর গ্রামে/গলা কাটার ধুম কি-! /গোঁ গোঁ করে রেডিওটা /কে জানে কার জিত /মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিল /সভ্য বিধির ভিত।" /

রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিভূ উচ্ছৃঙ্খল এবং প্রজাপীড়ক জমিদারদের সমালোচনাতেও মুখর হয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজে এক সময় জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। 'মুখুজ্জে বনাম বাড়ুজ্জে' প্রবন্ধে তিনি জমিদারদের সমালোচনা করেছেন। বুয়ার যুদ্ধের বিষয়কে তিনি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন তাঁর বিখ্যাত আফ্রিকা কবিতায়। কৃষ্ণাঙ্গদের উপর সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের অত্যাচার উৎপীড়নের চিত্রটি সজীব হয়ে উঠেছে। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসনারোহনে কংগ্রেস রাজমহিমা গান করেছিল - তারই প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'অত্যুক্তি' নামক প্রবন্ধ। এছাড়া বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'পাগল', 'সফলতার সদুপায়', 'আত্মশক্তি', 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রভৃতি প্রবন্ধ। এ সবই ছিল সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ যেমন বঙ্গভঙ্গ, কার্জনের শিক্ষানীতি, ভাষা বিচ্ছেদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ। মহাযুদ্ধের অভিঘাতে কবি শান্তিনিকেতনে যে সব ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলোর মধ্যে 'মা মা হিংসীঃ', 'পাপের মার্জনা', অমৃতস্যপুত্রাঃ প্রভৃতি প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল। মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। কবির 'মুক্তধারা', রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকেও তার সাম্রাজ্য বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে সমস্ত বাধ ভেঙ্গে দিয়ে মুক্তির পথে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত রয়েছে। এ নাটকগুলোতে দেখানো হয়েছে শোষণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন শেষ কথা বলে না। শ্রমিক কৃষকদের সাথে নিয়ে জীবনের জয়গান গাওয়ার জন্যই কবি উদ্বুদ্ধ করেছেন মানুষকে।

১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে স্পেনে ফ্যাসীবাদের প্রতাপে গৃহযুদ্ধ বেধে যায়- জেনারেল ফ্রাঙ্কো ডিক্টেটর হয়ে উঠেন। এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বিবৃতি দিয়েছিলেন। স্টেটসম্যান পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। কবি লীগ এগেন্স্ট ফ্যাসিজম এন্ড ওয়ার" এর সভাপতি পদেও বৃত ছিলেন।

ভারতে ইংরেজ শাসন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "অধীন দেশকে দুর্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোন স্থানে শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জীব করিয়া রাখা- এ বিশেষভাবে কোনও সময়কার রাষ্ট্রনীতি যে সময়ে পীড়িতেরও জন্য , দুর্বলের জন্য দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয়না, ক্ষুধিত ইম্পীরিয়লিজম স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে, সে সময়ে বীর্যের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা ইহা সেই

সময়কার রাষ্ট্রনীতি।"

সভ্যতার সঙ্কট প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কি রকম নখদন্ত বিস্তার করে বিভীষিকা ছড়াতে উদ্যত' এই মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জাব ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমান দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। একদিন ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যেতেই হবে, কিন্তু সে দিন কোন ভারতবর্ষকে তারা রেখে যাবে? ঐ লেখনী ছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? মানুষের প্রতি আগাধ বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ একদিন দেখা দেবেই। একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসব হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন শক্তিদম্ভ, স্বার্থলোভ মাবিব মত বিশ্ব সংসারকে গ্রাস করতে উদ্যত হলেও শেষ কথা বলবে জনগণ, মানুষ। তাই যীশুব জন্ম দিনে কবি আবার স্মরণ করলেন এবং সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন- 'মানুযেব প্রতি বিশ্বাস হাবানো পাপ।'

----- o -----

রামমোহনের সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্র চিন্তা

দীনেশ চন্দ্র সাহা

রামমোহনের সময় ভারতের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। চারদিকে চরম দারিদ্র,নিদারুণ নিরক্ষরতা,ধর্মান্ধতা ও সামাজিক কুসংস্কারে ডুবে ছিল ভারতীয় সমাজ। জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা সৃষ্টি করেছিল চরম সামাজিক বৈষম্য এবং দুর্দশা। আইন শৃঙ্খলার ছিল অরাজকতা।

ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তিন শ্রেনীর মানুষ ছিল। একদল বহিরাগত আগন্তুক শ্রেনী, দ্বিতীয় শ্রেনীতে ছিল ভারতের বিপুল সংখ্যক ধর্মান্তরিত মানুষ, তৃতীয় শ্রেনীতে ছিল আগন্তুক ও ধর্মান্তরিতদের মিশ্রনে নতুন প্রজন্মের মানুষেরা। ভারতীয় সমাজের প্রভাবে মুসলমান সমাজেও সৃষ্টি হয়েছিল অভিজাত এবং নিম্নবর্ণের শ্রেনীভেদ। এছাড়াও ছিল শিয়া সুন্নি বিরোধ।

সেকালে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। হিন্দু বিবাহে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিলনা। ফলে হিন্দু বালিকাদের এক বার বিবাহ হলে চিরকালের জন্য স্বামীর শ্রীচরণে দাসীরূপে গণ্য হত। মুসলমান সমাজে পুরুষেরা তিনবার তালাক দিলেই বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃত ছিল।

চৈতন্য দেবের প্রভাবে মধ্যযুগে হিন্দু মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সম্প্রীতির একটা নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু বাংলাতেই ১২১ জন মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ করেও অনেকে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

রামমোহনের সময় ভারতের জাতীয়তাবোধ বা ভারতীয়ত্ববোধ বলতে কিছু ছিলনা। আঞ্চলিকতা,ধর্মান্ধতা,গোষ্ঠী তন্ত্র ইত্যাদি সংকীর্ণ মানসিকতা সকলের মধ্যেই বিরাজমান ছিল। অখন্ড ভারত চেতনা ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজী শিক্ষারই ফল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের পরিবেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে নানা জাতি। কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে ? ধর্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই,বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই। রাজপুত, জাঠ এক ধর্মাবলম্বী হইলেও বংশগত ঐক্য নাই বলিয়া ভিন্ন জাতি। বাঙ্গালী,বিহারী এক বংশীয় হইলেও ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে, যাহাদের এক ধর্ম,এক ভাষা, এক জাতি,এক

দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতা জ্ঞান নাই ।"

জাতি এবং জাতীয়তাবোধ ইউরোপেও আধুনিক কালেরই সৃষ্টি। জার্মানীর সর্বত্র একই ভাষা এবং একই জীবনধারা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও জার্মানরা বহু রাজ্যে বিভক্ত হয়ে ছিল। ইতালী এবং জার্মানীতে নেপোলিয়ন নিজের অজ্ঞাতসারেই জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন, যেমন ইংরেজ শাসনে ভারতে জেগে উঠেছে জাতীয়তাবোধ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯১৮ সালে জার্মান জাতির একটা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৭১ সালে ফরাসী সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে বহু রক্ত এবং অস্ত্রের জোরে ঐক্যবদ্ধ জার্মান জাতির অভ্যুদয় ঘটেছিল ইউরোপ মহাদেশে।অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। বহু রক্তের বিনিময়ে সৃষ্টি হয়েছিল একেকটি আধুনিক রাষ্ট্র।

রামমোহন এসব রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাস গভীরে মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। ইউরোপে প্রতিটি দেশে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আগে প্রয়োজন হয়েছিল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের এক জাতীর জাগরণ।

আধুনিক ইতিহাস শিক্ষা দিয়েছে মানুষের জন জাগরণ ছাড়া স্বাধীনতা আসেনা এবং জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা বা রক্ষা করাও সম্ভব হয়না। রামমোহনের সময় কালেই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল।

ভারতে জাতীয় জাগরণের প্রথম ধাপ হবে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার এবং সমাজ সংস্কার। এই উপলব্ধি ভারতে প্রথম এসেছিল রামমোহনের মধ্যে। তাই তিনি এদেশে জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত বলে চিহ্নিত এবং অভিনন্দিত হয়েছেন।

ভারতের জাতীয়তাবোধের একটা ধারা প্রথমত: ভৌগোলিক আয়তন ও অবস্থানের ভিত্তিতে প্রাচীন কাল থেকে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত একই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব শত শত বছর ধরে রামায়ণ ও মহাভারতের মাধ্যমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিম আক্রমনের পূর্ববর্তী সমস্ত আক্রমনকারীরা ভারতীয় সভ্যতায় বিলীন হয়ে গেছে।

মুসলমানরাই ভারতের নামকরণ করেছে হিন্দুস্থান । মুসলমান আগমনের আগে এই শব্দটি সাহিত্যের বা ধর্মের কোন বিভাগেই উল্লেখ করা হয়নি।মুসলমানরা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে না গেলেও ক্রমে ক্রমে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে দেওয়া নেওয়ার বিনিময় ঘটার ফলে একটা ঐক্য বোধ গড়ে উঠেছে।

রামমোহন উপলব্ধি করেন যে, ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ মুসলিমদের বাদ দিয়ে হতে পারেনা। বৌদ্ধ,জৈন এবং শিখ ধর্মকে হিন্দু মানসিকতার

পৃথক ধর্ম রূপে কখনো গন্য করা হয়নি। তাই এসব ধর্মের মানুষেরা এক পরিবারভুক্ত বলেই বিবেচিত হয়েছে।

অভিজাত মুসলমানরা নিজেদের শাসক শ্রেনীর লোক বলে দাবী করতো। মৌলবীরা কঠোর শরীয়তী শাসনের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা পার্থক্য সৃষ্টি করে রাখতে সচেষ্ট ছিল।

তাই রামমোহন হিন্দু মুসলমানের শাস্ত্রীয় বিকৃতিগুলো চিহ্নিত করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির পথকে প্রসারিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। অজস্র প্রবন্ধ রচনা করে প্রচার করতে হয়েছিল।

রামমোহন জীবিত কালে ধর্মান্ধদের মন জয় করতে পারেননি বরং আক্রমনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিলেন।কিন্তু রামমোহনের গ্রন্থ গুলো আধুনিক ভারত গড়ার অমূল্য দলিল রূপে গন্য হয়েছে। ইউরোপীয় পন্ডিতরা বিশেষ ভাবে রামমোহনের গ্রন্থ পাঠ করেই ভারত প্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন। ভারতীয় শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিরাও রামমোহনের আদর্শ বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

বাঙ্গালীর সৌভাগ্য হল রামমোহনের পর রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলায় অসাধারণ প্রতিভাশালী বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী সমাজ সংস্কারক,কবি, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ বাঙ্গলায় যথেষ্ঠ সংখ্যায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাদের জীবন ও কর্ম শুধু বাঙ্গালী সমাজকেই উন্নত করেনি, সারা ভারতবর্ষেই জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করেছে। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম,মানবিক কাব্যধারায় ভারতবাসীর বিবেক বুদ্ধিকে জাগিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, ও বঙ্কিমচন্দ্র সাহসে,শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে বিশাল ভূমিকা পালন করেছেন।

সামাজিক জীবনে বাঙ্গালীর সমস্যা এবং সারা ভারতের সমস্যা পৃথক ছিলনা। সতীদাহ প্রথা,বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, শিশু
বলি, ইত্যাদি ধর্মীয় কুসংস্কার সারা ভারতে সব হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।দারিদ্র,নিরক্ষরতা, যুক্তিহীন আচারের প্রতি আকর্ষণ সারা ভারতে সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই ছিল।

রামমোহনের সমাজ চিন্তা সঠিক ভাবেই মূল সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। আধুনিক শিক্ষার প্রসার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেমন আঘাত করবে তেমনি দারিদ্র্য দূরীকরণেও সহায়ক হবে। অন্যদিকে সামাজিক ঐক্য এবং সম্প্রীতির মানসিকতাও গড়ে তুলবে। রামমোহনের এই ধারনা সঠিক প্রমানিত হয়েছে।

মুসলমানরা নবাবের জাত বলে অভিমান বশত: ইংরেজী শিক্ষা বয়কট করেছিল। তার ফলে মুসলিম সমাজের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার অভাবে সরকারী চাকুরীতে এবং কারিগরী বিদ্যায় মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিল। পরবর্তী কালে হিন্দুদের প্রতি অভিমান বশত: দেশটাকে ভাগ করে নিয়ে গোটা ভারতেরই ক্ষতি করেছে। এতে মুসলিম সমাজেরও মঙ্গল হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামিক আদর্শে রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। এরূপ চেষ্টা হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষকেই শুধু বাড়িয়ে দেয়। এই চেতনা বিকাশের পথে প্রধান বাধা হল মৌলবাদ।

প্রাচ্য বিদ্যা বিশারদদের মধ্যে সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিদেশী পন্ডিত কোল ব্রুক ছিলেন রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রাচীন ভারতের জীবন চর্চা, দর্শন,কাব্য, গনিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে অসাধারণ জ্ঞানী পুরুষ রূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

কোলব্রুক রামমোহনের সমাজ চিন্তাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সমর্থন করেছেন। মানসিক উন্নতি ছাড়া সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এটাই ছিল বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত। এবিষয়ে রামমোহনের চিন্তা ছিল অভ্রান্ত।

রামমোহন কোন সময়ই ইউরোপীয় সমাজকে অন্ধভাবে অনুসরণের পক্ষপাতি ছিলেননা। ভারতীয় সংস্কৃতির কষ্টিপাথরে বিচার বিশ্লেষণ করে ভারতের পক্ষে সমাজ কল্যান মূলক বিষয়কে গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন।

রামমোহন জীবনের শেষ তিনটি বছর লন্ডনে কাটিয়েছেন। কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি ইউরোপীয় পোষাক ব্যবহার করেননি। ইংল্যান্ডের রাজসভায় এবং পার্লামেন্টেও তিনি ভারতীয় পোষাকই ব্যবহার করেছেন।

সেকালে ইউরোপ যাত্রা এবং সমুদ্র পথে ভ্রমণ ভারতীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের পক্ষে মহাপাপ বলে গণ্য হতো। কিন্তু রামমোহন এই সংস্কারকে গ্রাহ্য করেননি। সমাজের কল্যানে তিনি যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

রামমোহন সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কারন সেকালের সমাজে ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন রকম সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব ছিলনা। তবে রামমোহনের ধর্মচিন্তাকে কোনভাবেই সাম্প্রদায়িক বলা যাবেনা। ধর্ম সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি রামমোহন চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট।

রামমোহনের ধর্ম চিন্তায় উপনিষদের যুগের সংকীর্ণতা মুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গিই প্রবাহিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম রামমোহনের চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন- ''দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রনী।''

রামমোহনকে অধার্মিক বলে যে সব গোঁড়া হিন্দু পন্ডিতরা নিয়মিত সমালোচনা ও নিন্দা করতেন- তাদের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ইতিহাসে অনেক তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। একটি প্রধান প্রমাণ হল - রামমোহন প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা এবং প্রার্থনা করতেন। দেশে এবং বিদেশে তার বহু সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে।

ডেভিড হেয়ারের ভাইঝি জ্যানেট হেয়ার তাঁর আত্ম জীবনীতে লিখেছেন যে- রামমোহন রায় যখন যেখানেই ছিলেন তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করতেন। কারো উপস্থিতিতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতোনা। এমনকি যখনই তাঁর মনে কোন দুঃশ্চিন্তা বা দুর্বলতা দেখা দিত তখনো তিনি প্রার্থনা করতেন।

রামমোহনের শাস্ত্রচিন্তা এবং ধর্ম চিন্তা যদি ব্যক্তিগত সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো তাহলেও তিনি সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পরতেন।

রামমোহনের বিরুদ্ধবাদীরা দুইশ বছর ধরে রামমোহনকে সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরূপে প্রমাণ করার চেষ্টা করে চলেছেন। নিন্দা এবং সমালোচনাকে রামমোহন কখনো গ্রাহ্য করেননি।

এভাবে ভারতে সমাজ উন্নয়নে এবং জাতীর বিবেক জাগ্রত করার প্রেরণা সঞ্চারের ক্ষেত্রে রামমোহনের ভুমিকা কে খাটো করে দেখাবার প্রচেষ্টা আজো অব্যাহত রয়েছে।

ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিছু অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব আছে, আবার একটি সামাজিক দিকও রয়েছে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো ধর্মীয় আচারেরও পরিবর্তন হয়। সমাজ পরিবর্তনের ধারা যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সে নিয়মের সঙ্গে ধর্মীয় রীতিনীতির একটা সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টা সমাজ জীবনে সর্বদাই সক্রিয় থাকে। এই প্রক্রিয়ায় যখন বিকৃতি ঘটে তখনই কোন একটি প্রতিভাবান পুরুষের চেষ্টায় বাস্তবোচিত চেতনার জন্য একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

রামমোহনের যুক্তিবাদ ভারতীয় সমাজে তেমনি একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই আলোড়ন থেকেই জন্ম নিয়েছিল নতুন যুগের নতুন সমাজ।

কলকাতা ভারতের রাজধানী হওয়ায় কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে নব যুগের নব জাগরণ। যা ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলোকে প্লাবিত করেছে নতুন চিন্তা ভাবনায়।

কিন্তু ভারতীয় গ্রামীন সমাজে তার প্রভাব পড়েছে সামান্যই। স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরও ভারতের গ্রামীন জীবনে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার এবং জাতিভেদ প্রবল

আকারে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

তাই বলা যায় রামমোহনের আরব্ধ কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। রামমোহনের সমাজ চিন্তাকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেবার মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ এখনো খুব জরুরী। হিন্দুত্ব এবং ইসলামের গোঁড়ামীর সঙ্গে জাত পাতের বিদ্বেষ দূর করতে গড়ে তুলতে হবে নতুন গণ জাগরণ।

রামমোহনের সময় ভারতে ইংরেজ শাসনের মাত্র সূত্রপাত হয়েছে। ভারতীয়রা ছিল ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় । সারা ভারতে তখনো ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হয়নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন রাজনৈতিক চেতনা ছিলনা। সমাজের কোন স্তরেই স্বাধীনতা বোধ ছিলনা।

ভারতে ইংরেজরা এসেছিল ব্যবসা বানিজ্য করতে । তারা চেয়েছিল অবাধ ব্যবসা বানিজ্যের অধিকার। মুসলিম বাদশাহরা এদেশে পর্তুগীজ, ফরাসী এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বানিজ্য করার অধিকার দিয়েছিল। কিন্তু আঞ্চলিক স্তরে দিল্লীর বাদশাহের নিয়ন্ত্রণ ছিলনা।

বাংলার নবাবের নিয়ন্ত্রণে ছিল বাংলা, বিহার, উডিষ্যা। মারাঠীরা পাঞ্জাব পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও ছিল চরম অস্থিরতা।

ভারতীয়রা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে ইংরেজরা কখনোই ভারতবর্ষ দখল করতে পারত না। ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যেও বানিজ্য অঞ্চল দখল করা নিয়ে ছিল নিয়মিত সংঘাত।

বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধাণ সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজরা নবাবকে পরাজিত করে ভারতের বুকে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের অপ্রত্যাশিত সুযোগ লাভ করে। নবাবের সেনাবাহিনীর তুলনায় ইংরেজ বাহিনী ছিল নগন্য। নবাব বহিনীর অধিকাংশ সৈনিক সেনাপতির নির্দেশে নিস্ক্রীয় ছিল। ইংরেজদের সেনাবাহিনী গঠন করার সুযোগ ও আর্থিক সঙ্গতি ছিলনা। জগৎ শেঠ,উমিচাঁদের মত ভারতীয় মহাজনরা ইংরেজ বাহিনী গঠন করার জন্য প্রচুর অর্থ ধার দিয়েছিল। মীরজাফর ও নবাবী পাওয়ার লোভে প্রচুর অর্থ ঘুষ দিয়েছিল।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য হাজার হাজাব ভারতীয় যুবক ভীড করেছিল। ইংল্যান্ড থেকে সেনা বাহিনী এনে ভারতবর্ষ জয় করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। সেকালে সমুদ্রপথে নৌবহর নিয়ে আসা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিলনা। ভারতের নৌবাহিনী ছিল খুবই দুর্বল। ভারতীয় স্থল বাহিনীই ছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের একমাত্র সম্বল।

ভারতে প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণের প্রথম যুগে ইংরেজ শাসকরা নানা কারণে দোদুল্যমান ছিল। ভূমি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতেও প্রায় ৫০ বছর সময় লেগেছে। একশালা,পাঁচশালা,দশশালা,বন্দোবস্তের পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তণ করে ইংরেজ শাসকরা স্থায়ী আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের জীবনে সর্বনাশ নেমে এসেছে। এক কলমের খোঁচায় জমির উপর থেকে কৃষকের সব অধিকার বাতিল করা হয়েছে। অন্যদিকে যারা খাজনা আদায় করতো তারাই জমিদার হয়ে কৃষক শ্রেনীর উপর অন্যায় শাসন,শোষণ এবং অত্যাচার চালাবার অধিকার লাভ করলো।

এরকম পরিস্থিতিতে রামমোহন নিজে একজন জমিদার হয়েও কৃষকের দুর্দশা লাঘব করার জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করেছেন এবং জমিদারী ব্যবস্থাই কৃষকের এই দুর্দশার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। ঐ সময় দেশের শতকরা নব্বই জন মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল।

রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের সমকালীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রচিন্তা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়ার উপযোগী ছিলনা।

আধুনিক জাতীয়তাবোধের আদর্শ অনুযায়ী ভারতবাসীকে বিশ্বের দরবারে এক জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আধুনিক জ্ঞান নির্ভর পাশ্চাত্য রাষ্ট্র শাসনের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। ইংরেজ শাসনের মাধ্যমেই আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

পরবর্তী একশ বছর ধরে ভারতে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে যে বুদ্ধিজীবী শ্রেনীর সৃষ্টি হয়েছে তারা সকলেই রামমোহনের রাষ্ট্র চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এজন্যই ১৯৩০ সালের আগে কংগ্রেস দলের পক্ষে পূর্ন স্বাধীনতার দাবী পাস করা সম্ভব হয়নি।

রামমোহনের মৃত্যুর পর ২৪ বছরের মধ্যেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু সারা দেশে তখনো ইংরেজ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটেনি।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং দেশীয় রাজারাই বিদ্রোহীদের দমন করে ইংরেজ শাসকদের রক্ষা করেছিল। জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা থাকলে এটা সম্ভব হতোনা। এই ঘটনাতেও ভারতীয়দের দুর্বল রাষ্ট্র চিন্তা সম্পর্কে রামমোহনের ধারনা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সারা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিস্তারের মধ্যে দিয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর আবির্ভাবের পরই ভারতে

জাতীয়তাবাদী চিন্তধারার বিকাশ ঘটেছে এবং পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তির কামনা জেগে উঠেছে। রামমোহনের মৃত্যুর সত্তর বছর পরে স্বদেশী চিন্তা এবং স্বদেশী আন্দোলন ভারতবাসীকে আলোড়িত করেছিল।

রামমোহন এরূপ সম্ভাবনার কথা সত্তর বছর আগেই বলে গেছেন। তবে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ চরিত্র কেমন হবে তা রামমোহন বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাননি।

রামমোহন ইংল্যান্ডের এক বন্ধুকে লিখেছিলেন ভারতবাসী যখন আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তায় সমৃদ্ধ হবে এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতরাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম হবে তখন ইংরেজদের বানিজ্য স্বার্থ যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেভাবে শান্তিপূর্ন একটা মীমাংসা সম্ভব হবে।

রামমোহনের এই অনুমান কিছুটা সত্য হলেও ইংরেজ শাসকরা নির্মম দমন নীতির শেষ স্তরে গিয়ে বাধ্য হয়েই ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল।আসলে সিপাহী বিদ্রোহের পরে বৃটিশ শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল।

রামমোহনের সময় ইংরেজ শাসকরা ভারতীয়দের সহানুভূতি এবং সমর্থনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। তাই ভারত শাসনের পূর্ণ অধিকার পাওয়ার পব সুসভ্য ইংরেজ জাতির লোকেরা যে বর্বর দমননীতি চালাতে পারে এমন ভাবনা কাবো মাথায় ছিলনা। ভারত সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যে সব যুদ্ধ পববর্তী কালে সংঘটিত হয়েছে সেগুলি দেখলে রামমোহন অবশ্যই শাসক শ্রেনীর ভবিষ্যৎ চরিত্র বিশ্লেষণ কবার সুযোগ পেতেন এবং দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের পবামর্শ দিতেন।

ইউরোপে প্রটেস্টান্ট খ্রীষ্টানরা আধুনিক ধনতন্ত্রেবই বাহক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এ বিষয়ে রামমোহনেব স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী একজন ইংবেজ বন্ধুর কাছে চিঠিতে রামমোহন লিখেছেন- "আমি স্বীকার করি যে, ইউরোপ ও আমেবিকার খ্রীষ্টানদেব তুলনায় ভারতীয়রা তুচ্ছ নয়। কিন্তু আমি দঃখিত যে বর্তমান ধর্মীয় প্রচলিত বিধি অনুযায়ী তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সম্ভব নয় "। শুধু তাই নয়, ভারতে বিভিন্ন ধর্ম,জাতি উপজাতি ও সম্প্রদায়গত বিচ্ছিন্নতা ভেদাভেদ ও অসংখ্য উপবিভাগ এত তীব্র যে, এখানে স্বদেশ প্রেমের কোন অনুভূতি পর্যান্ত নেই। ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরে একটা পরিবর্তন ছাড়া রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়"। (অনুবাদ লেখকের)

ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কার চিন্তার পেছনে যে রামমোহনের একটি সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল উপরোক্ত উদ্ধৃতি তারই প্রমাণ।

আরেকটি পত্রে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি আরো স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন- "বর্তমান কালের সংগ্রাম শুধু সংস্কারবাদী এবং সংস্কার বিরোধীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্বব্যাপী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম,অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের জন্য সংগ্রাম এবং ভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম" (অনুবাদ লেখকের)

এখানে রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তার বিশ্বব্যাপী বিস্তার লক্ষ্যনীয়। সেকালে এমন স্পষ্ট বক্তা আর কেউ ছিলনা। ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিশ্লষণেও রামমোহনের গভীর জ্ঞান ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় বন্ধুদের কাছে লিখিত পত্র গুলোতে। তিনিই প্রথম ভারতবাসী যিনি ফরাসী বিপ্লবের তাৎপর্য এবং ইউরোপের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার ধারাটি সার্বিক ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেনীর বিলুপ্তি এবং নতুন বুর্জোয়া শ্রেনীর আবির্ভাব সম্পর্কে রামমোহন সচেতন ছিলেন। এই প্রগতির ধারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এটাও বিশ্বাস করতেন।

রামমোহন গোষ্ঠীর মুখপত্র Bengal Herald-পত্রিকার ১৮২৯ সালের ১৩ই জুন সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে-- অল্প কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতা ও বঙ্গ দেশে অর্থনৈতিক দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। এর তিনটি লক্ষণের মধ্যে প্রথমটি হল ত্রিশ বছরের মধ্যে জমির দাম কুড়ি গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়টি হল অবাধ বানিজ্যের প্রসার ঘটেছে। তৃতীয়টি হল বহু সংখ্যায় ইউরোপীয়দের সমাগম হওয়ার ফলে বানিজ্যের উন্নতি ঘটছে। এসবের ফলে সমাজে নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেনীর জন্ম হচ্ছে যা এর আগে ছিলনা। এদের প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই নবযুগের সূচনা করেছে।

এই সম্পাদকীয় থেকে সহজেই বুঝা যায় রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তা স্পষ্ট ছিল। পৃথিবীর সর্বত্র মধ্যবিত্ত শ্রেনীই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল । এবং নবযুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

রামমোহন ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কারকে ব্যক্তিগত পুন্য কর্ম বলে কখনোই মনে করেননি। পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধন বন্টনের নতুন ব্যবস্থা সূচিত হওয়ায় ধর্মীয় এবং সামাজিক ব্যবস্থায় প্রচলিত ধারনাগুলোর দ্রুত পরিবর্তন জরুরী হয়ে উঠেছিল। কারণ নবযুগের মধ্যবিত্ত শ্রেনী সর্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দাবী করে।

রামমোহনের এই উপলব্ধি এবং বিশ্লেষণ থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে

উঠে। প্রথমত : সংস্কার আন্দোলন কোন ব্যক্তিগত কল্পনার ফল নয়। সামাজিক প্রয়োজন থেকেই এর উৎপত্তি। দ্বিতীয়ত ধর্ম,সমাজ এবং রাষ্ট্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। ধর্মীয় সংস্কার সমাজ সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন এক সূত্রে গাঁথা।

ভারতের মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে ইংরেজ শাসনে। শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থেই ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। রামমোহনের এই উপলদ্ধিও ছিল সঠিক। ইংরেজ শাসকদের সাহায্য ছাড়া ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারের পরিবর্তন ঘটানো যাবেনা এই উপলব্ধি থেকেই রামমোহন ভারতে কিছু কাল ইংরেজ শাসন থাকা প্রয়োজন মনে করেছেন।

এ বিষয়ে কালমার্কস বলেছেন- ভারতে বৃটিশ শাসকরা অচেতন ভাবে এক সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে ঐতিহাসিক,দায়িত্ব পালন করছে। তবে তাদের শাসন পদ্ধতি অমানবিক অত্যাচারের রূপ নিচ্ছে। ইংরেজরা ভারতে একদিকে যেমন ধ্বংসকারীর ভুমিকায় রয়েছে অন্য দিকে তেমনি মধ্যযুগীয় সমাজের পরিবর্তণ ঘটিয়ে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করছে।

ইংরেজ শাসকদের এই দ্বিমুখী ভুমিকা সম্পর্কে রামমোহন সচেতন ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের উপযুক্ত পরিস্থিতি না থাকায় সংস্কার চিন্তাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

কালমার্কস বলেছেন- ইউরোপীয় কায়দায় শিক্ষিত ভারতীয় সৈনিকরাই একসময় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল শক্তি হয়ে উঠবে। বৃটিশ শাসকরাই প্রথম স্বাধীন ছাপাখানা ও সংবাদ পত্র প্রকাশের অধিকার দিয়ে নতুন চেতনা বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে।

রামমোহন সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করে নিজের মতামতকে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

প্রতিটি দেশের সমাজ ও সভ্যতার কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট থাকে। তাই এক দেশের ইতিহাস অন্য একটি দেশের সঙ্গে হুবুহু মিলেনা। রামমোহন এবিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই ইউরোপের অবিকল নকল করার বিরুদ্ধে সতর্ক ছিলেন।

ধর্ম বা সমাজের সংস্কার কর্ম কখনোই সম্পূর্ণ নবীকরণ হয়না। সামাজিক ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ধারাকে সম্পুর্ন অগ্রাহ্য করে একটা জাতিকে নতুন পথে টেনে নেওয়া যায়না। রামমোহনের রাষ্ট্র চিন্তায় এ বিষয়ে সচেতনতা লক্ষ্যনীয়।

----- o -----

রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা

নীলমনি দত্ত

'কল্লোল', 'কালিকলম' পূর্ববর্তী যুগে যেকজন কবি রবীন্দ্র চৌহদ্দীর মধ্যে থেকেও জীবনদর্শন, চিন্তাভাবনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তথা স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর হয়েছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পাশে থেকে আলাদা করে চিনে নিতে কিছু মাত্র ভুল হয় না - তিনি আর কেউ নন, তিনি নজরুল। বুদ্ধদেব বসু মনে করেন, নজরুলই প্রথম কবি, বাংলা ভাষায় যিনি ররীন্দ্রপ্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এ ধরণের মূল্যায়ণ কতটা প্রাসঙ্গিক বা গতানুগতিকতায় আক্রান্ত সেই প্রসঙ্গ আমার আজকের অলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এখানে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে কি চোখে দেখেছিলেন নজরুল। কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিচার করেছিলেন নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্র মূল্যায়নের রীতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গেলে নজরুলের মূল্যায়নকে সম্ভবতঃ বাদ দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ বিশের দশকে নজরুলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থানের কথা মাথায় রাখলে, তাঁর রবীন্দ্র মূল্যায়ণের একটি বিশেষ ও পৃথক তাৎপর্য রয়েছে।

নজরুল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শুধু কবিতাই লেখেননি, বা কবিতাতেই শুধু শ্রদ্ধা অর্পণ করেননি. রবীন্দ্র প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় এসেছে নানাভাবে। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ এসেছে নজরুলের চিঠিতে। নজরুলের গল্প ও উপন্যাসের চরিত্রদের মুখে এসেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান। নজরুল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে তৈরী চলচ্চিত্রে উপন্যাসের নায়কদের মুখে দিয়েছেন রবীন্দ্র সঙ্গীত। রবীন্দ্র উপন্যাসের চরিত্র গেয়েছে নজরুলের লেখা ও সুর দেওয়া গান। ভাষার প্রয়োগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে নজরুল লিখেছেন প্রবন্ধ। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামে নাটক উৎসর্গ করায় তিনি অভিভুত ও উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। রবীন্দ্র নজরুল সম্পর্কের এই বহুমাত্রিকতাকেই তুলে ধরার সযত্ন প্রয়াস নিয়েছি। আমার শ্রম সার্থক হয়েছে জানলেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

রবীন্দ্রনাথ ছিল তাঁর বিশ্বাসে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র হৃদয়স্পন্দনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবশিষ্ট উচ্চারণে আলগ্ন হয়েছিল। রবীন্দ্র সাহিত্য তিনি কত গভীরভাবে পাঠ করতেন, রবীন্দ্রনাথের শত শত গান তিনি কত নিবিড় ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন, তাঁর কাব্য পাঠ করে সেই বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বেশি অনুসন্ধিৎসু গোয়েন্দা হতে হয় না। এককথায় রবীন্দ্র সান্নিধ্য ও রবীন্দ্র শিক্ষা প্রত্যক্ষ ভাবেই পেয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথকে আকৈশোর তিনি গুরু বলেই গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর এই খেয়ালি খ্যাপা শিষ্য ও ভক্তকে গ্রহণ করেছেন স্নেহে প্রশ্রয়ে, সমর্থনে। তাঁর সমগ্র আচরণ ও জীবনাচারের সঙ্গে আপন জীবনের কোন মিল না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ কখনও তাঁকে তিরস্কার করেননি, বরং তাঁর দেশপ্রেমকে প্রশংসা করেছেন অকুণ্ঠিতভাবে। তাঁর অনশনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আসনকে স্বীকার করেছেন নিঃসংশয়ে। নজরুলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই স্নিগ্ধ প্রশ্রয়, এই অতিবেগ আতিথেয়তা, রবীন্দ্রভক্ত

সমাজে ঈর্ষার তরঙ্গ তুলেছে। ক্ষোভ ও অসহিষ্ণুতা জাগিয়েছে প্রবলভাবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহপ্রশ্রয় সমর্থন থেকে নজরুলকে আমৃত্যু বঞ্চিত করেননি। নজরুল একবার রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝেছিলেন। কিন্তু তাঁর অহেতুক ভ্রান্তি অপনোদিত হতে দেরি হয়নি। সে বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা একটু বাদেই করবো।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ সেই বিদ্যালয় জীবনে ছাত্রাবস্থা থেকেই। রবীন্দ্রনাথ যে বছর নোবেল পুরস্কার পান - সেই সময়ে নজরুলের বয়স মাত্র চৌদ্দ। নজরুল তখন মৈমনসিংহের দরিরামপুর স্কুলে পড়ছেন। তখন তিনি সপ্তম শেণীরে ছাত্র। তখনই তিনি স্কুলের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি' আবৃত্তি করেছিলেন -এই তথ্য জানা যায়। সেই বয়সেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নজরুলের প্রায় শিশুসুলভ উচ্ছ্বাস এক গ্রাম্য বালকের দিক থেকে আশ্চর্যজনক। পরবর্তীকালে 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ,' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছিলেন- ''বিশ্ব কবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয় মন দিয়ে, যেমন করে ভক্ত তাঁর ইষ্টদেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ ধূপ,ফুল,চন্দন দিয়ে সকাল সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এনিয়ে কত লোক, কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে। এমনকি আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্র বিদ্বেষী কোন একজনের মাথার চাঁদিতে আজও অক্ষয় হয়ে লেখা আছে।''প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল' গ্রন্থে নজরুলের এই মারমুখী মেজাজের তথ্য জানা যায়।

নজরুলের রবীন্দ্রময়তার বহু নজির ছড়িয়ে আছে লেখক জীবনের গোড়ায় লেখা গল্পগুলির মধ্যেও। যেমন, ১৩২৬ বঙ্গাব্দের (১৯১৯) মাঘ সংখ্যায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ব্যথার দান' গল্পটিতে। দৃষ্টিহীন দাবা সে গল্পে গান ধরেছে - 'আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো।' শুধু এই একটি রবীদ্র সঙ্গীত নয়, সে আরও গেয়েছে - ''আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন/ আমার সকল ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।'' বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' পত্রিকারই ১৩২৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'হেনা' গল্পটিও লক্ষ্য করার মতো। 'হিন্ডেন বার্গ লাইন' এ লেখা ডায়েরীতে উত্তমপুরুষে এ গল্পের কথাকারের বিবরণ - ''যখন ১২৭ নম্বর বেলুচি রেজিমেন্টের প্রথম 'ব্যাটালিয়ান' যাত্রা কবলে এদেশে আসবার জন্যে, তখন আমার বন্ধু একজন বাঙালি যুবক ডাক্তার সেই গাছতলায় বসে গাচ্ছিল-- 'এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে। বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে।'

এরকম ভাবেই 'এমন দিনে তারে বলা যায়/এমন ঘন ঘোর বরিষায়' - রবীন্দ্র সঙ্গীতটি অব্যর্থভাবে নজরুল প্রয়োগ করেছেন 'বাদল বরিষণ' গল্পটিতে । ১৩২৭ বঙ্গাব্দের (১৯২০) শ্রাবণ সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকাতেই ১৯২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল নজরুলের পত্রোপন্যাস 'বাধন হারা'। তাতেও নানা চিঠির ছত্রে ছত্রে কেবলই রয়েছে রবীন্দ্রনাথ। যেমন নুরুকে চিঠি লিখছে মনয়ুর -''আমার মত কোন মুখ্যুর কথা যদি শুনিস, তাহলে তোর গুরুদেবের উদাত্ত

নির্ভীক বাণীতে তুইও যোগ দিয়ে প্রদীপ্ত কণ্ঠে বুক ফুলিয়ে বল -''বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়/অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'' এরকম অজস্র উদাহরণ। নজরুলের সবকটি উপন্যাস এবং গল্পেই রবীন্দ্রনাথ এভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। শুধু চরিত্রের মুখ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ নন, এগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নজরুল মানসের প্রতিক্রিয়াও কি প্রকাশ হয়ে পড়েনি?

তবে প্রবন্ধে নজরুল প্রথম রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছেন ১৯২০ সালে সান্ধ্য 'নবযুগ' দৈনিকে লেখার সময়। 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধটি একুশ বছরের নজরুলের সাহিত্য ও শিল্প সংক্রান্ত চেতনার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। শিরোনামটির সঙ্গে বিষয় বস্তুর প্রায় কোন মিলই নেই। 'সাহিত্যে সঙ্কীর্ণতা ' বিষয়ে আলোচনা করে নজরুল এই প্রবন্ধে লিখেছেন - ''সাহিত্য যে একটা নূতন ধারা চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক নূতন লেখক এখন অন্ধ। এইসব কারণে সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মত উন্মুক্ত উদার, তাহাতে কোন ধর্ম বিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড় ছোট জ্ঞান থাকিবেনা। বাঁধ দেওয়া ডোবার জলের মত যদি সাহিত্যিকদের জীবন পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য সাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আতুরঘরেই মারা যাইবে।......... সাহিত্যিক নিজের ব্যথা দিয়া, বিশ্বের সকল কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথার ছোঁয়া দেবেন। এইরূপেই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে বলে সাহিত্যের সার্বজনীনতা।'' এই হচ্ছে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গী। এখানেই সফল বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টির জন্য নজরুল তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথকে - 'এই বিশ্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ বরীন্দ্রনাথ এখন জগদ্বিবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন।'' এভাবেই সাহিত্যের নূতন ধাবার সঙ্গে নজরুল অনায়াসে মিশিযে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে। নজরুল যে সময় একথা বলেছেন, তখন সেই প্রজন্মে সম্ভবতঃ অন্য কোন সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে এভাবে বিশ্লেষণ করেন নি।

'ধূমকেতু' তে বিভিন্ন সংবাদের শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তিকে অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করেছেন নজরুল। যেমন ''আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/ পরাণ সখা ফৈসুল হে আমার '' 'ধূমকেতু' র জন্য আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছেন স্বযং রবীন্দ্রনাথ, ২৪শে শ্রাবণ, ১৩২৯ তারিখে দেওযা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীটি নিম্নরূপ ঃ-

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

''আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দেবে বিজয়কেতন
... .
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে

আছে যারা অর্ধচেতন।''

'ধূমকেতু'র প্রতি সংখ্যায় এই আশীর্বাণীটি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার ব্লক করে ছাপা হতো। এতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নজরুলের শ্রদ্ধা ও আবেগে যেমন প্রতিফলিত, তেমনি এ থেকে বোঝা যায় কবি নজরুলের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা। তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপের আগে রবীন্দ্রনাথ যখন নজরুল সম্পর্কে উৎসুক হয়েছিলেন -সে ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরীব 'সবুজপত্র'র সহকারী সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা 'চলমান জীবন' থেকে। পবিত্রবাবু লিখেছেন -''নজরুলের চোখমুখ উচ্ছ্বসিত, সত্যেনদার (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) পায়ের কাছে মাথা নিচু করে হাত বাড়িয়ে দেয়, পায়ে হাত দেবার আগেই সত্যেনদা জড়িয়ে ধরেন কাজীকে। বলেন, 'তুমি ভাই নতুন ঢেউ এনেছ। আমরা তো নগণ্য, গুরুদেবকে পর্যন্ত বিস্মিত করেছ তুমি।'' কথাগুলি শুনতে শুনতে উদ্বেল হয়ে ওঠেন কাজী। বলেন, 'এসবই আমার বরাত।'

নবীন সম্ভাবনাময় কবির কাছে কী চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? জানা যায় , সাক্ষাতের প্রথম দিনেই রবীন্দ্রনাথ নাকি নজরুলকে 'তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছার 'কথাটি বলেছিলেন। যাব নির্গলিতার্থ ছিল, কবিতায় নজরুল মনোনিবেশ করুন , এটাই চেয়েছিলেন কবিগুরু। তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচার কথাতে কবির মনে কোন বিরূপ ধারণা যে হয়নি, সেটা মুজাফ্ফর আমেদের কথাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুরের উপস্থিতিতে কথা প্রসঙ্গে গুরুদেব অরেকবার যখন বললেন, - 'শুনেছি, তুমি নাকি মনযোগানো লেখা লিখতে শুরু কবেছ। বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তলোয়ার হাতে, সে তলোয়ার কি তিনি তোমার হাতে দিয়েছেন দাড়ি চাঁচার জন্যে? এই কথাতেও নজরুলের প্রতি কবি গুরুর স্নেহ ও সদিচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ সুযোগ সন্ধানী কিছু মানুষ এর অপব্যাখ্যা করলো, কেউ কেউ নজরুলকে ভুল বুঝালো। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় তখন অবিরাম নজরুলকে আক্রমণ ও ব্যঙ্গ করে কুৎসিৎ ভাষায় লেখা বার হচ্ছে। যেমন -

''ওরে ভাই গাজীরে, কোথা তুই আজিরে
কোথা তোর রসময়ী কবিতা।'' ইত্যাদি।

এইসব পরশ্রীকাতর ও ক্ষুদ্রমনাদের তিনি জবাব দিলেন 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় -

''গুরু কন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা''।
প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন,
'তুমি হাঁড়ি চাচা'।
''আমি বলি প্রিয়ে, হাটে ভাঙি হাঁড়ি
অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি ।

....
পরোয়া করিনা বাঁচি বা না বাঁচি
যুগের হুজুগ কেটে গেলে।

মাথার উপর জ্বলিছেন রবি,
রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো -যারা কেড়ে খায়,
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায়
তাদের সর্বনাশ।''

এই কবিতা লেখার পর নিন্দুকেরা বেশ কিছুটা সংযত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রভক্তদের কেউ কেউ এই ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের মনকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, চেষ্টা করেন নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের মধুব সম্পর্কে ফাটল ধরাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি। তবু ১৯২৭ সালে প্রবাসীতে প্রকাশিত 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নবীন লেখকদের সম্বন্ধে যে বক্তব্য রাখেন, তাতে অনেকেই ক্ষুন্ন হয়েছিলেন, ভুল বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। ভাষণটির একাংশ এরূপ - ''সৃষ্টিতে যখন দৈন্য ঘটে, তখনই মানুষ তাল ঠুকে নতুনত্বের আস্ফালন করে। সেদিন কোন এক বাঙ্গালী হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন খুন। পুরাতণ রক্ত শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে, তাহলে বুঝব সেটাতে তার অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেননা বলেই তাক লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।''

এই লেখা পড়ে নজরুলের মনে হয় - তাকে খোঁচা দিয়েই এরূপ লেখা হয়েছে। 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে দারিদ্র্য সম্পর্কে মন্তব্য, ভাষণে আরবী, ফার্সি শব্দ প্রয়োগ নিয়ে উক্তি, তার সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা যোগ হয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল-যাতে নজরুলের মনে তখন প্রতিবাদ করার ইচ্ছে জাগে। এই ইচ্ছায় ইন্ধন জোগাবার মত লোকও তাঁর পাশে সেদিন কম ছিলনা। এই নিয়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে পত্র পত্রিকায় অনেক কথা চালাচালি করেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নজরুলের প্রতিবাদের ভাষা বেশ কিছুটা অসংযত হয়ে পড়ে। নজরুল বলেন,''আজ আমাদের মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চির চেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পিছনের বৈয়াকরণ পন্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে। খুন আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায় মুসলমান বা বলশেভিকি রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়তো কবি ওদুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর। কবিগুরুর কাছে নিবেদন, ''তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয়তো সইবে। কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিদ্র্য যন্ত্রণাকে উপহাস করে যেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা না দেন। কবিগুরুর কাছে প্রার্থনা, ঐ ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুণ, দুঃখ নেই, কিন্তু প্ররোচনায় আমাদের প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ করে যেন তাঁর মহিমাকে খর্ব না করেন।''

ঐসব টুকরো টুকরো মন্তব্যগুলো পড়লেই বোঝা যায়, এতটা অপরাধ রবীন্দ্রনাথ করেননি -যার জন্য এতসব রূঢ় মন্তব্য তাঁর সম্বন্ধে করা যেতে পারে। উল্লেখ্য 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'

প্রকাশিত হয় 'আত্মশক্তি'পত্রিকায় ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ অর্থাৎ 'বাংলার কথা'য় রবীন্দ্রনাথের ভাষণ প্রকাশের দশদিন পর। স্বাভাবতই নজরুলের ঐ লেখা নিয়ে চারদিকে তখন আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে এর কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ্যে জানাননি। তবে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ দৃষ্টি থেকে নজরুলকে সরাতে পেরেছেন মনে করে একদল সাহিত্য সেবী মনে মনে খুব আনন্দিত হন। ঠিক এসময় বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' এগিয়ে আসেন ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে। ১৩৩৪ সালের ২০শে মাঘ 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় তিনি লেখেন "কবিগুরু হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ যে কাজী সাহেবকে লক্ষ্য করে একথা বলেছেন এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়নি। যতদূর মনে হয় কোন উদীয়মান তরুণ কবির নবীন ভাষার উদাহরণ স্বরূপ তিনি খুনের কথা বলেন, কোন উদিত কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেননি।" নজরুল সম্পর্কে এই ছিল তাঁর সংযত অথচ স্পষ্ট স্বীকৃতি।

যাইহোক, বিষয়টি প্রমথ চৌধুরীর জবাবী লেখা বেরোনোর পরেই সব মিটে যায়। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কাজী নজরুল' গ্রন্থে লিখেছেন, নজরুল নাকি প্রমথ চৌধুরীর মারফৎ বিশ্বকবির কাছে ছলছল চোখে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন, এবং রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী কবিকে সস্নেহে বুকে তুলে নিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা নজরুল সর্বদা অকুণ্ঠভাবেই পেয়েছিলেন। নজরুলের রাজনৈতিক সক্রিয়তার প্রতিও তাঁর যে প্রশ্রয় ছিল, তা কারারুদ্ধ নজরুলকে 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করার মধ্য দিয়েই বোঝা যায়। 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গের ঘটনায় নজরুল যে আপ্লুত হয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। এরপর হুগলী জেলে বন্দী থাকাকালেও নজরুলকে অনশন প্রত্যাহার করার অনুরোধ করে রবীন্দ্রনাথ তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। সে তারবার্তা জেল কর্তৃপক্ষ যথাস্থানে না পাঠানোয় নজরুল তা জানতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির কথা উল্লেখ্য। সে চিঠিতেও নজরুলেরর প্রতি বিশ্বকবির স্নেহ ও ভালবাসা চাপা থাকেনি। নজরুলের পরিচালনায় 'লাঙল 'সাপ্তাহিকের জন্যও রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আশীর্ব্বাণী-

"জাগো জাগো বলরাম / ধরতব মরুভাঙা
হল / প্রাণ দাও, শক্তি দাও / স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল "

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত। ১৯২৪ - ২৫ সালের দিকে হুগলীতে অবস্থানকালে নজরুলের ইচ্ছে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটক অভিনয় করবেন। তিনি নিজে অভিনয় করবেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায়। তারজন্য রিহার্সেলও শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের আন্দোলনের জোয়ারে শেষ পর্যন্ত ঐ নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। সর্বোপরি, দেশের সামাজিক বিষয় ও সমস্যাদি নিয়েও যে উভয়ের মধ্যে কথা হতো, তাতে নজরুলের নিজের লেখাতেই রয়েছে এই পর্বে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দীর্ঘ একটি কবিতা নজরুল লিখেছিলেন। সে কবিতা ছিল রবীন্দ্রনাথের রচিত '১৪০০ সাল' কবিতা 'আমি হতে শতবর্ষ পরে' পড়ার পর নজরুলের প্রতিক্রিয়া। '১৪০০ সাল' নামে এই কবিতাটি 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। নজরুলকৃত দীর্ঘ কবিতাটির সামান্য অংশ এখানে

তুলে দিচ্ছি -

"আজি হতে শতবর্ষ আগে
হে কবি, স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদের শত অনুরাগে
আজি হতে শতবর্ষ আগে ।"

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নজরুলের মুগ্ধতা মিশ্রিত শ্রদ্ধার প্রতিফলন পড়েছে ছত্রে ছত্রে। নজরুলের অনেক কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ আছে - বিশেষ করে নজরুল লিখেছেন- 'কিশোর রবি', 'রবির জন্মতিথি', 'তীর্থ পথিক' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অনেক কবিতা।

উপসংহারে এই কথা বলেই আলোচনার ছেদ টানতে চাই যে কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি ক্ষমতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সজাগ ছিলেন - তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মজগৎ সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট খোঁজ খবর রাখতেন। প্রথমে কাজী নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার সেতুবন্ধনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। তিনিই প্রথম ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। বোলপুর স্টেশন থেকে সুধাকান্তই কবিকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং অতিথি ভবনে থাকার ব্যবস্থা ও তদারকি করেছিলেন। নজরুলের সঙ্গে ডঃ শহীদুল্লাহও ছিলেন। সাক্ষাতের সময় তিনি কবিগুরুকে বলেন, ট্রেনে আসতে কাজী সাহেব আপনার গীতাঞ্জলির সব গান আমাকে গেয়ে শুনিয়েছেন। একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করে নজরুলের স্মৃতি শক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কাজী নজরুল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আবৃত্তি ও গান শুনতে চেয়েছিলেন। কবিগুরু বললেন- 'আমি যে তোমার গান ও অবৃত্তি শুনবো বলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।' বাধ্য হয়েই নজরুল উদাত্ত কণ্ঠে গান গাইলেন, আবৃত্তি করলেন। নজরুল সে সময়ে এত বেশি রবীন্দ্রসঙ্গীত আত্মস্থ করেছিলেন যে সকলে তা শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন মুজাফ্ফর আহমেদরা নজরুলকে ঠাট্টা করে বলতেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'হাফিজ' অর্থাৎ অন্যান্য কোরাণ যার মুখস্থ তাকেই 'হাফিজ' বলা হয় রবীন্দ্রনাথ কবিকে বলেছিলেন শান্তি নিকেতনে থেকে যেতে সেখানে ছেলে মেয়েদের তিনি ড্রিল শেখাবেন এবং দিনু ঠাকুরের কাছে গান শিখবেন কবির এই প্রস্তাব নজরুল গ্রহণ করেননি। রবীন্দ্রনাথের বুঝতে কোন অসুবিধা হল না - আসলে নজরুল কোন পথের পথিক। মনে হয়, নজরুল কবিগুরুর সেই প্রস্তাব গ্রহণ না করে ভালই করেছেন- অন্ততঃ নজরুলের জীবনেই তা প্রমাণিত সমগ্র নজরুল জীবন জুড়ে রয়েছে কেবল রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ এর অক্টোবরে নজরুলের কাব্যসংগ্রহ 'সঞ্চিতা' প্রকাশিত হয় নজরুল তা উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে "বিশ্ব কবি সম্রাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী শ্রী চরণার বিন্দেষু" কিন্তু এত কিছুর পরেও মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সম্পার্কে নজরুলের অভিমান যায় নি গুরুতর কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও সাপ্তাহিক 'সওগাত' পত্রিকায় নজরুলের একটি মন্তব্যমূলক লেখায় কিন্তু আবার রবীন্দ্র প্রসঙ্গ এসেছিল ১৯২৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর "শুধু গাভী" শীর্ষক একটি ছোট্ট লেখা আমাদের নজরে পড়ে. লেখাটির বয়ান ছিল এরকম - "রবীন্দ্রনাথ

তাঁর নামিত কোন এক পরিষদে তরুণ সাহিত্যিকদের লেখার উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'দুধ নেই, শুধু ফেনা।' রবীন্দ্রনাথ দুধের এক্সপার্ট কিনা জানিনা। অন্ততঃ কর্পোরেশনের মিউনিসিপাল গেজেটে তো তাঁর নাম বেরুতে দেখিনি। কিন্তু দুধ ছাড়া কি শুধুতে ফেনা হয় ? ভাষাকে নিয়ে ফেনানো যাদের লেখা তারাই ভাল বলতে পারবেন। .... শুধু ফেনাতে যদি ছানা না রেরোয়, শুধু গাভীতেও ছানা বেরোয় না।''

এরপর অবশ্য দুজনের মধ্যে দীর্ঘদিন কোনো যোগাযোগের কোনো খবর পাওয়া যায় না। বিশেষত নজরুলের গান বা গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ কিংবা সিনেমা বা নাটকে অংশ নেওয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায়না।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯৪১'র ৭ই আগষ্ট । বাংলা তারিখ অনুযায়ী ১৩৪৮'র ২২শে শ্রাবণ। 'রবির জন্মতিথি' রবীন্দ্রনাথে মৃত্যুর পরে লেখা কিনা সন্দেহ থাকলেও নজরুলের অন্ততঃ দুটি কবিতা যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর উপলক্ষে লেখা হয়েছিল তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই - 'সালাম অস্তরবি' এবং 'রবিহারা'। 'সালাম অস্তরবি' ছাপা হয়েছিল মাসিক 'মোহাম্মদী' তে ১৩৪৮'র ভাদ্র সংখ্যায়। আর 'রবিহারা' নজরুল পাঠ করেছিলেন কলকাতা বেতারে। ১৩৪৮'র ভাদ্রে 'সওগাত ' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি কবিতা থেকেই কিছুটা অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো -

'সালাম অস্তরবি'

> ''কাব্য গীতির শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, দ্রষ্টা, ঋষি ও ধ্যাণী
> মহাকবি রবি অস্ত গিয়েছে! বীণা, বেণুকা ও বাণী।''

'রবিহারা'

> ''দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্ত পারের কোলে।
> শ্রাবণের মেঘ ছুটে এল দলে দলে
> উদাম গগন তলে।
> বিশ্বের কবি, ভারতের রবি,
> শ্যাম বাঙলার হৃদয়ের ছবি
> তুমি চলে যাবে বলে।''

এই দুটি কবিতারই মূলসুর প্রায় এক । নজরুলের ব্যক্তিগত শোক ও আবেগ গভীরভাবে বিধৃত। বিশের দশকের নজরুলের কবিতার গতি প্রাণস্পন্দন এখানে কি আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত।

তবে রবীন্দ্র-নজরুল প্রসঙ্গে শুধু কাব্য বা সাহিত্যে নয়, সিনেমার প্রসঙ্গও চলে আসতে বাধ্য রবীন্দ্রনাথের লেখা কাহিনী নিয়ে ফিল্ম। তাতে নজরুলের সঙ্গীত পরিচালনা। একবারই এটা ঘটেছিল। ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুলাই 'চিত্রা' সিনেমায় নরেশ মিত্র পরিচালিত 'গোরা' মুক্তি পেয়েছিল। ঐদিন রবীন্দ্রনাথের লেখা আরও একটি উপন্যাসের চিত্ররূপ 'শ্রী' হলে মুক্তি পায় - এটি ছিল 'চোখের বালি'। নজরুল তখন সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে।

প্রয়োজক এই জনপ্রিয়তার দিকে তাকিয়েই নজরুলকে যুক্ত করেছিলেন। 'গোরাতে' নজরুল রেখেছিলেন মোট সাতটি গান। তিনটি গান রবীন্দ্রনাথের। দুটি শ্লোক পুরাণ বা গীতা থেকে। কিন্তু গোল বেঁধে ছিল এই রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়েই। নিয়ম অনুযায়ী রেকর্ড বা ছায়াছবির জন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত ব্যবহার করতে গেলে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বোর্ড থেকে আগাম অনুমতি নিতে হতো। 'গোরা'র ক্ষেত্রে তা নেওয়া হয় নি। শেষ পর্যন্ত সমস্যা কাটাতে নজরুল, পরিচালক নরেশ মিত্র সরাসরি গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ধরলেন। সঙ্গীত বোর্ডের আপত্তি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'র অনুমোদন দিয়ে দেন। সন্দেহ নেই নজরুলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম স্নেহ ও ভালবাসার এও আরেক উজ্জ্বল নিদর্শন।

এইভাবে সমগ্র নজরুল জীবন চর্যায় এবং তাঁর রচিত যাবতীয় সাহিত্য সৃষ্টি কর্মে রবীন্দ্র নজরুল সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা প্রকাশে সমগ্র নজরুল সাহিত্য চিরভাস্বর হয়ে উভয়ের সুনিবিড় হৃদয় সম্পর্ককে চিরমধুর ও পরম রমনীয় করে তুলেছে।

<u>সহায়ক গ্রন্থ</u> ঃ-

১)	জনগনের কবি কাজী নজরুল ইসলাম	ঃ-	কল্পতরু সেনগুপ্ত
২)	সৃষ্টি সুখের উল্লাসে	ঃ-	অঞ্জন বেরা
৩)	রাজনীতির নজরুল	ঃ-	অরুণাভ ঘোষ
৪)	কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি কথা	ঃ-	মুজফ্ফর আহ্মদ

----- o -----

যুগ দিশারী মহানামব্রতের চিন্তায় রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান

শ্রী মোহনলাল সাহা

ভূমিকা ঃ- আমাদের এই ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এঁদের শ্রীমুখনিঃসৃত অমুল্য রত্নরাজি এই ভূমিকে করেছে সুশোভিত, আত্মাকে করেছে সমৃদ্ধ। যুগপুরুষ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ভক্তিমার্গের অনন্য সাধক। তিনি যখন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন তখন মনে হয় সমস্ত জ্ঞানমার্গকে তিনি আত্মস্থ করে সহজ সরল ভাষায় আমাদের মত সাধারণ মানুষের সহজভাবে বোধগম্য ক'রে ব্যক্ত করেন ঐ সমস্ত কঠিন কঠিন তত্ত্বের কথা। আমাদের মধ্যে প্রসুপ্ত আত্মবোধশক্তি জেগে ওঠে। আমাদের দুর্ভাগ্য, তা আমরা স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে পারি না। তবুও সে প্রচেষ্টা থেমে নেই।

এ যুগে আমরা যারা জন্মগ্রহণ করেছি তারা কেউই ঠাকুর রামকৃষ্ণ অথবা স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিনি। তাদের মত আমারও ক্ষোভ থাকে যে, কেন আমি সে মহামানবের যুগে জন্মগ্রহণ করিনি। কিন্তু বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক, পরাবিদ্যাচার্য ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর সে দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিগর্ভ ভাষণ আমি শুনিনি কিন্তু ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির অমৃতবাণী শুনেছি বিমুগ্ধ চিত্তে, স্থানু হয়ে।

বিগত ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং থেকে ১লা জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং পর্যন্ত সনাতন ধর্মের বিশ্ববিখ্যাত প্রবক্তা এবং বিশ্বধর্মমতের সংস্থা আয়োজিত চিকাগো ১৯৩৩ সম্মেলনের অন্যান্য সাধারণ ধর্মবক্তা ও উক্ত সংস্থাতার আমেরিকা শাখার আন্তর্জাতিক সম্পাদক পূজ্যপাদ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহোদয় আগরতলার শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনে অবস্থান করেছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত বর্ণাশ্রম, রাষ্ট্রশাসন ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি মূল্যবান ভাষণ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল উপচে পড়া কক্ষে নিবিড় নীরবতার মধ্যে সে অমৃত ভাষণ যেন এখনো কানে বাজছে তখন থেকেই এই মহাতাপসের কাছে কিছু উপদেশ শুনতে মন বার বার চাইছিল

তাঁর আগরতলা আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক ডঃ কুসুমলাল রায়ের সঙ্গে আলোচনা করলাম, কোন ধর্মসভার আয়োজন করা যায় কিনা তিনি জানালেন ডাক্তারের বারণ আছে, এখন সম্ভব নয়। বুকে পেসমেকার, তাছাড়া উনি যখন ধর্মকথা বলেন, মনে হয়, এক বিশেষ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েই কথা বলেন অতি বৃদ্ধ এই তাপস, তাঁকে এত কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে না ভেবে মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই চেপে রাখলাম। এছাড়া দেখেছি, তাঁর আশ্রমে সব সময় লোকের ভিড় লেগেই আছে তাদের সাথে কথাও বলতে হয় আগ্রহী ভক্তদের দীক্ষাও প্রদান করতে হয় এ সমস্ত কারণে আশ্রম-কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক কোন ধর্মসভার আয়োজন করেনি আফশোষ রয়েই গেল

অনেক আশা নিয়ে ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯০, ভোর পাঁচটায় আশ্রমে উপস্থিত হলাম দেখি, ইতিমধ্যেই বহু ভক্ত উপস্থিত হয়েছেন ডাক্তার কুসুমলাল রায় নিকটেই রয়েছেন ঠাকুর

উপবিষ্ট খাটের উপর। ভক্তগণ একে একে প্রণাম করে যাচ্ছেন। অনেকশিষ্য-শিষ্যা বসে আছেন মেঝেতে। দু'একটি কথা ঠাকুর শুনছেন, আবার বলছেনও। অনেক পন্ডিত ব্যক্তিও এসেছেন। সুযোগ পেয়ে এগিয়ে গেলাম মহারাজের ঠিক সম্মুখে। প্রথমে কুসুমবাবু ও পরে অধ্যাপিকা গীতাদি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। গীতাদি নিবেদন করলেন আমার কথা, কিছু প্রশ্ন করতে চায়। ঠাকুর উত্তর দিতে সম্মত হয়ে বললেন-"এটা আমার (ঠাকুরের) সৌভাগ্য।" এমন দৈন্যের অবতার চোখে পড়েনি আমার।

আমার প্রশ্ন ও ব্রহ্মচারী মহারাজের উত্তর স্মৃতি থেকে সাধ্যানুসারে লিখেছি। সঙ্গে টেপ রেকর্ডার নেই বা সে-রূপ কোন প্রস্তুতির অবকাশও পাইনি। এই জ্ঞানতাপসের অমৃতবাণী হুবহু বিধৃত করার মতো শ্রুতিধরও নই আমি, সাধ্যও আমার নেই। এই অক্ষমতা অবনত মস্তকে স্বীকার করছি। আমি মনোবিজ্ঞান বা দর্শনের ছাত্র নই, কমার্সের ছাত্র। ঠাকুরের অমূল্য সম্পদ্ বোঝবার শক্তির দীনতাও দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করি। পাঠকবর্গের নিকট বিনম্র চিত্তে ক্ষমা ভিক্ষা করে তাঁর অমৃতময় কথাগুলি অংশ মাত্র সাধ্যমত তুলে ধরার প্রয়াসী হয়েছি। ত্রুটি বিচ্যুতি যা ঘটেছে তা আমার অক্ষমতাপ্রসূত। অদোষদর্শী সকলে নিজগুণে ক্ষমা করবেন এই আমার ভরসা।

এ চয়ন প্রস্ফুটনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে তাঁরই নির্দেশ অনুসারে পূজনীয় মহারাজের অমূল্য গ্রন্থবাজির কিছু সাহায্য নেয়া হয়েছে, তা অকপটে আগেও বলে রাখছি।

সংকলিত প্রবন্ধত্রয় এবং মানবধর্ম সম্মেলন সংক্রান্ত সংবাদগুলি স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি সবই লেখকেরই মহানামপূজার পুষ্পাঞ্জলি। পূজ্যপাদ মহানাম ব্রতজী এগুলি পড়ে প্রকাশনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন কিন্তু নানা কারণে তা প্রকাশ সম্ভব হয়নি। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, দেখে যেতেও পারেননি এর দায়ভার জনিত সম্পূর্ণ অপরাধ আমার নিজের। অবনত মস্তকে তা স্বীকার করে নিতে কোন দ্বিধা নেই

আমার অক্ষমতা প্রতিপদে। পাঠকবৃন্দ যদি কোনভাবে প্রীত হন তা সবই শ্রীশ্রীপ্রভুর ইচ্ছায়। এই যুগপুরুষের অমূল্য বচনারাজি যাঁরা পড়বেন, অধ্যয়ন করবেন তার মধ্যেই তাঁরা পরম সুহৃৎ তথা পরাশক্তি লাভ করে শান্তিলাভ করবেন

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে অর্জুনকে যেমন বলেছেন,"সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।" ৫/২৯

অর্থাৎ আমাকে যিনি সুহৃৎ বলিয়া জানেন তিনি পরাশান্তি লাভ করেন ।

প্রশ্নকর্তা - শ্রী মোহনলাল সাহা, আগরতলা। উত্তরদাতা - ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

১) প্রশ্ন ঃ- বর্তমান বিশ্বে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে হিংসার দাবানল জ্বলে উঠেছে। জাতিগত বিভেদ, বিদ্বেষ, খুনোখুনিতে দেশ ভরে গেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে দলগত স্বার্থ, দলাদলি প্রবল হয়ে জাতীয় ঐক্যবোধে বিরাট ফাটল সৃষ্টি করেছে। এর কারণ কী? প্রতিকারই বা কী?

উত্তর ঃ- হ্যাঁ, কথাটা সত্য। এখন হিংসা, অশান্তি বা পরস্পর অবিশ্বাসের কারণ জানতে, হলে বিষয়টি ভালভাবে বিচার করে দেখতে হবে। সমাজদেহে দেশে এই রোগের ডায়োগ্নোসিস্ সবার আগে প্রয়োজন। ডায়োগ্নোসিস্ ঠিক হলেই সমস্যার অর্ধেক সমাধান হয়। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাগুলি বিচার করার জন্যই নানাপ্রকার মত রয়েছে তাঁর সমাধান সুত্র নির্ধারণে।

প্রথম দলের দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা মনে করেন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল চিন্তা ভাবনায় দেশে জনগণের সমস্যার কথা চিন্তা না করে পররাজ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের চিন্তাটাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। সেটা সাম্রাজ্য বিস্তারই হোক বা অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বা প্রভাব হোক, পররাষ্ট্র শক্তি যখন অপর কোন রাষ্ট্রের উপর নিজের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়, তখন ঐ রাষ্ট্রের প্রকৃত কল্যান সম্ভব হয় না। নিজ প্রভুত্ব রক্ষার স্বার্থেই তখন বৃহৎশক্তি অপর পাঁচজনের উপর উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয়। স্থায়ী শান্তির জন্য প্রয়োজন সকলের স্বাধীনতা, বৃহৎশক্তির প্রাধান্য বিস্তার রোধ, গোষ্ঠী বা দলগত প্রাধান্য মুক্ত সমাজ রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন।

দ্বিতীয় দলের মত অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে অর্থের সমবন্টনের ভিত্তিকে রাষ্ট্রগঠন। সমাজে অর্থবান লোকেরাই প্রভুত্বের অধিকারী। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লাগাম তাদের হাতে চলে আসে স্বাভাবিকভাবে। সমাজে তখন দেখা যায় একদলের হাতে অপর্যাপ্ত ধন সম্পদ। অপর দল একেবারেই সহায় সম্বলহীন। একদল বিলাসবহুল জীবন -যাবন করছে, অপর দল সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করতে পারছে না। পূর্ব দলের দয়ার পাত্র হয়ে তাদের থাকতে হয়।

এই খেটে খাওয়া মানুষ অসাম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে একদিন রুখে দাঁড়াবে। তখন সমাজে অশান্তির আগুন জ্বলবে। ধন-সম্পদের অধিকারী যারা তারা সংখ্যালঘু হলেও ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী, প্রাণপণে তারা চেষ্টা করবে নিজ অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে। এর অনিবার্য ফল সংঘাত। প্রকৃতির সম্পদ সকলের জন্য। অন্যকে বঞ্চনা করা প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলা। প্রতিবেশীর ঘরে আগুন দিয়ে কি আমরা তামাসা দেখতে পারি? কিছুক্ষণের মধ্যে সেই আগুন এসে আমার ঘরে লাগবে, সে ভাবনা থাকা উচিত। যাদের বঞ্চিত করছি আজ, তারা একদিন তার প্রতিশোধ নেবে। ধনীদের বঞ্চিত করে অর্থ কেড়ে নেবে। এই আর্থিক অসাম্যই অশান্তির কারণ, তা দূর না হলে শান্তি হবে না। মানুষে মানুষে আর্থিক বৈষম্য দূর করে সম্পদ সম দাবী ও সম অধিকারে সকলে যখন ভোগ করবে তখন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

তৃতীয় দলের মত জাতিগত বৈষম্য দূর করা। কালো চামড়ার লোক হলেই সাদা-চামড়ার লোক হতে হীন, এই সামাজিক বৈষম্য অশান্তির কারণ। সমাজে যেভাবে হোক যারা সম্পদের অধিকারী হয়েছে, তাদের চেষ্টা তাদের জাতের মধ্যে তা কুক্ষিগত করে রাখা। সে জন্য রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা নিয়ে সহায় সম্বলহীন লোকের উপর আধিপত্য বজায় রাখতে চেষ্টিত এরা। সমাজের এই মিথ্যা শ্রেণী বিভাগ এক অদ্ভুত প্রহসন। ঈশ্বর আমাদের উচ্চ শ্রেণীর অধিকার দিয়েছেন।

নিম্নশ্রেণীর লোকের কর্তব্য উহা মেনে চলা। এই ঘুমপাড়ানীর মতবাদ এখন অচল। নিম্নশ্রেণীর প্রতি আক্রমণ যত হিংস্র হবে, বিশ্বের জনমত তত বেশী ঘৃণায় গর্জ্জন্ করে উঠবে। জনগণের রায় তার বিরুদ্ধে যাবে।

এই তিন দলের কথা যা বলা হ'ল তার সার কথা এই -অসাম্য দূব করতে হবে। তা হলেই শান্তি আসবে। চিন্তা ধারা এক হলেও, এদের কাজের ধারা কিন্তু এক নয়। এদের মধ্যেও জাতিগত অবিশ্বাস, হিংসা, দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। তাই নতুন নতুন সমস্যা তৈরী হচ্ছে। তারা এদেশে থাকে, খায়, কিন্তু তাদের মন -বুদ্ধি ইউরোপের ভাবধারায় পুষ্ট। এ দেশের চিন্তাশীল লোকের এক বিরাট অংশ এই শ্রেণীর। এটাকেই তারা প্রগতিশীল চিন্তা বলে ভাবে। উপরে কথিত সকল চিন্তাই ইউরোপের শিক্ষার পরিণত ফল।

মহানামব্রতজী বলে চলেছেন -''এখন আমাদের কথা অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব কথা, ভারত -আত্মার কথায় আসা যাক। বৈদিক যুগের মুনি ঋষি, যথা যাজ্ঞবল্ক্য থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য দেবতুল্য মানবের সাধনা পুষ্ট যে বিরাট আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা, অনুভূতি ও সংস্কৃতি প্রবাহমান তাই ভারতীয় চিন্তা বলে পরিচিত। আমরা এই ভারতীয় দলের। এঁদের কথাই আমাদের কথা। ভারত আধ্যাত্মিক চিন্তার ধারক ও বাহক। আর্য ঋষিদের কথাই ভারতের আত্মার কথা। বর্তমান যুগসঙ্কটে বিশ্ব-সমস্যা সমাধানে ঋষিদের কি দান, কি বক্তব্য তাই আমাদেব জানতে হবে এবং তা শ্রদ্ধার সাথে শুনলে যুগ সমস্যার সমাধান হবে। রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তি জীবনের দুঃখ অশান্তি দূর হতেও পারে। ঋষিরা বলেন, ব্যাধি যার তারই চিকিৎসা করা প্রয়োজন। ব্যাধি ব্যক্তির। সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি ব্যক্তিরই সমষ্টি। সামাজিক বা জাতীয় সমস্যা মূলতঃ ব্যক্তি জীবনের, সমষ্টির প্রথমতঃ রোগের কারণ নির্ধারণ করতে রুগীর অবস্থা বিশ্লেষণ করা দরকার। ব্যক্তির স্বরূপ জানা দরকার। ব্যক্তি জীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রধানতঃ দুটি বস্তু পাই। তন্মধ্যে একটি বস্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, অপরটি সদাসর্বদা অপবিবর্তনীয়। সর্বদা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে মানুষের দেহ। যে শাশ্বত বস্তু দেহ মধ্যে থাকায় শত পরিবর্তনেব মধ্যে ব্যক্তি আপনাকে অপরিবর্তনীয় বলে জানে উহাই আত্মা। ঋষিরা বলেন, এই আত্মা জন্মের পূর্বেও ছিল, মৃত্যুর পরেও থাকবে। আত্মা দেহ -আশ্রয়টি যে মুহূর্তে ছেড়ে দেয় সেইক্ষণ হতেই দেহেব বিনাশ শুরু হয়। দেহের মৃত্যু ঘটে। আত্মা স্বীকার না করলেও এটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে আমাদের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত একটা অপরিবর্তনীয় সত্ত্বা আমাদের মধ্যে আছে। তা আছে বলেই শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যে দেহের অশেষ পরিবর্তন ঘটলেও নিজের একই ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে নিজের বা অপরের মনে কোনরূপ সংশয় উদ্রেক করে না। বাল্যের আমি আজ বার্ধক্যেও সেই আমি আছি, এই বোধ আমার নিজেরও আমার সম্বন্ধে অপরের হচ্ছে যে বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যমানতা হেতু, সেই বস্তুই আত্মা। দেহ ও আত্মা এই দুই বস্তু নিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবই বিদ্যমান- ইহাই ঋষির দিব্য অনুভূতি।

এখন আমাদের শরীর বিশ্লেষণে পাওয়া গেল দেহ ও আত্মা। এই দুই নিয়েই অমাদের

ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব রক্ষায় এই দুইয়ের চাহিদা এবং দাবী সমান সমান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা দেহের দাবী বা ইন্দ্রিয় সুখ মেটাতেই ব্যস্ত। আত্মার তৃপ্তির জন্য কোন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ দেহের সুখের দ্রব্য সম্ভারের বিজ্ঞাপনে দেশ ভরে গেছে। তোমার ভিতরে দুইজন দাবীদার। দেহ ও আত্মা উভয়ের দাবীর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। কেবল দেহের তৃপ্তি, সুখ সাধনে তো জীবনের অশেষ দুগর্তি ঘুচবে না। তোমাদের একপেশে আচরণে দেহটি পুষ্ট হয়ে বুর্জোয়া, ধনী সেজেছে, আত্মা উপস্থিত ক্ষেত্রে সর্বহারার রূপ লাভ করেছে। তাই ব্যক্তি সত্তার মধ্যেই ভয়ানক বৈষম্য দেখা দিয়েছে। এই বৈষম্য সকল দুঃখের কারণ। তা দূর করতে না পারলে শান্তি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। ঐ বৈষম্য সৃষ্টি করবে বহু প্রকারের সমস্যা। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তরাষ্ট্রীয় জীবন-সমস্যা -পীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত হবেই হবে

মানুষের জীবনে যত প্রকার অশান্তি আছে, সবারই মূল কারণ এই দেহ ও আত্মার বৈষম্য। যত প্রকার উদ্বেগ, অশান্তি, গন্ডগোল সবই ক্ষুধার্ত আত্মার আর্তনাদ। জাতিতে জাতিতে রজনৈতিক কারণে যুদ্ধ, মালিক শ্রমিকের লড়াই, হিন্দু -মুসলমান ও সাদা কালোর আত্মঘাতী কলহ সামাজিক বর্ণ-বিদ্বেষ হিংসা, ঘৃণা, পারিবারিক অশান্তি কলহ সবকিছুর মূলে আত্মার অসন্তোষ। শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে দেহে প্রকাশ পেল নানা ব্যাধি, অল্পজ্ঞ চিকিৎসক বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে সাময়িক কিছু উপশম করতে সক্ষম হলেও ব্যাধি নিরাময় হয় না। তা অন্যরূপে পুনরায় দেহে ব্যাধির প্রকোপ ঘটায়। সেইরূপ আজ আমাদের সমাজ দেহে অশেষ প্রকার রোগ। রাষ্ট্রনেতা সমাজনেতা সেগুলির প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করছেন। কখনও কখনও সাময়িক কিছু ফল পেলেও রোগেব মূল উৎপাটন না হওয়ায় পুনরায় ঐ ব্যাধি অন্যরূপে সমাজদেহে প্রকাশ পায়। ক্ষুধাতুর আত্মাকে তৃপ্ত না করলে, উপযুক্ত খাদ্য না দিলে, এই ব্যাধির নিরাময় হবে না। পক্ষান্তরে আত্মার তৃপ্তিতেই হবে সর্বব্যাধির চিরতরে নিরাময়। ইহাই আর্য ঋষিদের কথা। ভারতীয় সংস্কৃতির নিজস্ব কথা, আমাদের কথা।

দেহ জড়বস্তু তাই তার খাদ্যও জড় উপাদান। ডাল, ভাত, পানীয় যা কিছু আমরা খাই। কিন্তু আত্মা চেতন বস্তু , তাই তার খাদ্যবস্তুও হবে চেতন। আত্মা অবিনশ্বব, তার আস্বাদনের বস্তুত হবে নিত্য, শাশ্বত।

"প্রত্যেক জীবের সত্তা আছে- যতটুকু হোক। চেতনাও আছে- যত সীমাবদ্ধই হোক, এবং আনন্দও আছে- যৎকিঞ্চিৎই হোক। জীবনে আনন্দ মোটেই না থাকলে কেউ বাঁচতে ইচ্ছা করত না।

আমরা প্রত্যেকেই একটি ছোট সচ্চিদানন্দ, একটু সত্তা, একটু চেতনা, এক বিন্দু আনন্দ আমাদের আছে। এই কারণে অর্থাৎ আমাদের সত্তা, চেতনা ও আনন্দ খুব অল্প বলে, সীমাবদ্ধ বলে আমরা নিয়ত অতৃপ্ত, আমরা সব সময়ই চাই - অফুরন্ত সত্তা, অফুরন্ত চেতনা, অফুরন্ত আনন্দ। আমি পাই কি না পাই - তা আলোচ্য নয়, উহা যে প্রতি নিয়ত চাইছি তাতে কোন সংশয

বা ভুল নেই।

প্রত্যেক মানুষ গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে সত্তায় বা চেতনায় বা আনন্দে সীমারেখা থাকলে সে বিষাদিত হয়, সীমাকে সে সহ্য করতে পারে না। কারণ তার অন্তরাত্মা চায় অসীম সত্তা, অসীম চেতনা ও অসীম আনন্দ। এই অসীম অনন্ত সাচ্চিদানন্দই ভগবান। তাঁর জন্যই আমাদের আত্মা তৃষ্ণাতুর।

জলের পিপাসায় বোঝা যাচ্ছে জলে সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ আছে। আপনার ভিতরে বাইরে জল আছে। ভিতরে জল কম পড়েছে এখন সেই অল্পতার দ্যোতক আপনার তৃষ্ণা, সেই রূপ আপনার অন্তরে অফুরন্ত সচ্চিদানন্দের ক্ষুধা। এতে বোঝা যায় ঐ সচ্চিদানন্দের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ আছে। আপনার অন্তরে বাইরে তাঁর বিদ্যমানতা আছে। আপনার অন্তরে ঘটেছে তার অল্পতা। আপনার চাহিদা অনুরূপ পাচ্ছেন না তাঁকে অন্তরে। সেই অফুরন্ত ভান্ডারের সঙ্গে আপনার যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। সে জন্য আপনার জীবনে দেখা দিয়েছে নানা সমস্যা, অশেষ প্রকার দুঃখ। সেই সচ্চিদানন্দের সঙ্গে যুক্ত হলেই শান্তির অফুরন্ত প্রবাহ বইবে জীবনে। যে জীবন মনে হচ্ছে ভয়ানক সংগ্রামমুখর, প্রতি মুহূর্তেই জীবন -সংগ্রাম লেগে আছে, অশান্তি দুর্গতির শেষ নেই, সেই জীবনই সচ্চিদানন্দকে পেলে অনুভূত হবে মধুময়, অফুরন্ত আনন্দময। ভারতের ঋষিগণের ইহাই দিব্য অনুভূতি-লব্ধ সত্য, ইহাই অন্তরতম বাণী। এ শিক্ষাই আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে একমাত্র পাথেয়। সচ্চিদানন্দের অনুভূতির প্রয়াস ভিন্ন অন্য কৌশলের কোনও স্থান নেই।"

২) প্রশ্ন ঃ ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অথচ ধর্ম নিয়ে দেশব্যাপী হানাহানি, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা-এব কারণ কী? সমাধানই বা কী?

পূজ্যপাদ মহারাজের উত্তর ঃ পৃথিবীতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে আমি প্রথমেই বলব আমেরিকার কথা। সেখানে সকল ধর্মের সমান মর্যাদা আছে। সেখানে আমি অনেকদিন থেকেছি, দেখেছি সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষতার সম্মান তারাই দেয় রাশিয়া এক আধটু চেষ্টা করছে, সফল হতে পারেনি। আর ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা সুবিধাবাদের নামান্তর। যেখানে যে সম্প্রদায়ের লোক বেশী, ভোটের জন্য রাষ্ট্র শক্তি সে পক্ষে যায়। এতো কোনো নীতিই নয়। কেবল পলিটিকস্ স্বার্থসিদ্ধির অপকৌশল, দেশ সেবা নয় আমাদের দেশে এখন আগুন নিয়ে খেলা হচ্ছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কেউ বিচার করতো না, মুখেও আনত না জাতপাতের কথা। নেতাজী 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' গড়েছেন, দেশের জন্য সবাই রক্ত দিয়ে লড়েছে। কৈ সেখানে তো হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান নিয়ে কোনও প্রশ্ন ছিল না। উদ্দেশ্য এক যুদ্ধ করা, লক্ষ্য এক মাতৃভূমির মুক্তিপণ। স্বাধীনতা পেলাম কিন্তু পলিটিক্স করে দেশের চিত্তকে আমরা হারিয়েছে। দেশের চিন্তা নয়, নিজ স্বার্থের চিন্তা কেবল।

সেবা অত্যন্ত পবিত্র ধর্ম। তা অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধাসহ নিবেদন করতে হয়, কৌশল করে নয়। কৌশল করলেই বিচ্যুতি আসবে আসলে ধর্মের কথাই আমরা ঠিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করিনি। ধর্ম এবং মত পুরোপুরি আলাদা।

মানুষের তিনটি বৃত্তি প্রধান - জানবার ইচ্ছা, করবার ইচ্চা এবং অনুভবের ইচ্ছা। যাঁর ভিতর জ্ঞানের তৃষ্ণা প্রবল তিনি চলে যান জ্ঞানমার্গ ধরে, যাঁর ভিতর কর্মের ইচ্ছা প্রবল, তিনি চলে যান কর্ম-মার্গ ধরে, আর যাঁর ভিতর চিত্তের অনুভূতি বা আবেগ অধিক, স্নেহ প্রীতি, ভালবাসা যাঁর ভিতর প্রবল তিনি চলে যান ভক্তিমার্গ অনুসরণ করে। এই তো কথা। তিনটি বৃত্তির জন্য তিনটি বড় রাস্তা, অবশ্য এরা মিলে মিশেও চলে। যেমন, কর্ম-মিশ্রিত জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি। যাঁর যে রকম বৃত্তি, তিনি সে দিকে যান। তবে যেতে হলে রাস্তা একটা ধরতেই হবে।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই এ তিনটি রাস্তার বিবরণ আমাদের শাস্ত্রে আছে। আবার তিনটি রাস্তার সব কয়টিতেই বহু আচার্য আছেন, পথে যেতে তাঁরাই আপনাকে সাহায্য করবেন, তাঁরাই আপনার গাইড-এর কাজ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে যান, সেখানেও একজন গাইড চাই।

আপনি দেবত্ব লাভের পথে চলেছেন, আপনারও একজন পথপ্রদর্শক চাই । দিশারী চাই। যীশুখ্রীষ্টের মতে গেলে সেটা খৃষ্ট ধর্ম নয়, খৃষ্ট মতম্। পয়গম্বর হজরত মহম্মদের মতে যান - মুসলিম মতম্, বৌদ্ধ মতে গেলে - বৌদ্ধ মতম্। এ ধরনের বিভিন্ন মত, যথা- শিখ মতম্, জৈন মতম্ প্রভৃতি। কিন্তু সেটা খৃষ্ট ধর্ম, মুসলিম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিখ ধর্ম বা জৈন ধর্ম হবে কেন? সকলের ধর্মই মানব ধর্ম। তন্ত্রমত বা বৈষ্ণবমত ইত্যাদি নানা মত আছে। যার যা পছন্দ সেই পথে যাবে, তবে তা কোন মহাপুরুষের রচিত হওয়া চাই। সব মিলে এক ধর্ম তা মানব ধর্ম। মত আলাদা। ধর্ম এক। আমি আমার মাকে ভক্তি করি, আপনি আপনার মাকে ভক্তি করেন গভীর ভাবে - তাতে তো আমারও আনন্দ। তেমনি প্রত্যেক মতকে, প্রত্যেক ইজম্‌কে শ্রদ্ধা করতে হবে এই শিক্ষাই তো মানব ধর্ম দিয়ে থাকে।

মনুষ্যত্ব লাভের পর দেবত্ব লাভ। দেবত্ব লাভের জন্য প্রয়োজন মত বা পথের, ঋষিব প্রবর্তিত মত। ঋষি মানে দ্রষ্টা, দ্রষ্টা মানে যিনি সত্যকে দেখেছেন।

আপনি বলাবেন, মতে -মতে এত দ্বন্দ্ব কেন? দ্বন্দ্ব তো থাকবেই। আমি একজন দ্রষ্টা, আমি একরকম দেখেছি, আপনি একজন দ্রষ্টা আপনি দেখেছেন আব এক রকম। কাজেই মতে মতে মিল হচ্ছে না। ঈশ্বব বিরাট কিনা, তাই এ রকম মনে হচ্ছে। ধরুন হিমালয় পর্বতে পাঁচ হাজার লোক পাঠিয়ে দিলেন ফটো তুলে আনবাব জন্য। হিমালয় পর্বতটা এত বড় যে, পাঁচ হাজার লোক পাঁচ হাজাব স্থানে দাঁড়িয়ে ফটো তুলতে পারে। ফটোগুলি এক রকম হবে কি করে? ফটোগুলি যে মিলছে না, এটাই তো পাহাড়েব গৌবব! পাহাড়টা যে সত্যি বিরাট তা বুঝা গেল। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তো সেই একই কথা। ঈশ্বব খুব বিরাট কিনা তাই দ্রষ্টা ঋষিদের দেখার রূপ মিলছে না।

বাস্তব জীবনে আমরা মানব ধর্ম পালন না করলে জীবন কল্যাণময় হতে পারে না। সমাজে তা অনর্থ বাঁধায়। মত আলাদা হলেও পরমেশ্বরকেই ভজনা করা আমাদের জীবনচর্যার শিক্ষা দেখা হয়েছে। একই পূজা মন্ডপে আমরা তো বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করি। পরমাত্মার

কাছে যেতে হলে প্রতীকের মাধ্যমে যেতে হয়। সাকারের মধ্যেই নিরাকারের ভজন। মূর্তির মধ্যেই পরম ব্রহ্মের চিন্তা। বিগ্রহ উপলক্ষ্য। অর্ঘ্য পরম ব্রহ্মের পাদপদ্মে অর্পিত।

আমাদের দেশে যত মত, তত পথ, যত ধর্ম তত পথ তো বলা হয়নি। ধর্ম এক, মত বিভিন্ন হতে পারে। মনুষ্যত্ব লাভই পরম সাধনা। যে কোন পথ ধরে মানবধর্মে দীক্ষিত হয়ে পরমেশ্বরের পাদপদ্মে বিলীন হওয়া, এই তো আমাদের সনাতন ধর্মের মূলমন্ত্র।

৩) প্রশ্ন ঃ ত্রিপুরা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? এখানেও আমরা ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা দেখেছি। তা কেন এবং এর মুক্তি -পথ কোথায়?

মহারাজের উত্তর ঃ- ত্রিপুরা সম্পর্কে আমার ভাল জানা নেই। তবে বিভিন্নভাবে শুনে মনে হয়েছে এখানে একটা অবহেলা কাজ করছে। তারা এখন শিক্ষিত হয়ে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাই মনোমালিন্য। অনেক কিছু যা ঘটেছে সে-কথা তো এ রাজ্যের মানুষ ভালভাবে জানে। অজ্ঞতা, অসাম্যের অন্ধকারে মানুষকে দীর্ঘদিন দৃষ্টিহীন করে রাখা যায় না।

শান্তির পথ একমাত্র মানবধর্মে দীক্ষিত হওয়া। অন্তরাত্মাকে জাগরিত করা। তবে এ রাজ্য বেশ শান্তির জায়গা। একটু সাম্যভাবের প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং তা সত্যিকারের হতে হবে, লোক দেখানো নয়।"

----- o-----

সংগীতের সুধাকন্ঠ কবি হেমাঙ্গ বিশ্বাস

শ্রী সরোজ কান্তি দেব

ভারতের গণমুক্তিতে সাম্যবাদী আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে, এ সত্যটি আজ সর্বাংশে স্বীকৃত।

শ্রীহট্টে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং বিপ্লবী কার্যকলাপ কতটা অনুসৃত হয়েছিল তা বলা শক্ত। ১৯৩০ সালের পর থেকে বামপন্থী আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নের ক্রিয়াকলাপ সেখানে জোরদার হতে থাকে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৪ই ডিসেম্বর ১৯১২ সালে শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার মিরাশি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি ছিল খুবই উন্নত। সেখানে ছিল বহু জমিদার শ্রেণীর লোকের বাস এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকেরাই ছিলেন সংখ্যায় অধিক। সেখান থেকে আগত মাধু বিশ্বাস বর্তমানে কল্যাণপুরে মহারাজ কল্যাণমাণিক্য প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের পুরোহিত। তারই নিকটবর্তী গ্রাম বামুই -এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব্রজবিদেহী চতুঃ সম্প্রদায়ের মহন্ত শ্রীশ্রী ১০৮ সন্তদাসজী। সন্তদাসজী সম্পর্কে এক জায়গায় ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলেছেন, ''সন্তদাসজীব 'ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা' গ্রন্থ আজও পড়ি, জীবন ভরিয়া পড়িব। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ পড়িবে। গ্রন্থ খুলিলেই মনে অনুভব হয় আচার্য শঙ্করের মত ইঁহার মনীষা ও জ্ঞানবত্তা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ভাস্বর হইয়া আছে। আচার্য শঙ্কর বুদ্ধদেবের মত খন্ডন করিয়াছেন । এই দুই মহামানব একত্রে দাঁড়াইয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলে কেমন হয়, যদি দেখিতে কারও সাধ জাগে - তবে তাহাকে বলি ব্রজবিদেহী সন্তদাস মহারাজকে দর্শন করুন''। এই মাধু ঠাকুর থেকেই শুনেছি আরও বিখ্যাত ব্যক্তি এই অঞ্চলে ছিলেন।

আমার ঠাকুর্দা (প্রধান শিক্ষক ছিলেন)-এর মুখ থেকে শুনেছি সিলেটের দীঘলী গ্রামের সুন্দরী মোহন দাস, পইলের বিপিন পাল, তারাকিশোর চৌধুরী এবং এ প্রবন্ধকারের প্রপিতামহ সহপাঠী ছিলেন। তাঁরা সকলেই পালকি করে বা ঘোড়ায় চড়ে সিলেট স্কুলে যাতায়াত করতেন। সন্তদাসজী, বিপিন চন্দ্র পাল, সুন্দরী মোহন দাস বর্তমানে ইতিহাসে বিশ্ববিশ্রুত নাম। বাগ্মী বিপিন পাল ছিলেন অসামান্য ন্যায়নিষ্ঠ এবং তেজস্বী পুরুষ। তিনি প্রথম জীবনে ঢাকার সদরালার অফিসে পেশকারের কাজ করতেন। একবার একটি তদন্ত উপলক্ষে ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ তাকে দু'হাজার টাকা ঘুষ দিতে চাইলে বিপিন পাল তা প্রত্যাখ্যান করে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরী মোহন দাস সিলেট স্কুল থেকে এনট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ ও মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি. পাশ করে কলকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতার বিখ্যাত ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ।

এভাবে ক্রমে ক্রমে সিলেট স্কুল থেকে সকলে চলে গেলেও প্রবন্ধকারের প্রপিতামহ

রাজচন্দ্র দেব (মুন্সী) এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সিলেট কালেক্টরীর অধীনে ডেপুটি কালেক্টরের পদ পেয়ে যাওয়ায় আর উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় যান নি। আমার পরমারাধ্য প্রয়াত পিতৃদেবের মুখে শুনেছি সেবারে যখন কলকাতায় এসে তারাকিশোর চৌধুরী, বিপিন চন্দ্র পাল এবং সুন্দরী মোহন দাস শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্ম সমাজে অন্তর্ভুক্ত হন এবং তারাকিশোর চৌধুরী উপবীত পর্যন্ত ত্যাগ করেন তখন তারাকিশোর চৌধুরীকে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য খুবই তোড়জোড় চলছিল। এ ব্যাপারে আমার প্রপিতামহের একটি মুখ্য ভূমিকা ছিল। সে উদ্দেশ্য আমার প্রপিতামহ আমার বাবাকে নিয়ে এক সুরম্য পালকি করে মিরাশির প্রমোদ চন্দ্র দত্ত, যিনি তখন আসাম সরকারের মন্ত্রীও বটে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। প্রমোদবাবু আমার প্রপিতা মহকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়েছিলেন এবং ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ গিল্টকরা স্বর্ণের বোতামের সেট উপহার দিয়েছিলেন। সে সেটটি আজও আমার খোয়াই বাসরত প্রয়াত মধ্যম কাকার গৃহে রক্ষিত অছে।

এরূপ বহু খ্যাত অখ্যাত মনীষীদের দ্বারা সমাবৃত যে পরিবেশ তাতেই গড়ে উঠেছিলেন বলে হেমাঙ্গ বিশ্বাসও যে একজন নিঃস্বার্থ সমাজসেবী হবেন তাতে বিচিত্রতা কি ? এ প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করা চলে চারণ কবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৮.৫.১৯৩৪)-এর। কারণ উভয়েই ছিলেন জাগরণের কবি, গণসংগীত শিল্পী। স্বদেশী আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লে তার একটি পীঠভুমি হয়ে পড়ে মুকুন্দ দাসের লীলাক্ষেত্র বরিশাল। এ ব্যাপারে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ তাঁর 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় লিখলেন, " The bureaucracy is developing its campaign against swadeshism with a great rapidity and a really admirable energy and decision. Barishal was naturally the first district to be declared, and now we learn that Dacca, Mymensing, Faridpur, Pabna, Rangpur and Tippera, the Habiganj Subdivision of the district of Sylhet and the Sudharam Thana in the district of Noakhali have also been proclaimed"

১৯০৬ সালের প্রথম দিকে গোপনে গোপনে মুকুন্দ দাস প্রস্তুত করলেন তাঁর স্বদেশী যাত্রাপালা 'মাতৃপূজা'। মাতৃপূজার একটি 'চরণের উপর ভিত্তি করে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। চরণটি ছিল এরূপ ঃ

" বাবু বুঝবে কি আর ম'লে ....
ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত-ইঁদুরে করলে সারা,
চোখের ঐ চশমা জোড়া, দেখ্ না তোরা খুলে।"

হেমাঙ্গ বিশ্বাস চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গানে প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা তা বলা যায় না। তবে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানের অনেক ক্ষেত্রে মিল থাকতে দেখা যায়। এ কারণে মুকুন্দ দাসের বিখ্যাত কয়েকটি কবিতার কয়েকটি চরণ এখানে প্রদত্ত হল যে গানগুলি বাঙালী তথা ভারতবাসীর জনমানসকে তখন ভাবের বন্যায় উদ্বেলিত করেছিল।

১)　"রুধিরাসক্তা পানেতে মত্তা
মা আজ ছেলের রক্ত চান।
দিতে হবে তাই মনে রাখিস ভাই
স্বরাজ পথের যাত্রীদল,
মরণ দিয়েই বরণ করিতে
হইবে তোদের মুক্তি ফল।"

২)　" ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে
.... আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে।
সাজরে সন্তান হিন্দু-মুসলমান
থাকে থাকিবে প্রাণ না-হয় যাইবে প্রাণ।
লইয়ে কৃপাণ হওয়ে আগুয়ান,
নিতে হয় মুকুন্দরে নিও রে সঙ্গে ।।"

হবিগঞ্জ হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস শ্রীহট্ট জিলার মুরারীচাঁদ কলেজে ভর্তি হন। এ কলেজটি নির্মাণ করেন রাজা গিরীশ চন্দ্র রায় তাঁরই পূর্বপুরুষ দেওয়ান মানিকচাঁদের পুত্র মুরারীচাঁদ রায়ের নামে। অপুত্রক অবস্থায় মুরারীচাঁদ মারা গেলে তাঁরই বালবিধবা কন্যা ব্রজসুন্দরী গিরীশ চন্দ্রকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই কলেজটি শহরের বাইরে অতি সুরম্য পরিবেশে থ্যাকারে টিলার উপরে নির্মিত হয়েছে ।এককালে ঔপন্যাসিক থ্যাকারে সাহেবের প্রপিতামহ এ টিলাতে বাস করতেন বলেই এর নামকরণ হয়েছে থ্যাকারে টিলা। এ কলেজে যেমন বহু নামীদামী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের সমাবেশ হয়েছে তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরাও কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, সুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, কেমব্রিজের বিখ্যাত ছাত্র অপূর্ব কুমার দত্ত, শ্রদ্ধেয় সুশান্ত কুমার চৌধুরী প্রভৃতি মনীষীগণ এ কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩২ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৫ সালে কারাগরে বন্দী অবস্থায় যক্ষা রোগে আক্রান্ত হলে অসুস্থতার কারণে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় ।মূলত হেমাঙ্গ বিশ্বাস ছিলেন একজন কবি ও গণসংগীত শিল্পী। তিনি ছিলেন নির্যাতিত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী সাম্যবাদী। নানা অনিয়ম ও নির্যাতনের ফলেই তিনি টি.বি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁর বাঁচবার কোন আশা ছিল না। কিন্তু অদম্য মনের বল, সুচিকিৎসা ও সহকর্মীদের চেষ্টায় তিনি অতি অল্প সময়েই সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি প্রমাণ করলেন টি.বি.রোগও চেষ্টায় নিরাময় হয়। সুস্থ হয়েই তিনি আবার শুরু করেন তাঁর লেখনী ও কর্মপ্রচেষ্টা। শুরু করলেন সংগীতের সাধনা এবং তাঁর সুরেলা কণ্ঠে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে উজ্জীবন।

সে সময়ের ফ্যাসিস্ট দাবানলের হিংস্রতায় বিপন্ন মানব জাতির সংকট ও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতায় নিঃস্ব মানুষের হাহাকার ও পরাধীনতার জ্বালা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সংবেদনশীল কবিমনকে সৃষ্টির বেদনায় অস্থির করে তুলেছিল। তাই তিনি লিখলেন ঃ

"তোর মরা গাঙে আইলো এবার বান
ওরে ও কিষাণ
তোর মরা গাঙে আইলো এবার বান ।।
নতুন দিনের নতুন কিষাণ নতুন বিধান
যায় যদি যাক্ নারে প্রাণ
দিব না তো ধান রে ।।

....

চারদিকে আজ মিলছে জনগণ
হাজং টিপরা মনিপুরী সাওতালী বর্মণ-রে।।"

রমাঁ রোঁলার আহ্বানে ১৯৩৬ সালে ব্রাসেল্স-এ যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি ইস্তেহার পাঠানো হয়েছিল। সেই ইস্তেহারে বলা হয়েছেল ঃ "দেশে এবং বিদেশে সম্প্রতি যেসকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অত্যন্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগজনক। উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া ও জাতিবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য লইয়া খেলা করিতেছে এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস কবিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং আমরা ইহার বিরুদ্ধে ভারতের লেখক শিল্পীগণের এবং সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ আছে তাহাদের সকলের প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদ জানান অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি।" এই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রেমচাঁদ প্রভৃতি।

প্যারিস সম্মেলনের পর হ্যারল্ড ল্যাস্কি, হার্বার্ড্ মূলকরাজ আনন্দ, রজনী পাম দত্ত, এ.এম. ফষ্টার প্রভৃতি লেখক- বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে লন্ডনে প্রথম গঠিত হয় 'প্রগতিশীল সাহিত্য সংঘ'। একই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে 'প্রগতিশীল লেখক শিল্পী সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০.০৪.১৯৩৬ সালের লক্ষ্মৌ সম্মেলনে গঠিত হয়'নিখিল ভারত প্রগতিশীল লেখক সংঘ'। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচাঁদ । বাংলাদেশেও অনুরূপ 'প্রগতিশীল লেখক সংঘ' এ সময়েই গড়ে উঠে। প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ প্রকৃতপক্ষে সাম্যবাদী শিল্পী সাহিতিকদেরই মিলনস্থল ছিল । প্রগতি লেখক সংঘ ছাড়া ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখকশিল্পী সংঘ' গঠিত হয় । পঞ্চাশের দশকে এ সংঘের অবলুপ্তি পর্যন্ত এর সঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যে গান সোচ্চার, মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে দূর করার জন্য তাকে সুস্থ সুন্দর জীবনে নিয়ে আসার জন্য পথ দেখায় যে গান, তাই গণসংগীত। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে, " স্বাদেশিকতার ধারা যেখানে

সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার সাগরে গিয়ে মিশেছে সেই মোহনায় গণসংগীতের জন্ম"। অধিকার সচেতন শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষকেই বলা হয় 'গণ'। আমাদের দেশে খুব সম্ভবত গণসংগীত কথাটার ব্যবহার শুরু হয়েছে চল্লিশের দশকের প্রথম পাদে।

পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০ বঙ্গাব্দ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) সম্পর্কে সে সময়ে যেমন কবিতা গল্প লিখেছিলেন ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ এর লেখক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা তেমনি গান বেঁধেছিলেন সুগায়ক ও কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, হরিপদ কোশারী এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

সিলেট বা শ্রীহট্টকে কেন্দ্র করে হেমাঙ্গ বিশ্বাস সারা সুরমা উপত্যকায় জ্যোতিপ্রকাশ আগরওয়ালের সহযোগিতায় গড়ে তুলেছিলেন গণনাট্য আন্দোলন। ১৯৪২ সালে বাংলার প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের আমন্ত্রণে তিনি প্রথম কলকাতায় যান এবং সেখানে মনমাতনো সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পূর্ণ পর্যন্ত যাঁরা গানের সুর দিতেন তাঁদের মধ্যে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ছিলেন প্রধান। তাঁর প্রথম সংগীত সংগ্রহ'বিষাণ'। তাঁর রচিত ও সুর দেওয়া কয়েকটি গণসংগীত যেগুলি তখন সারা বাংলা ও আসামে খুবই জনপ্রিয় হযেছিল তা এখানে প্রদত্ত হল ঃ

১) "কাস্তেটারে দিও জোরে শান
কিষাণ ভাইরে,
কাস্তেটারে দিও জোরে শান।।
ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান-রে।।"

২) "বাইন্যাচঙে প্রাণবিদারী ম্যালেরিয়া মহামারী
হাজার হাজার নরনারী মরছে অসহায়,
শান্তি ভরা সুখের গেহ
শূন্য আজি নাইবে কেহ
মৃত সন্তান বুকে লইয়া কান্দে বাপ মায়।"

দ্বিতীয় গানটি ১৯৪৩ -৪৪ সালে বানিয়াচঙে ম্যালেরিয়া মহামাবীরূপ ধারণ কবলে তাব করাল ছায়াবলম্বনে কবি লিখেছেন। অনুরূপ একটি কবিতা লিখলেন বন্যা নিয়ে।

৩) "মাছ মারিয়া যেজন যায় মাছ লইয়া যায় ঘব
পানির লগে জালোয়ার পীড়িত পানিত কিবা ডর
আমার নাও-এ কর ভর।"

বস্তুত পক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মঘট, শ্রেণী সংগ্রামে বিপর্যস্ত মূল্যবোধ, সাম্যবাদী চেতনা - এই সমস্তই ছিল ১৯৩৯ সালে থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের সাম্যবাদী লেখকদের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। এই দৃষ্টি-কোণ থেকেই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কবিতাও লিখিত হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে কলকাতার

মহম্মদ আলি পার্কে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের তৃতীয় ও শেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ' রূপান্তরিত হয় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'- এ।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস গান রচনা করেছিলেন জনগণের দুঃখ মোচনের জন্য । তার গান ছিল জনগণের মরনপণ বলিষ্ঠ সংগ্রামের হাতিয়ার । তাই তো তিনি লিখেন ঃ

১) এই মাটির ধূলিকণায়
কতো রক্ত লেখা
এই মাটির এই ঘাসে ঘাসে
ইতিহাস লেখা।

....

বারে বারে বন্যা এলো ঝঞ্ঝা ঝড় বাদল
এই মাটিকে ছিনিয়ে নিতে বন্য পশুর দল,
প্রতিশোধে ফাঁসির মঞ্চে শুনি মাটি. গান
নীল সাগরের ওপার হতে ডাকে আন্দামান
আমার মাটি, আমার মা-টি
আমার অভিমান।।"

২) "হায় -হায়!
ঘোর কলিকাল আইল আকাল সোনার বাংলায়
ক্ষুধার অনল দিকে দিকে ধিকি ধিকি ধায়।"

এ কবিতাটি পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় কবি লিখেছিলেন।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানে যেমন একদিকে দুর্ভিক্ষের চিত্ররূপটি ফুটে উঠেছে তেমনি জীবন্ত হয়ে উঠেছে নিপীড়িত মানুষের হাহাকার, ফুটে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী দানবের ভয়ঙ্কর রূপ, আলোকপাত করা হয়েছে পুঁজিপতি জমিদার মুনাফাখোরদের শোষণের চিত্র, অন্যদিকে তাঁর গানে ফুটে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী শাসক শোষক ও শত্রুর বিরুদ্ধে তার স্বভাব সুলভ সংগ্রামী অভিব্যক্তি। তাইতো কবি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হয় ঃ

১) "ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না-
মহানগরীর রাজপথ পথে যত রক্তের স্বাক্ষর
অগ্নিশিখায় অঙ্কিত হোল লক্ষ বুকের' পর
আমরা ভুলবো না"

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ভাষা ছিল সহজ ও সরল। সাধারণ লোকেদের বোধগম্য হয় এমন সহজভাবে চিত্তাকর্ষক শব্দচয়নে তিনি তাঁর গান রচনা করেছেন। তাঁর গান আরও রসগ্রাহী

হয়েছে কারণ তিনি তাঁর বহু গানে শ্রীহট্ট জিলার আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন শব্দের অবতারণা করেছেন। ভাটিয়ালী, জারি সারি ধামাইল বাইদ্যার গান প্রভৃতির সুরের মাধ্যমে হেমাঙ্গ বিশ্বাস গণসংগীত পরিবেশন করেছেন। তাঁর গানে একদিকে মানুষ হেসেছেন আবার কোন কোন বিয়োগাত্মক গানে অনেকে কেঁদেছেনও। আর এখানেই তাঁর কবি মাহাত্ম্য।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস কমিউনিস্ট পার্টির অনুষঙ্গ হিসেবে 'কালচারেল স্কোয়াড' নামে সংস্থাটি গঠন করেন। তাঁর গানের প্রচারে এ স্কোয়াড ছাড়াও সিলেটের শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবা মহিলা প্রভৃতি সংগঠনগুলো অধিক সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করতো। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানগুলি তাই বাছাই করা শিল্পীদের কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়নি কেবলমাত্র। শিল্পীদের থেকে তা ছড়িয়ে পড়েছিল হাজার হাজার নরনারীর কণ্ঠে। তা থেকে বড় জমায়েতে মিছিলে এবং কমিউনিস্ট সম্মেলনে। সে গানগুলির কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হল ঃ

১) "সৈনিক, মুক্তিশিবিরে হাঁকে বিউগল্
আহ্বান শুন ঐ সেনানীর।
তালে তালে ফেল পা কমরেড
শিবে তব গুরুভার ধরণীর।।"

২) "বাজে ক্ষুব্ধ ঈশানী ঝড়ে রুদ্রবিষাণে
ইনক্লাবী আহ্বান-।"

এ গানটি কবি নাট্যকার ও অভিনেতা উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নাটকের প্রস্তাবনা সংগীত ছিল।

৩) "তুমি ছিলায় গরীব কিষাণ এই মাটির সন্তান
হাতে নিলায় তাই তো বন্ধু দুঃখীর এই লাল নিশান।
রে সাথী সর্বহারার নিশান
সেই লাল নিশানের মান রাখিতে দিলায় বন্ধু জান
বন্ধু, লুটাইলায় পরাণ
তোমার রক্তে রাঙা নিশান দিল পথের নিশানা।।"

নারী জাতির দুঃখ দুর্দশা, পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের পণ্য করার মনোভাব হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে সদাই উৎপীড়িত করতো । নারী জাতির দুঃখ দুর্দশার হাত থেকে উত্তরণের লড়াই -এর সংকল্প নিয়ে তিনি অজস্র গান রচনা করেছেন। সেই সময়ে দুঃখ ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে বহু অসহায় নারী অসামাজিক কার্যকলাপে বাধ্য হত, তাদের অনেকে ভাড়াটে সৈন্যের লালসার শিকারও হতো। এই নিয়ে সিলেটের বহুল প্রচারিত ধামাইলের সুরে একটি সুন্দর গান রচনা করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। সেটি এরূপ ঃ

"তোরা বল সখী বল আমারে

ও কে ঘরের বার , কুলের বার
করলো নারীরে।।
ছিল ছায়ায় ঢাকা পাখি ডাকা মায়ায় ঘেরা ঘর
স্বামীর সোহাগ ছিল কত সন্তানের আদর
সেই ঘরে কে আগুন দিল
সর্বস্ব ধন নিল হরে।।
ছিল বাংলা বঁধু বুকে মধু, অমৃতের খনি
আন্ধার ঘর উজল করা নীলকান্ত মণি
সেই বুকে কে গরল দিল
দংশিলো কোন বিষধরে।।
ওরে হতভাগা দেশবাসী জাগবি কবে বল
সর্বনাশের রসাতলে সমাজ হইল তল
দেশমাতা হয় কুলটা
লম্পটের ব্যভিচারে ।।"

ময়মনসিংহের বাইদ্যার গানের সুরে এ ব্যাপারে আর একটি গান লিখলেন ঃ

"ছিল আমার একটি বইন বড় সোহাগিনী
ক্ষুধার জ্বালায় মান বেচিয়া হইল কলঙ্কিনী
আজ নাই রে ।।"

এ সময় নির্যাতীতা নিপীড়িতাদের হয়ে কবি বিরোধী মনোভাব নিয়ে লড়াইয়ের সুরে লিখলেন ঃ

"তোরা দেখবে যদি আয়, কুলনারী লড়াইতে যায়।"

গানের প্রশিক্ষণ, সুর সংযোজন , বাদ্য যন্ত্র পরিচালনা, শিল্পী সংগ্রহ, মেয়েদের গানে তালিম দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের কাছে থেকে মত আদায় করা - সমস্ত কাজ হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিজেই করতেন। এ ব্যাপারে কারও কারও সহযোগিতাও তিনি পেয়েছেন। তাঁকে সাহায্যকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী (২৭.৭.১৯২২-১৮.৪.১৯৮১), সুরথ পাল চৌধুরী, গোপাল নন্দী প্রভৃতি। সে সময়ে সিলেটের গণনাট্য মঞ্চে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও নির্মলেন্দু চৌধুরী পরবর্তীকালে কলকাতায় বিখ্যাত লোকশিল্পী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তখন সাংস্কৃতিক স্কোয়াডে নির্মলেন্দু চৌধুরীর পরেই আরও দু'টি নাম স্মরণীয়। এঁরা হলেন মায়া ও শান্তা। শান্তা নির্মলেন্দু চৌধুরীর সঙ্গে দ্বৈত ভাবে গানে অংশ নিতেন, আর মায়া তাঁর সুরেলা কণ্ঠে বহু গান একক ভাবে পরিবেশন করেছেন। গণনাট্য আন্দোলন পরিচালনার মূলে ছিলেন কবি ও গণসংগীতের শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এই সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকান্ড সে সময়ে শুধু সিলেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তার কর্মকান্ড ছড়িয়ে পড়েছিল সিলেটের ও কাছাড়ের ছোট বড় শহরে এবং আসামের শিলং, গৌহাটি , লামডিং প্রভৃতি শহরে। এ সমস্ত শহরে ঘুরে ঘুরে

তিনি নাটক পরিচালনা করেছেন এবং গণসংগীত পরিবেশন করেছেন।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস মূলত সংগীতশিল্পী হলেও তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক। তাঁর নেতৃত্বেই সিলেটে গড়ে উঠেছিল গণতান্ত্রিক লেখকদের সংগঠন 'লেখক শিল্পী সংঘ'। এই সংঘের অধিবেশন সপ্তাহে একদিন বসত। তাতে বিভিন্ন বিষয় - যেমন স্বরচিত কবিতা পাঠ, আলোচনা, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশিত হতো। সিলেটের সেরা সাহিত্যিকরা এখানে সমবেত হতেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন অশোক বিজয় রাহা, গল্পকার সত্য ভূষণ চৌধুরী, অধ্যাপক কৃপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন দাস, শ্যামধন সেনগুপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

১৯৪৬ সালে নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত হয় লক্ষাধিক কৃষকের সমাবেশে এক সম্মেলন। এই সম্মেলনে ময়মনসিংহের বাইদ্যার গানের সুরে ও আঙ্গিকে তিনি একটি গান পরিবেশন করেন। দুর্ভিক্ষে গৃহহারা দুই অপরিচিত কিষাণ ও কিষাণীব মধ্যে কথোপকথনের আকারে তাদের সুখ এবং দুঃখ এবং পরে তাদের জীবনপণ সংগ্রামের অঙ্গীকার - এই ছিল গানটির বিষয়বস্তু। গানটি ছিল এ-প্রকার ঃ

" কিষাণ-মৈমনসিংহের কিষাণ আমি গফুর আমার নাম
কিশোরগঞ্জের মহকুমায় ছিল আমার ধাম,
আজ নাই নাইরে।।
কিষাণী-বাইন্যাচঙের নারী ও গো আমি যে কিষাণী
আইজ আমি পথে পথে ঘুরি একাকিনী,
হায় নাই নাইরে।।"

তারপর ঘটে একে একে পট পবিবর্তন। এল স্বাধীনতা, তবে খন্ডাকারে। দেশ বিভাগের বিভিন্ন বিপর্যয়ের হেতু হেমাঙ্গ বিশ্বাস ভাবতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। গানের প্রবাহে তাই কিছু টান পড়ল। তবে তা থেমে রইল না। দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভুত দাঙ্গা, তজ্জনিত উভয়দেশে আশ্রয়প্রার্থী শরনার্থী ঢল নামল. এ সময়েব বিকৃত স্বাধীনতা এবং সংকটেব উপর নির্ভর কবে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বহু গান লিখলেন, লিখলেন 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য'। গানটির কয়েক পংক্তি এখানে প্রদত্ত হল ঃ

" মাউন্টব্যাটন সাহেবও
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে
থুইয়া গেলায় ও
তোমার সোনার পুরী আন্ধার কইরা ও ব্যাটন সাহেব
তুমি কই চলিলায়
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও "

বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা দেশবাসী কি হিসাবে পেল তার বর্ণনায় উক্ত কাব্যে লিখলেন।

" যে বাঁশেতে বাজলোরে ভাই স্বরাজের বাঁশরী

সেই বাঁশ যে ডান্ডা হইয়া মাথায় মারল বাড়ি'
(আহা মরি মরি)।
মাথায় ভাঙলো কাঁঠাল ভাইরে মুখে লাগলো আঠা
স্বরাজের মন্দিরে আমরা হইলাম বলির পাঁঠা।''

দেশ বিভাজনের ফলে এবং বাংলাদেশ থেকে আগত বলে হেমাঙ্গ বিশ্বাস খুবই বিচলিত হয়েছিলেন, তবে হতাশ হন নি। তাঁর দেশের স্মৃতি সেখানকার নদ-নদী, মাঝি প্রভৃতি তার স্মৃতিপটে উকি মারলে তিনি সেই স্মৃতিচারণ করে বিখ্যাত গানটি লিখলেন ঃ

''আমার মন কান্দেরে পদ্মার চরের লাইগ্যা
দরদীরে, মন কান্দে পদ্মার পাড়ের লাইগ্যা
আমার শান্তির গৃহ, সুখের স্বপনরে
দরদী কেদিল ভাঙিয়া।।
পানিত কান্দে, পানী খাউরি, শুকনাত কান্দে টিয়া
আমার অভাগ্যার অন্তর কান্দেরে
পোড়া দেশের লাইগ্যা।

এ প্রকার অপর একটি গান প্রদত্ত হল ঃ

'' পদ্মারে, কোন বিভেদের বালুচরে
তোর ময়ূর পঙ্খী ভাঙলো ওরে
কোন কাল সাপে দংশিলো তোর
সুজন নাইয়ারে
আজ ভেলায় ভাসে বেহুলা বাংলারে
বঁধুর বিষের জ্বালা অন্তরে।''

হেমাঙ্গ বিশ্বাস ছিলেন আশাবাদী তাই লিখলেন ঃ

'' বাঁচবো বাঁচবোরে আমরা বাঁচবোরে বাঁচবো
ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়া
নয়া বাংলা গড়বো।।''

সমগ্র আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মানবিক ও নাগরিক অধিকারের দাবীতে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ বঞ্চিত শোষিত মানুষের ঐতিহাসিক সমাবেশে গীত হয় যে সংগীতটি, সেটি হল ''We shall overcome'' জনপ্রিয় এ গানটির অনুবাদ করে লিখলেনঃ

'' আমরা করবো জয়
আমরা করবো জয় নিশ্চয়
আহা বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়
আমরা করবো জয় নিশ্চয় ।।''

এ জয় নিপীড়িতের পীড়নকারীর বিরুদ্ধে জয়।

২২শে নভেম্বর, ১৯৮৭ সালে এই বিপ্লবী কবি ও গণ্যসংগীত শিল্পীর দেহান্তর ঘটে। দেশ হারায় এক মহান পুরুষকে। তাঁর লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'শঙ্খচিলের গান', 'জন হেনরীর গান ', 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গল কাব্য', 'মশাল জ্বালো', 'আমি যে দেখেছি সেই দেশ' প্রভৃতি ।

(এ প্রবন্ধটি ১৪.১২.১৯৯৬ এবং ১৫.১২.১৯৯৬ সালে যথাক্রমে 'স্যন্দন' ও 'ত্রিপুরা দপর্ণ' পত্রিকায প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি পবিবর্ধিত আকারে প্রদত্ত হল - লেখক)

----- o -----

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের অগ্রদূত মহামণীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রী শ্যামল চৌধুরী

প্রকৃতির নিয়মে এ বিশ্ব সৃষ্টিশীল। সারা বিশ্ব জুড়ে সাতটি মহাদেশ রয়েছে। আমাদের মহাদেশের নাম এশিয়া। আগে আমাদের ভারত ভূখন্ড এত বিশাল ছিল যার জন্য ইহা পাক-ভারত উপমহাদেশ বলে আখ্যায়িত ছিল। ব্রিটিশ চক্রান্তে আমাদের ভূখন্ড ছোট করতে করতে চার খন্ডে বিভক্ত করেছে। প্রথমে আফগানিস্তান ভারত থেকে আলাদা করে। তারপরে ভারতবে ভাগ করে পাকিস্তান তৈরী করে। এরপর সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ। আজকের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য উনবিংশ শতাব্দীর এক অনন্য সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি যে সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় বর্তমান তিন রাষ্ট্রের কোন সীমানা ছিল না। সারা পাক-ভারত উপমহাদেশের মধ্যে কোলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী শিল্প সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর সময়ে উত্তরোত্তর এই পরিবারের নাম -যশ প্রতিপত্তি দেশ-বিদেশে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে মাতা সারদাসুন্দরীর গর্ভে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য জীবন অনেকটা নিঃসঙ্গ ভাবেই কাটে । তাঁর পরিবারের রক্ষণশীলতাকে কাটিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে অতি সংগোপনে তিনি পরিচিত হন। কৈশোরে কলকাতার ইস্কুলে ভর্তি হয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ পেলেন না। লাজুক লাজুক কিশোরটি অন্যদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতেও পারতেন না। শিক্ষকদের কাছেও তেমন প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেন নি। উচ্চ শিক্ষায়ও শিক্ষিত হন নি। কিন্তু ইস্কুল কলেজের বাধা ধরা শিক্ষার গন্ডী অতিক্রম না করেও এই মানুষটি কিভাবে সমস্ত বিশ্বের শীর্ষাসনে অধিষ্ঠিত হন, এটা ভাবলেও বিস্ময়কর মনে হয়। একাধারে এত গুণের সমন্বয় যা দ্বিতীয়টি ইতিহাসে সাক্ষ্য বহন করে না। যদিও তিনি কবি হিসাবেই বিশ্বে সমধিক পরিচিত, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, দার্শনিক, স্বদেশপ্রেমিক ও উচ্চ মূল্যবোধের এক আদর্শ রাজনীতিজ্ঞও বটে। অর্থাৎ এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামেব সাথে গোটা বিশ্বের মানুষ পরিচিত, তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের অন্যান্য সাধনার পরিপূর্ণতায়। মানব জীবনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যাঁর বিচরণ। এমন কোন ক্ষেত্র বাদ নেই, এমন কোন ভাব নেই, এমন কোন চিন্তা নেই, যেইখানে তিনি প্রবেশ করেননি।

তাঁর কাব্যে ব্যথাহতরা যেমন পেয়ে থাকেন ব্যথা জয়ের অমোঘ প্রেরণা, দার্শনিকরা পান প্রকৃত সত্য সন্ধানের খোঁজ, রাজনীতিকরা পান মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মানব সভ্যতার ব্যথা, বেদনা ও হতাশাময় বিশ্বের সকলের বলিষ্ঠ মূর্ত প্রতীক।

উল্লেখ্য, এই জন্যই বিখ্যাত ইংরেজ কবি বি.ইয়েটস্ বলেছেন - একজন টেনিসন, একজন শেলী, একজন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, একজন বায়রন - তাদের সকলের সমান একজন রবীন্দ্রনাথ। যার প্রকৃত অর্থ ইয়েটসের কথায় বহু পাশ্চাত্য কবির ভাবধারার সমন্বয় ঘটেছে এক রবীন্দ্রনাথের

জীবন দর্শনে। পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলার সংস্কৃতি, ধর্ম ও সাহিত্য জগতের ইতিহাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এক অবিস্মরণীয় নাম। পিতা কিংবা পিতামহ ছাড়াও বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিখ্যাত পন্ডিত ও দার্শনিক। মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের প্রথম আই. সি.এস এবং আরেকদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন শিল্পী ও সাহিত্যিক। সুতরাং ঠাকুর পরিবারের উন্নত শিক্ষা -দীক্ষা -মার্জিত সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ সমুজ্জ্বল সহজাত গুণের বিস্ময়কর রূপে মূর্ত হয়ে উঠে রবীন্দ্রনাথের জীবনে। প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য্যবোধ ও স্বদেশ ইত্যাদি সৃষ্টির সকল দিগন্তেই পড়েছিল তাঁর জ্যোতির্ময় প্রভাব। শৈশবে শিক্ষা কিছুকাল ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ও নর্ম্যালি ইস্কুলে অধ্যয়ন কালে বিশ্ব প্রকৃতির উদার আহ্বান কিশোর রবিকে চঞ্চল করে তুলল। তাই ইস্কুল কলেজের গতানুগতিক শিক্ষা তাঁর ভাগ্যে জুটল না সত্য, কিন্তু তারপরও বিশ্ববিদ্যার সব দুয়ার তাঁর সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। বাংলার প্রথম রোমান্টিক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথের তের বছর বয়সে প্রথম কবিতা ''হিন্দু মেলার উপহার'' প্রকাশিত হলো তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। তাবপর থেকেই কাব্যোদ্যানে শুরু হয়ে গেল 'কাব্যকুসুমের বসন্ত উৎসব'. সতেরো বৎসর বয়সে অধ্যয়নের জন্য চলে গেলেন বিলাতে। কয়েক বৎসর পর সেখানে থেকে ফিরে এসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেরণায় সঙ্গীত সাধানায় অনুবাগী হয়ে সঙ্গীতে মগ্ন হন। রচিত হল তাঁর প্রথম অনবদ্য গীতিনাট্য - 'বাল্মিকি প্রতিভা' যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত জগতের আশ্চর্য ফসল রূপে সমধিক পরিচিত। বাংলা কাব্যের রূপশিল্পী রবীন্দ্রনাথের যৌবনে প্রথম প্রভাতে হৃদয়ের নিবিড় বেদনায় সঙ্গীতের যে উৎস মুখ খুলেছিল, তাঁর মর্মর কলতান ঝংকৃত হয়ে উঠল সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, ভানুসিংহের পদাবলী, মানসী ও সোনার তরীতে। চিত্রা, চৈতালী, কণিকা, কল্পনা, কথা ও কাহিনী, নৈবদ্য, খেয়া এবং গীতাঞ্জলী-গীতালি-গীতিমাল্যের সোনার ফসলে তরী বোঝাই হল। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্পের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন- ''ছোট প্রাণ ছোট কথা, ছোট ছোট দুঃখ ব্যথা, যা নিতান্তই সহজ ও সরল অনাবিলতায় মুগ্ধ। শিশুদের জন্য আরও সৃষ্টি করেন 'অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে/শেষ হয়ে হইলনা শেষ'। তাই বলা চলে বিশ্ববরেণ্য শিশু সাহিত্যিক রুশো, প্যাস্তলৎসির মতো শিশু শিক্ষার জগতেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঠিক তাই, কবি তার ছোট গল্পের সহজ সরল ভাবও ভাষায় ছোট ছোট সুখ-দুঃখের চিত্র মনোগ্রাহী করে তুলেছেন তাঁর রচিত ছোট গল্পের মধ্যে বিশেষতঃ রামকানাই-এর নির্বুদ্ধিতা, গুপ্তধন, কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষান, দান- প্রতিদান, স্ত্রীর পত্র, জীবিত ও মৃত, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, হৈমন্তী, মেঘ ও রৌদ্র, ছুটি, পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি, দৃষ্টিদান, মাল্যদান, নষ্টনীড়, কঙ্কাল, মণিহার, মাস্টার মশাই, অতিথি ইত্যাদি, বিশ্ব সাহিত্যে প্রখ্যাত অনেক ছোট গল্পকারের পরিচয় পাই, যেমন-মোঁপাসা, নিকোলাই গোগল, গোর্কী, লরেন্স, চেকভ প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ তাদের কারো থেকে কম নন এজন্যই তাঁর ছোট গল্প ও বিশ্ব সাহিত্য ভান্ডারে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আবার আমরা যদি তাঁর স্বদেশ প্রেমের দিকে তাকাই সেখানেই অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের

বিরুদ্ধে দেশের আবেগ চঞ্চল মানুষের ক্রুদ্ধ শাসকের সমস্ত অত্যাচার, লাঞ্ছনা, সহ্য করতে কবির কণ্ঠে গাইলেন - আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। আরও গাইলেন, ''ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা / তোমাতে বিশ্বময়ীর .... আঁচল পাতা ''-। তিনি চাইলেন দেশপ্রেমের এই গভীর আবেগকে গঠনাত্মক রূপ দিতে। অপরদিকে দেশের সকল সম্প্রদায়কে হৃদয়ে এক করার জন্য রাখী বন্ধন উৎসবের প্রবর্তন। প্রকৃত অর্থেই দেশপ্রেমের ঝর্ণাধারায় অভিষিক্ত। তাই গাইলেন -''আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে / ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক' দিন থাকে'? বিদেশী জিনিষ বর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি আয়োজন করেন স্বদেশী মেলার। রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন উদ্ধত শাসকের অত্যাচারের, অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী হয়েছেন, আবার জোর করে বিলেতী কাপড়, লবণ সহ অন্যান্য জিনিস ধ্বংসের, ইংরেজ হত্যা, দেশসেবার নামে পিস্তল দিয়ে স্বদেশী সেজে ডাকাতি ইত্যাদিরও তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তখন তিনি লিখলেন, 'রাজনৈতিক মতামত'। 'কর্তার ইচ্ছা কর্ম্ম' স্বদেশ ও সংকল্প ইত্যাদি প্রবন্ধ। স্বদেশী যুগের পট্ভূমিকায় তিনি লিখলেন, 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়'। যা সত্য বলে জেনেছেন- তা থেকে কখনো বিচলিত হননি। যেমন প্রতিবাদ করেছেন প্রবল ও শক্তিশালী অত্যাচারের, তেমনি নিন্দা করেছেন কাপুরুষতা, ভীরুতা, অক্ষমতার অজুহাতকে। তাই তিনি লিখলেন, ''অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে'। তিনি ছিলেন বিশ্বে সৃষ্টির এক অনবদ্য প্রতিভাধর। তিনি সঙ্গীত জগতেরও সম্রাট হিসাবে বিশ্ব বন্দিত। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও সুরে তিনি এক অনন্য জগতের স্রষ্টা। তিনি প্রচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের জন্য শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বিশ্বভারতীতে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদের। বিশ্বভারতীয় আর্দশ ছিল, জ্ঞানে, ধ্যানে, প্রেমে জগতের সকল শুভ কর্মের সমন্বয় সাধনে সমস্ত বিশ্বকে এক সূত্রে গ্রথিত করার ঐকান্তিক আহ্বান। আর এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সারা বিশ্বে বিরল। ইংরেজী ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদের জন্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাছাড়া ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার তাঁকে নাইট উপাধি প্রদান করেন কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ইংরেজের দেওয়া 'নাইট' উপাধি তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

স্বদেশ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ ইং সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ভাতৃভাবকে মধুরিমা করে তোলার উদ্দেশ্যে রাখিবন্ধন উৎসবের প্রচলন করেন। তাঁর রচিত অনবদ্য জাতীয় সঙ্গীত যা বিশ্বসেরা বললেও অত্যুক্তি হবে না। ভারতের জনগণের উদ্দেশ্যে স্তব। 'জন গণ মন অধিনায়ক' এবং 'আমার সোনার বাংলা' যথাক্রমে ভারত-বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভকরেছে। প্রতি বৎসর দেশের রাজধানী ঐতিহাসিক লালকেল্লায় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের পর কবিগুরুর রচিত ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে এই স্তব ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর লয়ে যখন গীত হয় তখন প্রত্যেক ভারতবাসীকে পুলকিত করে তুলে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশেও। এহেন অবস্থায়

আশ্চর্যান্বিত হতে হয় এই কবিগুরুর বিশ্বসেরা অনবদ্য স্তবের অংশ নিয়েও আজ ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় প্রশ্ন তুলেছে - জাতীয় সঙ্গীত থেকে 'সিন্ধু' শব্দটা হটানোর। এবং এজন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র, বিদেশ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে। নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলে 'বঙ্গ' ও 'পাঞ্জাব' নামটিও জাতীয় সঙ্গীত থেকে বাদ দিতে হয়। কেন না, এ'দুটি প্রদেশেরও অর্ধেকটা বর্তমানে ভারতের বাইরে। আর সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই জাতীয় বোধটাও থাকা উচিত যে, 'সিন্ধু' একটা সংস্কৃতির নাম, যা এশিয়ার একটি পূণ্য সলিলা নদীর নাম। বিভিন্ন নথীপত্রের তথ্যাদিতে আমাদের দেশের যে সর্বপ্রাচীন নাম পাওয়া যায় তা হলো 'সপ্ত সিন্ধু' বা 'সিন্ধু' এই নাম প্রতিটি জাতির সুপ্রাচীন অতীত আর সুদূর ভবিষ্যতের সংযোগের মেরুদন্ড হয়ে থাকবে। আমাদের দেশ ও জাতির বৈদিক নাম 'সিন্ধুস্থান'। সংস্কৃত ভাষায় সিন্ধু শব্দের অর্থ সমুদ্র, যা দক্ষিণ উপদ্বীপকে ঘিরে রয়েছে। সিন্ধু শব্দের মাধ্যমে আমাদের চতুর্সীমা সূচিত হয়ে আসছে। এমনকি পূর্ব বাহিনী ব্রহ্মপুত্রও সিন্ধুর শাখা। সিন্ধু নদী দিয়ে ঘেরা ভারতভূমিতে যাদের বসবাস তারাই 'হিন্দু' নামে পরিচিত। সেই কারণে সিন্ধু একটা সভ্যতার নাম। একটা জাতি ও দেশের ইতিহাসের নাম। এই কারণেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে যথাক্রমে প্রায় রাজ্যের মন্ত্রীগণ ও অন্যান্য দলনেতারা সভা-সমিতিতে জয়হিন্দ শব্দটা উচ্চারণ করে থাকেন। ভারত বিভাজন করে ভারতের ভূগোলকে বদলে দেওয়া হলেও ইতিহাসকেতো গায়ের জোরে বদলানো যাবে না। কাজেই যে সমস্ত অর্বাচীন এই বিষয়ে ন্যায়ালয়ের নির্দেশের জন্য কোর্টে বিচার প্রার্থী, এ সমস্ত দেশদ্রোহীদের জেলে প্রেরণের ব্যবস্থা করা জরুরী। কেননা, তাদের এই উদ্দেশ্যের পেছনে বিশেষ কোন বদ্‌মতলব যে ক্রিয়াশীল, এ সম্পর্কে কারও কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং যে কথাটা বর্তমান ভারতের বুদ্ধিজীবী হতে শুরু করে রাজনীতিক, অধ্যাপক, লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, এবং সমস্ত পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সচেতন হওয়া আবশ্যক যে এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্রের বর্হিপ্রকাশ মাত্র। যেখানে রবীন্দ্রনাথ শাশ্বত ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক। মহাঋষির ন্যায় ছিল তাঁর প্রজ্ঞা দৃষ্টি। বাল্মীকি, বেদব্যাস, মহাকবি কালিদাসের ন্যায় ছিল তাঁর কবি হৃদয়। আর পাশ্চাত্যের গ্যাটে -টলস্টয়ের মতো ছিল সুগভীর সমাজ চেতনা। বিশ্বকে সুন্দরের আরাধনায়, মানবতায় পূজায় তিনি তাঁর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে যেন আরতি করে গেছেন। যে গভীর স্পর্শকাতরতা, যে নিবিড় বিশ্বাত্মবোধ তাঁর কাব্যধারাকে ত্রিবেণী সঙ্গমে পৌঁছেছেন, তাঁর নিবিড় অসঙ্গ পেতে হলে সেই রবীন্দ্র তীর্থেই যাত্রা করতে হবে। তাই ভারতবাসী হিসাবে প্রত্যেকেরই জানা থাকার কথা যে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের পূণ্য জন্মদিন প্রতি বৎসর নব প্রজন্মের কাছে অতি প্রিয় মাস ও দিন। এই দিনটির জন্য কচি-কাঁচারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে। প্রস্তুতি চলতে থাকে কয়েক মাস আগে থেকেই। সে কিসের প্রস্তুতি? কেন এত সাড়া, এত আনন্দ? অনেক বড় বড় মহান ব্যক্তিত্বইতো যুগে যুগে এ'ভারতে ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নব প্রাণে এত সাড়া আর কেউ জাগাতে পারেনি। এজন্যই তাঁকে বলা হয় বিশ্বের মানুষ গড়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর। এই উপলক্ষ্যে আমরা রবীন্দ্রভাবনায় ভাবিত হই। ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় ও

আত্মীয়তার বন্ধন ছিল, যা'নাকি ভারতের ৫৮২ টি মহারাজাদের মধ্যে এত নিবিড় সম্পর্ক আর কারোও সাথে ছিল না। ভারতের-প্রান্তিক রাজ্যে তিনি যথাক্রমে সাতবার পদার্পণ করেন। সর্বপ্রথম তিনি ত্রিপুরায় পদার্পণ করেন ১৩০৬ বঙ্গাব্দের বসন্ত উৎসব উপলক্ষে। দ্বিতীয়বার ১৩০৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে। ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে দুই বার পদার্পণ করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৭ই আষাঢ় কবি উমাকান্ত একাডেমী হল ঘরে ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মেলনীর প্রতিষ্ঠায় পৌরোহিত্য করেন। এমনিভাবে ত্রিপুরার জনগণের সাথেও তাঁর আত্মার গভীর নৈকট্য জন্মে। ত্রিপুরার 'উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ', কুঞ্জবন 'মালঞ্চনিবাস','নীরমহল', আজও রবীদ্র স্মৃতি বহন করছে। ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। যা তাঁর রচনায় 'রাজর্ষি','মকুট' , 'বিসর্জন' নাটকে ত্রিপুরার গৌরব সারা বিশ্বে উদ্ভাসিত হয়েছে। ত্রিপুরার সাথে রবীন্দ্রনাথের এই নিবিড় সম্পর্ক তাঁর তিরোধান দিবস (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বাং) পর্যন্ত অটুট ছিল। এই মহামনীষীর জীবন দর্শনকে ভারত সহ বিশ্বে পাথেয় করে চললে বর্তমানে উদ্ভুত সন্ত্রাসবাদ সহ অন্যান্য জটিল সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ২০০৫ ইং সনের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন কালে মাননীয় রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে আব্দুল কালাম প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কে. আর নারায়ণকে রাজীব গান্ধী সদ্‌ভাবনা পুরস্কার প্রদান করেন। পুরস্কার অনুষ্ঠানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কে. আর নারায়ণন বর্তমানের উদ্ভুত ভারতসহ বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ নিবারণে ভারতের ঐতিহ্যমন্ডিত নৃত্যসঙ্গীতের উল্লেখ করেন। এক্ষণে তাঁর অন্তিম শয্যার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোকপাত করছি। অনেক গুণগ্রাহী পাঠক ও লেখক এ সম্পর্কে জানতে উৎসুক। এমন দু'জন ত্রিপুরার গুণগ্রাহী এবং সনিষ্ঠ পাঠক মোহনলাল সাহা এবং আমার অগ্রজ সম শ্রীযুত হিরন্ময় চক্রবর্তীর (প্রাক্তন নির্বাচনী যুগ্ম কমিশনার) নাম স্মরণীয়। তাঁরা দৈনিক স্যন্দন পত্রিকায় ২২ শে শ্রাবণ কবিগুরুর ৬৪ তম মহাপ্রয়াণ দিবসে প্রকাশিত 'মহামানবের সাগরতীরে' প্রবন্ধখানা পড়ে তৃপ্ত হন এবং সাথে সাথে দুরভাষযোগে আমার সাথে লেখার তথ্য প্রসঙ্গে জেনে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তাই পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে তা সংযোজিত হলো।

অসুস্থ কবিকে শান্তিনিকেতন থেকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনা হয়। ৩০ শে জুলাই ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ শল্য চিকিৎসক ডঃ ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কবির প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের সাধারণ অপারেশন করেছিলেন। আশা করা গিয়েছিল অপারেশন সফল হলে পরবর্তীতে বৃহত্তর অপারেশন করা হবে। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। ১লা আগষ্ট থেকেই প্রায় নির্বাক ও আচ্ছন্ন কবি। মাঝে মধ্যে স্নেহধন্য পরিজনদের আকুল আহ্বানে মুহূর্তের জন্য সাড়া দিলেও পর মুহূর্তেই স্থির। যেন মেঘের কোলে রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি। এভাবেই ছয়দিন অতিক্রান্ত হল। বাইশে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বাংলা। রাখী পূর্ণিমার শেষ লগ্ন। আকাশ থেকে চাঁদের ওড়না সরিয়ে দিয়ে একটু একটু করে অরুণ আলোর অঞ্জলি ছড়িয়ে পড়ছে পূর্বদিগন্তে। জোড়াসাঁকোর সারারাত কেটেছে নিদ্রাহীন ভয়ংকর কিছুর আশঙ্কায়। মাঝে মাঝে শোনা গেছে জানা-চেনা মানুষদের উৎকণ্ঠা ব্যাঞ্জক প্রশ্নপর্ব। ভোর চারটে বাজতে না বাজতেই গাড়ির জমায়েত বেড়ে চলে। আত্মীয় স্বজনরা

আসছেন দলে দলে। চারদিকে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। পুত্রবধূ প্রতীমা দেবী কানের কাছে ঘেঁষে আকুল কণ্ঠে ডাকলেন বাবা-বাবা বলে। কবি সস্নেহের মামণির দিকে এবার খানিকটুকু তাকালেন। দৃষ্টি নির্লিপ্ত। ছোট দিদি স্বর্ণকুমারী অস্থিরতায় চঞ্চল হয়ে ভাইয়ের শয্যা শিয়রে মুখভার করে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার কাঁদতে কাঁদতে একটু দূরে চলে যান। শেষ রাত্রি থেকে শুরু হয়েছিল ব্রহ্মসঙ্গীত। অমিতা দেবী খাটের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেন প্রতিদিনের ধ্যানমন্ত্র। শান্তম্ শিবম্, অদ্বৈতম্। দু'হাতে অঞ্জলিভরা সোনা রঙের চাঁপা ফুল নিয়ে এলেন অমিয়া ঠাকুর। নিবেদন করলেন গুরুদেবের শ্রীচরণে। শ্বেতশুভ্র শাল দিয়ে ঢেকে রাখা হল রক্ত কমল পা দু'খানি। রানি চন্দ ফুলগুলি ছড়িয়ে দিলেন তার উপরে। নির্মলাকুমারী দেবী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন - কবিরই দেওয়া ইষ্টমন্ত্র। তমসোঃ মা জ্যোতির্গময়। খাটের ডান দিকে মাটিতে বসে রয়েছেন হেমলতা ঠাকুর। নির্ব্বাক নিঃশব্দ অবস্থায়। উপস্থিত প্রায় সকলেই যেন নিথর।

সকাল সাতটায় রামানন্দ চাটার্জি এসে উপাসনা করলেন। পন্ডিত বিধু শেখর শাস্ত্রী এসে পায়ের দিকে মাটিতে বসলেন। উচ্চারণ করলেন উপনিষদ মন্ত্র। বাইবে বারান্দায় এক অনুরাগী ভক্ত মৃদুকণ্ঠে গাইলেন -

'কে যায় অমৃত ধাম যাত্রী'।

এলেন কবিরাজ বিমলেন্দ্র তর্কতীর্থ। পাশের নির্মলা দেবীর দিকে তাকিয়ে শোকার্ত কণ্ঠে বললেন- আমি কিছুই করবার সুযোগ পেলাম না। তাছাড়াও এলেন হেমন্তবালা দেবী। যিনি কবিকে মানসপটে কৃষ্ণের আসরে বসিয়ে পত্রালাপ করেছিলেন কবির সঙ্গে বৈষ্ণবীর বেশে। তিনি কবির ললাটে তুলসীর মালা ও গঙ্গা মাটি স্পর্শ কবিয়ে শেষ দর্শন করে গেলেন। একটু পবে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন দিলীপ কুমার রায়। নিঃশব্দে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। তারপর বেরিয়ে যান। প্রখ্যাত ডাক্তার জ্যোতিষ চন্দ্র রায় কবির নাড়ি ধরে বসেছিলেন। ডঃ অমিয় সেন এসেও নাড়ি ধরলেন, হাতের কব্জিতে না পেয়ে কনুইয়ে মৃদু নাড়ির স্পন্দন পান। নাড়ির গতি অত্যন্ত ক্ষীণ। অপারেশনের স্থান পরিস্কার করে বেঁধে দিয়ে বিষন্ন মনে বেরিয়ে যান। ইতিমধ্যে একে একে স্যার নীলরতন সরকার, ডঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডঃ জে.এন. দত্ত, ডঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, ডঃ ললিত মোহন ব্যানার্জি প্রমুখ দেশ বিদেশের চিকিৎসকগণ এসে বিষন্ন মনে পরাজয়ের গ্লানিতে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে যান। বেলা ন'টায় অক্সিজেন দেওয়া শুরু হল। ক্রমে নিঃশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। রাণী চন্দ, নির্মলকুমারী বসে আছেন কবির পাযে ধরে। বাইরে -ভিতরে চলছে মন্ত্রোচ্চারণ। বারান্দায় ধ্বনিত হচ্ছে - 'কে যায় অমৃত ধাম যাত্রী' 'সম্মুখে শান্তি -পারাবার', 'ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার'। বেলা বাড়ার সাথে সাথে জনতার স্রোত আছড়ে পড়েছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। সকাল সাড়ে দশটা। মহাকবির নাড়ির গতি ক্রমেই অচল হয়ে আসছে। পায়ের দিকও বরফের মত ঠান্ডা। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় বারোটা দশ বাজছে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ডান হাত খানা কাঁপতে কাঁপতে উপরে তুলতেই পড়ে গেল। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল হৃদস্পন্দন। কোরামিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হল । কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। রবির পার্থিব দেহ

নিথর অবস্থায় শায়িত। মুহূর্তে কলিকাতা নগরীতে স্তব্ধতা নেমে এল। ঠাকুর বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। এক কথায় জনসমুদ্রে পরিণত। প্রত্যেকেরই একান্ত কামনা মহামানবকে শেষবারের মতো দর্শন। এরপর সাজানোর পালা। সবাইকে অনুরোধ করা হল ঘরের বাইরে চলে যেতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘর খালি করে দিলেন প্রায় সবাই। রইলেন নির্মলকুমারী, রাণী, অমিতা, নন্দিতা, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ। স্নানপর্ব চলছে। এমন সময় বাইরের জনতার এতদল দরজার ছিটকিনি খুলে ঢোকার চেষ্টা করে। সবারই দাবি - একটি বারের জন্য আমাদের দেখতে দিন। উন্মত্ত জনতাকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। যত শীঘ্র সম্ভব সাজনোর পালা শেষ করতে হয়। অমিতা দেবী ও নির্মলকুমারী দেবীর সহায়তায় নাতনি নন্দিতা কবিকে পরিয়ে দিলেন ধপধপে সাদা বেনারসী জোড়, গরদের পাঞ্জাবী ও শ্বেত উত্তরীয়। ললাটে দেহে চর্চিত হল শ্বেতচন্দন। গলায় পরানো হল রজনীগন্ধার মালা। দু'পাশে বিছিয়ে দেওয়া হল রাশি রাশি রজনীগন্ধা ও শ্বেতপদ্ম। দরজাও খুলে দেওয়া হল। এবারে আত্মীয় -স্বজন হতে বন্ধু বান্ধব সকল অংশের দর্শনার্থীদের সুযোগ ঘটল কবিকে শেষবারের মতো প্রণাম জানাবার। এর মধ্যে যে সকল সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছিল সব গানই কবির রচনা। তাঁরই কথা ও সুরের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁরই বিদায় অর্ঘ্য রচনা। মৃত্যুর বিভীষিকা কোথাও নেই। এ যেন আজন্ম শান্তির পূজারির যথার্থ চির শান্তিনিকেতনের যাত্রী। প্রিয় শিষ্য নন্দলাল বসু সকাল থেকেই নকশা এঁকে মিস্ত্রি নিয়ে কাঠের পালংক তৈরীর কাজ শুরু করেছিলেন গুরুদেবের শেষ যাত্রার জন্য। বেলা তিনটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্ব-মহামানবের মৃতদেহ নীচে নামিয়ে সুসজ্জিত পালংকের উপর শায়িত করা হল। তারপর, জনসমুদ্রের উপর দিয়ে যেন একখানি ফুলের নৌকা ভেসে চলে গেল পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরের নিমতলা শ্মশানঘাটে। যদিও কবির একান্ত ইচ্ছা ছিল-'আমায় যেন কলকাতার উন্মত্ত কোলাহলের মাঝে চিরনিদ্রিত রাখা না হয়। আমি যেতে চাই শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠের মধ্যে উমুক্ত আকাশের তলায় আমার ছেলেমেয়েদের মাঝখানে। সেখানে জয়ধ্বনি থাকবে না, উম্মত্ততা থাকবে না। থাকবে শান্ত স্তব্ধ প্রকৃতির বৈচিত্রতা। সেখানে আমার দেহ শানিতনিকেতনের মাটিতে মিশে যাবে। এই আমার আকাঙ্খা।' দুর্ভাগ্য, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের অগ্রদূত 'শান্তম'-এর উপাসক মহাকবির শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়নি। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অতৃপ্তই রয়ে গেল। এটা শুধু তাঁর পরিবারের ব্যর্থতা নয়, জাতীয় ব্যর্থতা বললে অত্যুক্তি হবে না। কেন না- যাঁর অসামান্য অবদানে ভারতবাসী বিশেষ গর্বিত, গৌরবান্বিত সেই মহামানবের অন্তিম ইচ্ছা পূরণের দায়ভার সকলের। উল্লেখ্য কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের ৬ বৎসরের মধ্যেই ভারতের খন্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটে। খন্ডিত স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে যে রক্ত ঝরা ধারাবাহিকভাবে চলেছে, যা বিশ্বে নজিরবিহীন। কবিগুরুর জীবদ্দশায় ব্রিটিশ বঙ্গ-ভঙ্গ করে। সিংহ বিক্রমে জননেতার দায়িত্ব পালনে তিনি সর্বাগ্রে রাস্তায় নামেন। যাঁর ফলে ১৯০৫ সনের কর্মপ্রবাহ ও ভাবধারায় যে গণ-আন্দোলনের জোয়ার বয়েছিল, তা ক্রমেই অবিচ্ছিন্ন কলেবর ও স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়ে মুক্তি ও স্বাধীনতার উদ্বেলিত অবস্থায় পরিণতি পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাতীয় নেতাদের অসহিষ্ণুতা, কতকটা দায়িত্বহীনতার ফলেই

দেশ ভাগের মতো সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়ায় দেশ জাতি আজ গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন। কবিগুরু বেঁচে থাকলে ভারতের দেশভাগের সিদ্ধান্তকে কখনও তিনি মেনে নিতেন না। কেন না, দেশ খন্ডিত হওয়ার ফলেইও পর্বত প্রমাণ সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক থেকে তিন রাষ্ট্রে পরিণতি লাভ করেছে। আরও ভাগের আশঙ্কা রয়েছে। তাঁর 'ভারততীর্থ' দেশটিতে গণতন্ত্রের নামে যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে চলেছে তারই সাথে যুক্ত হল সাম্প্রতিক নোবেল চুরির ঘটনা। আমরা এমন দুর্ভাগা উত্তরসুরি, যিনি ভারতকে বিশ্বে জ্ঞান -গরিমার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাঁর মৃত্যুর ছয় দশক পরেই সেই ঐতিহ্যমন্ডিত সাধনার অবস্থান থেকে আমরা পেছনের দিকে ধাবিত হলাম। এর চেয়ে জাতির দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে। কেন না সাত দশক ধরে ভারত সহ বিশ্বের মানব সভ্যতায় তিনি যেভাবে মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছেন, বিশ্বে দ্বিতীয়টি আর এমন সাক্ষ্য দেয় না।

পরিশেষে তাঁর রচিত পংক্তিগুলির স্মৃতিচারণ করে শ্রদ্ধাঞ্জালি জানিয়ে এই প্রবন্ধের ইতি টানছি - যা ভারত আত্মার ডাক বা আহ্বান ঃ 'মার অভিষেকে এস এস ত্বরা/মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা/সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীড়ে/এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে'।

----- o -----

আক্রান্তের আত্মীয় কবি রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতির্ময় রায়

ফলে ফুলে ভরা এ বিশ্বে বিশ্বমানবতায় উন্নীত হতে সুসভ্য মানুষের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। সুবৃহৎ এ ধারার সিংহ ভাগ লোকই বিশ্ববরেন্য কবি শ্রী রবীন্দ্রনাথকে উঁচু তলায় কবি বলে ভাবেন। কেউ বা বলেন কবি সুন্দর সোনার চামচ সুখে নিয়ে জন্মেছেন। তাঁর মানসিকতা ঐ জমিদারীর চার দেওয়ালের গন্ডীতেই আবদ্ধ। কিন্তু সমুদ্রসম সৃষ্টি যাঁর সেই প্রোথিতযশা কবি সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করতে গেলে তাঁর অমর রচনার সাক্ষ্য নিতে হবে।

জীবনের গোধূলি লগ্ন যখন সমাগত, বিদায়ের রক্তিম আভা যখন স্পষ্টতর রূপ লাভ করছে, ভাঁটার গভীর টানে যখন জীবনের তরীখানি মহাকাল সমুদ্রের দিকে দ্রুত ভাসমান তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অতীতের কর্মময় জীবনের রোমন্থন করে "পরিচয়" কবিতায় যা বলেছিলেন তা দিয়েই ব্যবসায়ী মহলের ঐ চিন্তা ধারার বিচারের সূত্রপাত ঘটানো যায়।

কবি বলেছেন -

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়-
এই হোক মোর শেষ পরিচয়।'

- পরিচয়, সঞ্চয়িতা

গৌরবের কথা, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানান আন্তর্জাতিকতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যুঅরদের গণতান্ত্রিক অধিকার দাবীর জবাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যলিপ্সা ব্যুঅরদের উপর যে উৎপীড়ন অত্যাচার ও গণহত্যা চালায় তার প্রতিবাদে ১৯০১ সালে প্রকাশিত 'নৈবদ্য' কাব্য গ্রন্থের ৬৪, ৬৫ এবং ৬৬ নং কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং অত্যাচারিত ব্যুঅরদের সপক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

দুর্বল দেশগুলোকে সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে গ্রাস করে তার ঘৃণ্য ও নগ্ন দিকগুলো তিনি "রাজা প্রজা" প্রবন্ধ গ্রন্থের "ইম্পীরিয়লিজম" প্রবন্ধে (১৯০৫) তুলে ধরেন।

ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই এই যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগের কথা জানা যায় পি.সি.এফ এনড্রুজের লেখা একটি চিঠি থেকে। বলাকা কাব্যের ৪ এবং ৩৭ নং কবিতাতেও এই যুদ্ধ সম্পর্কে তার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

এছাড়া ১৯১৪ সালে লেখা তাঁর "সামাহিংস্রী ও "লড়াইয়ের মূল" প্রবন্ধ এবং ঐ বছরই নভেম্বর-ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'সবুজপত্র" পত্রিকার একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোর বৈশ্যবৃত্তি ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের অমোঘ

পরিণতি হিসেবে এবং একে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগেই ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন যে সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম সংকট কালে সাম্রাজ্যবাদেরই ঘণীভূত রূপ হিসেবে ফ্যাসীবাদের জন্ম হয়। শুধু তাই নয় তিনি ফ্যাসীবাদও সাম্রাজ্যবাদকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে এদের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনার জন্য বিশ্ব জনমত সংগঠনে এক গৌরবজ্জ্বল ও মহান ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৯৩৬ সালে স্পেনে ফ্যাসী বিরোধী সংগ্রামে পূর্ণ সহযোগিতা সহানুভূতি এবং অর্থ ও উপকরণ দিয়ে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানিয়ে "স্পেন" নামে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এতে আন্তর্জাতিকতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর আবেদনে বলেন "স্পেনে আজ বিশ্ব সভ্যতা পদদলিত, স্পেনের জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রাংকো বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে। শিল্প সংস্কৃতির গৌরব কেন্দ্র মাদ্রিদ জ্বলেছে। নারীও শিশুদের খুন করা হচ্ছে, গৃহহারা ও নিঃস্ব করা হচ্ছে। স্পেনে গণফ্রন্টের পাশে দাঁড়ান, জনগণের সরকারকে সাহায্য করুন লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি তুলুন- প্রতিক্রিয়া দূর হও। লাখে লাখে এগিয়ে আসুন গণতন্ত্রের সাহায্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায়।"

শুধু স্পেন কেন, যে কোনো দেশের পিছিয়ে পড়া জাতের প্রতি তাঁর ছিল জোড়ালো সমর্থন। চীনের ওপর জাপ আক্রমণের গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ জাপানের প্রতি তীব্র নিন্দা করে আসছিলেন। ১৯৩৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাপ বোমারু বিমান চীনের বিভিন্ন শহরে রোমাবর্ষণ শুরু করে। অসহায় চীনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য জনডিউই, আইনস্টাইন, রাসেল ও রোঁলার প্রমুখ বুদ্ধিজীবিগণ পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে আবেদন জানান। এই আবেদনে রবীন্দ্রনাথও সাড়া দিয়ে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ উৎসবের দিনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে গৌরবান্বিত করে বলেন; "দৈত্যরা জেগে উঠেছে মানুষের সমাজে, মানুষের প্রাণ যেন তাদের খেলার জিনিস। মানুষের ইতিহাসের এই দানবিকতাই কি শেষ কথা? না তা হলে মানুষ বাঁচত না। আমাদের মেশিনগান নেই কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে। তার মূল্য যতটুকুই হোক, তাকে আমরা মহতের দিকে প্রয়োগ করব।"

জওহরলাল নেহরু ১৯৩৮ সালের ৯ই জানুয়ারী দিনটিকে দেশের সর্বত্র "চীন দিবস" হিসেবে পালনের জন্য আবেদন করেন। রবীন্দ্রনাথ ও চীনের জনগণকে সর্বোতোভাবে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান। "চীন দিবস" কে সার্থক করে তোলার জন্য ঐ ৯ই জানুয়ারী "আনন্দবাজার" পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে বলা হয় : "মানব মুক্তির সংগ্রাম রত চীন আজ সমগ্র প্রাচ্য ভূমির সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থী। জাগ্রত ভারত পীড়িত চীনের জয় কামনা করিতেছে। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে সমগ্র মানব পরিবারের সর্ববন্ধন মুক্তির আদর্শবাদ।"

জাপানের চীন আগ্রাসনকে ধিক্কার জানানোর জন্য জাপানের কবি ইয়োন নোগুচি রবীন্দ্রনাথের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠান। চীনে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও পৈশাচিক তান্ডব লীলার পক্ষে

নোগুচির এই নির্লজ্জ ওকালতির তীব্র সমালোচনা করে কবি সুন্দর লিখেছিলেন- "আপনি যখন এশিয়ার জন্য চীনকে রক্ষা করার উপায় স্বরূপ চীনা নারী ও শিশুদের উপর বোমাবর্ষণ এবং প্রাচীন মন্দির ও বিশ্ব বিদ্যালয়সমূহ ধ্বংসের কথা বলেন- তখন আপনি মানবতার উপর এমন একটি জীবন ধারা আরোপ করেন যাহা প্রাণীদের মধ্যেও অনিবার্য্য নহে।"

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির জয়ঢাক যখন জালিনওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের গর্বে মুখরিত তখনই ঐ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ তিনি একেক কণ্ঠে জানিয়েছিলেন। নিজের সরকারী খেতাব"নাইট" উপাধি বর্জন করেছিলেন।

১৯৩৭সালে আন্দামানে অনশনকারী বন্দীদের সমর্থনে কোলকাতার টাউন হলের জন সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন এবং দেশের বিধিবদ্ধ আইন ও মানুষের স্বাধীনতার বিধি সঙ্গত দাবীর প্রতি ভারত সরকারের শ্রদ্ধাহীন মনোভাবকে ফ্যাসিস্ট মনোভাব বলে অভিহিত করেন।

জীবনের শেষ পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে সংগ্রামী। অস্তাচলের ডাক যত নিকটবর্তী হয়েছে রবীন্দ্র নাথের সংগ্রামের আহবনা তত দৃঢ় এবং সত্যাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। এ সময়ে তাঁর একমাত্র কামনা ঃ-

মহাকাল সিংহাসন
বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বাণী শিশুঘাতী,
নারীঘাতী কুৎসিৎ বীভৎসা 'পরে' ধিক্কার
আনিতে পারিবেন।

(প্রান্তিক, ১৭নং)

চারিদিকে যখন ধনতন্ত্রেব নাভিশ্বাস উঠেছে, যখন ভীষণ সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে তখন শুধু ধিক্কার দিয়ে কাজ হবে না। তার মূলোৎপাটনের জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তা সার্থক করতে হবে। সে আহ্বান রবীন্দ্রনাথ করেছেন -

নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নিবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে,

- তাঁর এই উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান আমাদের জাতীয় সম্পদ, আর সেই আহ্বানে মানুষের প্রতিদিনের সংগ্রামে সাড়া দেওয়াই যথার্থ প্রাণ শক্তির লক্ষণ।

সূত্র ঃ- ১)"পশ্চিমবঙ্গ", ২) নৈবদ্য, ৩) বিভিন্ন রবীন্দ্রসাহিত্য।

- - - o - - -

শিক্ষা সংকটের আবর্তে ত্রিপুরার বর্তমান প্রজন্ম

ডঃ জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আরম্ভ করা যেতে পারে 'শিক্ষার অধিকারের কথা দিয়ে। চাই সবার জন্য শিক্ষা- Universal Education বা সার্বিক শিক্ষা । বিবেকানন্দ এই শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, বিশেষ করে নারীশিক্ষার উপর। তিনি বলেছিলেন -"There is no chance of welfare unless the condition of women is improved. A bird cannot fly only on one wing" তিনি আরো বলেছিলেন যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে এক অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণতা। তাকে বিকশিত করে তোলাই হচ্ছে শিক্ষা - "manifestation of perfection in man." রাষ্ট্রসংঘের দলিলে নিখিল মানবের যে মৌলিক অধিকারগুলো ঘোষিত হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে "শিক্ষার অধিকার"। প্রতি বছর ১০ই ডিসেম্বর 'মানবাধিকার দিবস' উপলক্ষে মিটিং হয়, সেমিনার হয়। অনেক ভাল ভাল কথা শোনা যায়। ওখানেই শেষ। বাস্তব হল এই 'অধিকার' ত্রিপুরার তরুণ প্রজন্মের কাছে আজও অধরা হয়ে আছে। আমাদের সংবিধানের নীতি নির্দেশাবলীর ৪৫ নম্বর ধারায় বিধিবদ্ধ হয়েছিল যে সংবিধান গৃহীত হবার দশ বছরের মধ্যে, মানে ১৯৬০ সালের মধ্যে, দেশে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়ের জন্য অবৈতনিক সার্বিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছিল যে সবাইর জন্য পাঁচ ক্লাশের প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রবর্তিত করতে হবে। আর মধ্যস্তরে আট ক্লাশ পর্যন্ত এই কাজটি শেষ করতে হবে ১৯৯৫ সালের মধ্যে। আমাদের রাজ্যে এই কাজ দুটি এখনো অসমাপ্ত। শুধু অসমাপ্ত নয়, লক্ষ্যমাত্রা থেকে আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। সময়সীমা কবে পার হয়ে গিয়েছে।

সবার জন্য পাঁচ ক্লাশের (I-V) প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে মূল পদক্ষেপ হচ্ছে তিনটি ঃ (ক) Universal provision of facilities বা সুযোগ সুবিধার সার্বিক বন্দোবস্ত, (খ) Universal enrolment বা সার্বিক ছাত্রভর্তি এবং (গ) Universal retention বা ভর্তি হওয়া শিশুদের সার্বিক ধারণ। প্রথম কাজটি হল স্কুলবিহীন এলাকাগুলো চিহ্নিত করে সেখানে স্কুল স্থাপন করা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ, যাতে শিশুরা বাড়ী থেকে হেঁটে গিয়ে এক -দেড় কিলোমিটারের মধ্যে স্কুলে ভর্তি হতে পারে। আসবাবপত্র সরবরাহের আয়োজনও শেষ করতে হবে এই পর্যায়ে। এই সুযোগ সৃষ্টির পরে দ্বিতীয় কাজটি হল সার্বিক ছাত্রভর্তির অভিযান, যাতে ৬-১১ বছরের কোন শিশু স্কুলের বাইরে না থাকে। একাজ দুটি শেষ হলেও সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা হল না। নামেমাত্র স্কুলে ভর্তি হয়ে দু'তিন বছরের মধ্যেই শিশুরা যদি অসময়ে স্কুল ছেড়ে দেয় তাহলে সার্বিক শিক্ষার কাজ অসম্পূর্ণই থেকে গেল। কাজেই চূড়ান্ত ও সব থেকে গুরুত্ব পূর্ণ কাজটি হল ভর্তি হওয়া শিশুরা যাতে দু'এক বছরের মধ্যেই স্কুল থেকে চলে না যায় তা সুনিশ্চিত করা। ত্রিপুরায় এ কাজ তিনটির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির বাস্তব চিত্র কি? 'শিক্ষার

অধিকার' অর্জিত হয়েছে?

ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকার থেকে ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল জাতীয় শিক্ষামূলক সার্ভের অন্তর্গত আমাদের স্টেট রিপোর্টটি। এই সার্ভে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, রাজ্যের পল্লী অঞ্চলে মোট ৬৮০২ টি জনপদ রয়েছে। এর মধ্যে ১৬৬৮ টি জনপদে আজও কোন স্কুল নেই। এর আগে ১৯৮৪ সালে শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রকাশিত সপ্তম পঞ্চম বার্ষিক যোজনার (১৯৮৫-৯০) Approach Paper বা প্রস্তুতিপত্রে বলা হয়েছিল যে, ত্রিপুরার ১৬০০ পল্লী জনপদে কোন প্রাথমিক স্কুল নেই এবং রাজ্যে সার্বিক শিক্ষার জন্য ১২০০ প্রাইমারি স্কুল খুলতে হবে এই জনপদগুলোতে।'৯০ সালে এসে আমরা কি দেখলাম? ১২০০ তো দূরের কথা, স্কুল করা হয়েছে ৩২১ টি। লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৬ শতাংশ। একদিকে নতুন স্কুল খোলা হল ৩২১ টি। আবার নয় বছর বাদে '৯৯ সালের সার্ভে রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে স্কুলবিহীন গ্রামীণ জনপদের সংখ্যা ১৬০০ থেকে বেড়ে হয়ে গেল ১৬৬৮। শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতার এই হল একটি মাত্র নমুনা।

এ প্রসঙ্গে যে কথাটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হল স্কুলবিহীন এসব এলাকাগুলো কোথায়? দেখা যাবে এগুলো সব অভ্যন্তরভাগে দূরবর্তী উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। যেমন, কাঞ্চনপুরের খেদাছড়া-লম্বাছড়া অঞ্চল, ছাওমনুর মানিকপুর ও গোবিন্দ বাড়ী, সালেমার গান্ধীনগর-চাকমাপাড়া, অমরপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা, বিশেষ করে গন্ডাছড়া ও ভগীরথের চারপাশে, সাব্রুমের বিস্তৃত দক্ষিণ পূবাংশ আর খোয়াই, মাতাবাড়ী ও বগাফার অরণ্য ও পাহাড়ী এলাকা। এসব অঞ্চলে জনবসতি কম। রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। উপজাতি পাড়াগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কোন স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই। উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থাটুকুও নেই, যা আন্ত্রিকের প্রকোপের সময় সংবাদপত্রে শিরোনাম হয়। স্থানীয় কোন বাজার নেই । বিদ্যুৎ তো অনেক দূরের কথা। এক কথায় এ সব অঞ্চলে আধুনিক জীবনযাত্রার কোন বেগবান প্রবাহই নেই। জীবনের ভারে পর্যুদস্ত এসব এলাকার অতিদুর্গত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শুধু স্কুল আর ছাত্র ভর্তি করাই নয়, তারপর শিক্ষকের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করে স্কুলগুলোকে প্রকৃত অর্থে সক্রিয় রাখা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। এদিকে জাতীয় শিক্ষানীতির সময়সীমা ১৯৯০ সাল কবে পার হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের রাজ্যে শত শত জনপদে এখনো কোন স্কুলই নেই। আর যেখানে স্কুলই নেই সেখানে ছাত্রভর্তির প্রশ্নও ওঠে না। কাজেই সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম যে কাজটি তাও আমাদের রাজ্যে শেষ হয়নি। আসলে এক্ষেত্রে বিরাজ করছে চরম এক উদাসীনতা, যার ফলে '৯৯ সালের সার্ভে রিপোর্টে দেখা যায় যে সরকারী খাতাপত্রে এমন ৪০টি স্কুল আছে যাদের বাড়ীঘর নেই বলতে কিছুই নেই। আর ২২টি এমন স্কুল অছে যেখানে শিক্ষক একজনও নেই।

অথচ সরকারী পরিসংখ্যানে প্রচারিত হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার নাকি ১০০ শতাংশ অতিক্রম করে ১১৬ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। আর উপজাতি শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার নাকি ১৩১ শতাংশ। কি হাস্যকর অদ্ভুত সব দাবী। রাজ্যের স্কুলবিহীন এলাকার

শত শত জনপদে যেখানে কোন স্কুলই নেই, যেখানে উগ্রপন্থী সন্ত্রাসের কারণে শত শত স্কুল বন্ধ হয়ে আছে, সেখানে ছাত্রভর্তির হার শুধু ১০০ শতাংশ নয়, ১০০ শতাংশ অতিক্রম করে যায় কি করে? কোথায় ভর্তি হল শিশুরা? শিক্ষাজগতের পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞগণ এ ধরনের পরিসংখ্যানকে বলে থাকেন smiling mask বা স্মিত হাসির প্রফুল্ল মুখোশ যা সুমধুর সাইরেন সংগীতের মত অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষকে মোহগ্রস্ত করে আত্মপ্রবঞ্চনার দিকে নিয়ে যায় এবং তাঁরা মনে করেন যে আমরা ১০০ শতাংশ অতিক্রম করে গিয়েছি, আমাদের কাজ তো তাহলে শেষ। এই smiling mask-এর আরেকটি পরিসংখ্যান হল ত্রিপুরায় প্রাইমারি স্তরে ভর্তি হওয়া শিশুদের মোট সংখ্যা নাকি এখন ৪ লক্ষ ৬১ হাজার। রাশিবিজ্ঞানের স্বীকৃত সূত্র অনুযায়ী যে কোন সমাজে প্রাইমারি স্তরে (I-V) পড়বার উপযুক্ত ৬-১১ বছরের শিশুদের সংখ্যা হতে পারে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩ ভাগ। ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা যদি ধরে নেই ৩৩ লক্ষ, তাহলে শতকরা ১৩ জন হিসেবে প্রাইমারি স্তরে পড়বার উপযুক্ত শিশুদের মোট সংখ্যা হতে পারে ৪ লক্ষ ২৯ হাজার। এই সংখ্যাও বাস্তবসম্মত নয়, কারণ অন্ধ, মূকবধির, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ স্কুলে ভর্তি হয় না। এজন্য সাধারণ স্কুলে ভর্তির হার শতকরা ৯৪/৯৫ জন হলেই সার্বিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। এখন, ৯৫ শতাংশ ধরলেও ভর্তির সংখ্যা হতে পারে ৪ লক্ষ ৭ হাজার। অথচ তথ্য প্রচারিত হচ্ছে যে ৪ লক্ষ ৬১ হাজার ছেলেমেয়ে নাকি এখন প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করছে। এই বিসদৃশ ব্যাপারটি হয়েছে এই কারণে যে ৬ থেকে কম এবং ১১ থেকে বেশী বয়সের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পঞ্চায়েত থেকে বয়সের ভেজাল প্রমাণপত্র নিয়ে এসে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এ জিনিস চলছে কতগুলো প্রলোভনের কারণে। যেমন স্কুলে জলখাবারের ব্যবস্থা, পোষাক, হাজিরা বৃত্তির টাকা ইত্যাদি। ফলে যাদের প্রাইমারি স্কুলে পড়বার কথা নয় তারাও অসত্য প্রমাণপত্রের জোরে ভর্তি হচ্ছে এবং ভর্তির হার স্ফীত করে ১০০ শতাংশের বেশী করে তুলছে। কিন্তু আরেকদিকে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অহরহ দেখতে পাচ্ছি যে প্রাইমারি বয়সের অসংখ্য শিশু সংসারের চাপে নানাপ্রকার উপার্জনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। এদের স্কুলে যাবার কোন সুযোগ নেই। এরা মাঠে গরু রাখে, বন থেকে লাকড়ি আনে, মোটর স্ট্যান্ডে মোট বয়, খাবারের দোকানে চা-মিষ্টি পরিবেশন করে, বিত্তবানদের ঘরে গৃহভৃত্যের কাজ করে, আবার আকালের দিনে খাদ্যের সন্ধানে বড়দের সঙ্গে বনে চলে যায়। এদের শৈশব হারিয়ে গেছে। বালিকারা আবার ব্যস্ত থাকে নানা গৃহস্থালির কাজে। তাছাড়া মহকুমা, ব্লক অথবা পঞ্চায়েত নিয়ে আলাদা ভর্তির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে জনগোষ্ঠী, ছেলেমেয়ের পার্থক্য ও অঞ্চলভেদে ভর্তির হারে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। যে smiling mask এর সংখ্যা প্রচারিত হয়ে থাকে তা একটি অবাস্তব স্ফীতকায় সংখ্যা যা সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার সত্যিকার পরিচায়ক নয়। কথাটা সরকারীভাবে অষ্টম যোজনা পত্রে (১৯৯২-৯৭) স্বীকারও করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে -"The apparent high enrolment ratio is due to enrolment of over-aged and under-aged children at this (primary) stage. The net en-

rolment ratio will be much less and below 100" ভাবনাব কথা হল প্রকৃত ৬-১১ বছরেব কত শিশু এখনো স্কুলের বাইরে বয়েছে তাব সঠিক সংখ্যা সংগ্রহেব কোন প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয় না। বলাব অপেক্ষা রাখে না সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছাত্রভর্তিব কাজটিও আমাদেব বাজ্যে এখনো অসমাপ্ত বয়ে গিয়েছে। অথচ কাজটি শেষ হওয়াব কথা ছিল পনেব বছর আগে ১৯৯০ সালে।

তৃতীয় পদক্ষেপ universal retention বা সার্বিক ধাবণেব কাজটি হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আব ত্রিপুবায় এব অবস্থাটি অত্যন্ত ভযাবহ। বিশেষজ্ঞবা বলেন যে স্থায়ী সাক্ষবতা অর্জন কবতে হলে একটি শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে চাব বছব চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপডা কবে যেতে হবে। তাব আগে স্কুল ছেডে দিলে অনুশীলন ও চর্চাব অভাব এবং গৃহেব পবিবেশ অনুকূল না হওযাব কাবণে সে অচিরেই আবাব নিবক্ষব হয়ে যাবে।

কিন্তু সবকাবী নথিতেই দেখতে পাওয়া যায় আমাদেব বাজ্যে অসময়ে স্কুল ছেডে দেওয়া, যাকে বলা হয drop out বা স্কুলছুট, এদেব সংখ্যা কতটা বেদনাদাযক। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওযা প্রতি ১০০ টি শিশুব মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকে ৫০ জন। বাকী পঞ্চাশ জন আগেই উধাও। তাব মানে অচিরেই এবা নিবক্ষব হয়ে যাবে। আব লক্ষ্যণীয় যে এই ড্রপ আউট প্রথম দুই ক্লাশ থেকেই সব চাইতে বেশী হয়ে থাকে। উপজাতি শিশুদেব মধ্যে আবাব এই ড্রপ আউটেব হাব আবো বেশী, শতকবা ৬৩ জন। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকে মাত্র ৩৭ জন। যেখানে বিবাট এক জনগোষ্ঠীব প্রতি ১০০টি ছেলেমেয়েব মধ্যে ৬৩ জনই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না কবে নিবক্ষবতা, অজ্ঞানতাব অন্ধকাবে হাবিয়ে যাচ্ছে, সেখানে সবাব জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীব সাববস্তু আর বইল কি? মধ্যস্তব ক্লাশ VI-VIII- এ এই ড্রপ আউটেব হাব আবো বেশী শতকবা ৬৩ জন। উপজাতি শিক্ষার্থীদেব ক্ষেত্রে এই হাব ভীতিপ্রদ শতকাব ৭৯ জন। আবাব মাধ্যমিক স্তবে (IX - X) সাবা বাজ্যে এই হাব যেখানে শতকবা ৭৭ জন, উপজাতিদেব মধ্যে তা হল শতকবা ৮৬ জন। বিশেষ কবে উপজাতিদেব ক্ষেত্রে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এদেব প্রতি ১০০ টি ছেলেমেয়েব মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকে মাত্র ৩৭ জন, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ২১ জন, আব মাধ্যমিক পর্যন্ত মাত্র ১৪ জন। অপচয়েব কি মর্মান্তিক চিত্র।

এই অপচয়েব পবিণাম দ্বিবিধ একদিকে সামাজিক, আব একদিকে আর্থিক। প্রাথমিক স্তবে ড্রপ আউটেব ফলে নিবক্ষবতাব পবিধি বেডে চলেছে ত্রিপুবায়। আমবা আত্মপ্রসাদ লাভ কবি এ কথা ভেবে যে ত্রিপুবায় সাক্ষবতাব হাব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কথাটা অবশ্যই সত্য। ১৯৯১ সালে সাক্ষবতাব হাব ছিল ৬০ শতাংশ। মোট নিবক্ষব মানুষেব সংখ্যা ছিল এগাব লাখ। দশ বছব বাদে ২০০১ সালে সাক্ষবতাব হাব ৬০ থেকে বেডে হল ৭৩ শতাংশ। কিন্তু মোট নিবক্ষব মানুষেব সংখ্যা বয়ে গেল প্রায় নয় লাখ। দশ বছবে কমল মাত্র দুই লাখ। এব কাবণ হল দশ বছবে জনসংখ্যা ২৭ লক্ষ ৫৭ হাজাব থেকে বেডে হল ৩২ লাখ। ৪ লাখ ৪৩ হাজাব বেশী, মানে বৃদ্ধিব হাব ১৬ শতাংশ। জনসংখ্যা যেখানে বেডেছে ১৬ শতাংশ হাবে সেখানে সাক্ষবতাব

হার বেড়েছে ১৩ শতাংশ হারে। উপজাতিদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা আরো হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৮১ সালে উপজাতিদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল ২৩ শতাংশ। আর মোট নিরক্ষর উপজাতি মানুষ ছিল ৪ লাখ ৪৯ হাজার। দশ বছর বাদে ১৯৯১ সালে সাক্ষরতার হার ২৩ থেকে অনেক বেড়ে হল ৪২ শতাংশ। কিন্তু নিরক্ষর উপজাতি মানুষের সংখ্যা হল ৪ লাখ ৯৪ হাজার । দশ বছরে কমার পরিবর্তে বেড়ে গেল ৪৫ হাজার, যদিও ঐ সময় তাদের সাক্ষরতার হার বেড়েছিল ১৯ শতাংশ। কারণ ঐ একই । '৮১-৯১ দশ বছরে উপজাতি জনসংখ্যা ৫ লাখ ৮৩ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছিল ৮ লাখ ৫৩ হাজার। জনসংখ্যা বাড়ল ৪৬ শতাংশ হারে, অপর দিকে সাক্ষরতার হার বাড়ল ১৯ শতাংশ হারে। মূল কথা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনা না করে শুধুমাত্র সাক্ষরতার বৃদ্ধির হার হিসাব করলে কোন সমাজের নিরক্ষরতার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। বললে ভুল হবে না যে ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে নিরক্ষরতার পরিধি এখনো বেড়ে চলেছে। মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে উপজাতি মহিলাদের। কিছুদিন আগে দেখেছিলাম প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে উপজাতি মহিলাদের মধ্যে শতকরা ২৩ জন মাত্র সাক্ষব,৭৭ জনই নিরক্ষর। কোন সমাজে মহিলাদের যদি এমন অবস্থা হয় তাহলে সে সমাজ এগুবে কি করে? বিকেকানন্দেব কথাটিই আবার মনে পড়েঃ'A bird cannot fly only on one wing' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে উপজাতিদের মধ্যে জনসংখ্যা ও সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার কত ছিল তার আলাদা হিসেব এখনো পাওয়া যায়নি।

এছাড়া, প্রাথমিক স্তরে উপজাতি শিশুদের মধ্যে ব্যাপক ড্রপ আউটের ফলে শুধু যে নিরক্ষর উপজাতি মানুষের সংখ্যা বাড়ছে তাই নয় স্কুল শিক্ষার উপরের দিকে আগের মতেই তারা পিছিয়ে পড়ছে। চিত্রটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। দারুণ প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান দিন বড় কঠিন দিন। একবার পিছিয়ে পড়লে চলার পথ আর মসৃণ থাকে না। প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ ও উত্তরণ সম্ভব হতে পারে একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের মাধ্যমে। কিন্তু এখানকার অবস্থাটিই অত্যন্ত করুণ। সারণী থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার

তারিখ ৩১.০৩.১৯৯৮

শতকরা ভর্তির হার

	সব সম্প্রদায় মিলিয়ে			শুধুমাত্র উপজাতি সম্প্রদায়		
শিক্ষাস্তর	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট
উঃ প্রাথমিক (VI-VIII)	৫৬.২	৪৬.৭	৫১.৫	৪৮.৩	৩৪.৫	৩৯.২
মাধ্যমিক (IX-X)	৪২.২	৩১.৪	৩৬.৭	৩৩.৩	১৭.৬	২৫.৮
উঃ মাধ্যমিক (XI-XII)	১৮.০	১১.০	১৪.৫	০৮.১	০২.৬	০৫.৪

'৯৮ সালের পরবর্তী বছরের অনুরূপ সংখ্যাগুলো এখনো পাওয়া যায়নি। দেখা যাচ্ছে যে গোটা রাজ্যের চিত্রটাই হতাশাব্যঞ্জক। মধস্তরে পড়বার বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভর্তি হতে পেরেছে শতকার ৫১ জন, উপজাতি ৩৯ জন। কাজ হয়েছে অর্ধেক। অথচ ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী কাজটি শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল দশ বছর আগে ১৯৯৫ সালে। অত্যন্ত দুঃখদায়ক অবস্থা হচ্ছে উপজাতি ছেলেমেয়েদের। মাধ্যমিকে এঁদের ভর্তির হার শতকরা ২৫, বালিকাদের মধ্যে শতকরা ১৭ জন। নিদারুণ অবস্থা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ৫ জন, বালিকা ৩ জনেরও কম। আর এ তো শুধু ভর্তির হিসাব। এদের মধ্য কতজন বোর্ডের পরীক্ষা ভালভাবে পাশ করবে, তারপর উচ্চশিক্ষা শেষ করে শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রশাসক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজীবী প্রভৃতি হয়ে জনজীবনে নেতৃত্বপদ অধিকার করবে, আর আস্তিন গুটিয়ে ত্রিপুরার উন্নয়নের রথচক্রে কাঁধ মেলাবে তা সহজেই অনুমান কার যায়। এই অবস্থার পেছনে মূল কারণ কিন্তু সেই প্রাইমারি স্তরের ভয়াবহ ড্রপ আউট। আসলে নীচের ক্লাশ থেকে ঠিকমত উঠে এলে তো উপরের দিকে সংখ্যা বাড়বে। ফলে সমাজজীবনে আগের মতই থেকে যাচ্ছে বৈষম্য, বাবধান ও অনগ্রসরতা। শিক্ষাসোপানের তলার দিকে যেখানে বিরাট গলদ সেখানে সংরক্ষণের রক্ষাকবচ দিয়ে ব্যবধান দূর করা যাবে? যদি যেত তাহলে শত শত সংরক্ষিত পদ বছরের পর বছর খালি পড়ে থাকত না।

বিরাট এই অপচয়ের ফলে আর্থিক দিক থেকে রাজ্যকে দিতে হচ্ছে এক সর্বনাশা মাশুল। যখন ক্লাশ V পর্যন্ত টিকে থাকে ৫১ শতাংশ আর উপজাতিদের মধ্যে ৩৭ শতাংশ এবং বাকীরা নিরক্ষরতার অন্ধকারে হারিয়ে যায়, যখন উপজাতি শিক্ষার্থী ক্লাশ VIII পর্যন্ত টিকে থাকে শতকরা ২১ জন এবং X পর্যন্ত থাকে ১৪ জন, তখন তো শিক্ষাখাতে ব্যয়িত অর্থের সিংহভাগই বৃথা জলে যাচ্ছে। পরিকল্পনা রচনার সময় অগ্রিম একথা ভেবে কেউ অর্থবরাদ্দ করে না যে ১০০ টি উপজাতি শিশুর মধ্যে V পর্যন্ত টিকে থাকবে ৩৭ জন, মধ্যস্তরে ২১ জন এবং মাধ্যমিক স্তরে মাত্র ১৪ জন। কাজেই অর্থব্যয় যা হবার ঠিকই হচ্ছে। কিন্তু তা সমাজের মুষ্টিমেয় একটা অংশের কাজেই শুধু আসছে, বাকীটা নয়ছয়। পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞগণ এই অবস্থাকেই বলে থাকেন ঃ "Exercise in futility, investment in ignorance" বা "ব্যর্থ প্রচেষ্টার কসরত, শিক্ষাহীনতায় বিনিয়োগ" ইত্যাদি। ত্রিপুরার মত হতদরিদ্র একটি রাজ্যে এই মারাত্মক আর্থিক অপচয় তো রাতের ঘুম উড়িয়ে দেওয়ার কথা। কারা এই ড্রপ আউটের শিকার? দেখা যাবে এরা সব উপজাতি, তপশীল সম্প্রদায়, দিনমজুর, ক্ষেতমজুর প্রভৃতি শ্রমজীবি দুর্গত মানুষ এবং বালিকা। অথচ শিক্ষার প্রয়োজন এদেরই সব থেকে বেশী। এদেরই মধ্যে নবজাগরণের তরঙ্গ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শিক্ষা প্রসারের এত আয়োজন ও অর্থব্যয়। কিন্তু এরা আগেকার সামন্ততান্ত্রিক দিনের মতই থেকে যাচ্ছে অশিক্ষিত ও অনগ্রসর। আমাদের রাতের ঘুম কি বিঘ্নিত হচ্ছে ? রবীন্দ্রনাথের কথাটি মনে আসে ঃ "আমরা এক দেশে বাস করি বটে, কিন্তু দেশ আমাদের এক নয়।" এই অবস্থায় আগামীদিনে রাজ্যের সুস্থিতি সংহতি যদি বিড়ম্বিত হয় ওঠে তাহলে অবাক হবার কিছু

নেই। আগেকাব সংহতি এখনই আব নেই। শত শত জনপদে কোন স্কুল নেই। পড়বাব বযসী হাজাব হাজাব ছেলেমেয়ে বযেছে স্কুলেব বাইবে আব ড্রপ আউটেব ফলে বেড়ে চলেছে মানুষে মানুষে ব্যবধান ও বন্ধ্যা অর্থব্যয। সাম্প্রতিককালে গঠিত ত্রিপুবা শিক্ষা কমিশন তো তাঁদেব বিপোর্ট সেই কবে ২০০৩ সালেব অ'গষ্ট মাসে সবকাবেব কাছে পেশ কবে দিযেছেন। সেই বিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয নি। উল্লিখিত জ্বলন্ত বিষয়গুলোব উপব কমিশন কি কোন অলোকপাত কবেছেন? উত্তবণেব কোন পথনির্দেশ কি সেখানে আছে? বাজ্যবাসী জানতে পাবলে উপকৃত হতেন।

এই অবস্থায বিশেষ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকাব দিযে দু'টি কর্মসূচী রূপাযিত কবা দবকাব ছিল - শিক্ষক শিক্ষণ এবং শিক্ষামূলক পবিদর্শন। আক্ষেপেব বিষয হল প্রথমটি এখন মৃতকল্প, আব দ্বিতীযটিব বহুকাল থেকে আমাদেব বাজ্যে কোন অস্তিত্বই নেই।

পূর্বোক্ত সার্ভে বিপোর্ট থেকে জান [illegible] ত্রিপুবায ২০২৯ টি প্রাইমাবি স্কুলেব মধ্যে শতকবা ৯৬টি স্কুলই হচ্ছে গ্রামীণ এলাকায তাব মানে প্রাথমিক শিক্ষকদেব প্রায গোটা কাজটাই সামলাতে হচ্ছে অভ্যন্তবভাগে প্রত্যন্ত অঞ্চলে (১) এসব এলাকায যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। বাসস্থান থেকে স্কুলে যেতে হলে অনেক পথ হাঁটতে হয। স্কুলেব কাছে কোনবকম থাকবাব মত একটা বাসস্থান পাওযাও দুষ্কব [illegible] জীবনযাত্রাব ন্যূনতম সুযোগসুবিধা এখানে নেই। আব দিনেব পব দিন শিক্ষকদেব কা[illegible] হবে এমন এক জনগোষ্ঠীব মধ্যে যাবা যুগ যুগ ধবে বঞ্চনা, দাবিদ্র্য, ব্যাধি, অশিক্ষা, কুসংস্কাব আব প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাব শিকাব হয়ে আছে। স্কুলে পডাতে হবে এমন সব পবিবাবেব প্রথম প্রজন্মেব শিক্ষার্থীদেব (২) ছন বাঁশেব তৈবী অধিকাংশ স্কুল বাডী জবাজীর্ণ, আসবাবপত্রেব অবস্থা অত্যন্ত করুণ। অনেক স্কুলে একটা ভাল ব্ল্যাকবোর্ড পর্যন্ত নেই। এক মন্ত্রী অভিযোগ কবেছিলেন যে অনেক স্কুলে নাকি বাত্রে গরু ছাগল থাকে। শিক্ষার্থীদেব উপস্থিতিব হাব খুবই অনিযমিত আবাব শিশুদেব লেখাপডাব বিষযে বযেছে পবিবাবে সচেতনতা ও আগ্রহেব অভাব কাযক্লেশে জীবন ধাবণ কবাটাই এদেব মূ[illegible] সমস্যা, লেখাপডা পবেব কথা। (৩) তাবপব বযেছে এসব এলাকাব ছোট ছোট স্কুলেব বিশেষ এক সমস্যা। পাঁচটি ক্লাস থাকলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে খুব কম স্কুলেই পাঁচ জন শিক্ষক আছেন। ইদানিং একটা কথা শোনা যায যে এক শিক্ষক দুই -শিক্ষকেব প্রাইমাবি স্কুল নাকি ত্রিপুবায আব নেই। থাকলেও যৎসামান্য কিছু থাকতে পাবে '৯৯ সালেব সার্ভে বিপোর্ট কি বলে? চমকে উঠবেন না। নেই বলতে একজন শিক্ষকও নেই এমন ২২ টি সবকাবী প্রাইমাবী স্কুলও আমাদেব বাজ্যে আছে। এক শিক্ষক স্কুল বযেছে ১৫৫টি দুই শিক্ষকেব ৫০৮ টি আব তিন শিক্ষকেব ৩৮৭ টি। শিক্ষকহীন স্কুল বাদ দিযে মোট সংখ্যা হল ১০৫০ বাজ্যে মোট প্রাথমিক স্কুলেব সংখ্যা ২০২৯। তাহলে শতকবা ৫২টি স্কুলে শিক্ষক বযেছেন একজন, নযতো দুই জন বা তিনজন কিন্তু ক্লাশ তো পাঁচটি। এসব স্কুলে একাধিক ক্লাশ এক সঙ্গে মিলিযে যুগ্ম শ্রেণীপাঠনা (multiple class teaching) কবতে হয। রুটিনও কবতে হয সেভাবে। হাতেকলমে বিশেষ প্রশিক্ষণ ছাডা

একজন সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে কাজটি ঠিকমত করা সম্ভব নয়। (৪) তাছাড়া বর্তমানে রাজ্যে শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে মেধা, পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান, দক্ষতা, ইত্যাদির কোন মূল্য নেই। বেকার জীবনের দীর্ঘতা, পারিবারিক প্রয়োজন, পরিবারে অন্য কেউ চাকুরী করে কিনা এসব বিচার করেই শিক্ষকের চাকুরি দেওয়া হয়। (৫) এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ককবরক শিক্ষকদের যোগ্যতামানের প্রশ্ন। ককবরকভাষী উপজাতি কর্মপ্রার্থীরা আগেও প্রাইমারী শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হত। তখন অন্যান্য সাধারণ শিক্ষকদের মত তাদেরও ন্যূনতম যোগ্যতামান ছিল ম্যাট্রিক অথবা তখনকার হায়ার সেকেন্ডারী (ক্লাশ XI) পাশ। ১৯৭৮-৭৯ সালে এই যোগ্যতামান শিথিল করে সিদ্ধান্ত হয় যে ককবরকভাষী উপজাতি কর্মপ্রার্থী যারা ক্লাশ X পর্যন্ত পড়েছে তারাও অন্যান্য সাধারণ শিক্ষকদের মত সমান বেতন হারে প্রাইমারি শিক্ষক নিযুক্ত হতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে এই নিয়মটি সংশোধন করে সিদ্ধান্ত হয় যে শুধু ক্লাশ X পর্যন্ত পড়া নয়, যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে অর্থাৎ যাদের Admit Card বা প্রবেশপত্র আছে তারাই নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবে। শিক্ষক হিসেবে চাকুরীব পাসপোর্ট হয়ে গেল Admit Card যা অনায়াসেই পাওয়া যেতে প্যারে। X ক্লাশ পর্যন্ত পড়ার প্রমাণপত্র নিয়ে যে কেউ বোর্ডের কাছে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি চাইতে ও পেতে পারে। একান্ত আলোচনায় বোর্ডের সূত্রেই জেনেছিলাম যে এসব প্রাইভেট পরীক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৯০০ নম্বরের পরীক্ষায় ৫০ নম্বরও পায় না। গড় নম্বর ৫/৭, গণিতে অধিকাংশই শূন্য। মনে রাখা দরকার যে, ককবরক শিক্ষকদের নিযুক্তি তো শুধু ককবরক মাতৃভাষা হিসাবে পড়াবার জন্য নয়। ককবরকের মাধ্যমে তাদের তো অঙ্ক, সমাজবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ও পড়াতে হবে। তারপর রয়েছে ইংরেজী। অভিযোগ শোনা যায় যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ইদানিং নাকি রাজ্য সরকারের নীতিও মানা হচ্ছে না এবং V-VI ক্লাশ পাশ করা প্রার্থীদেরও ককবরক শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে। কারণ, সব এলাকায় মাধ্যমিক স্কুল না থাকায় তাবা প্রাইভেট পরীক্ষায় বসতে পাবে না এবং ফলে এডমিট কার্ডও তাদের নেই। চরম ক্ষতি হচ্ছে কাদের? প্রথম শৈশব থেকে সারা জীবনের জন্য কাদের পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে? অবশ্যই নিরপরাধ উপজাতি শিশুদের। একদিন বড় হয়ে প্রতি পদে হোঁচট খেয়ে আজকের শিশুবা যখন বুঝতে পারবে জীবনেব প্রত্যূষেই তাদের কি মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে এবং যখন আবার নতুন করে করার সময় আর থাকবে না, তখন আজকের নীতিনির্ধারক ও চলমান ব্যবস্থাদিকে তারা কোন্ চোখে দেখবে? কিরূপ আশীর্বাণী উচ্চারণ করবে? ইদানীং ককবরক শিক্ষকদের জন্য আলাদা সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং কোর্স চালু করা হয়েছে। কিন্তু এই কোর্সের সারবত্তা ও কার্যকারিতার কোন মূল্যায়নই করা হয়নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে দুর্গম দূরবর্তী এলাকায় কাজের প্রতিকূল পরিবেশ, স্কুলবাড়ী আসবাবপত্রের চরম দৈন্যদশা, এক শিক্ষক, দুই শিক্ষক স্কুলে বিশেষ পঠন-পাঠন সমস্যা, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা ও বিষয় জ্ঞানের পরিবর্তে শিক্ষাবহির্ভূত বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া, ককবরক শিক্ষকদের শিক্ষাগত মান - এসবের প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষণের কাজটি, শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, কতটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষক শিক্ষণের অবস্থা কি ? তথ্য নীচে দেওয়া হল।

২০০৪ সাল

স্তর	মোট শিক্ষক সংখ্যা	ট্রেনড্ শিক্ষক	আনট্রেনড্ শিক্ষক	শতকরা ট্রেনড্ শিক্ষক
প্রাইমারি	৯৩২৭	২৬৯৭	৬৬৩০	২৮.৯
মিডল	৭০২২	১৪৯১	৫৫৩১	২১.২
মাধ্যমিক	৮৫২৯	২১৯০	৬৩৩৯	২৫.৬
উঃমাধ্যমিক	৯৩৯২	৩৪৭৫	৫৯১৭	৩৬.৯
মোট	৩৪২৭০	৯৮৫৩	২৪৪১৭	২৮.৭

দেখা যাচ্ছে মোট ৩৪২৭০ জন শিক্ষকের মধ্যে ট্রেনিং বাকী এমন শিক্ষকের সংখ্যা ২৪ হাজারেরও বেশী। মধ্যস্তরে ট্রেনড শিক্ষক শতকরা মাত্র ২১ জন। সারা রাজ্যে ৩০ শতাংশ শিক্ষকও ট্রেনিং পায়নি। ট্রেনিং কলেজগুলোতে এখন যে আসন সংখ্যা রয়েছে তাতে আগামী পঞ্চাশ বছরেও ট্রেনিং এর কাজ শেষ হবে না। তাব মানে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে পড়তে হবে এমন সব শিক্ষকের কাছে যাদের শিক্ষাবিজ্ঞানের কি (দর্শন তত্ত্ব), কেন (ব্যক্তি ও সমাজ জীবন) কখন ও কিরূপে (মনোবিজ্ঞান, পাঠ-পরিকল্পনা ও পদ্ধতি) ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোতে পেশাগত জ্ঞানলাভের কোন সুযোগই হয়নি। এখন নবতম ব্যবস্থা হয়েছে চাকুরীতে কর্মরত শিক্ষকদের এক বছরের জায়গায় ছয় মাসের ট্রেনিং দেওয়া হবে, যাতে বছরে দু'টি দলের ট্রেনিং শেষ করা যায়। অথচ এক সময়ে ত্রিপুরার শিক্ষার কর্ণধারগণ প্রাইমারী ট্রেনিং কলেজগুলোতে একদিকে আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষণকাল এক বছরের জায়গায় দুই বছর করার জন্য, শুধু পরিকল্পনা নয়, কাজও আরম্ভকরেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বড় আকারের হোস্টেল নির্মাণের কাজও শেষ করেছিলেন। কারণ তখন কলেজগুলো বাধতামূলকভাবে আবাসিক ছিল। শুনতে পাই সেই পাকা বাড়ীগুলোতে এখন নাকি অন্য অফিসের স্থান হয়েছে, কোথাও নাকি আবার বি.এস.এফ., সি.আর.পি.-র শিবির করা হয়েছে। শিক্ষণকাল দুই বছর করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকদের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো (theoretical content) সম্বন্ধে সম্যক অবহিত করা, পাঠ পরিকল্পনা ও পদ্ধতি (lesson plan and methods of teaching) সম্বন্ধে হাতেকলমে দক্ষতা অর্জনের জন্য কমপক্ষে ছয়মাস teaching practice করা এবং সর্বোপরি মাতৃভাষা, ইংরেজী, অঙ্ক, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য বিষয়ে গভীরতর জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা, যাতে করে তাঁরা দক্ষ শিক্ষক তথা সমাজসেবী হিসাবে কাজ করতে পারেন এখন ট্রেনিং হয়ে গেল ছয় মাসের। এই ছয়মাসও একটা কথার কথা। ভর্তির কাজ, সরকারী ছুটি, অন্য স্কুলে গিয়ে teaching practice করা এবং নিজেদের পরীক্ষায় বসা এসব করে প্রকৃত ক্লাশের সময় তিন চার মাসও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ফলে ট্রেনিং সিলেবাসও অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নামকাওয়াস্তে 'বুড়িছোঁয়া ' ট্রেনিং -এর পরিণামে শিক্ষামানের ক্রমাবনতি যে অবশ্যম্ভাবী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কয়েক বছর আগের কথা। একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের

কাজে দিল্লী ও ব্যাঙ্গালোর থেকে দুজন সর্বভারতীয় আধিকারিক তথা প্রবীণ শিক্ষাবিদ ত্রিপুরায় এসেছিলেন। দু'টি ট্রেনিং কলেজ দেখে এসে এই প্রতিবেদককে তাঁরা বলেছিলেন ঃ ' তোমাদের ট্রেনিং কলেজ দু'টিতে আগের শ্রী ও সমৃদ্ধির কিছু চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু বর্তমানে এগুলো ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতকল্প হয়ে আছে (decaying and moribund)। আমাদের 'অগ্রগমন' কোন্ দিকে হচ্ছে? সামনের দিকে না পিছনের দিকে?

রাজ্যের বিপর্যস্ত স্কুল শিক্ষার অন্যতম মূল কারণ শিক্ষামূলক পরিদর্শনের চরম বিলুপ্তিসাধন যা অনেক দিন আগে থেকেই করা হয়েছে। এই পরিদর্শন বলতে ইংরেজ আমলের পুলিশী ব্যবস্থা বা শিক্ষকদের সন্ত্রস্ত করা বোঝায় না। বোঝায় শ্রেণীপাঠনার কাজে সহযোগী অংশীদার হয়ে শিক্ষকদের সাহায্য করা, পাশে থেকে তাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ রাখা, লেখাপড়ার মান উন্নত করা, অভিভাবকদের আশ্বস্ত করা ইত্যাদি। এখন বাস্তব হল পরিদর্শকদের দিয়ে এই শিক্ষামুলক আসল কাজটি ছাড়া অন্য অনেক কিছুই করিয়ে নেওয়া হয়। যেমন মাসকাবারে বেতন দেওয়া, দীর্ঘ অনুপস্থিতি, নাম ডেকে স্কুল ছুটি, জল খাবার, পোষাক, হাজিরাবৃত্তি , স্কুল মেরামতের টাকা আত্মসাৎ, প্রশ্ন ফাঁস ইত্যাকার অভিযোগের তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়া , বন্যাত্রাণ, লোকগণনা, স্থানীয় মেলা প্রদর্শনীর কাজে দায়িত্ব পালন - আসল কাজ ফেলে এসব দিকেই পরিদর্শকদের সময় ব্যয় হয় বেশী। জেলাস্তরে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষাকাজে গতিবেগ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে প্রত্যেকটি জেলায় Zonal Dy.Director-এর অফিস স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর সহকারী ছিলেন আরও তিনজন অফিসার District Inspector of Schools, District Planning Officer ও Accounts Officer। আজ জেলাগুলোর কোন অফিসে একসঙ্গে চারজন অফিসারকে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ফলে মফঃস্বল থেকে সদরে শিক্ষাবিষয়ক পরিসংখ্যানও সময়মত আর আসে না। তাগিদ পাঠাতে হয় কয়েকবার। আসলে শিক্ষামূলক পরিদর্শন বলতে কিছুই আর আমাদের রাজ্যে নেই। কোনদিন হয়তো শিক্ষা পরিচালনার এই অপরিহার্য প্রক্রিয়াটির পুনরুজ্জীবন হবে, কিন্তু ততদিনে তরুণ শিক্ষার্থী তথা সমগ্র সমাজকে কি মাশুল দিতে হবে তার পরিমাপ কেউ করতে পারবে না, কারণ এই ক্ষয়ক্ষতি চোখে দেখা যায় না।

১৯৫৫-৫৬ সালে রাজাদের আমলের স্কুল পরিদর্শক উদয়পুরের প্রয়াত পরেশ ভট্টাচার্যের (মুখ্য বনপাল প্রয়াত নরেশ ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) বাড়ীতে বসে গল্প শুনেছিলাম কিভাবে তাঁদের হাঁটাপথে বা গোমতীর বুকে নৌকায় অমরপুরে গিয়ে পরিদর্শন করতে হত এবং যথাসময়ে ওপরওয়ালা মহকুমা হাকিমের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে হত। অনুরূপ গল্প শুনেছি আগরতলায় সতীশ দেববর্মার কাছে; ধর্মনগরে নিতাই সিংহের কাছে। সে আমলেও কাজটি ছিল; আজ আমাদের আধুনিক আমলে সব চুকেবুকে গিয়েছে। কাজটির পুনঃপ্রবর্তন করতে হলে প্রথম সার্কেল অফিস থেকে প্রাইমারী স্কুলকে ভিত্তি করেই আরম্ভ করতে হবে, ক্রমশঃ উপরের দিকে। কিন্তু এ কাজের জন্য যে নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টার প্রয়োজন তার সামান্য অবশিষ্টও কি আজ আমাদের আছে?

স্কুল শিক্ষার তলার দিকে দীর্ঘদিনের সীমাহীন উদাসীনতা ও উপেক্ষা, মৃতকল্প শিক্ষক শিক্ষা, বিলুপ্ত পরিদর্শন, ব্যাপক কর্মবিমুখতা, প্রগল্‌ভ পল্লবগ্রাহিতা সব মিলিয়ে পরিণতি যা হবার তাই হচ্ছে। বোর্ডের পরীক্ষায় বছরের পর পছর ফেলের পাহাড়। এখন ক্লাশ V পর্যন্ত চালু হয়েছে নতুন নিয়ম অবাধ প্রমোশন - automatic promotion. ওখান থেকেই শুরু, যার জের চলছে মাধ্যমিক পর্যন্ত। বোর্ডের পরীক্ষায় যারা পাশ করে তাদের মধ্যেও আবার প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে পাশের সংখ্যা অতি নগণ্য। আবার রয়েছে grace marks -এর ভরতুকি যার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। প্রয়োজন বুঝে এক এক বছর এক এক রকম। একান্ত আলাপে জানা যায় যে খাতা দেখার পর প্রকৃত নম্বরের উপর ফলাফল প্রকাশিত হলে পাশেব হার ১৫-২০ শতাংশও হত না। একজনও পাশ করতে পারে না এমন সরকারী মাধ্যমিক স্কুলও আমাদের রাজ্যে আছে।

২০০২ ও ২০০৩ সালের নিয়মিত (রেগুলার) মাধমিক পরীক্ষার্থীদের ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

		২০০২ সাল	২০০৩ সাল
১)	মোট পরীক্ষার্থী	১৮,২৩৫	১৯,৮৬৬
	পাশের সংখ্যা	১১,৯২১	১৩,০৬৫
	ফেলের সংখ্যা	৬.৩১৪	৬,৮০১
	শতকরা পাশের হার	৬৫.৩২	৬৫.৭৬
	প্রথম বিভাগ	৯২৮ (৭.৭৮%)	১,২৪৩ (৯ ৫১%)
	দ্বিতীয় বিভাগ	২,৬২৪ (২২.০১%)	২ ৯৬৪ (২২.৬৮%)
	তৃতীয় (পাশ) বিভাগ	৮,৩৬৯ (৭০.২০%)	৮,৮৫৮ (৬৭ ৭৯%)
২)	সবাই ফেল এমন স্কুলের সংখ্যা	৩০	৪৩
৩)	মোট উপজাতি পরীক্ষার্থী	১০,৬৩৩	১০,৫৫৪
	পাশের সংখ্যা	২,৫৯৯	২,৭৬৭
	ফেলের সংখ্যা	৮,০৩৪	৭,৭৮৭
	শতকরা পাশের হার	২৪.৪৪	২৬.২১
	প্রথম বিভাগ	২৮ (১.০৭%)	৪১ (১ ৪৮%)
	দ্বিতীয় বিভাগ	২০২ (৭ ৭৭%)	২৭৬ (৯ ৯৪%)
	তৃতীয় (পাশ) বিভাগ	২,৩৬৯ (৯১.১৫%)	২.৪৫০ (৮৮ ৫৪%)

দেখা যাচ্ছে ২০০২ ও ২০০৩ সালে সব পরীক্ষার্থী ফেল করেছে এমন স্কুলের সংখ্যা

৩০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৩। আবার রাজ্যে যেখানে পাশের হার ৬৫ শতাংশের উপরে, সেইখানে উপজাতি পরীক্ষার্থীদের পাশের হার ২৫-২৬ শতাংশ। উপজাতিদের মধ্যে শতকরা দুইজন পরীক্ষার্থীও প্রথম বিভাগে পাশ করতে পারে না। অবশ্য সারা রাজ্যেও প্রথম বিভাগে পাশের সংখ্যা শতকরা ১০ জনও হয় না। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় আরেকটি বিষয়ের। দেখা গেছে ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ -এই সাত বছরে নিয়মিত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮২৫ জন। এর মধ্যে পাশ করেছে ৭৫,৭২৬ জন , ফেল ৫২,০৯৯ জন।-ভাবনার বিষয় হল প্রতি বছর এই যে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ফেল করছে এরা কারা? কোন্ অঞ্চলের? কোন্ সম্প্রদায়ের ? কি রকম পরিবারের ? কোন্ স্কুল থেকে এসেছে? অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ফেলের সংখ্যা সেখানেই সর্বাধিক যেখানে কেবলমাত্র সাইনবোর্ড পরিবর্তন করে হাইস্কুল করা হয়েছে। যেখানে প্রধান শিক্ষক নেই, বিষয় শিক্ষক নেই, যেখানে অত্যাবশ্যক উপকরণের একান্ত অভাব আর যেখানে পরীক্ষার্থীদের কয়েকজন করে গৃহশিক্ষক রাখবার সংগতি নেই। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই রকম চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। সবাই ফেল এমন স্কুল সেখানেও আছে। এমন কি বছর বছর সবাই ফেল এমন স্কুলও আছে। বলা বাহুল্য স্কুলগুলো উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। এই অবস্থা ভবিষ্যতের দিক থেকে কি বার্তা বহন করে আনছে? রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত - না থাকারই মত। এই অবস্থায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটি যে কতটা দক্ষ, শ্রেষ্ঠ ও নিপুণ করে গড়ে তোলা দরকার ছিল তা না বললেও চলে। একমাত্র সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া ধর্মনগরের উত্তরে ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের দাঁড়াবার কোন জায়গা নেই। আর তাদের পাশ করান হচ্ছে grace marks দিয়ে। এই প্রসঙ্গে বোর্ডের কথা বলে কোন লাভ নেই। প্রতিষ্ঠিত সব নিয়মকানুন পদদলিত করে যদৃচ্ছ চাকুরি বন্টন, গোপনে প্রকাশককে পাঠ্যবই এর পান্ডুলিপি হস্তান্তর, নোটবই ছেপে বেপরোয়া ব্যবসা, সময়মত পুস্তক মুদ্রণ ও সরবারহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর সব অভিযোগ নিয়ে ইদানিং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সম্বন্ধে ন্যক্কারজনক যেসব সংবাদ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই বোর্ডের কাছ থেকে আশা করার কিছু আছে বলে মনে হয় না। এই প্রতিষ্ঠানটি যেন নিজের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা সব বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। কাজেই বোর্ডের কথা বলে কোন লাভ নেই। আমরা কোন্ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি? ত্রিপুরার "মানব সম্পদ উন্নয়নের" আসল চেহারাটা কিরূপ? সময় কিন্তু থেমে নেই।

এবার দেখুন শিক্ষিত বেকারদের কর্মহীনতা কি তীব্র হয়ে উঠেছে। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত এই বেকারদের মধ্যে যেমন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ কর্মপ্রার্থীরা আছে তেমনি অছে স্নাতক, স্নাতকোত্তীর্ণ, প্রযুক্তি ও কারিগরি পাশ করা বেকারগণ। ২০০২ সালের তালিকায় দেখা যায় মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তীর্ণ প্রার্থী রয়েছে প্রায় ৭২,০০০। স্নাতক ও স্নাতকোত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ৩৫,০০০। আই. টি.আই ও অন্যান্য প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা ৭৫৩৭। এগ্রি.বি.এস.সি / এম.এস.সি পাশ রয়েছে ১৯৪ জন। ইংরেজীর স্নাতকোত্তীর্ণ প্রার্থী রয়েছে ১৭৬ জন। আইন পাশ

বেকারও এই তালিকায় রয়েছে। ২০০২-২০০৩ সালের তালিকায় কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ৯৪ হাজার। এখন শেষ সংবাদে জানা যায় এই সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৫ হাজারের কাছাকাছি। একে আমরা কি বলব? ত্রিপুরায় শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতি? না, সমষ্টিজীবনে এক ভয়াবহ অশনি সংকেত একটি মারাত্মক time bomb? আসল কথা হল উচ্চমানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে পেশাগত যোগ্যতা অর্জন, জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বপদ অধিকার, কল্যাণধর্মী চেতনা ও আদর্শে দীক্ষিত নতুন এক শ্রমশীল প্রজন্মের সৃষ্টি, আমজনতার আর্থ-সামাজিক উত্থান - এসব উদ্দেশ্য সামনে রেখেই শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এই কাজটি ঠিকমত করতে পারলে রাজ্যে জীবন জীবিকার গোটা পরিমন্ডলটিই রূপান্তরিত হয়ে যেত। উগ্রপন্থার জন্মও হত কিনা সন্দেহ।

এখানেই জড়িয়ে আছে উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের ওতপ্রোত সম্পর্কের বিষয়টি। উচ্চ শিক্ষার পরিধি অনেক বড় আকারের যার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। সে অবকাশ এখানে নেই। শুধু এটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে উচ্চ শিক্ষার সমস্যা, এর গুণাগুণ, প্রত্যেকটি মহকুমায় পৃথক কলেজের সত্যিকার প্রয়োজনীয়তা, এদের উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণের ব্যয়ভার, ত্রিবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের পরে বিভিন্ন বিষয়ে পাশের হার, কলেজগুলোতে আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়াবলীর প্রাসঙ্গিকতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে উৎকৃষ্ট শিক্ষামান স্থাপনের প্রয়াস - এসব বিষয়ে নিরন্তর সজাগ দৃষ্টি না রাখলে উচ্চ শিক্ষার নামে সমস্যা শুধু জমতেই থাকবে, যা এখন ঘটে চলেছে। আজ একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে একদিকে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন, আরেকদিকে এই ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা সুনিশ্চিত করা। রাজ্যের উন্নয়নমুলক কর্মসূচী যা বর্তমানে আছে এবং আগামীদিনে গৃহীত হতে চলেছে তার সঙ্গে এর সংযোগ স্থাপন করা, যাতে করে শিক্ষা শেষে ছেলেমেয়েরা যথাসম্ভব রাজ্যের উৎপাদনমূলক ও সেবামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। সুনিশ্চত করা যাতে তাদের জন্য কিছু পরিকল্পিত কমর্সংস্থান হয়। এই লক্ষ্য যদি এখনও উচ্চ শিক্ষা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার রূপদান প্রণালীর ক্ষেত্রে সক্রিয় আঙ্গিকে পরিণত না হয়, এখনো যদি শিক্ষা পরিকল্পনায় নূতন চিন্তাভাবনা ও আর্থ-সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার জায়গায় মান্ধাতার আমলের সেই সম্প্রসারণমূলক মডেলটিই চলতে থাকে, যা নবনির্মাণের পরিবর্তে তরুণ সমাজকে কর্মহীনতার অভিশাপে দিন দিন দিশেহারা করে চলেছে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এক নিদারুণ দুঃসময় যে ত্রিপুরাকে অস্থির উত্তপ্ত করে তুলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যাকে বলে fatal hour বা ক্রান্তিলগ্ন তার ডমরু নিনাদ কিন্তু ধ্বনিত হতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কান পাতলেই শোনা যায়।

উত্তরণের কি কোন পথ নেই? নিশ্চয়ই আছে। তার জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা, দীর্ঘস্থায়ী কর্মপ্রয়াস এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও গণমাধ্যমের সহযোগিতা। আর প্রয়োজন বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় এক উদার, দুর্নীতিমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসনিক পরিমন্ডল। এ ক্ষেত্রে সংকীর্ণ রাজনীতির সর্বগ্রাসিকতার কোন স্থান থাকতে পারে না।

----- o -----

শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন

মিহির তিলক দাস

১৯৬৪-৬৬ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা কমিশন (যা কোঠারী কমিশন নামেও খ্যাত) তাদের প্রতিবেদনের একেবারে শুরুতেই লিখেছেন, বড় ধরণের কোন সামাজিক পরিবর্তন আনতে হলে শিক্ষার মাধ্যমেই তা আনা সম্ভব। কমিশনের ভাষায়,"If this change on a grand scale is to be achieved without violent revolution (and even then it would be necessary) there is one instrument and one instrument only that can be used : EDUCATION". এখানে education শব্দটিকে বড় হাতের অক্ষরে লেখা থেকেই বোঝা যায়, সমাজ পরিবর্তনের বিষয়ে শিক্ষার উপর কমিশন কতখানি গুরুত্ব দিতে চান।

ইতিহাসের পাতা থেকে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখানো যায়, যেখানেই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পবিবর্তন আনা হয়েছে সেখানেই শিক্ষার মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্র স্পার্টাতে যখন জাতীয় লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করে সাম্রাজ্য বিস্তার করা তখন এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাকেই কাজে লাগানো হয়েছিল। দেশকে একটি উন্নত সামরিক শক্তিতে পরিণত কবতে গেলে নাগরিকদের মধ্যে যে সকল মৌলিক যোগ্যতা থাকা দরকার, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাই গড়ে তোলার চেষ্টা করা হতে লাগল। অন্য দিকে সমসাময়িক এথেন্সে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি র উপর গুরুত্ব দিয়ে উন্নত রুচিবোধ সম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলার চেষ্টা চলতে থাকে। কারণ এটিই ছিল তাদের জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ইদানিং কালে দেখতে পাই প্রথম মহাযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় এবং অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে জার্মান জাতিকে প্রস্তুত করার কাজে হিটলাব শিক্ষাকেই ব্যবহার করেছিলেন। শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের জার্মান জাতিব শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বোঝানো হত। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করা হত। মাও সে তুং এর আমলে চীনের ছাত্রছাত্রীদের কমিউনিষ্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কবে তোলার জন্য সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে রাশিযাতে তরুণ সম্প্রদায়কে নিয়ে Communist League, Young Pioneers ইত্যাদি সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

বৃটিশ আমলের শেষ দিকে জাতিকে নূতন ভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৩৭ সালে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল, বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতে একটি রক্তপাতহীন নীরব সামাজিক বিপ্লব(silent social revolution) আনতে সক্ষম হবে। এই শিক্ষার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ভিত্তিক এমন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে প্রতিটি মানুষ অন্যের মনুষ্যত্বকে মর্যাদা দেবে, যেখানে থাকবেনা কোন শ্রেণীবিভেদ, থাকবেনা সম্প্রদায় বা বর্ণভেদের বেড়াজাল, থাকবে না একের দ্বারা অন্যের শোষণ। আশা করা হয়েছিল নূতন সমাজে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় শেখার সঙ্গে সঙ্গে

কোন না কোন উৎপাদনাত্মক কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে যাতে বড় হয়ে কাউকে বেকার হয়ে বসে না থাকতে হয়। উৎপাদনাত্মক কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেই কোন ব্যক্তি একজন শ্রমজীবি মানুষের কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, তার সুখ, দুঃখ বেদনা ও সমস্যার প্রতি সংবেদনশীল হতে পারেন এবং তার জীবনের আনন্দ ও তৃপ্তিবোধের গভীরতার পরিমাপ করতে পারেন। এরকম একটি পরিবেশেই সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হ্রাস পেতে পারে। বিদ্যালয়ে উৎপাদনাত্মক কাজের মধ্য দিয়েই ভবিষ্যত নাগরিকদের মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগানো সম্ভব। প্রতিটি নাগরিকের শ্রমের মধ্য দিয়েই একটি জাতির আর্থিক -প্রগতি সাধিত হতে পারে। যে সমাজে সকলেই কাজে নিয়োজিত থাকে সেখানে সমাজের সম্পদ অন্তত মোটামুটি ভাবে সমবন্টিত হয়। সীমাবদ্ধ একটি শ্রেণীর হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হবে আর অধিকাংশ লোক আর্থিক দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটাবে, এটি ছিল বুনিয়াদী শিক্ষা-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী একটি ধারণা। সামাজিক সাম্য এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ছিল বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

স্বাধীনতা লাভের পর বুনিয়াদী শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষার আদর্শ বলে গৃহীত হয়। সকল শিশুর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সাংবিধানিক সঙ্কল্পকে বাস্তবায়িত, করার উদ্দেশ্যে দেশেব দ্রুত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, আর এই বিদ্যালয়গুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের কাজ চলতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি সঙ্গত ভাবেই উপলব্ধি করল, বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শকে কার্যকরী করতে হলে এমন একদল শিক্ষক তৈরি করতে হবে যারা বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাবান হবেন, নিজের জীবনে এই আদর্শ পালন করবেন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই ভাবধারা সঞ্চারিত করবেন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। আমাদের ত্রিপুরাতে ১৯৫৪ সালে আগরতলাতে একটি বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর পব ১৯৫৯ সালে কাকড়াবনে একটি এবং ১৯৬১ সালে পানিসাগরে আরও একটি বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিনটি মহাবিদ্যালয়ে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে তোলার কাজ চলতে থাকে। এই মহাবিদ্যালয়গুলির তখনকার কর্মসূচীর দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায় বুনিয়াদী শিক্ষা কি ধরণের সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিল। এই মহাবিদ্যালয়গুলির তখনকার কর্মসূচীর মুল লক্ষ্য ছিল শিক্ষকদের শিক্ষা বিজ্ঞান, বিভিন্ন বিদ্যালয়-পাঠ্য বিষয় এবং বিষয়গুলির পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে এমন দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা যাতে তারা একটি নূতন জাতি গঠনে সাহায্য করতে পারেন।

তখনকার সময়ে শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিতে প্রশিক্ষণরত শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণ সকলের পক্ষে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একই আবাসিক পরিসরে বাস করা বাধ্যতামূলক ছিল। উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সকল রকমের ভেদাভেদ ভুলে একই পরিবারের সদস্যের মত এক

সঙ্গে বাস করবেন এবং এক সঙ্গে সকল রকমের পাঠনিক এবং সহপাঠনিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করবেন। প্রশিক্ষণরত সকল শিক্ষককে একই হোষ্টেলে এক সঙ্গে থাকতে হত। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একই খাবার ঘরে একই সঙ্গে খাবার খেতেন। খাওয়ার সময় -

"ওঁ সহনা ববতু সহনৌ ভূনক্তু
সহবীর্যং করবাবহৈ
তেজস্বিনা বধিতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করার পরই সকলে একসঙ্গে খাবার মুখে দিতেন। মন্ত্রটিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একসঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করা, একসঙ্গে তেজ ও বীর্যের আরাধনা করা এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ না করার সঙ্কল্প ব্যক্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দল পালাক্রমে খাবার পরিবেশন করতেন। দিনের কার্যক্রম শুরু হত ভোর ৫টায়। একজন শিক্ষার্থী রাইজিং বেল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে হোষ্টেলের সকল শিক্ষার্থী ঘুম থেকে ওঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ করার পর দৈনিক প্রার্থনা সভায় হাজির হতেন। প্রার্থনার সঙ্গীত এবং অন্যান্য কার্যক্রম এমন ভাবে নির্বাচন করা হত যেন এগুলি সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন, যে মন্ত্রটি দিয়ে প্রার্থনা সভা শুরু কবা হত তা হলঃ

"অসতো মা সদগময়ো
অসো মা জ্যোর্তিময়ো
মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়ো
আবিরাবীর্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন সাং পাহি নিত্যম্।

মন্ত্রটির অর্থ হল ঃ হে পরমেশ্বর আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও,
অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও,
মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে নিয়ে যাও।
হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও।
হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্নময় মুখ
তা দ্বারা আমাকে সতত রক্ষা কর।

মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সহ সকল অধ্যাপকগণই প্রার্থনা সভায় যোগ দিতেন। কোন আইনের কড়াকড়ির জন্য নয়, একটি শুচি স্নিগ্ধ আনন্দের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দিনটি আরম্ভ করার তাগিদেই সকলে প্রার্থনা সভায় যোগ দিতেন। প্রার্থনার পর শুরু হত সমবেত ভাবে শারীরিক ব্যায়ামের ক্লাশ। তত্ত্বাবধানে থাকতেন শারীর শিক্ষা বিষয়ের অধ্যাপক। ৮ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে থিয়োরী ক্লাশ। সাড়ে দশটার পর সাফাই। সাফাই এর কর্মসূচীটি ছিল দেখার মত।

শিক্ষার্থীদের এক একটি দল এক বা একাধিক অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে এক একটি জায়গায় সাফাই এ যেতেন। সাফাই এর স্থানগুলির মধ্যে থাকত রাস্তা, খেলার মাঠ, শ্রেণীকক্ষ, হোস্টেলের বাগান, রান্নাঘর, স্নানাগার, শৌচাগার ইত্যাদি। একই রকমের শর্টস ও সার্ট পরে সকলে এমন ভাবে সাফাই এ অংশ নিতেন যে কাজের সময় বোঝার উপায় থাকত না কে শিক্ষার্থী, কে অধ্যাপক, কে অধ্যক্ষ। অপরাহ্নে বিভিন্ন বিষয়ের থিয়োরী ও প্র্যাকটিকেল ক্লাশ শেষ হওয়ার পর অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীগণ একই সঙ্গে খেলাধুলায় যোগ দিতেন।

শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত একটি বিদ্যার্থী পরিষদের উপব থাকত সামুদায়িক জীবনের বিভিন্ন বিষয় সংগঠনের দায়িত্ব। এই বিদ্যার্থী পরিষদের নির্বাচন হত প্রতি মাসের শেষের দিকে কোন একদিন সন্ধ্যার পর। পরবর্তী মাসের প্রথম দিনেই নূতন নির্বাচিত সদস্যরা নিজ নিজ বিভাগের দায়িত্ব বুঝে নিতেন। নির্বাচন হত সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণ সকলে নির্বাচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও কোন ভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতেন না। বিদ্যার্থী পরিষদের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী কোন না কোন পদে অন্তত একবার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কেউই দ্বিতীয়বার নির্বাচন প্রার্থী হতে পারতেন না। সকল শিক্ষার্থীকে কোন না কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের সুযোগ দেওয়াই ছিল এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। প্রতি মাসের প্রথম দিকে কোন একদিন সন্ধ্যার পর বসত বিগত মাসের মন্ত্রী সভার কার্য বিবরণী পাঠের আসর। এখানে প্রত্যেক মন্ত্রী তার কার্যকালের একটি লিখিত বিবরণী পেশ করতেন। প্রচুর তর্ক বিতর্ক হত এক একজন মন্ত্রীর প্রতিবেদন নিয়ে। অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণ সকলেই এই বিবরণী সভায় হাজির থাকলেও সরাসরি এতে অংশ নিতেন না। একমাত্র বিশেষ প্রয়োজন হলেই তারা এধরণের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে তাদের মতামত প্রকাশ কবতেন।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কৃষিকাজ, তাঁতের কাজ, কাঠের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ প্রভৃতি কোন না কোন শিল্প কাজে প্রশিক্ষণ নিতে হত। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষক যেন তার বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদেব কোন একটি উৎপাদনাত্মক কাজ শেখাতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পক্ষে কোন একটি শিল্প কাজের সঙ্গে সমন্বিত করে মাতৃভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যালয়- পাঠ্য বিষয় শিক্ষা দেওয়ার অভ্যাস করা বাধাতামূলক ছিল। যে সকল শিক্ষার্থীব সঙ্গীত ও চিত্রকলাতে আগ্রহ ছিল তারা এই দুইটি বিষয়ের চর্চা করারও সুযোগ পেতেন। ফলে তারা বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই দুইটি বিষয়ে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সাহায্য কবতে পারতেন।

উপরের কথাগুলি দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে জেনেও এগুলি উল্লেখ কবতে হল একথা বোঝানোর জন্য যে তখনকার সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচী শিক্ষকদের শিক্ষা-বিজ্ঞান, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় এবং পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। শিক্ষকদের চিন্তা, দৃষ্টি ভঙ্গি, মূল্যবোধ, এক কথায় তার সমগ্র জীবন দর্শনের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন আনাই এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। লক্ষ্য ছিল,এমন একদল শিক্ষক তৈরী করা যারা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্যের মধ্য দিয়ে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করতে পারবেন।

উপরোক্ত আলোচনার পর সহজেই প্রশ্ন করা যায়, বুনিয়াদী শিক্ষা কি তার লক্ষ্য পূরনে সক্ষম হয়েছে? এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাওয়া হয়েছিল আমরা কি তা করতে পেরেছি? আমাদের সমাজ থেকে কি জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছে? সাম্প্রদায়িকতাকে কি দেশ থেকে নির্মূল করা গেছে? পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ বলে গর্ব করলেও আমাদের নির্বাচনগুলি কি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পন্থা পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্ন হয়? দেশের যে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক সভাগুলিতে সকল পক্ষকে খোলাখুলি ভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার পর একটি যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে আসার কথা সেখানে কি তা করতে দেওয়া হয়? বিরুদ্ধ মতবাদকে কি আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা দেই? সবল কর্তৃক দুর্বলের শোষণ কি বন্ধ হয়েছে? প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতা কি আমাদেব সমাজের বৈশিষ্ট্য? উত্তরগুলি আমাদের সকলেবই জানা আছে।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে কেন এমনটি হল? বুনিয়াদী শিক্ষা তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হল কেন? তাহলে কি বলতে হবে শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে না? কোঠারী কমিশনের যে অভিমতের কথা প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে তা কি ভ্রান্ত? এর উত্তরটিও কমিশনের প্রতিবেদনেই নিহিত আছে। কমিশন বলেছেন, শিক্ষা একটি যন্ত্র। আর আমরা সবাই জানি যন্ত্র নিজে কাজ করে না। যন্ত্রকে যেভাবে কাজে লাগানো যায় সেভাবেই ফল পাওয়া যায়। বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে যে ধরণের সমাজ গঠনকে লক্ষ্য হিসাবে ধবা হয়েছিল আসলে তার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনতে হলে সমাজকে তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। পরিবর্তনেব জন্য সমাজে একটি প্রবল চাহিদা থাকতে হবে। শিক্ষা নিজে থেকে সমাজকে প্রস্তুত করতে পারে না। শ্রেণীবিভেদহীন, শোষণহীন, সুশৃঙ্খল গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কথা সবাই মুখে বললেও আমরা কেউই মনেপ্রাণে তা চাইনি। স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম দিকে কেউ প্রকাশ্যে গান্ধীজীর আদর্শের বিরোধিতা করার দুঃসাহস দেখাননি। তবে এখন অনেকেই এ বিষয়ে রেখে ঢেকে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেন না। এখন প্রায় সবাই প্রকাশ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতির বিরোধীতা করে থাকেন। যুগের পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে বুনিয়াদী শিক্ষার সব কিছু চিরদিন অপবিবর্তিত থাকুক একথা বুনিয়াদী শিক্ষার অতি গোঁড়া সমর্থকও বলবেন না। কারণ শিক্ষাকে সব সময়ই যুগেব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান কবে চলতে হয়। কিন্তু এই শিক্ষার মূলনীতিকে উপেক্ষা কবা সমাজের পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক হবেনা। আমাদের মনে রাখতে হবে বুনিয়াদী শিক্ষা যে সমাজ ব্যবস্থাকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে সেই আদর্শ সমাজই ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা নামটি কারো পছন্দ না হলে তা অবশ্যই পালটানো যায়। বুনিয়াদী শিক্ষা কথাটি গান্ধীজী দিয়ে যাননি। তিনি তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষার নাম দিয়েছিলেন "নই তালিম বা নূতন শিক্ষা - ইংরেজীতে New Education. "বুনিয়াদী শিক্ষা" নামটি দিয়েছিলেন পরবর্তী সময়ের প্রশাসকগণ। কারণ তাঁরা মনে করতেন এই শিক্ষা ব্যবস্থাই হবে ভাবী সমাজ জীবনের বুনিয়াদ। অসল কথা হল

দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, মূল লক্ষ্যটি থেকে বিচ্যুত হলে আমরা একটি মারাত্মক ভুল করব। মূল লক্ষ্যের প্রতি সকলের বিশ্বাস হালকা হওয়ার ফলেই বুনিয়াদী শিক্ষা তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বহু কাজকর্ম যেমন সাফাই, উৎপাদনাত্মক কাজ সমাজের উচ্চবিত্ত ব্যক্তিগণ তো বটেই সাধারণ মানুষও খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। শিশু বিদ্যালয়ে এসে সাফাই করুক কিংবা উৎপাদনাত্মক কাজ করুক তা কোন অভিবাবকই সমর্থন করতে পারেননি। মোট কথা, বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি সমাজে জনসমর্থন পায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই বুনিয়াদী শিক্ষা সমাজের স্রোতধারার বিরুদ্ধে যেতে পারেনি। যথার্থই বলা হয়েছে "Education acts within the society and not upon the society"

শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করার চেষ্টা আজকের নয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা কমিশন (Hunter Commission) থেকে আরম্ভ করে কোঠারী কমিশন পর্যন্ত অনেকেই শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করার কথা বলেছেন। কোঠারী কমিশন শিক্ষার সকল স্তরে Work experience বা কর্ম অভিজ্ঞতা চালু করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে ঈশ্বরী ভাই প্যাটেল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কর্ম অভিজ্ঞতার স্থলে -Socially Useful Productive Work (SUPW) চালু করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই উৎপাদনাত্মক কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করছে তা মোটেই বলা যায় না। এর কারণ একটিই। হাত পা নোংরা করে কাজ করতে আমরা মোটেই রাজি নই- না ছাত্র, না শিক্ষক, না অভিভাবক।

কোন একটি বিষয় বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে ঢুকিয়ে দিলেই যে মানুষের জীবনে তার প্রভাব পড়বে একথা বলা যায় না। ইদানিং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে Moral Education বা নীতি শিক্ষা নামে একটি পৃথক বিষয় সংযোজিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ে পরীক্ষাতে ৭০-৮০% নম্বরও পায়। কিন্তু কতজন এই শিক্ষা দ্বারা সত্যি সত্যি উদ্বুদ্ধ হয়েছে? তেমনি জনসংখ্যা শিক্ষা ও পরিবেশ বিদ্যা আজ বহু বছর যাবতই বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সমাজের উপর এই দুইটি বিষয়ের প্রভাবও মোটেই লক্ষ্য করা যায় না। এতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ পাঠ্যসূচীর উদ্দেশ্য এবং সামাজিক চাহিদা এই দুই এর মধ্যে সঙ্গতি থাকলেই সমাজের উপর পাঠ্যসূচীর প্রভাব পড়া সম্ভব।

সমাজে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ে বিচলিত অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজে নীতিবোধ জাগ্রত করা সম্ভব। তাই ছাত্রছাত্রীদের নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য তারা শিক্ষকদের কাছে আবেদন জানান। তাদের এই আবেদনের মধ্যে সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রবল দুশ্চিন্তার প্রতিফলন ঘটলেও এই আবেদন ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা কম। হাটে মাঠে ঘাটে সর্বত্র নীতিহীনতা এত ব্যাপক ভাবে প্রসারিত যে তাদের এই আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য। অভিবাবকদের একদলকে প্রকাশ্যেই তাদের ছেলেমেয়েদের "একটু চালাক চতুর" হওয়ার পরামর্শ দিতে দেখা যায়। পরীক্ষার সময় অসদুপায় অবলম্বন করতে অনেক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে

ছেলেমেয়েদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। নিজেদের জীবনে সৎ ও স্বচ্ছ আচরণের কোন দৃষ্টান্ত তারা তাদের ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরতে পারেন না। সমাজে অন্য একটি শ্রেণী আছে যারা সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করতে আন্তরিক ভাবেই আগ্রহী। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই আশা করেন নিজেরা ছাড়া আর সকলেই যেন অসদাচরণ থেকে বিরত থাকেন। তাতে ফল হয় আমাদের অতি পরিচিত গল্পের রাজার দুধের পুকুর জলে ভর্তি হওয়ার মত। গল্পটিতে প্রজাদের প্রত্যেকেই ভাবলেন, সবাই তো রাজার হুকুম মেনে পুকুরে দুধ ঢালবে, আমি একা এক ঘটি জল ঢাললে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবেনা। ফলে পুকুরে আর দুধ পড়লনা। মোট কথা সমাজে মূল্যবোধ জাগানোর চেষ্টাতে সবাই জড়িত না হলে, সকলের মধ্যে আন্তরিকতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা না থাকলে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজে নীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারেনা।

শুধু নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেই নয়, অন্য যে কোন ধরনের সামাজিক পরিবর্তনের দায়িত্ব অনেকেই শিক্ষকদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। তাদের মতে শিক্ষকরা হলেন জাতির মেরুদন্ড। সুতরাং শিক্ষকগণই সামাজিক পরিবর্তন এনে জাতিকে নূতন ভাবে গঠন করতে পারেন। যথাযথ দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক চাপ, শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এখানেও আমাদের মনে রাখতে হবে একজন শিক্ষক ভিন্ন গ্রহ থেকে আগত কোন জীব নন। তিনিও এই সমাজের ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা, মূল্যবোধ ইত্যাদি দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত। কাজেই তিনি সমাজের স্বাভাবিক স্রোতের প্রতিকূলে নৌকা বাইবেন এমনটি আশা করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। ব্যক্তিগত ভাবে দুই একজন শিক্ষক কোন উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রচলিত সামাজিক প্রথা পদ্ধতির উপরে উঠতে পারেন কিন্তু বেশী দিন সেখানে থাকতে পারেন না। পরিপার্শ্বিক শক্তিগুলোর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শীগগিরই তাঁকে নিচে নেমে আসতে হয়।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সমাজ চিরদিন এক-জায়গায় বসে থাকে আসলে একটি প্রবহমান নদীর মত সমাজ সদা পরিবর্তশীল। বলা হয়, কোন একজন লোক যেমন একই নদীতে দুইবার স্নান করতে পারে না তেমনি একই সমাজে কেউ দুইবার শ্বাস নিতে পারেনা। বিভিন্ন রকম আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক কারণে সমাজের পরিবর্তন আসে নিজস্ব বাধ্যবাধকতাতে শিক্ষার কাজ হল এই পরিবর্তনকে স্থায়িত্ব প্রদান করা। শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনকে অনুসরণ করে মাত্র, নির্দেশিত বা পরিচালিত করতে পারেনা। সামাজিক পরিবর্তনের কারণ যাই হোক না কেন, প্রকৃতির দিক থেকে এই পরিবর্তন দুই প্রকার - বিপ্লব এবং বিবর্তন। বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধিত হয় হঠাৎ করে। সব কিছু যেন ওলট পালট হয়ে যায়। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে অনেকেই এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন না। তাদের কাছে এই পরিবর্তন বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তন হয় অত্যন্ত ধীর গতিতে। পরিবর্তন যে হচ্ছে তা প্রায় বোঝাই যায় না। বিবর্তনের মাধ্যমে যে নূতন সমাজের বিকাশ ঘটতে থাকে তা সবসময়

পুরনোকে স্বীকার করে নিয়েই হয়। ফলে পরিবর্তন সত্ত্বেও সুবিধাভোগী শ্রেণীর পক্ষে তার স্বার্থ বজায় রাখা সহজ হয়। প্রকৃত পক্ষে সামাজিক বিবর্তন সুবিধাভোগী শ্রেনীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই সংঘটিত হয়, সাধারণ মানুষের ভাগ্যের বড় একটা ইতর বিশেষ এতে হয়না। ছলে, বলে কৌশলে সমাজেকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এই সুবিধাভোগীরা সব সময় নিজেদের হাতে রেখে দেন। উন্নত বুদ্ধি ও বাকচাতুর্যের সার্থক প্রয়োগ করে তারা জনগণকে একথা বোঝাতে সক্ষম হন যে তাদের প্রস্তাবিত পথই সামাজিক পরিবর্তনের সঠিক পথ এতেই সকলের মঙ্গল। সাধারণ মানুষ তাদের যুক্তিকে যথার্থ বলে মেনে নেন অথবা নীরবে সহ্য করে যান।

সৌভাগ্যক্রমে এই বিবর্তনে মাঝে মাঝে এমন কিছু ক্ষমতাবান পুরুষের আবির্ভব হয় যাদের প্রভাবে সমাজে পরিবর্তনের এক একটি জোয়ার আসে। জোয়ারের জল দ্রুত গতিতে এসে যেমন নদীমুখের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে নিয়ে যায়, এসকল ক্ষণজন্মা পুরুষের প্রভাবে তেমন সমাজে দ্রুত এবং সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এঁরা সমাজের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে সমাজকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। সাধারণ মানুষেব পক্ষে যা অসাধ্য, শিক্ষার কাছে যা আশা কবা অযৌক্তিক, এঁরা তাঁদের অসাধারণ ব্যক্তিত্বেব দ্বারা তা'ই সম্ভব করেন। তাদের আবেদনে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে জনগণের মধ্যে প্রাথমিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকলেও অল্প দিনের মধ্যেই তারা তা কাটিয়ে উঠেন। এসকল যুগস্রষ্টা পুরুষের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে তারা বেশী সময় নেন না। শ্রীচৈতন্য, রাজা রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী হলেন এরকম কয়েকজন মহামানবের দৃষ্টান্ত। চলুন, আমরা সকলে মিলে পরম করুণাময়েব কাছে এই প্রার্থনা। করি, আজকের এই সঙ্কটেব দিনে আমাদের মধ্যে এরকম আরও ক্ষমতাবান পুরুষের আবির্ভাব ঘটুক। কাবণ একমাত্র তা হলেই সমাজে জনকল্যাণমুখী পরিবর্তন আসা সম্ভব।

----- ০ -----

ত্রিপুরায় স্ত্রী শিক্ষার প্রথম প্রয়াস

মৃণালকান্তি দেবরায়

প্রাচীন ভারতে স্ত্রী শিক্ষার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও মধ্যযুগে বাল্য বিবাহ, গৌরীদান, অকাল বৈধব্য ইত্যাদির জোরে স্ত্রী শিক্ষার ধারা মারাত্মকভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ঐ সময়ে সামগ্রিকভাবেই সমাজে নারীদের স্থান চূড়ান্ত অবহেলিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের ভারতে আগমণের পর থেকেই নারী শিক্ষার প্রগতির শুরু হতে থাকে । খৃষ্টান মিশনারীদের হাত ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে নারীশিক্ষার প্রথম উদ্যোগ শুরু হয়। এছাড়াও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রাণকেন্দ্রের অর্থাৎ কলিকাতায় ইংলন্ডাগত বিদেশী মহিলার ব্যক্তিগত উদ্যোগেও মেয়েদের জন্য বেশ কিছু স্কুল খোলা হয়। এদের মধ্যে মেরী অ্যান কুকের অবদান সর্বাগ্রগণ্য। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় বাঙালী হিন্দু মেয়েদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক স্কুল চালু করেন। শুধু তাই নয় বাংলায় কথা বলতে পারেন এমন এক বান্ধবীকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে তাদের মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে অনুরোধ করতেন।

১৮২৪ -এর ১০ই এপ্রিল তারিখের সমাচার দর্পণে দেখা যায়, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ঐ অঞ্চলে ১২টি মেয়েদের স্কুল চালাচ্ছিলেন, বীরভূমে ছিল ৬টি । এছাড়া শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই ঢাকায় ৫টি ও চট্টগ্রামে ৩টি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ঐ সময়ে ঢাকাতে 'দি খৃষ্টান ফিমেল স্কুল' নামে একটি মেয়েদের স্কুল Mrs. Charles Leonard চালাতেন। এর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঐ সময়ে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত নারানদিয়ার স্কুলটিতে ৩০ জন ও চট্টগ্রামের মুদ্দারবাড়ি স্কুলে ৫০ জন ছাত্রী ছিল। এছাড়াও মোরাদপুর স্কুলটিতে ১৭ জন ও ভালুয়াডিগিতে ৩২ জন ছাত্রী পড়ত। মুদ্দারবাড়ি স্কুলটিতে চারটি শ্রেণীতে মেয়েরা পড়ত। এসব স্কুলে যীশুখৃষ্টের বাণী পড়ানো হত। ফলে সমাজের উচ্চবর্ণের অংশ এইসব স্কুলকে সন্দেহের চোখে দেখত। এছাড়া সমাজে মহিলাদের অন্দরমহলে আটকে রাখার মতো রক্ষণশীলতার কারণে উচ্চবর্ণ মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আপত্তি ছিল। কাজেই প্রথমত এইসব স্কুলে সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাই পড়ার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য এরপর সমাজের উচ্চবর্ণের মেয়েদের ক্ষেত্রেও বাধানিষেধ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হওয়ায় তারাও ধীরে ধীরে এই প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।

অবশ্য বঙ্গদেশের সর্বত্র কলিকাতার মতো স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। পূর্ববঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার জোয়ার তুলনামূলকভাবে স্তিমিত ছিল। এমন কি ১৮৩৮ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত ঢাকা ও চট্টগ্রামের মেয়েদের স্কুলগুলি অর্থাভাবে বা অন্য কারণে বন্ধ হয়ে যায়। ত্রিপুরায় নারীশিক্ষার সূত্রপাত ও তার অগ্রগতির ধারা অনুধাবনে এই পরিস্থিতির কথা মনে রাখতেই হবে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজন্য ত্রিপুরায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্তির মাধ্যমে

সরাসরি হস্তক্ষেপের আগে নিস্তরঙ্গ মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় নবচেতনার কোন তরঙ্গের সংঘাত ঘটে নি। ঐ সময়ে রাজধানীতে কিছু উচ্চবর্গের কর্মচারী ছাড়া রাজ্যের সমতল অঞ্চলে কিছু কিছু সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রধানত কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধ গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। এছাড়া ছিলেন রাজ্যের দুর্গম পাবর্ত্য অঞ্চলে উপজাতি প্রজারা, যাদের কাছে সামতলিক সুযোগ-সুবিধা নাগালের বাইরে ছিল। সমগ্র রাজ্যে তখন রাজধানীতে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারী উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে একটি 'মাইনর' গোত্রীয় স্কুল ছিল। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানে সমৃদ্ধ গ্রামগুলিতে যে আরো দুই একটি দেশীয় পাঠশালা ছিল, তা নিশ্চিত। ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট বোল্টনের রিপোর্টে উদয়পুরে এমন একটি স্কুলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এসবই ছিল কেবলমাত্র ছেলেদের জন্য, মেয়েদের জন্য কোন স্কুল ছিল না।

১৮৭১ সালে ত্রিপুরায় ব্রিটিশ পালিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপিয়ান Enlightment এর ধারায় নিষিক্ত ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে সংপৃক্ত নব্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ বঙ্গদেশীয় কর্মচারীদেরও ত্রিপুরায় আবির্ভাব ঘটে। ফলে রাজধানী ব্যতীত রাজ্যের অন্যত্রও ধীরে ধীরে পাঠশালার প্রতিষ্ঠা ঘটে। এক্ষেত্রে কৈলাসহরের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ গুপ্তের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে এক্ষেত্রে রাজ্যের অর্থনৈতিক দুরবস্থা শিক্ষা প্রসারণেব ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

বালিকাদের জন্য পার্বত্য ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম বিদ্যালয়টি যে রাজধানী আগরতলাতেই প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৭৫-৭৬ বর্ষের রিপোর্টে। The idea of instituting a girls' school at Agurtollah has been entertained by the Rajah, and there is some prospect of the idea being carried out before the next report is submitted "- কিন্তু ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টরা স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রাজাকে অবহিত করতে পারলেও রাজধানী অধিবাসীদের রক্ষণশীলতার প্রাচীরকে ভেদ করতে সক্ষম হন নি। তাই রাজধানী আগরতলা রাজ্যের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার দুলর্ভ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ঐ সময়ে আগরতলায় রাজার আত্মীয় পবিজন অর্থাৎ ঠাকুর সম্প্রদায়, চাকুরীবত কিছু বাঙালী হিন্দু, কিছু মণিপুরী ও সামান্য কয়েকজন দোকানদাবেব বসতি ছিল। অবশ্য চাকুরীর স্বার্থে কিছু বাঙালী মুসলমান এবং দেশোয়ালীও থাকতেন। এদের মধ্যে মণিপুরীরা অন্যান্যদের তুলনায় অনেকটা মুক্তমনা হলেও তাদের ক্ষেত্রেও মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে কিছুটা দ্বিধা ছিল। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে কলিকাতাতেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই।

ফলে আগরতলা সন্নিকটে মরিয়মনগরে খৃষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালযটি স্থাপিত হয়। ১৮৭৬-৭৭ বর্ষের রিপেটি থেকে জানা যায় যে, বিদ্যালয়টি ৫ জন খৃষ্টান বালিকাকে নিয়ে শুরু হয়। মহারাজ অমর মাণিক্য (১৫৭৭-৮৫ খৃঃ) মগদের আক্রমণ প্রতিহত করতে এক পর্তুগীজ গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। ঐ সময়ে পর্তুগীজরা রাজধানী উদয়পুরেই বসবাস করতে থাকে। কৃষ্ণমাণিক্যের আমলে (১৭৬০-৮৩ খৃঃ) রাজধানী পুরাতন

আগরতলায় স্থানান্তরিত হলে এই পর্তুগীজদের বংশধরেরাও মরিয়মনগরে চলে আসে। এদের সম্পর্কে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট C.W.Bolton তার ১৮৭৬-৭৭ বর্ষের রিপোর্টে লিখেছেন - "The Christians mentioned in the statement are the inhabitants of a village some four miles from Agartala. I am informed by them that their ancestors came to Hill Tipperash some seven genarations ago from Chittagong. They claim a Portuguese origin. They are well conducted people, and live purely by agriculture. Their church is a thatched hut, on a mat wall of which is affixed a coloured print of Christ on the Cross. They are visited at distant intervals by a Roman Catholic priest from Noakhally. There is no one who can read and write among them, but they express their desire for instruction, and a pathsala for boys and girls has recently been established by the Rajah in their village."খুব সম্ভবতঃ নোয়াখালী থেকে আগত রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীই তাদের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করেছিলেন।

যাই হউক, মরিয়মনগরের এই বালিকা বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার পরই বিশেষ করে মণিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা সংক্রান্ত দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে । ফলে পরের বছরই বালিকাদের জন্য আরো তিনটি স্কুল খোলা হয়। অবশ্য এই স্কুলগুলিতে মূলত মণিপুরী বালিকারাই পড়ত। এবিষয়ে Bolton লিখেছেন -" The Manipuris have no objection to send their daughters to these schools, and the numbers in attendance are large. I trust that the wish for female education which they are manifesting will outlast the novelty of the schools." ফলে ঐ বছরে ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে ৫৩ হয়। অবশ্য এই তিনটি স্কুল কোথায় কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা জানা যায় নি। ঐ সময়ে কৈলাসহর, কমলপুর, আগরতলা, বিশালগড় ও Berjoil (বড়জলা?) তে মণিপুরীদের বসতি ছিল। এদের মধ্যে যে কোন তিনটিতেই যে বালিকাদের এই তিনটি বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল তা নিশ্চিত। আগরতলার মণিপুরী বসতিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনা খুবই প্রবল ছিল। তাহলে মহারাণীর নামাঙ্কিত তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের আগেই রাজধানীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়।

এরপর থেকে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে। বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা রাজ্যে আর বেড়েছিল কিনা তা জানা না গেলেও রাজ্যে মোট স্কুলের সংখ্যা ১৮৮০-৮১ বর্ষে ৩১-এ দাঁড়ায়। রাজ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে ৭৪ জন হয় । তাই দেখা যায় যে, রাজ্যে শিক্ষাগ্রহণে উন্মুখ ছাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে রাজ্যে প্রচন্ড আর্থিক সংকট ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে স্কুলের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। মেয়েদের জন্য খোলা স্কুলগুলিরও এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। ১৮৮৪-৮৫ বর্ষের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে রাজ্যের ১৮টি স্কুলের মধ্যে ২টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল এবং এতে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬ জন। ১৮৮৬-৮৭ বর্ষে এই দু'টো বালিকা বিদ্যালয়ও লুপ্ত হয়ে যায়। এইভাবেই রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার

ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার ফলশ্রুতি হিসেবে রাজধানীতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে, যা পরবর্তী কালে মহারাণী তুলসীবতীর নামে পরিচিত হয় । ১৮৯৮-৯৯ বর্ষের বিবরণীতে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে কৈলাসহরেও আরেকটি বালিকা বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল। এরপর থেকেই ত্রিপুরায় ধীরে ধীরে প্রতিটি মহকুমায় অন্ততঃ একটি করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে।

ত্রিপুরা রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার এই প্রথম উদ্যোগ সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও তা যে চেতনার জগতে এক নতুন মাত্রা এনেছিল, তা পরবর্তীকলে রাজ্যে পুনরায় নতুনভাবে স্ত্রী শিক্ষাব প্রসারের উদ্যোগেই প্রমাণিত হ' ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে শতাধিক বছরের প্রথম প্রয়াসটির ইতিহাস আজ চূড়ান্ত অবহেলিত। মরিয়মনগরের সেই পাঁচজন ছাত্রী , যারা শিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে রক্ষণশীল সমাজের আটোসাঁটো বাঁধনকে উপেক্ষা করে ঐ সময়ের নারীসমাজকে শিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশে নতুন পথের সন্ধান দিয়ে মহত্তম ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ঐতিহাসিব গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করে গেছেন তাদের স্বীকৃতি না দিলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা কববে না। এই ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে সকলে এগিয়ে আসবেন এটাই প্রত্যাশিত।

সাহায্যকারী পুস্তক ঃ-

১. বাঙালী মেয়েদের লেখাপড়া ঃ- তপতী বসু, শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

২. Tripura District Gazetteers, K D.Menon, Govt of Tripura, 1975

৩. Administration Report of the Political Agency, Hill Trpperah (1872-78), Vol -I, Tripura State Cultural Research Institute & Museum, Govt. of Tripura, 1996 Edited by Dipak Kumar Choudhury

৪. Administration Report of the Political Agency, Hill Tipperah (1878-90), Vol-II, Edited by Dipak Kumar Choudhury, Tripura State Cul tural Research Institute & Museum, Govt of Tripura, 1996

৫. Report on the Administration of the Tripura State (1898- 99, 1899-1900, 1943-46), Ranjit Kumar De, Tara Book Agency,Kamachha, Varanasi, 1997

----- o -----

অসমের ভাস্কর্যে শ্রীসূর্য্য পাহাড়ের স্থান

শ্রী অরবিন্দ ভট্টাচার্য

প্রকৃতির নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে আজও শ্রী সূর্য্য পাহাড় বিরাজমান। দুধটনে থেকে এই পাহাড়ের দুরত্ব প্রায় ৮ কিলো মিটার। অসমের গোয়ালপাড়া জিলাতে শ্রীসূর্য্য পাহাড় অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ পারের সুবিস্তীর্ণ এলাকার ভিতরে শ্রীসূর্য্য পাহাড়কে ভাস্কর্য্যের এক অফুরন্ত ভান্ডার বলে অভিহিত করা যায়। কিংবদন্তী থেকে এই ধারণা করা হয়েছে যে এই পাহাড়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রায় এক লক্ষ মূর্তি আছে। এ ভাস্কর্য নিদর্শন এখনও বনে জঙ্গলে অনাদৃত ও অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বড় বড় পাথরে খোদাই করা কিছু দেব দেবীর মূর্তি মানুষের দেখার মত অবস্থাতে আছে। তার মধ্যে কয়েকটি বিষ্ণুর মূর্তি আর কয়েকটি নগ্ন চতুর্ভুজের মূর্ত্তি আছে । এই পাহাড়ের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য মূর্তি হল জৈন-তীর্থঙ্করের। এখানকার ভাস্কর্যের মুর্তির শিল্পশৈলী দেখে পন্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে এই মূর্তিগুলি অষ্টম শতাব্দীর আগের। শুধু শ্রী সূর্য্য পাহাড়েই নয়, নিকটবর্ত্তী ঢোটাপাড়া গাঁওযের ডে কধোয়া পাহাড়েও অনেক ছোট ছোট শিবলিঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। এই শিবলিঙ্গ দেখে মনে হয়, এক সময়ে এই অঞ্চলে শৈব ধর্ম্মের প্রভাব ছিল।

মানব সভ্যতার ইতিহাস অতিপুরাতন ও জটিল। বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিত উইল ডুরান্টে শিল্পকলার বিষয়ে আক্ষেপ করে বলে ছিলেন যে, শিল্পকলার পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরাতন ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত শিল্প কলার একটা নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপন করতে পারা যায়নি। ডুরান্টে বলেছেন যে, শিল্প সংস্কৃতি এমনি একটি জিনিষ যে, লক্ষণের দ্বারা বুঝতে পারা যায়, কিন্তু তার কোন ব্যাখ্যা করা যায় না।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা" একটি সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করে তার সৌন্দর্য্য উপভোগ করা শিল্প সৃষ্টির মূলকথা। অসমের ভাস্কর্য বলতে অসমের প্রধান তীর্থক্ষেত্র ও মঠ মন্দিরের ছবি মনে আসে। অসমের ভাস্কর্য বলতে মঠ মন্দিরের গায়ে অংকিত করা বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তি, জীব-জন্তুর ছবি, পাথরের নির্মিত সাকোঁ, পাথরের খুঁটি ও মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি, প্রভৃতিকে বিশেষ করে বুঝায়। অসমের বিভিন্ন স্থানে এই সবের নিদর্শন আছে। এগুলির ইতিহাস অতি চমৎকার। অসমের সবচেয়ে প্রাচীনতম ভাস্কর্যের নিদর্শন দেজপুরের দ-পর্বতীয়া মন্দিরের দুটি পাথরের দরজার ভাস্কর্য।

সুকুমার কলা - পাঁচ প্রকারের।

১) সঙ্গীত, ২) নৃত্য, ৩) চিত্র, ৪) কাব্য, ৫) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। সুকুমার কলার ভিতরে ভাস্কর্য অন্যতম কলা। এই কলাই হিন্দুদের মঠ মন্দির ও তীর্থস্থান সমুহকে কেন্দ্র করে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই কলার বৈশিষ্ট্য হল, শিল্পী তার ধারণা মতো নিজের হাতের নিপুণতা ও যন্ত্রের সাহায্যে পাথর, মাটি. ধাতু এবং কাঠ ইত্যাদির উপর বাস্তবে রূপায়িত করে। ভারতীয় ভাস্কর্য

বলতে মঠ মন্দিরের গায়ে পাথরের উপর আঁকা দেব-দেবীর মূর্ত্তিকে বুঝায়। এ ছাড়া ঋষি, মুনি, যক্ষ, রক্ষ কিন্নর এবং গন্ধর্ব সকলের মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায় । এই ভাস্কর্যের নিদর্শন মোটের উপর তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১) শৈল ভাস্কর্য (Stone sculpture)

২) ধাতু ভাস্কর্য (Bronze sculpture)

৩) পোড়া মাটির ভাস্কর্য (Terracotta)

ভাস্কর্য বিদ-পন্ডিত গোপীনাথ রাও -এর মতে বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও অসমের ভাস্কর্য একই শ্রেণীর। অসমের ভাস্কর্যের ঐতিহ্য বিচার এর জন্য আমাদের বেশী দূর যেতে হয়না। অসমের মঠ-মন্দিরে, পর্বতে কন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে এই ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন আছে। গুয়াহাটি, শিবসাগর, তেজপুর, গোলাঘাট, গোয়ালপাড়াকে কেন্দ্র করেও অসমের ভাস্কর্য বিকাশ লাভ করেছিল বলে অনুমান করা যায়।

অসমের ভাস্কর্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন। অনামী শিল্পীর নিদর্শনগুলা মোটের উপব দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

১) প্রাক্ আহোম যুগ, (৫ম শতাব্দী হইতে ১১ শ শতাব্দী পর্যন্ত)

২) আহোম যুগ (১৩শ শতাব্দী হইতে ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত)

সাম্প্রতিককালে প্রাক্ আহোম যুগেব নিদর্শন কারো হাতে নাই। প্রাকৃতিক ‌র্যাগ, বিদেশীর আক্রমণ, ইত্যাদি কারণে সেই দূর অতীতের শিল্পের কোন চিহ্ন আমাদের হাতে নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাজা-মহারাজা অসমে রাজত্ব করেছিলেন। সেই রাজা -মহারাজাদেব বাজত্বকালে অসমের ভাস্কর্য শিল্পের অনেক উন্নতি হয়েছিল। সমযটাকে অসমের ভাস্কর্য বিদ্যার শৈশবকাল বলে অনুমান করা যায়। প্রাচীনকালে প্রাগজ্যোতিষপুর শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের চর্চা হ'ত।

গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধির সঙ্গে সংগতি রেখে ভাস্কর্যেব সাধনা কবা হত। বৈদিক যুগের পর ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও আরণ্যক আদি বেদের অংশ বিশেষ সামাজিক জীবনে পরিবর্ত্তনের স্রোত এনে ছিল , ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতে, বিষ্ণু, শিব এবং ইন্দ্র পবমারাধ্য দেবতা ছিলেন। অন্যান্য ছোটখাট দেব-দেবীকেও সেই সময়ের মানুষ প্রাধান্য দিয়েছিল । হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস মতে, পুরাণ, উপপুরাণ আদির মতে, ভারতবাসীর তেত্রিশ কোটি দেবতার আকার ও প্রকাবের নাম শুনতে পাওয়া যায় । সেই সব দেব-দেবী ভাস্কর্য আর স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ, পাথর মাটি ও কাঠে খোদাই করা ছিল। শক্তি পূজার কেন্দ্রস্থল নীলাচলের কামাখ্যা মন্দিরে বহু ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। গুহাতে চিত্র ও পাথরের মূর্ত্তি এঁকে একশ্রেণীর শিল্পী মনে গভীর আনন্দ লাভ কবেছিল। অতি কঠোর জীবন যাপন করে শিল্প সাধনাতে এইসকল শিল্পী নিমগ্ন ছিল। এই শিল্প সাধনাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নাম উল্লেখযোগ্য। কামাখ্যা পাহাড়ে যত মূর্ত্তি আছে, সেই সবের নির্মাণ ৮ম শতাব্দী থেকে ১৬ শতাব্দীর ভিতরে হবে বলে ভাস্কর্যবিদ স্থির করেছেন। গুয়াহাটীর শুক্রেশ্বর পাহাড়ের গনেশ, বিষ্ণু, জনার্দন,

দূর্গা, শিব প্রভৃতির মূর্ত্তিগুলি মনে রাখার মত। এই সব মূর্ত্তি নবম -দশম শতাব্দীতে তৈরী বলে অনুমান করা যায়। উত্তর গুয়াহাটীর অশ্ব ক্লান্ত দেবালয়ে অনন্ত শয্যায় বিষ্ণু মূর্ত্তি আছে। এই সব ভাস্কর্যের এক অতুলনীয় নিদর্শন। আর এটা দ্বাদশ শতাব্দীর বলে অনুমান করা যায় । গোলাঘাট, নুমলীগড় অর গোয়ালপাড়া জিলার শ্রীসূর্য্য পাহাড়ের অনাবিষ্কৃত ভান্ডার বলে ধরা হয়। নুমলীগড়ে বিভিন্ন ভঙ্গীতে হেসে থাকা অপ্সরা সকলের মূর্ত্তি আছে। শিব সাগর জেলা থেকে আনা ভাস্কর্যের মূর্ত্তি অসম রাজ্য সংগ্রহালয়, গুয়াহাটীতে রাখা হয়েছে। বাই হাটা চারি আলি থেকে ৫ কিঃ মিঃ দূরে থাকা পিঙ্গলেস্বর দেবালয় পুন নির্মান এর সময় বহুমূর্ত্তি পাওয়া গেছে। সেই রকম , মদনকাম দেবের দেবালয় নির্মানের সময় বহু ভাস্কর্যের মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। অসম পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই মূর্ত্তিগুলোর রক্ষণা- বেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে। পিঙ্গলেশ্বর দেবালয়ের খনন কার্য্যের সময় দু'টি তাম্র ফলক উদ্ধার করা হয়েছে। এই তাম্র ফলক দুটি রাজা শিব সিংহের সময়ের বলে অনুমান করা যায়। এই দুই ফলকে পূজার সামগ্রী ও দেবালয়ে যাবতীয় খরচের হিসাব সংস্কৃত ভাষাতে লিখা অছে। এই সব প্রাক্ অহোম যুগের ভাস্কর্য্যের অন্যতম নিদর্শন। গুয়াহাটীর আমবারীতে সেই ধরণের বহু ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। কয়েক বছর আগে কাহিলীপাড়ার ও দাল কাকরাতে কিছু ধাতুর ভাস্কর্য্যের মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। ঐ মূর্ত্তিদের মধ্যে ঐরাবতের উপর থাকা ইন্দ্রের মূর্ত্তি, চারটি বিষ্ণুর মূর্ত্তি, দুটো সূর্য্যের মূর্ত্তি , একটা গনেশ ও একটা মনসা দেবীর মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসমের সাহিত্য সংস্কৃতিব বিকাশেব ক্ষেত্রে আহোম বাজা সকলের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আহোম রাজা স্বর্গদেও রুদ্রসিংহ, গদাধর সিংহ, প্রমত্ত সিংহ, শিব সিংহ আর রাজেশ্বর সিংহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব রাজার রাজত্বকালে ভাস্কর্য্য আর লতাপত্য বিদ্যার বিকাশ লাভ করে ছিল। কোচ রাজা মহারাজ নর নারায়ণের সময়ে অসমীয়া ভাস্কর্য সংস্কৃতির বিশেষ অগ্রগতি লাভ করে ছিল। এই রাজার রাজসভাতে শংকরদেব, রাম সরস্বতী, পরুযোত্তম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি কয়েকজন পন্ডিত সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চ্চা করে ছিলেন। এই রাজার সময় কামাখ্যা মন্দির কালা পাহাড় ধ্বংস করাব পর পুনরায় নির্ম্মান কবা হযেছিল। ধাতুর ভাস্কর্য্যে অসমের শিল্পীদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। গুয়াহাটীর রাজ্যিক সংগ্রহালয়ে রক্ষিত মহিষমর্দ্দিনী দূর্গা আর বিষ্ণুর মূর্ত্তি ইহার প্রমাণ। এই মূর্ত্তিটি অতি বিচিত্র ধরণের। কেননা বিষ্ণু পাদুকা পরে পাঁচটা থাক থাকা আসনের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। ডান দিকে লক্ষ্মী, বাম দিকে সরস্বতী বিবক্ষা অবস্থাতে দেখতে পাওয়া যায়। ধাতুর ভাস্কর্য্য উত্তরপূর্ব ভারতের থেকে দক্ষিণ পূর্ব ভারতেই বেশি প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। বিশেষ করে পল্লব আর চোল বংশের রাজারা এই ভাস্কর্য্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে ছিলেন। এই সব সুন্দর মূর্ত্তিতে এক শ্রেণীর অনামী শিল্পীর কর্ম্ম দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে গোটা ভারতেবর্ষে পোড়ামটি ভাস্কর্য্যের খুব সমাদার ছিল। এই সব ভাস্কর্য্যের বিশেষ করে মানুষ, জন্তু ও পক্ষীর প্রতিকৃতি বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। এইসব মূর্ত্তি হাতে তৈরি করে আগুনে পুড়ে শক্ত করা হত। মানুষের মূর্ত্তি থেকে পক্ষী আর জীব জন্তুর প্রতিকৃতি আঁকতে শিল্পীরা অধিক দক্ষ ছিলেন। প্রাচীনকালে মৌর্য বংশের রাজাদের রাজত্বকালে পোড়ামাটির ভাস্কর্যশিল্প

প্রসার লাভ করেছিল। দক্ষিণ ভারতে এই শিল্পের তেমন সমাদর ছিল না ।

অসমে এই ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শন আছে। পক্ষী, জীবজন্তু এবং মানুষের চিত্রই বেশি। এই চিত্র মন্দিরের গায়ে ফলক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এইসব নিদর্শনের ভিতরে নর্তক-নর্তকী, সৈনিক, নৌকা, দৌড়ের প্রাণবন্ত চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিগুলিতে এক শ্রেণীর অনামী শিল্পীর শিল্প নিপুনতার পবিচয় পাওয়া যায়। আজও আমবা এই ভাস্কর্য্য শিল্পকে নিয়েই গৌবব অনুভব করি ।

---- o ----

প্রত্ন সভ্যতা কালাছড়া

মন্টু দাস

এক

প্রত্ন সভ্যতা কালাছড়া এখন আর গুণীজন মহলে অপরিচিত নাম নয়। অতীতের মানুষের জীবন যাত্রার ধূসরতা ক্লিষ্ট সার্বিক ইতিহাস অনাবিষ্কৃত থাকলেও আবিস্কৃত উপাদান নিতান্ত স্বল্প নয়। আবিষ্কৃত উপাদান আর সমসাময়িক তথ্যাদি ভিত্তিক ইতিহাস নির্মাণ করলে তা ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, বরাক উপত্যকার প্রচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চার এর নতুন দ্বার উন্মোচিত করবে। তাছাড়া তা হবে উত্তর পূর্ব ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। অফুরন্ত প্রত্ন সম্ভারে সমৃদ্ধ এ অঞ্চলে খনন কার্য আবশ্যক। আলোচ্য অঞ্চলে খননকার্য চালালে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকা ইতিহাসের বহু তথ্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আমাদের ধারণা ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক স্তর আলোচ্য অঞ্চল স্পর্শ করেছিল। এ ক্ষেত্রে আচার্য সুনীতিকুমারের একটি বক্তব্যকে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। সুনীতিকুমার লিখেছেন - ' ভারত ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক স্তরটি অসম সহ পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে প্রলম্বিত হয়েছিল।'

বক্ষমান নিবন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগের আলোচ্য অঞ্চলে বিকিরিত সভ্যতা এবং মানুষের নৃতাত্বিক প্রচরণ ও আত্তিকরণ প্রক্রিয়াজাত সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণের সমন্বিত স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হবে। আলোচ্য অঞ্চলে বিকশিত সভ্যতার কালসীমা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল। চৈনিক সুত্র থেকে আমরা জানতে পারি খৃষ্টপূর্বকালে আলোচ্য অঞ্চলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।'India through chinees eyes' গ্রন্থ থেকে উদ্বৃতি -

As early as 126 B.C chang K'ien, a chinees diplomat who spent more than a decade in the land of the western barbarions (Central Asia) reported his Imperial master, that he had found goods of western chinese origin in central asian market.

According to his information, these goods had been imported there by Indian merchants. They obviously travelled to south western province of China through Assam

ভৌগোলিক দিক থেকে আলোচ্য অঞ্চল সুরমা উপত্যকার অংশ। পানিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে সুরমম নামক পূর্বভারতের একটি বিশিষ্ট জনপদের উল্লেখ আছে। পনিনি বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ বাসুদেব শরণ আগরওয়াল দেখিয়েছেন - পানিনি উল্লিখিত 'সুরময়ই আধুনিক সুরমা উপত্যকা। আলোচ্য অঞ্চলটি বঙ্গভুমির পূর্ব প্রান্তের সম্প্রসারণ। ডঃ কামালউদ্দিন আহ্মেদের মতে- 'প্রাচীনকালে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের সমভুমি ও শ্রীহট্ট নামক ভুখন্ডের ভৌগোলিক সীমার অন্তর্ভূক্ত ছিল।'

আসলে বঙ্গভূমি থেকে ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন প্রাকৃতিক বাধা নেই। তাই প্রাচীনকালে প্রোটো অষ্ট্রোলয়েড কিংবা আলপাইন আর্যরা কোন প্রাকৃতিক বাধা না পেয়ে অবলীলায় এখানে প্রবেশ করে সভ্যতার বিকাশে ও পরবর্তী সময়ে বৃহৎ আত্তিকরণ প্রক্রিয়ায় সামিল হতে পেরেছিল।

দুই

প্রত্নসভ্যতা কালাছড়ার মূল কেন্দ্রটির অবস্থান আধুনিক ধর্মনগর শহরের মাত্র ৫ কিমি. উত্তরপূর্বকোণে। প্রত্নসম্ভারে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটির বিস্তৃতি ধর্মনগর শহরের বৃহৎ অংশ সহ শহরের উত্তর ও পূর্বদিকের প্রত্যেকরায়, গোবিন্দপুর, লক্ষ্মীনগর, শনিছড়া, উত্তরহুরুয়া, দক্ষিণহুরুয়া, পূর্বহুরুয়া, লালছড়া গাঁও পঞ্চায়েত পর্যন্ত - যার আয়তণ প্রায় ১২ কিলোমিটার। এই বিস্তৃত অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে - ১) প্রাচীন কালের রাজপথ ২) অসংখ্য প্রাচীন দীঘি, পুকুর ও সরোবর, ৩) দশম শতকের তাম্রমুদ্রা, ৪) খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শিবলিঙ্গ, ৫) ৮ম/৯ম শতকের হেবজ্রের মূর্তি, ৬) প্রাচীনকালের জনযান, ৭) চতুর্দশ - পঞ্চদশ শতকের কষ্টিপাথরের নাড়ুগোপালের মূর্তি, ৮) অপূর্ব কারুকার্যময় অত্যন্ত উন্নত শিল্পরীতিব পরিচায়ক, উদ্ধারেতা শিবমূর্তি, (৯) সোনার চক্র, ১০) অসংখ্য প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকার অংশ, ১১) মাটির প্রাচীরঘেরা দূর্গ সদৃশ একটি বিশাল জায়গা- মানুষ যে জায়গাকে বলে রাজবাড়ী, ১২) প্রাচীন তলোয়ার আর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ ভাঙ্গা ইটের সমাহার, ১৩) বৌদ্ধ স্তুপের ধ্বংসাবশেষ, ১৪) পাথরে তৈরী পাটার মত সামগ্রী, ১৫) কাঠের ময়ূর, ১৬) আরো কতকি! জানা যায় মাটির নীচ থেকে কেউ কেউ কড়ি ও স্বর্ণমুদ্রাও পেয়েছেন।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি কোন যুগের? কাদের কীর্তি ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলে? মুখ স্থবির হয়ে আছে এক আলোক উজ্জ্বল সভ্যতা ! এই নির্বাক সভ্যতার খোঁজে হণ্যে হয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি বছরের পর বছব। শতাধিক প্রবীণ মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে জেনেছি - আলোচা অঞ্চলে বসবাসরত মিশ্র জনবসতি গড়ে উঠেছে প্রায় তিনশত বছর পূর্বে। বংশানুক্রমিকভাবে ধারাবাহিক চলে আসা জনশ্রুতিতে জানা যায় আলোচ্য অঞ্চল একসময় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বাঁচার তাগিদে চলে আসা ছিন্নমূল কিছু মানুষ জঙ্গল আবাদ করে বসতি গড়ে তোলে। বাঘ, ভাল্লুক, আর ভয়ঙ্কর জন্তু জানোয়ারের সাথে দস্তুর মত সংগ্রাম করে এখানকার নব্যবসতি গড়ে তোলা নাগরিকগণ আবিষ্কার করেন মজে যাওয়া বিশাল বিশাল দীঘি আর রাজপথ। জানা যায় একসময় পোড়া মাটির তৈরী অসংখ্য ঘোড়া আর বলদের মূর্তি পাওয়া যেত। পাওয়া যেত ধূপদানি আর অসংখ্য ভগ্ন মৃৎ পাত্র - যাতে বিভিন্ন ছবি আঁকা থাকত। মাটির বাসনের ভগ্ন অংশ আজও মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায়। মাটির ৩/৪ ফুট নীচে পাওয়া মৃৎ পাত্রের বহু ভগ্ন টুকরো নিবন্ধকারের সংগ্রহে আছে। আছে উর্দ্ধরেতা কারুকার্যময় শিবমূর্তিসহ বহু প্রত্ন নিদর্শন। এখানে

একটি মিউজিয়াম ও রিসার্চ সেন্টর গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলছে।

তিন

কালাছড়া একটি ছোট্ট জনপদ। উত্তর হুরুয়া গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত। এখানে একটি ছোট বাজার ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। পাশেই নদীয়াপুর রেলস্টেশন। কালাছড়া জনপদটি ছোট্ট হলেও প্রত্ননিদর্শন, উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসহ বিভিন্ন কারণে বিস্তীর্ণ এলাকাকে কালাছড়া অঞ্চল বলা হয়। বীরচন্দ্র মাণিক্য - রাধাকিশোর মাণিক্যের শাসন কালে জানা যায় কালাছড়া নামে একটি প্রাচীন মৌজা ছিল। সেই সাথে কালাছড়া নামে একটি তহশীল ছিল। স্বাধীনোত্তর কালে এই তহশীলের অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে কালাছলা হুরুয়া তহশীল ও মৌজার অন্তর্গত। স্বাধীনতা পূর্বকালে ব্রজেন্দ্র চন্দ্র 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর' নামক রচনায় আলোচ্য অঞ্চলের ঐতিহাসিব নিদর্শনের বিস্তৃত বিবরণে জানা যায় - কালাছড়া মৌজার জহর মহম্মদের বাড়ীতে মাটির নীচে একটি দালান বাড়ীর অস্তিত্ব ছিল। ১৩১৬ ত্রিংসনে জানা যায় এখানে গুপ্তধন আছে। এই সংবাদে আগরতলা থেকে রাজকীয় বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা মাটি খনন করে এক খন্ড প্রস্তর ফলক ও একটি লৌহ নির্মিত উন্নত নির্মাণশৈশলীর দীপাধার পাওয়া যায়। দীপাধারটি তহশীল কাছারিতে সংরক্ষিত ছিল। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত জানান - 'এই লৌহ দীপাধারের নির্মাণ কৌশল ও বিশেষজ্ঞদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।'[৬] দত্ত আরো জানান ' এই স্থানেরই সন্নিকটে অনতি-উচ্চ ভুমিতে কয়েকটি প্রাচীন কীর্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।'[৭]

দত্তের রচনা থেকে আরোও জানা যায়- 'কলাছড়া মৌজার হায়দর ও কাদির মহম্মদ নামে দুইজন প্রজার বাড়ীর নিকটে মৃত্তিকার প্রাচীর বেষ্টিত একটি দুর্গের ন্যায় প্রাচীন স্থান আছে। .... প্রাচীরের মধ্যে চারিটি পুস্করিণী বিদ্যমান।

.... ইষ্টাকালয়ের ভগ্নাবশেষ .... প্রশস্ত সড়কের অস্তিত্ব স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।'[৮] কিছু সামগ্রী দেখতে পেয়েছি। উল্লিখিত প্রশস্ত রাস্তা আজও আছে। এর অবস্থান কালাছড়া বাজারের পাশে। উল্লিখিত প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ সদৃশ স্থান যাকে রাজবাড়ী বলা হয়- রাস্তাটি এখান থেকে শুরু হয়ে পার্শ্ববর্তী কালাছড়া বাজারের পাশ দিয়ে গিয়ে গোবিন্দপুরের উত্তর অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রায় একশত হাত চওড়া ছিল রাস্তাটি বছর চল্লিশেক পূর্বে। বর্তমানে হাত ছয়েক প্রশস্ত রয়েছে। রাস্তা কেটে মানুষ জমি তৈরী করেছে। এ জাতীয় প্রশস্ত সড়ক ধর্মনগর শহরের রাজবাড়ীর সন্নিকটে বটরশিতেও বছর ৪০/৫০ পূর্বে ছিল।

প্রাচীব বেষ্টিত স্থানটি বিশাল রাজবাড়ী সদৃশ। বর্তমানেও দুইটি দীঘি ও একটি পুকুর আছে। একটি দীঘির পাথর কাটানো ঘাট আবিষ্কৃত হয়? অরেকটি পুকুরের ঈশান কোণে মাটি কাটতে বেরিয়ে আসে পিতল বাঁধানো নৌকার গলুই। মানুষ অতীন্দ্রিয় কিছু ভেবে এটাকে মাটি চাপা দেয়। আজও খুঁড়লে এটা পাওয়া যাবে। এরই সন্নিকটে আবিষ্কৃত হয়েছে পুকুর খুড়তে কারুকার্যময় রাজকীয় শিবলিঙ্গ। অদ্ভুত কারুকার্যময় এই রাজকীয় শিবলিঙ্গ পরিদর্শন করে অধ্যাপক

মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য জানান- 'খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে বুধগুপ্তের তাম্রপাত্রে স্থাপিত লিঙ্গ দেবতা এবং উত্তর ত্রিপুরার কালাছড়া গ্রামে অধুনা আবিষ্কৃত শিবলিঙ্গ অভিন্ন হতে পারে।'

১৯৮৫ সালে মাটির কয়েক ফুট নীচে এই লিঙ্গ পাওয়া যায়। লিঙ্গটি আড়াআড়িভাবে খন্ডিত -যা সামনে থেকে দেখা য়ায় না। সম্ভবত এটি কোন দেয়ালের গায়ে লাগানো ছিল। প্রাচীন একটি রীতি অনুযায়ী লিঙ্গ পূর্ণ প্রদক্ষিনের নিয়ম ছিল না। তাই দেয়ালে লাগানো ছিল লিঙ্গ। এ থেকেই লিঙ্গের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ হয়। লিঙ্গের পরিমাপ-অর্দ্ধ কুম্ভাকৃতি বেদীমূল যা ভুমির উপর অবস্থিত, তার নিম্নভাগের প্রস্থ ৯৫.৫ সেন্টিমিটার, অর্দ্ধকুম্ভাকৃতি বেদীর উপরাংশ - যা কলমের গলার মত সেই স্থানে স্থাপিত প্রদীপাকৃতি গৌরিপাতের প্রস্থ ১০৮.২ সেন্টিমিটার। বেদীমূলের ভূমি থেকে শিবলিঙ্গের শীর্ষ ভাগের উচ্চতা ৬৮.৮ সেন্টিমিটার। শুধুমাত্র লিঙ্গের উচ্চতা ২০.৬সেন্টিমিটার। কালোপাথরে তৈরী অপূর্ব এই লিঙ্গটি কালাছড়া কালীবাড়ীতে রক্ষিত আছে।

গুপ্ত সম্রাট কুমার গুপ্তের দামোদর পুর তাম্র পত্রে দেখা যায় অগ্নিহোত্র দেবস্থানের জন্যে এককূল্য বাপ ভূমি ক্রয় করা হয়। এই ভুমি কোটিবর্ষ জেলার অন্তর্গত। কোটি বর্ষ আধুনিক ঊনকোটি। কোটিবর্ষের অন্তর্গত ভোঙ্গাগ্রাম- যা পরবর্তীকালে অগ্রিহোত্র তার্থস্থানে পরিণত হয়। এই অগ্নিহোত্র থেকেই হুরুয়া নামের উৎপত্তি- যা শত শত বছরের ব্যবধানে আজও টিকে আছে ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে। হুরুয়া পরবর্তীতে তিনটি গাঁওসভায় পরিণত হয়েছে। কালাছড়া উত্তর হুরুয়া গাঁও পঞ্চায়েতেরই একটি জনপদ।

উল্লিখিত প্রশস্ত সড়কটির গুরুত্ব অসাধারণ। এটি এসেছে পূর্ববঙ্গের সমতট থেকে যা চলে গেছে বদরপুরে বরাকের তীরে গড়ে উঠা কাঠি গড়া বন্দর পর্যন্ত । কালাছড়া - গোবিন্দপুর লালছড়া ফুলবাড়ী - বাঘন হয়ে কাছাড়ের কাঁঠালতলির উপর দিয়ে চাঁদক্ষীরা হয়ে পাহাড়ের পাশ দিয়ে সোজা কাঠিগড়াতে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় জানাচ্ছেন, 'বঙ্গদেশ থেকে .... লালমাই ময়নামতী অঞ্চল হইতে সুরমা ও কাছাড় উপত্যকার ভিতর দিয়া . .... ব্রহ্মদেশের পাগন পর্যন্ত বিস্তৃত। ' অধুনা করিমগঞ্জ জিলার স্থানে স্থানে এই রাজপথের (হাইওয়ে) অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়- যাকে স্থানীয় জনসাধারণরা 'পিঠা খাউরির জাঙ্গাল' বলেন। আর কালাছড়া অঞ্চলে যার নাম 'রাজার জাঙ্গাল'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাচ্ছে কাঠিগড়া বন্দর থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে শিলচর- ইম্ফল হয়ে চিনদুযাং গিরিপথ ধরে চিনের মূল ভূ-খন্ডে। আর অন্যটি চলে গেছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। 'India and China' গ্রন্থ থেকে জানা যায় "From Assam the routes to Burma were in early times as now one by the valley of the Brahmaputra up to the Patkoirange and then through it passes up to upper Burma" চার

যেখানটায় প্রাচীর নির্মিত স্থান আছে সেখানেই ১৯৮৫ সাল নাগাদ পাওয়া গিয়েছিল সোনার চক্র যা সুদর্শন চক্র হওয়াই স্বাভাবিক। পাওয়া গেছে তলোয়ার ইত্যাদি। আবার এস্থান থেকে কিলোমিটার দুয়েক দূরে হুরুয়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় মাঠে মাটি কাটতে গিয়ে ৯৮ সালে

পাওয়া গেছে বল্লম ও টাক্কল। এই স্থনের একটু পশ্চিমে বিগত ২০০১ সালে একটি অনুচ্চ টিলা কাটতে গিয়ে ইট দ্বারা নির্মিত একটি বৌদ্ধ স্তুপ আবিষ্কৃত হয়েছে। স্তুপের পাশাপাশি জায়গায় প্রায় বাড়ীতে ২৫ ইঞ্চি প্রস্থের বড় বড় দালানবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে। স্থানীয় সুরেন্দ্র মালাকারের বাড়ীতে এল প্যাটার্নের বৃহৎ একটি দালান বাড়ীর ভগ্নাংশ। মাটির নীচ থেকে কতক পরিমাণে বেরিয়ে এসেছে। পাওয়া গেছে বৃহৎ কোদালের পেছনের অংশ। আবার কিছু রৌপ্য মূদ্রা।

গোবিন্দপুর মন্ডপে রক্ষিত নাড়ুগোপাল যার ওজন প্রায় চল্লিশ কি.গ্রা.। এই অপূর্ব মূর্তিটি ১৯৫২ সালে পুকুর কাটতে পাওয়া গেছে। এটি কষ্টি পাথরের তৈরী। গোবিন্দপুরে বেশ কতকগুলো প্রাচীন পুকুর আছে। গোবিন্দপুরের জমিদার গোবিন্দচরণের বাড়ীর পুকুরটিও প্রাচীন কালের। জমিদারের উত্তর পুরুষদের সাক্ষাৎকারে এই তথ্য জানা যায়।

ভবানন্দের দীঘি। বহু অনুসন্ধানে ভবানন্দের পরিচয় পাওয়া গেছে। তবে সন্দেহ কাটেনি। বৈষ্ণব সাহিত্যের শক্তিশালী কবি ছিলেন ভবানন্দ। সিলেটি নাগরি ভাষায় তাঁর লেখা গ্রন্থের নাম 'হরিবংশ' যা ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহম্মদ আফজল কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন অনুসন্ধানে জানা গেছে ভবানন্দ নামে একজন বৈষ্ণব সাধু এই দীঘির পাড়ে থাকতেন। যিনি নিজে গীত রচনা করতেন। সেহেতু আলোচ্য অঞ্চল শ্রীহট্টের ভূমি সীমার মধ্যে আর ভবানন্দ সিলেটি নাগরি হরফে তার গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই বৈষ্ণব কবি ভবানন্দের সাথে প্রত্যেক রায়ের ভবানন্দের দীঘির পাড়ে অবস্থানকারী বৈষ্ণব কবি ভবানন্দের মধ্যে আমরা মিল খুঁজে পেতে চাচ্ছি। ইতিহাস আলোচনার শেষ কথা বলে কিছু নেই। আমরা আশাবাদী একদিন হয়তো আমাদের ধারনা সত্য বলেই প্রতিপন্ন হবে।

কালাছড়ার প্রাচীর ঘেরা দূর্গসদৃশ স্থানকে স্থানীয় জনসাধারণ পোড়া রাজা বা কালারাজার বাড়ী বলেন। এখানেই প্রাচীন রাজকীয় দীঘির পশ্চিম পাড়ে ডঃ গিয়াজউদ্দিনের পিতা জমিদারী গড়ে তোলেন। ডাঃ গিয়াজ উদ্দিনের বংশধরদের নিকট থেকে আলোচ্য অঞ্চলে জমিদারি পাত্তনের সময় প্রাপ্ত বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের ইতিহাস জানা যায়। এই দীঘির নীচে হয়তো লুকিয়ে আছে অনেক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য। এই স্থান থেকে কিলোমিটার দু'য়েক পশ্চিমে দক্ষিণ পশ্চিম হুরুয়া জে.বি.স্কুলের পূর্বদিকের টিলা কাটতে গিয়ে মৃত্তিকার বহু নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে অপূর্ব কারুকার্যময় উর্দ্ধরেতা শিবমূর্তি। অত্যন্ত উন্নত শিল্পরীতির পরিচয়জ্ঞাপক এই মূর্তি। মূর্তিটির মস্তক না থাকায় অনেকে এটাকে বিষ্ণু মূর্তিও বলে থাকেন।

ধর্মনগর শহরের অফিসটিলার পাশে জুড়ি নদীর তীরে মৃত্তিকার নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি শিবের মূর্তি। শহরের কেন্দ্রস্থলের দীঘিটিও সুপ্রাচীন কালের। পূরাণ কালীবাড়ীর দীঘি, সেন্ট্রাল রোডের দীঘি সবগুলোই প্রাচীন কালের। ঐতিহাসিক কালে এগুলোর সংস্কার হয়েছে মাত্র।

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত তাঁর রিপোর্টে দেখিয়েছেন- বর্তমান ধর্মনগর বিভাগে 'রাজবাড়ী' নামে একটি পুরাতণ মৌজা আছে। এই মৌজায় এবং বিভাগের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি পুরাতণ

বসতি, ইষ্টকালয় ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়.....।

নিবন্ধের পরিসর ছোট রাখার প্রয়াসে বিস্তৃত বিররণ দেয়া সম্ভব হলো না।

পাঁচ

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রত্নসভ্যতা কালাছড়ায় প্রাপ্ত প্রত্নসম্ভার ও কিছু তথ্যাদির উল্লেখ করা হলো। এবার আমরা সমসাময়িক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত তাম্রপত্র ও কিছু রচনার আলোকে আলোচ্য অঞ্চলকে উপস্থাপন এবং কাল নির্ণয় করার প্রচেষ্টা করব। প্রথমে 'রাজমালা'র দিকে তাকাতে চাই। যদিও 'রাজমালা' সর্বজন গ্রাহ্য স্বীকৃত ইতিহাস নয়, তথাপি পুরাতাত্ত্বিক পর্যায়ে ত্রিপুরা জাতি নৃতাত্ত্বিক প্রচরণ প্রক্রিয়া গল্প কাহিনীর কিংখাবে.থাকলেও এর সত্যতাকে স্বীকার করতে হয়। তিব্বত-বার্মিজ শাখার বোড়ো ভাষীর (খুব সম্ভবত বরাহি গোষ্ঠী) একটি গোষ্ঠী কক্‌বরক ভাষী ত্রিপুরীরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে ক্রমে বরাক উপত্যকা হয়ে ধর্মনগরে রাজ্যপাট স্থাপন করে। প্রতীতের ধর্মনগর আগমন ও পরবর্ত্তীতে ডাঙরফা বা আদি ধর্মফার পুত্রের রাজপাট স্থাপনকে অনৈতিহাসিক বলা যাবেনা। এখানে 'রাজমালা' থেকে একটি চরণ উদ্ধৃত করা হলো-

'আর পুত্র ধর্মনগরেতে রাজা কৈল।'

ত্রিপুর জাতির নৃতাত্ত্বিক প্রচরন প্রক্রিয়ায় ধর্মনগরের কালাছড়া অঞ্চলে বেশ কিছুকাল রাজধানী থাকার সম্ভাবনা প্রবল। এবং তা পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্বে। বর্তমান কাছাড়ের বেশীর ভাগ অংশও শ্রীহট্টের পঞ্চখন্ড, বড়লেখা, মৌলভি বাজার, ভাটেরা সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে এই রাজ্যটি ছিল। রাজ্যও রাজধানী হিসাবে এই অঞ্চলকে বেছে নেয়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে। নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল অগ্নিহোত্র দেবস্থল। বিভু পাল এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।[১২]

রিভু পাল ছিলেন ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালক। আলোচ্য অঞ্চলে সুপ্রাচীন কালে বিশাল ব্যবসায়িক পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর ত্রিপুরাসহ শ্রীহট্টের বেশীর ভাগ ভুমি একসময় জলমগ্ন ছিল। এ অঞ্চলের ভূমিরূপ সম্পর্কে একটিউদ্ধৃতি; W.W.Hunter এর 'Statistical Account of Assam' - The conformation of some of the sandy Hillocks and the presence of marine shells at the foot of the hills along the northern boundary indicate that, sea flowed at the base of the hills at a (Geologically speaking) comparatively recent period'[18]

শ্রীহট্ট কাছাড়ের জলমগ্ন স্থানের পাশে গড়ে উঠেছে জনবসতি ও বিভিন্ন নৌবন্দর - যেমন কাবিগড়া, প্রডামার, ইন্দ্রেশ্বর ইত্যাদি। সেই সাথে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন হাইওয়ে। তবে খৃষ্টপূর্বকালে আলোচ্য অঞ্চলে কাবা বাজপাট করেছিল তার সার্বিক কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। সময়ের পথ চালায় নিশ্চয়ই তা একদিন প্রকাশিত হবে। আলোচ্য অঞ্চলের ভৌগোলিক রূপ বৈচিত্র, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির বহুবিধ তথ্য নিম্নোক্ত গ্রন্থে সবিস্তারে আছে -

1) Periplus Maries Erythraci

2) Pliny's Natural History

এই সকল গ্রন্থ থেকে জানা যায় চীন ও গ্রীকের সাথে আলোচ্য অঞ্চলের সংযোগ ছিল। চীনের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কের একটি উদ্ধৃতি;

"We also know of the authority of the classical writers, that chinese merchandise used to be taken through eastern India to Gangetic valley for export by the sea in the 1st century A.D.Buddhism to the south China went by the Assam Burma route in the early Century of the Christan era."[14]

এ অঞ্চলে সুপ্রাচীন কালে অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়, আর্য, মঙ্গোলয়েড ইত্যাদি মানুষের উপস্থিতি ছিল। পরবর্তীতে এই সকল জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি বৃহৎ আত্মীকবণ সংগঠিত হয়। ফলতঃ গড়ে উঠে একটি মিশ্র জাতি/মিশ্র সংস্কৃতি। অধ্যাপক ডঃ জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য লিখেছেন - 'অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও আর্যগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সমগ্র পূর্বাঞ্চলের বাঙালী জাতির বিবর্তন হয়েছিল বরাক উপত্যকাও ছিল সেই প্রক্রিয়ার মূলস্রোতের স্বতঃস্ফূর্ত অংশীদার।'[১২]

বলা বাহুল্য বরাক সুরমা উপত্যকার মধ্যেই উত্তর ত্রিপুরা, কাছাড়, শ্রীহট্ট ইত্যাদি অঞ্চলের অবস্থান।

বিভিন্ন তাম্রপত্রাদি ও সমসাময়িক রচনা থেকে জানা যায় লু সাই পাহাড়, উত্তর ত্রিপুরা পর্বতশ্রেণী থেকে নেমে আসা মৃত্তিকা থেকে বরাক -সুরমা উপক্যকার বিস্তীর্ণ ভূমি সাগর বক্ষ থেকে উঠে আসার পর, এই ভূমির উপর অধিকার দৃঢ় করার জন্য গুপ্ত যুগে বৈদিক ব্রাহ্মণদের আনয়ণ কবা হয়। পঞ্চম -ষষ্ঠ শতকে কালাছড়ায় গড়ে উঠে শক্তশালী তীর্থস্থান। তাই দেখা যায় কুমার গুপ্তেব তাম্রপত্রে আলোচ্য অঞ্চলের নাম। এখানে গড়ে উঠে অসংখ্য মন্দির। ভাস্কর বর্মনের আমন্ত্রণে আসা চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ শ্রীহট্টে যাওয়ার পথে যে মন্দিরময় নগরী দেখেছিলেন- তা'হলো কালাছড়ার অগ্নিগোত্র দেবস্থান। কারণ ভাস্কর বর্মনের শাসনকালে আলোচ্য অঞ্চল কামরূপের ভূমি সীমার মধ্যে কিছুকাল ছিল। নিধনপুর তাম্রপত্রে দানকৃত ভূমি শ্রীহট্টে ছিল - এটা আজ প্রমাণিত। পশ্চিমভাগ তাম্রপত্র আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে নিধনপুর তাম্রপত্রে উল্লিখিত চান্দপুরি বিষয়কে কেউ কেউ বিহারের পুর্ণিয়া জেলার ত্রিস্রোতা অঞ্চল বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিম ভাগ তাম্রপত্র আবিষ্কার হওয়ায় সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হয়েছে চন্দপুর বিষয় শ্রীহট্টের ভূমি সীমার মধ্যে।

পশ্চিমভাগ তাম্রপত্রে একহাজার মাইল জায়গা জুড়ে ছয়হাজার মানুষ যে বসতি বিক্রমপুরের রাজা শ্রীচন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন তার চতুঃসীমায় ছিল মনু-ঘুঙ্গি জুড়ি-কুশিয়ারা ও বৃহৎ কট্টালী বাঁধ। এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত ভূমি আধুনিক ধর্মনগর, কৈলাসহর মৌলভী বাজার জেলা ও শ্রীহট্টের একাংশ এবং করিমগঞ্জ জেলার বৃহৎ অংশ নিয়ে যে ছিল এটা একেবারে

স্পষ্ট। এবং পশ্চিম ভাগ তাম্রপত্রেই প্রথম শ্রীহট্ট নাম পাওয়া যায়। এবং আশ্চর্যের বিষয় হলো এখানে দশম শতকে চন্দ্রপুর মঠ বা বিশ্ববিদ্যালয় নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ছয়হাজার একর ভূমি দান করেন শ্রীচন্দ্র। যে বিশ্ববদ্যিালয়ের জন্যে ছয়হাজার একর ভূমি দান করা হয় সে বিশ্ববিদ্যালয় কি ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অধ্যাপক মানবেন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নিলামবাজারের পাশ্ববর্তী স্থানে চন্দ্রপুর নামক অঞ্চলে। দশম শতকে শ্রীহট্ট অঞ্চলে রাজা শ্রীচন্দ্র প্রচুর ভূমি দান করেছিলেন কেন? এটা কি অটোবি ভূমি ছিল? এর উত্তরে আমরা বলব, না। কারণ অটোবি ভূমিতে তো বিশ্ববিদ্যালয় থাকার কথা নয়। বিশেষত ধর্মনগর বিভাগে সহস্রবছর পূর্বে প্রত্ন সভ্যতা কালাছড়ার বিকাশ হয়েছিল। ঊনকোটির পাদদেশ দিয়ে আসার সময় শ্রীচন্দ্রের সৈন্য বাহিনী ঊণকোটির মন্দির ও ভাস্কর্য দর্শন করেন। শ্রীচন্দ্রের রাজকীয় বাহিনী কৈলাসহরে, ধর্মনগর, পাথারকান্দি ইত্যাদি স্থান জয় করেন।

জয় করা ভূমির উপর দখল স্থায়ী করার জন্য তিনি ভূমি দান করেন। শ্রীচন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় চিন্তা প্রকট ছিল বলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ভূমি দান করে সে যুগে মানুষের সমন্বয় চিন্তাকে দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন প্রশ্ন হলো শ্রীচন্দ্র কার সঙ্গে যুদ্ধ করে এই ভূমির অধিকার নেন। ইতিহাস এবিষয়ে আজও নীরব। ১৯৬১ সালে পশ্চিম ভাগ তাম্রপত্র আবিষ্কার না হলে আমরা এই ভূমিদান এমনকি দশম শতকে শ্রীহট্ট নামে যে একটি মন্ডল ছিল তা জানতাম না। এই তাম্রপত্র আবিষ্কার আলোচ্য অঞ্চলের ইতিহাস চর্চার নতুন দিগন্ত উম্মোচিত করেছে। সমকালীন ইতিহাসে আবর্জনা ঘেঁটে জানা যায় পাল সাম্রাজ্য আধুনিক উত্তর ত্রিপুরা অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল। কালাছড়া অঞ্চলে বৌদ্ধস্তুপ ও মূর্তি-পাল সাম্রাজ্য বিস্তারের ইঙ্গিত মিলে।

এখানে হরিকেল নামে আরেকটি প্রাচীন রাজ্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ত্রিপুবার শ্রীহট্ট, বরাক উপত্যকা ময়নামতি ইত্যাদি স্থানে প্রচুর হরিকেল মুদ্রা পাওয়া গেছে। অনেকে হরিকেল ও শ্রীহট্টকে সমার্থক বলেছেন। তবে হরিকেল রাজ্যের সীমানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। চট্টগ্রাম পর্যন্ত এক সময় হরিকেল ব্যাপ্তি ঘটেছে। তবে হরিকেলের রাজ্য কোথায় ছিল তা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন সূত্র ধরে এগিয়ে গেলে অষ্টম দশম শতকের মধ্যে বেশ কিছুকাল কালাছড়া অঞ্চলে হরিকেলের রাজধানী থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

আলোচ্য অঞ্চলে বারে বারে বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর শাসনাধীনে যায়। এবং প্রথমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, পরে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ও শেষ পর্যায়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব কালাছড়া সভ্যতায় দেখা যায়। অবশেষে পঞ্চদশ শেষ পর্যায়ে আলোচ্য অঞ্চলে কোন একটা বৃহৎ রাজশক্তির আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে মহামারি মরক ও ভূমিকম্পও আলোচ্য অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এক সময়ের অলোকোজ্জ্বল সভ্যতা ভূমির অতলে গেলেও আজ আবার বিস্মৃত ইতিহাস কথা বলছে।

----- o -----

ত্রিপুরার মাণিক্য রাজা ও তাঁদের মুদ্রা

জহর আচার্জী

ত্রিপুরার রাজেন্দ্রবর্গ ও তিপ্রা সম্প্রদায় বোড়োল্যান্ড এর মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে বর্তমান ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন এবং অবশেষে 'লিকা' (বৌদ্ধ মগ) সম্প্রদায়কে হটিয়ে অমরপুরে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সে সময় বর্তমান পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরা সহ সমভূমি কুমিল্লা (কমলাংক) অঞ্চলে বৌদ্ধদের বেশ প্রভাব ছিল। কিন্তু দেব বংশ, ঘর্গ বংশ, বর্ম বংশ, পট্টিকেরা, হরিকেল, সমতট ইত্যাদি রাজত্ব পতনের পর ত্রিপুরা সহ বঙ্গদেশের পূর্বাংশে একটা বিরাট শূণ্যতার সৃষ্টি হয়। তখন দিল্লীর সুলতানগণ তাঁদের গভর্ণরদের মাধ্যমে এয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ত্রিপুরার কিছু অংশ সহ বঙ্গদেশের পূর্বাংশ অধিকার করে নেয়। একদিকে বিদেশী আক্রমণ, অন্যদিকে ধর্মান্তকরণের আতঙ্ক, আবার শক্তিশালী শাসকদের ভীতি ইত্যাদি হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জনগণকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসে। তখন 'ফা' উপাধিধারী 'তিপ্রা' রাজগণ প্রায় নির্জনে আস্তে আস্তে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পান। সে সময় থেকেই 'ফা' রাজগণ বঙ্গের সংস্পর্শে এসে বঙ্গের বৃহৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেন এবং হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হন।

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যায় যে দেব, ঘর্গ, বর্ম ইত্যাদি বংশের রাজত্ব ত্রিপুরার পশ্চিম ও দক্ষিণ জেলা সহ কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের কিছু অংশও তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ, এসব অঞ্চল থেকে তাদের প্রচুর পরিমাণ প্রত্মতাত্ত্বিক সম্ভার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আরো হচ্ছে। এগুলির মধ্যে মুদ্রা, তাম্রসনদ, মূর্ত্তি, পোড়ামাটির ফলক, মৃৎপাত্র, লিপি এবং হস্তলিখিত পুঁথি ইত্যাদি প্রধান। সমতটের মুদ্রা, হরিকেল মুদ্রা, দিল্লীর সুলতানদের মুদ্রা, বাংলা সুলতানদের মুদ্রা, আরাকান রাজ্যের মুদ্রাও বর্তমান ত্রিপুরা থেকে প্রচুর পরিমানে আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষভাবে বলতে হয় বর্তমান ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চল কিন্তু এর ব্যতিক্রম। সে সময় উত্তর ত্রিপুরাটা হালাম-কুকি রাজাদের কিংবা কুকি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের প্রাধান্য ছিল। ঊনকোটির ঊনকোটিশ্বরের মাথার মুকুট এর সাক্ষ্য বহন করে যা কুকি বা মিজো আদিবাসীরা উৎসবে ব্যবহার করেন। রাজমালায়ও এর ইঙ্গিত রয়েছে। যাই হোক, 'ফা' উপাধিধারী রাজগণ চতুর্দ্দশ শতকের শেষভাগে বা পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে অমরপুরে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে আস্তে আস্তে ত্রিপুরা রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তবে এখানে উল্লেখ কার যায় যে, মাণিক্য উপাধিধারী রাজাদের পূর্বে রাজমালায় যে বিরাট তালিকা রয়েছে তা আসলে কল্পনাপ্রসূত যা সংস্কৃত সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর কিরাত-জন-কীর্তি নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, "রাজমালায় এই তালিকায় বোড়ো (তিপ্রা) নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং তা কাল্পনিক।" সে সময়কার প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদি বিন্দুমাত্র কিছু পাওয়া

যায়নি। মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে 'রাজমালা' নামক গ্রন্থটি লেখা হলেও ত্রিপুরা রাজগণ নিজেদের অভিজাত্য বাড়াতে মহাভারতের সঙ্গে যোগসূত্র টেনে নিজেদেরকে চন্দ্রবংশের উদ্ভব বলে দাবি করলেন যা মঙ্গোলীয় জাতির পক্ষে বেমানান ও অসঙ্গতিপূর্ণ।

তবে প্রমাণ মেলে যে, রত্নফা 'রত্ন মাণিক্য দেব' (১৪৬৪-৮৭) নাম ধারণ করে ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে রত্নপুর বিজয় করে (অমরপুরের রতনপুর গ্রাম) বাংলার সুলতানদের অনুকরণ করে বাংলার লিপিও সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি তাঁব উপাস্য হিন্দু দেবদেবীর নামেও অনেক মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ (প্রথম) ধর্ম মাণিক্য কিংবা তৎপিতা মহামাণিক্য বাংলার সুলতান রুকুন-উদ্-দিন বরবাক শা (১৪৫৯-৭৪খৃঃ) কিংবা (প্রথম) নাসিরু-উদ্-দিন-মাহমুদ-শার ((১৪৩৩-৫৯ খৃঃ) কাছ থেকে প্রথম 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করেন। কারণ, রাজমালায় ধর্মমাণিক্যের ১৩৮০ শকাব্দের (১৪৫৮ খৃঃ) একটা তাম্র শাসনের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাম্র শাসনের হরফ বাংলা এবং ভাষা সংস্কৃত। উক্ত তাম্র শাসনে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, 'শূণ্যা-কষ্ট-হর-নেত্রো' অর্থাৎ 'অঙ্কস্য বামাগতি' নিয়ম অনুসারে এই তারিখ হল ১৩৮০ শকাব্দ। এজন্য আমরা সঙ্গত কারণে ধর্ম মাণিক্য বা মহামাণিক্যকে ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তাছাড়া, উক্ত তারিখটি কিন্তু অক্ষরে লেখা রয়েছে, তাই ভুল হবার সম্ভাবনা কম। তবে রাজমালায় ভুলবশতঃ ধর্ম মাণিক্যকে রত্ন মাণিক্যের পিতা না বলে তাঁর পৌত্র বলে উল্লেখ কবেছেন। রাজমালায় এমন সব ব্যাপার আরও অনেক রয়েছে। ঐ তাম্র শাসনে কিন্তু ধর্ম মাণিক্যের পিতা মহামাণিক্যেব নামের উল্লেখও রয়েছে। কিন্তু মহামাণিক্য থেকে মাণিক্য উপাধিটি বাদ দিলে শুধু 'মহা' বলে বাজার যে নাম পাই তা কোন নামের অর্থ হয না। এখানে মনে বাখা প্রয়োজন যে তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষা সংস্কৃত ও বাংলা।

আমরা মুদ্রায় প্রথম 'ত্রিপুবা' শব্দটি পাই ধন্যমাণিক্যের ১৪১২ শকাব্দের (১৪৯০ খৃঃ) একটি মুদ্রা থেকে। 'শকাব্দ'গ্রহণ করে তাঁবা বৃহৎ ভারতীয সংস্কৃতিব অংশীদার হিসেবে দুরদর্শিতার পরিচয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু 'ত্রিপুবাব্দ' গ্রহণ বা প্রচলন অনেক পবের ব্যাপার, যার অনেক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য রয়েছে।

ঐতিহাসিক পুরুষ ব্যতীত অর্থাৎ মাণিক্য রাজাদেব পূর্বে 'ফা' উপাধিধারী যে কয়েকজন পূর্বপুরুদের নাম রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা হলেন, রাজা ফা, ডাঙ্গর ফা, ঘিচিং ফা, আচোং ফা, ছেং তুং ফা ইত্যাদি। কিন্তু এর আগে যাদের নাম রাজমালায উল্লেখ রয়েছে যেমন সম্রাট, বীরবাহু, বনিস্বর, বিষ্ণু প্রসাদ, প্রতাপ রায়, সুধা রায় ইত্যাদি তা' অবশ্যই অসঙ্গতি, বিভ্রান্তিকর ও কল্পনাপ্রসূতও বটে। তবে অনেকেই তা' মানতে চান না। তাই ত্রিপুরার প্রকৃত ইতিহাস রচনায় বিভ্রাট। তারা ভাবেন রাজমালা ত্রিপুরার প্রকৃত ইতিহাস। কিন্তু আসলে তা নয়। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকারের মতে রাজমালায় অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রভাব রয়েছে।

'রত্মা ফা' তথা রত্নমাণিক্য ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরায় প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁর প্রবর্তিত মুদ্রায় বাংলার সুলতানদের যে প্রভাব রয়েছে তা' স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে ত্রিপুরার সর্বশেষ মুদ্রা প্রবর্তনকারী রাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী কীর্তিমনি ও কাঞ্চনপ্রভা দেবীর নাম সহ মুদ্রা প্রবর্তন করেন। সুতরাং দেখা যায় যে (এ যাবত আবিষ্কৃত) ত্রিপুরার মুদ্রার ইতিহাস ৪৬৭ বছরের।

সব দেশের রাজারাই মুদ্রা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁদের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতেন। ত্রিপুরার রাজাদের মুদ্রা প্রচলনের ক্ষেত্রে ও তাঁদের নিজস্ব কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজাদের তুলনায় ত্রিপুরার রাজারা অনেক বেশী কৃতিত্ব ও স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছেন তাঁদের মুদ্রায়।

ত্রিপুরার মুদ্রাগুলো প্রধানতঃ রৌপ্য নির্মিত। তবে কোন কোন রাজার স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গেছে। উল্লেখযোগ্য যে, মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের কেবল একটাই তামার মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমান লেখক কর্তৃক। অধিকাংশ মুদ্রাই হাতে পেটা ছাঁচে তৈরী। এগুলোর আকৃতি গোল। পূর্ণ মুদ্রার সাধারণ ওজন সাড়ে দশ গ্রাম, পরিমাপ ২৩ থেকে ২৭ মিলিমিটার। এ যাবৎ দু'টাকা, এক টাকা, আট আনা, চার আনা, দু'আনা, এক আনা ও আধ আনার মুদ্রা পাওয়া গেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রাগুলো সম্ভবতঃ ছোট ছোট লেনদেনের কাজে ব্যবহৃত হ'ত। ত্রিপুরার অনেক স্থানে মাটির তলায় কড়ি মুদ্রাও পাওয়া গেছে। রাধা কিশোর মাণিক্যের মাত্র দু'টো দু'টাকার রৌপ মুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রা বিজ্ঞানের ভাষায় এগুলোকে 'নজরানা মুদ্রা' বলা হয়। উক্ত তামার এবং দু'টাকা মুদ্রা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাম্র মুদ্রা প্রবর্তনের চেষ্টা অর্থনৈতিক কারণে হ'তে পারে।

ত্রিপুরার মুদ্রাগুলো সংস্কৃত ভাষায় এবং প্রাচীন বাংলা হরফে লেখা। প্রথম দিকের প্রায় প্রত্যেকটি মুদ্রায় শকাব্দ এবং পরের দিকের মুদ্রাগুলোতে ত্রিপুরাব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মুদ্রাগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায় সবকটা পূর্ণ মুদ্রায় রাজা ও রাণীদের নাম এক সঙ্গে রয়েছে। মুদ্রার ইতিহাসে এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। অবশ্য আসামের অনেক মুদ্রায় রাজা ও মহিষীর নাম ব্যবহার করা হয়েছে। ত্রিপুরার রাজারা অনেক সময় নিজ নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহিষীদের নামকরণ করতেন। যথা, বিজয়-বিজয়া, অমর-অমরাবতী, গোবিন্দ-গুণবতী, ধর্ম-ধর্মাবতী, ধর্মমানিক্য- ধর্মশীলা, ঈশ্বর-ঈশ্বরী ইত্যাদি। অনেক সময় রানীদের নামে দিঘি, মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করতেন। বীর বিক্রম স্মৃতি মন্থন করে মৃতরাণী কীর্তি মনির নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন। নারী জতির প্রতি এস্‌ব শ্রদ্ধা প্রদর্শন। এ প্রসঙ্গে রাজমালায় বলা হয়েছে, ''আচোং রাজার নাম আচেংমারানী/ তদবদী বাজা রাণী এক নামে জানি।'' ইত্যাদি। ত্রিপুরার রাজদরবারে রাণীরা বিভিন্ন বিশেষণে ভুষিতা হতেন। যেমন মাই দেবতা,

ঈশ্বরী, জগদেশ্বরী ইত্যাদি। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, মহারাজা প্রথম রত্ন মাণিক্য নিজ মহিষী 'লক্ষ্মীদেবী' এবং তাঁর পুত্র(?) মুকুট মানিক্যের (১৪১১) মুদ্রায় মহিষী 'মচত্রী' দেবীর নাম নিজ নামের আগে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ মুদ্রার মুখ্য দিকে লেখা আরম্ভ করেছেন নিজে রানীদের নাম দিয়ে। এক এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। এসব অতি ভালবাসা বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন কিংবা নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইত্যাদি কিনা তা' গবেষণা সাপেক্ষ। যাই হোক, নিঃসন্দেহে তা' চিত্তাকর্ষক উদাহরণ বটে। অন্যদিকে মহারাজ মুকুট মাণিক্যের মুদ্রার বিরল ব্যতিক্রম স্বরূপ একজন আদিবাসী মহিলার নাম পাওয়া যায়। তিনি 'মচত্রী' দেবী। তবে কোন আদিবাসী রাজার নামে কোন মুদ্রা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। রাজা বাঙ্গালী মহিলাকে পাটরাণী হিসেবে বরণ করেছেন এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। মূর্তিতত্ত্বের দিকে দিয়েও ত্রিপুরার মুদ্রা বৈচিত্র পূর্ণ ও অসাধারণ। ত্রিপুরা ছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের কোন রাজার মুদ্রায় তেমন দেবদেবীর মূর্তি খোদিত নেই। শিল্প শৈলীর দিক দিয়েও এসব মুদ্রা ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বে একটা বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। এসব রাজাদের হিন্দু ধর্মের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয়। ত্রিপুরার রাজলাঞ্জন সিংহ মুর্তি প্রায় প্রত্যেকটি মুদ্রায় রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে রত্ন মাণিক্য, মুকুট মানিক্য, দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্য, অনন্ত মানিক্য বা যশো মাণিক্যের মুদ্রায়। মহারাজা যশো মানিক্যের ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দেব মুদ্রায় গোপী সহ বংশী বাদনরত শ্রীকৃষ্ণের স্কেচ এক কথায় অনবদ্য ও তুলনাহীন। এত অল্প পবিসরে এর গভীরতা অনেক আধুনিক ভাস্কর্য বা শিল্পকেও হাব মানিযে দিতে পারে। তাই মুদ্রা বিজ্ঞানী ও সংগ্রাহকদের কাছে ত্রিপুরার মুদ্রার কদর বেশী।

আবার অনেক রাজা তাঁদের মুদ্রায় মূর্তি খোদাই না করেও তাঁদের আরাধ্য দেবদেবীর নাম ব্যবহার করেছেন। যথা, নারায়ণ চরণপর - শ্রী শ্রী রত্নমানিক্য দেব। শিব-গোবিন্দ মানিক্য দেব, হর গৌরী-শ্রী শ্রী ছত্র মানিক্য দেব বা রাধাকৃষ্ণ-বীরচন্দ্র মানিক্য ইত্যাদি। ব্যতিক্রম স্বরূপ প্রথম রত্ন মানিক্য তাঁর একটি মুদ্রায় চৌদ্দ দেবতার চৌদ্দটি 'দন্ত' প্রতীক ব্যবহাব কবেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে কিন্তু মুন্ড প্রতীক ব্যবহৃত হয়নি। এসব মুদ্র' সুন্দব দৃষ্ট'ন্ত ত'ই মুদ্র' প্রেমীরা এসব রস সাগরের নাগর। রসের ভান্ডারী। রসের রসিক।

ত্রিপুরার মহারাজাগণ যুদ্ধ জয়ে বা তীর্থ ভ্রমণে কিংবা ধর্মীয় স্মৃতি স্মবণেও মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। যেমন- চাটি গ্রাম বিজয়ী শ্রী শ্রী ধন্য মানিক্য, সুবর্ণ গ্রাম বিজয়ী শ্রী শ্রী দেব মানিক্য, শ্রী হট্ট বিজয়ী , শ্রী অমর মানিক্য ইত্যাদি। অনেক সময় তাঁরা মুদ্রা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে কিছু গৌরবান্বিত উপাধিতেও ভুষিত করেছেন। যেমন ত্রিপুরেন্দ্র বা বিজয়ীন্দ্র শ্রী শ্রী ধন্য মানিক্য। কুমুদ দীশ দর্শী বা ত্রিপুর মহেশ শ্রী শ্রী বিজয় মানিক্য ইত্যাদি। তীর্থ ভ্রমন বা ধর্মানুষ্ঠানেও তাঁরা অনেক মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন, যথা- দুরাসার স্থায়ী শ্রী শ্রী দেব মাণিক্য, ধ্বজঘট স্থায়ী, পদ্মা স্নায়ী শ্রী শ্রী বিজয় মাণিক্য ইত্যাদি। উত্তর-পূর্ব ভারতে এসব বিরল ঘটনা। ধর্ম নিষ্ঠার পরিচায়ক হিসেবেই একে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। মহারাজা রামগঙ্গা মানিক্যের মুদ্রায় প্রথম পাশ্চাত্য

প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ, সে সময় ব্রিটিশরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিলেন। সর্বোৎকৃষ্ট ব্রিটিশ প্রভাব বীরচন্দ্র মানিক্যের মুদ্রায় রয়েছে। ব্রিটিশ কোর্ট অফ আর্মিস ও মুদ্রায় 'ত্রিপুরাব্দ' তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন ব্যাপকভাবে। বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রায় নিজ প্রতিচ্ছবি ব্যবহার করেন। প্রতিচ্ছবি ব্যবহার এই প্রথম পাওয়া যায়। বীর বিক্রমের মৃত্যুর পর আর কোন মুদ্রা ছাপা হয়নি।

বিশেষ উল্লেখ যোগ্য এবং ঐতিহাসিকভাবেও আশ্চর্যের বিষয়, রাজমালা বা সমসাময়িক কোনও রেফারেন্স গ্রন্থে উল্লেখ নেই এমন কয়েকজন রাজার মুদ্রাও গত পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে (১৯৩৫-২০০০) আবিষ্কৃত হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে, তাঁরা যে ত্রিপুরার রাজাই ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এসব অজ্ঞাত নৃপতিগণ হলেন বীরভদ্র মানিক্য (১৫২১ শকাব্দ) ঈশ্বর মানিক্য (১৫২২ শকাব্দ) এবং দ্বিতীয় ধর্ম মানিক্য (১৫২৩ শকাব্দ)। কী সব কাবণে রাজমালার লেখকগণ এসব রাজাদের কথা এড়িয়ে গেলেন তা' সত্যি রহস্যময়ও গবেষনা সাপেক্ষ। তবে এসব নিয়ে নানাহ সন্দেহ রয়েছে। রাজমালার উপরও নানাবিধ প্রশ্ন জেগেছে। রবীন্দ্রনাথকে লেখা বীরচন্দ্র মানিক্য এক চিঠিতে বলেছেন, "রাজমালার লেখককে আমি বালক বয়েসে দেখেছি।" যাই হোক, উক্ত মুদ্রাগুলো ছাড়াও বর্তমান লেখক ত্রিপুরার অনেক মুদ্রা আবিষ্কার করেছেন এবং 'রাজেন্দ্র কীর্তিশালা'র সংগ্রহে এসব রযেছে। বিভিন্ন সময়ে তা' প্রকাশিতও হয়েছে।

মুদ্রার কথা আলোচনা কবতে গেলে স্বভাবতই 'মেডেল' ও 'সিলের' কথাও এসে যায়। ত্রিপুবার রাজাবা এগুলো তৈবী করেছিলেন। তবে একমাত্র ঈশান চদ্র মানিক্য ভিন্ন অন্য কাবোর মেডেল এ যাবত পাওয়া যায়নি। বীর বিক্রম নানা ধরনের মেডেল তৈবী করেছিলেন। এগুলো হ'ল- কর্মবীর, কর্মদক্ষ, কর্মনিষ্ঠ, পারিতোষিক ইত্যাদি। তাছাড়া সৈনিকদেরকেও বিভিন্ন মেডেল দেয়া হ'ত। নিজস্ব 'সীল' প্রায সব রাজাই ব্যবহার কবতেন। এগুলো রাজ স্বাক্ষরের বিকল্পে দলিল, আদেশ ইত্যাদিতে 'আজ্ঞা মোহব' নামে ব্যবহৃত হ'ত। প্রথানুসারে রাজ্যভাব গ্রহণ করে নিজ উপাস্য দেবতার নামে স্বীয় 'স্বাক্ষর মোহর' তৈবী কবে রাজার সই-এর পরিবর্তে ছাপ দেয়া হ'ত। পববর্তী চার জন রাজার এসব সীলগুলো হ'ল, - বীরচন্দ্রের 'শ্রী গোবিন্দ আজ্ঞা' (১৮৬৯ পর্যন্ত শ্রীল শ্রীযুত বীরচন্দ্র যুবরাজ)। রাধাকিশোরেব- 'শ্রীহরি আজ্ঞা'। বীরেন্দ্র কিশোরেব - 'শ্রী বিষ্ণু আজ্ঞা' বীর বিক্রমের-'শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞা' (তবে ১৯২৭খৃঃ সাবালক হয়ে পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্তির পর)। রিজেন্ট - মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীব - 'শ্রী শিব আজ্ঞা'। এসব মূল্যবান সীল ও মেডেল অধিকাংশই 'রাজেন্দ্র কীর্তিশালার' সংগ্রহে রয়েছে। রাজাদেব ছাড়া যুবরাজ, যুবরাণী ও মহারাণীর নামেও কিছু নিজস্ব সিল -মোহব পাওয়া গেছে। এসব দুস্প্রাপ্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শন। এসব সিল-মোহর তারা -নিজেদেব

তত্ত্বাবধানে রেখে দিতেন। অনেক সময় এসব সিল চুরি গিয়ে রাজার নামে আদেশ ইত্যাদি বে-
হয়ে যাবার ঘটনাও বিরল নয়। এসব সিল-মোহর ছাড়া আদেশ ইত্যাদি কার্যকর হ'ত না। এগুলো
'পদ্মমোহর', 'আজ্ঞামোহর' নামে অভিহিত হ'তো। সিলগুলো ছিল সাধারণত রৌপ্য নির্মিত।

----- o -----

ত্রিপুরায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদামাতা ও স্বামীজী মহারাজের ভাবধারা প্রচার ঃ গোড়ার কথা

জিতেন পাল

ত্রিপুরায় ঠাকুর স্বামীজীর তথা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার সম্পর্কে কিছু লিখবার জন্য কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি কিছুকাল যাবতই আমাকে তাগাদা দিয়ে আসছেন। আমারও এ সম্পর্কে কিছু লিখে যাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু সময় সুযোগ করেই উঠতে পাছি না, আর বিষয়টাও খুব সহজ নয়। আমি আর কতটাই জানি, বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার আর কতটা। অনেক পুরনো ইতিহাস ঘাটতে হবে, অনুসন্ধান করে জানতে হবে, তবেতো লিখব ! যাঁরা কিছু বলতে পারতেন, তথ্য দিতে পারতেন তাঁদের অনেকেই এখন আর ইহলোকে নেই। এই অবস্থায় অনেক চেষ্টা যত্ন করে যা পেয়েছি তাই পাঠকদের দরবারে উপস্থাপন করেছি।

ত্রিপুরায় ঠাকুর স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, - ১) মিশনের দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তবৃন্দ বা পূজনীয় স্বামীজী মহারাজগণ এবং ২) সংঘ-সংস্থা বা আশ্রম সমূহ। প্রথম ভাগটিই দুরূহ। কারণ, কখন কে বা কারা, কার বা কাদের আহ্বানে ত্রিপুরায় এসে ঠাকুর স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, তার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হয়নি। তবে অমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি সঠিক তথ্যের অনুসন্ধানে এবং যা পেয়েছি তা-ই পাঠকবর্গের দরবারে উপস্থিত করছি।

ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে প্রথমেই নাম করতে হয় কৈলাসহরের স্বনামধন্য, সুপন্ডিত, শিক্ষাবিদ্, পরম ভক্তপ্রবর প্রয়াত কুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের। তিনি সস্ত্রীক শ্রী শ্রী মায়ের আশ্রিত, কৃপাধন্য ছিলেন। তাঁরই আন্তরিক চেষ্টায় ও আগ্রহে, সম্ভবতঃ প্রথমে ত্রিপুরায় আসেন বেলুর মঠের স্বামীজী মহারাজরা এবং তাঁরই আন্তরিক চেষ্টায় ব্যবস্থাপনায় ত্রিপুরায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কৈলাসহরে, ১৯২৯ খৃঃষ্টাব্দে।

কুঞ্জবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমানে প্রয়াত মাধবলাল চট্টোপাধ্যায়ের (তিনিও বেলুড়মঠের আশ্রিত) কাছ থেকে অনেক আগের পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কুঞ্জবাবু যখন (১৯২০) বিলোনীয়া হাই স্কুলের (বি.কে.আই) প্রধান শিক্ষক, তখনই তিনি বেলুড় মঠের স্বামীজী মহারাজদের ত্রিপুরায় এনেছেন, আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেছেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দীক্ষারও ব্যবস্থা করেছেন। পরবর্ত্তীকালে কৈলাসহরে আর.কে আই এর প্রধানশিক্ষক হিসেবে বদলী হয়ে যাওয়ার পর সেখানেও তাঁর আগ্রহে এবং উদ্যোগে স্বামীজী মহারাজদের বিভিন্ন সময়ে আগমন ঘটেছে।

প্রয়াত অধ্যাপক মাধববাবুর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯২১ ইং সনে স্বামী অনুভবানন্দ বিলোনীয়ায় আসেন এবং কুঞ্জবাবুর সরকারী আবাসেই অবস্থান করেন। উদ্যোক্তা এবং আহ্বায়ক কুঞ্জবাবুই। তখন পাঠ, কীর্ত্তন ও আলোচনার ব্যবস্থা হয় এবং অনেক লোক তাতে অংশ গ্রহণ

কবেন। ১৯২৬ সনে আসেন স্বামী সুবোধানন্দ মহাবাজ। তাও বিলোনীযায় এবং কুঞ্জবাবুরই বাডীতে, - তাঁবই উদ্যোগে। স্বামীজী কযেক জনকে দীক্ষাও প্রদান কবেন। ১৯২৭ সনে স্বামী নিখিলানন্দ ও স্বামী অৰূপানন্দ বিলোনীযায আসেন এবং কুঞ্জবাবুব বাডীতেই অবস্থান কবেন। ঠাকুব স্বামীজীব ভাবধাবা প্রচাবে কযেকটি আলোচনা সভাব ব্যবস্থা হয। বিলোনীযায তখন ঠাকুব স্বামীজীব অনেক ভক্ত বা অনুবাগী ঠাকুবেব জন্মোৎসবও সবিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনায উদ্‌যাপিত হতো

ঐ একই সূত্র অনুযাযী ১৯২৮ ইং সনে স্বামী অৰূপানন্দ মহাবাজ কৈলাসহবে আসেন এবং কুঞ্জবাবুব বাডীতেই অবস্থান কবেন। কুঞ্জবাবু তখন কৈলাসহবে বদলী হযে এসেছেন। স্বামীজী দীর্ঘকাল কৈলাসহবে ছিলেন এবং তখনই সেখানে বামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপনেব মাটি উর্ব্বব হযে ওঠে। বস্তুতঃ কৈলাসহবে বামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠায উক্ত স্বামীজী আব কুঞ্জবাবুব অবদানই সর্ব্বাধিক এবং মুখ্য। উল্লেখ, কৈলাসহবে প্রতিষ্ঠিত এই "শ্রীবামকৃষ্ণ আশ্রমই" ত্রিপুবা বাজ্যেব প্রথম বামকৃষ্ণ আশ্রম।

বিলোনীযা আব কৈলাসহব ছাডা ত্রিপুবা বাজ্যেব আব কোন মহকুমায বা স্থানে বেলুডমঠেব স্বামীজী মহাবাজবা তখন এসেছিলেন কিনা, এমন কোন তথ্য আমি পাইনি। বাজ আমলে বাজধানী সহব আগবতলাতেও কোন স্বামীজী মহাবাজ (বেলুড মঠেব) এসেছিলেন কিনা এমন তথ্যেবও সন্ধান পাইনি। তবে অধুনা প্রযাত তডিৎবাবুব (তডিৎ মোহন দাশগুপ্ত) মতে ১৯৩০ ৩১ বা তাব কাছাকাছি কোন সময়ে বেলুড মঠেব এক স্বামীজী মহাবাজ এসেছিলেন আগবতলায এক শাস্ত্র আলোচনায যোগ দিতে। সেই আলোচনা ছিল ধর্ম্ম বা শাস্ত্রেব বিচাব বিশ্লেষণ। ঐ স্বামীজীব নাম তাঁব জানা নেই, তবে আমেবিকা থেকে এসেছিলেন বলে শুনেছেন।

১৯৪৭ সালেব স্বাধীনতাব আগে ত্রিপুবায বেলুড মঠেব আশ্রিত ভক্তদেব সংখ্যা ছিল নগন্য। নোয়াখালী দাঙ্গাব (১৯৪৬) পবে এবং স্বাধীনতা ও দেশভাগেব কাবণে এ বাজ্যে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তুব তথা হিন্দু বাঙ্গালীব আগমন ঘটে এবং এব সঙ্গে সঙ্গে বেলুডমঠেব ভক্তদেব সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। মঠেব স্বামীজী মহাবাজদেব ও আগবতলায ঘন ঘন আগমন ঘটতে থাকে, ভক্তদেব টানে। প্রথম আসেন মঠেব প্রযাত প্রবীন সন্ন্যাসী অসীমানন্দ মহাবাজ। সনটা ১৯৪৭ এব শেষ ভাগ। অতঃপব ১৯৫৫/৫৬ পর্যন্ত প্রতিবছবই তিনি এসেছেন। তাঁব অনেক আশ্রিত ভক্ত ও'পাড ছেডে এ'পাডে এসে গেছেন। তাঁদেবই আগ্রহে ও প্রার্থনায তাঁব বাবে বাবে আগমণ। তাঁব উপস্থিতিকে পাঠ, কীর্ত্তন, আলোচনায বহু ভক্তেব সমাবেশ ঘটতো।

অতঃপব একই সঙ্গে আসেন অধুনা প্রযাত প্রবীণ সন্ন্যাসীদ্বয স্বামী ত্যাগীশ্ববানন্দ (হেম মহাবাজ) এবং স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ (সুধীব মহাবাজ) সম্ভবতঃ ১৯৪৮ এব প্রথম ভাগে। স্বামী ত্যাগীশ্ববানন্দ তখন মিশনেব সাহায্য ও পুনর্বাসন বিষযেব ভাবপ্রাপ্ত, আব জ্ঞানাত্মানন্দ মিশনেব ঢাকাব আশ্রমেব অধ্যক্ষ। নোয়াখালী দাঙ্গাব ফলে আগত উদ্বাস্তুদেব সাহায্য ও পুনর্বাসনেব পবিকল্পনাব কাবণেই তাঁদেব আগমন। একটি প্রকাশ্য সভায এবং কয়েকটি ঘবোয়া আলোচনা

চক্রে শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গ তাঁরা আলোচনা করেন। ঐ প্রকাশ্য সভায় প্রায় দুই হাজার ভক্তের সমাবেশ ঘটে।

১৯৪৯ ইং সনের মাঝামাঝি সময়ে স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ পুনরায় আগরতলায় আসেন নোয়াখালী দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব নিয়ে। আনন্দনগরে পুনর্ব্বাসনের স্থান নির্ধারিত হয় এবং পুনর্ব্বাসন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আগরতলায় শিববাড়ীতে অবস্থান করেন। সভাবতঃই ভক্তরা সেখানে সমবেত হতেন তাঁর সান্নিধ্য লাভ, আর ঠাকুর স্বামীজীর কথা শোনার জন্য। প্রতি সন্ধ্যায়ই বসতো আলোচনাচক্র , যার মুখ্য ভূমিকায় থাকতেন স্বামীজী। মাঝে মাঝে পাঠ -কীর্ত্তনও হতো। শিববাড়ীতে প্রায় প্রতি সন্ধ্যার এই অনুষ্ঠান চলে ১৯৫২ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত - যখন স্বামীজী তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব তথা উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন কার্য্য সম্পন্ন করে আগরতলা তথা ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যান।

বোম্বে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ উদ্বাস্তুদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে ১৯৫০ এর ৪ঠা জুন এখানে আসেন । তিনি দুদিন এখানে অবস্থান করেন এবং ঠাকুর স্বামীজী সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নেন। তাঁকে কেন্দ্র করে শিববাড়ীতে বহু ভক্তের সমাবেশ ঘটে। ১৯৫৪ ইং সনের ৩রা জুন বেলুড় মঠ ও মিশনের তৎকালীন সহ সভাপতি পরম পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ কুমিল্লা থেকে এখানে আসেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী অসীমানন্দ মহারাজ। ভক্তরা তাঁদের দর্শন ও প্রণাম করেন এবং আশীর্ব্বাদ নেন।

এই গেল ত্রিপুরায় ঠাকুর স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারে বেলুড় মঠের স্বামীজী মহারাজদের কৃত অধ্যায়। এবার আসছি গৃহী ভক্তদের প্রচার কার্য্যের বিবরণে। প্রথমেই নাম করতে হয় আগরতলা মধ্যপাড়ার তৎকালীন অধিবাসী প্রয়াত নির্ম্মল চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর এবং জয়নগর ১ নং রাস্তার অধিবাসী প্রয়াত ননী গোপাল দত্তের নাম। তাঁদের সঙ্গে আর একটি নাম মন্ত্রীবাড়ী রোড নিবাসী প্রয়াত সুবোধ চৌধুরী। তাঁরা সকলেই ছিলেন বেলুড় মঠের আশ্রিত ভক্ত। সময়টা ১৯৪২ -৪৪ খৃষ্টাব্দ। আমি তখন রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের স্কুল সাব্ ইন্স্পেটার। নির্ম্মলবাবু ঐ শিক্ষা বিভাগেরই একজন পদস্থ অফিসার, আর ননী গোপাল দত্ত উমাকান্ত একাডেমীর সিনিয়র শিক্ষক সুবোধবাবু কি করতেন এখন আমার ঠিক মনে নেই , তবে তিনি যেন কোন এল.আই.সি'র স্থানীয় এজেন্ট ছিলেন।

অফিসের কাজকর্ম্মের ফাঁকে একদিন জানতে পারি, নির্ম্মল বাবু ঠাকুর স্বামীজীর ভক্ত এবং বেলুড় মঠের আশ্রিত। আরও জানতে পারি, নির্ম্মলবাবু আরও কয়েকজন ভক্তের সহযোগিতায় মাঝে মাঝে এখানে সেখানে পাঠচক্রের ব্যবস্থা করেন এবং তাতে কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ বা শ্রীমায়ের জীবনীর অংশ পাঠ ও আলোচিত হয়। এই পাঠচক্র বসতো নির্ম্মলবাবুর বাড়ীতে বা জয়নগরে ননীগোপাল বাবুর বাড়ীতে বা সুবোধবাবুর বাড়ীতে বা ভক্তগণের অনুরোধে অন্য কোন ভক্তের বাড়ীতে। এইসব শুনে আমি খুব আনন্দিত হই এবং আমার বনমালীপুরের বাড়ীতেও

পাঠচক্রের অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানাই। নির্ম্মলবাবু খুব খুশী হয়ে তাতে স্বীকৃতি দেন। অতঃপর আমার বাড়ীতেও মাঝে মাঝে পাঠচক্রের আসর বসতো। উল্লেখ্য, ছোটবেলা থেকেই আমি ঠাকুর স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী এবং আমার স্ত্রীর যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও শ্রী শ্রী মায়ের প্রতি। আরও উল্লেখ্য, আমরা তখনও মঠের দীক্ষাপ্রাপ্ত নই। দীক্ষাপ্রাপ্ত হই আমরা এর সুদীর্ঘকাল পরে ১৯৬৮ ইং সনে।

পরমভক্তপ্রবর কুঞ্জলাল বাবু, ব্রজেন্দ্র দেবগুপ্ত (পরবর্তী নাম তাপস চৈতন্য) সহ অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে কৈলাসহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠচক্রের ব্যবস্থা করে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনলীলার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে ঠাকুর স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারে সহায়তা করেছেন। পরবর্ত্তীকালে ডঃ সচ্চিদানন্দ ধরও এই প্রচার কার্য্যে সামিল হন। কৈলাসহর রামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন বা আছেন। তাঁরই উদ্যোগে কৈলাসহরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরিচালনায়ও ছিলেন তিনি দীর্ঘকাল।

এই প্রসঙ্গে নাম করতে হয় প্রয়াত মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ (লালু কর্ত্তা) মহোদয়ের। তিনি বেলুড় মঠের দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু ঠাকুর স্বামীজীর প্রতি তথা বেলুড় মঠের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ছিলেন মঠ মিশনের অন্যতম অনুরাগীও। তাঁর বাড়ীতে (এখন মহিলা কলেজ) বা তাঁর পৌরোহিত্যে ঠাকুর স্বামীজী বা মঠ মিশন সম্পর্কিত অনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি নিজেও এমন কয়েকটি সভায় উপস্থিত ছিলাম। তাছাড়া, তিনি আমার প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘে'র(১৯৪৭) সভাপতি ছিলেন। আর সম্পাদক ছিলাম আমি নিজে। পরবর্তীকালে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কমিটির" সভাপতি পদে বৃত হন তিনি, আর সম্পাদক হন ভক্তপ্রবর অধুনা প্রয়াত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত। ঠাকুর স্বামীজীর প্রসঙ্গ আলোচনায় লালু কর্তা অত্যন্ত উৎসাহিত ছিলেন। এ ব্যাপারে যখনই তাঁকে ডাকা হয়েছে, তখনই তাঁকে পাওয়া গেছে। রাজপরিবারজাত কোন অহংকার বা অলসতা তাঁর ছিল না।

সবশেষে নাম করতে হয় আমার সম্পাদিত দুইটি পত্রিকার - (১) অর্দ্ধসাপ্তাহিক "জনকল্যাণ" আর (২) দৈনিক "জাগরণ"। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও উপদেশ প্রচারে এই দুইটি পত্রিকা কি নিরলস ও নিয়মিত প্রচেষ্টা নিয়েছিল, প্রবীণ পাঠকবর্গ এবং ঠাকুর স্বামীজীর ভক্তমাত্রই তা অবশ্যই অবগত আছেন। প্রতিদিন পত্রিকা দুইটির প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষেই থাকতো শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী বা উপদেশ - "শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ গীতা" থেকে। এই প্রচেষ্টা চালু ছিল সুদীর্ঘকাল, ১৯৪৯ থেকে ১৯৮২ পর্য্যন্ত, সুদীর্ঘ ৩৪ বছর।

এই গেল আমার জানা তথ্যমত ত্রিপুরায় ঠাকুর স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারে ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টা। এর বাইরে আরও প্রচেষ্টা থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। এর বেশী যাঁদের জানা আছে, পত্রিকা মারফতে বা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানালে অত্যন্ত আনন্দিত হব এবং ইতিহাসও সুষ্ঠু বা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে। এবার আসছি আশ্রমিক প্রচেষ্টায় ঠাকুর স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারের তথ্যাবলীতে। আশ্রমিক প্রচেষ্টা মানে আশ্রম স্থাপন করে এবং আশ্রমকে কেন্দ্র করে যে প্রচেষ্টা

চালান হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

এই অধ্যায়ে প্রথমেই নাম করতে হয় কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ আশ্রমের। আশ্রমটির নাম - শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। স্থাপিত হয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। উদ্যোক্তা তখনকার প্রধান শিক্ষক কুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায়, আর বেলুড় মঠের পরম পূজ্যপাদ স্বামী অরূপানন্দ মহারাজ। তাঁদের সহকারী ব্রজেন্দ্র দেবগুপ্ত - তাপস চৈতন্য নামে যিনি পরিচিত । এই তাপস চৈতন্যই ছিলেন আশ্রমের আবাসিক ও পূজক এবং আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে আশ্রমের রক্ষক পরিচালক। নিত্য পূজা, পাঠ, আরতি, কীর্ত্তন ওখানে চলতে থাকে তখন থেকেই নিয়মিতভাবে। প্রতিদিনই সন্ধ্যায় ভক্ত সমাবেশ ঘটে আর রবিবার ঘটে বিরাট আকারে। ঠাকুর -মা- স্বামীজীর তিথি পূজা উৎসব চলতে থাকে সাড়ম্বরে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দিকে লক্ষ্য রেখে আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ স্কুলের নাম করা হয় "রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়।" পরবর্ত্তীতে ঐ স্কুলটি কলেজে উন্নীত হয় এবং নাম করা হয় "রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়।" এর অধ্যক্ষ পদে বৃত হন ভক্তপ্রবর ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। ঠাকুর স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারে এই আশ্রমের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

দ্বিতীয় আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় আগরতলায় ধলেশ্বরে। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। প্রতিষ্ঠাতা এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী দয়ালানন্দ। আশ্রমটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় কল্যাণীর কালীতলায়। কিছুদিন পরেই চলে আসে বর্ত্তমান স্থানে, আশ্রম চৌমুহনীতে। এই আশ্রমের কারণেই চৌমুহনীর নাম আশ্রম চৌমুহনী। এই আশ্রমটি একটু অন্য ধরনের। ঠাকুর স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারে অন্যতম সহায়ক হলেও, মন্দিরে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর প্রতিচ্ছবি নিয়মিত এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে পূজিত হলেও, ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব বিশেষ সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হলেও - আশ্রমটি বেলুড় মঠ মিশনের অনুমোদিত নয়, অনুসারীও নয়। এই আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ স্বাধীন। তাঁরা নিজেদের পছন্দমত কাজ করেন।

এর আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো - এটি গার্হস্থ্য আশ্রম, সন্ন্যাস আশ্রম নয়। আশ্রমাধ্যক্ষ্য বিবাহিত এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়েই আশ্রমে বাস করেন বা আশ্রমজীবন যাপন করেন। তাঁর ভাইরাও বিবাহিত এবং তাঁরাও স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়েই এই আশ্রমে বসবাস করেন। তাঁদের বাহ্যিকরূপ অবশ্য সাধু-সন্ন্যাসীর, পরিধানে লাল বা রঙীন কাপড়।এই পরিবারের ১০/১২ জন লোক ছাড়াও আরও কয়েকজন ঠাকুর স্বামীজীর নামে ও প্রেমে এই আশ্রমে ঠাঁই নেন এবং তাদেরও কারও কারও পরনে লাল কাপড়, আবার কারো কারো পরনে সাদা কাপড়(ব্রহ্মচারীর মত)। সব মিলিয়ে আশ্রমটির কর্মী সংখ্যা প্রায় ১৪/১৫ জন এবং খুবই জমজমাট ও কর্ম্মমুখর। আশ্রমটির নাম - শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা কুটীর। এদেরও বিদ্যালয় আছে, টোল আছে এবং ছিল প্রচুর জমিজমাও। উল্লেখ্য, এই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দয়ালানন্দ বা অন্য কেউ-ই বেলুড় মঠের আশ্রিত বা দীক্ষিত নন।

তৃতীয় আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় আগরতলা থেকে ৮/৯ মাইল দূরে সীমান্তগ্রাম কোণাবনে। প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ। প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ নিখিলানন্দ মহারাজ। আশ্রমটির নাম ছিল

প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। বেলুড় মঠের নাম 'রামকৃষ্ণ মঠ' হওয়ায় বেলুড় থেকে আপত্তি দিয়ে নাম পরিবর্ত্তন করতে বললে পরবর্ত্তীতে নাম করা হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মঠ'। এই নামই এখন বহাল। অধ্যক্ষ নিখিল মহারাজ বেলুড় মঠের আশ্রিত এবং ব্রহ্মচারী অবিভক্ত বাংলায়ও তিনি আশ্রম নিয়েই ছিলেন। দেশ ভাগের কারণে এখানে চলে আসেন।

আগরতলা গাঙ্গাইল রোডের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম" - রাজ্যের চতুর্থ আশ্রম। প্রতিষ্ঠাকাল - ১৫.০২.৫৭ বাং (২৯.০৫.৫০ ইং)। প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ - পরম ভক্তপ্রবর অনন্ত লাল বণিক। উদ্বোধন কার্য্যের প্রধান অতিথি ছিলেন বেলুড় মঠের পরম পূজ্যপাদ স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ মহারাজ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা এডভোকেট নিবারণ চন্দ্র ঘোষ, সাংবাদিক জিতেন পাল, ভক্তপ্রবর শান্তলাল বণিক, ইন্দ্রলাল বণিক প্রমুখ। আশ্রমটি প্রথমে স্থাপিত হয় উত্তর বনমালীপুরের ভগবান ঠাকুরের পুকুরের পশ্চিম পাড়ে- একটি চিল্‌তা জায়গায়। মাস দুই পরেই তা চলে আসে বর্ত্তমান স্থানে - গাঙ্গাইল রোডে। এইটি চতুর্থ আশ্রম হলেও পরবর্ত্তীতে এইটিই হয়ে যায় রাজ্যের প্রধান আশ্রম। বিশেষ উল্লেখ্য, ভক্তপ্রবর অনন্তবাবু বেলুড় মঠ ও মিশনের ভক্ত ও অনুরাগী হলেও বেলুড় মঠের আশ্রিত ছিলেন না। তিনি দীক্ষা নেন বেলুড় মঠ ও মিশন থেকে বহিষ্কৃত সন্ন্যাসী স্বামী সর্ব্বানন্দ মহারাজের কাছে থেকে।

এরপরের আশ্রমটি স্থাপিত হয় সহরতলীর আনন্দনগরে, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজনীয় স্বামীজী ত্যাগীশ্বরানন্দ মহারাজের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে। এর সেবক-পূজারী ছিলেন ভক্তপ্রবর কানুগোপাল চক্রবর্ত্তী। এখানে পুনর্ব্বাসিত উদ্বাস্তুদের কলোনীরও নামকরণ করা হয় "রামকৃষ্ণ কলোনী", স্থাপনা কাল- ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ। এই আশ্রমে ভোগ-আরতি, পূজা-অর্চ্চনা, ভজন-কীর্ত্তন নিয়মিতই হতো, - স্বামীজী মহারাজ থাকাকালীন খুব জমজমাট আসরই বসতো। সহর থেকেও অনেক ভক্ত যেতেন সেখানে। এর প্রতিষ্ঠাকাল - সম্ভবতঃ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ এবং আশ্রমটির নাম- শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম। .

পরবর্ত্তীকালে সারা ত্রিপুরায় ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, আর স্বামীজীর নামে অনেক আশ্রম বা মঠই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি এখন নাম করছি উদয়পুরের আশ্রমটির। আশ্রমটির নাম - শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পাঠচক্র। স্থাপিত - ১৯৬৪ ইং সনের ৬ই জুন। প্রধান উদ্যোক্তা পরম ভক্তপ্রবর (এস.ডি.ও) কুলেশপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। সঙ্গে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ। পাঠচক্রই ছিল এখানকার প্রধান কর্মকেন্দ্র। পরে মন্দির স্থাপিত হয় এবং নিয়মিত পূজা-পাঠ, আরতি-অর্চ্চনার ব্যবস্থা হয়। উৎসবও হয় খুব জাকজমাট।

এরপরে নাম করছি দক্ষিণ সহরতলীর আমতলীর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম"এর। আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬ ইং তারিখে। প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ স্বামী পরমানন্দ (দ্বারিক মহারাজ)। অনেক জায়গা নিয়ে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরের বহু ভক্ত এই আশ্রমের অনুরাগী ছিলেন। পূজা, ভোগ, আরতি, কীর্ত্তনে এবং বিভিন্ন উৎসবে এই আশ্রমটি সর্ব্বদা মুখরিত ছিল। অনাথ বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয়ও ছিল সেখানে। এখন এই আশ্রমটি

বেলুড়মঠ ও মিশনের ত্রিপুরার প্রধান কার্য্যালয়ে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা স্বামী পরমানন্দ মহারাজ স্বেচ্ছায় তা তুলে দিয়েছেন বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে।

এরপরে নাম করছি বিলোনীয়ার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম"-এর। আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সনের রথযাত্রার দিনে। প্রথমে নাম ছিল "সারদা সঙ্ঘ। পরে "সারদা সেবাসঙ্ঘ"। ১০ বছর পরে বর্ত্তমান নামকরণ হয়। সম্পাদকের দায়িত্বে বৃত হন পরমভক্ত রেবতী পাল। এখানেও নিয়মিত পূজা-পাঠ, কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসবগুলিতে বহু ভক্তের সমাবেশ ঘটে।

পরবর্ত্তী নামটি করছি পশ্চিম আগরতলায় অবস্থিত প্যারীবাবুর বাগানের সংলগ্ন আশ্রমটির। এর নাম "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠ"। প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ। প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ - পরম ভক্তপ্রবর অনন্ত লাল বণিক। এখনেও ঠাকুর -মা-স্বামীজীর নিয়মিত পূজা-অর্চ্চনা, ভোগরাগ, ভজন-কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, গাঙ্গাইল রোডস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে অনন্তবাবু এই নূতন আশ্রমটির প্রতিষ্ঠা করেন।

এবারে উল্লেখ করছি মধুবন রাণীরখামারের আশ্রমটির। নাম- 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম"। প্রতিষ্ঠাকাল - ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯০ খৃষ্টাব্দ। প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ - স্বামী পরমানন্দ মহারাজ। আমতলীর আশ্রমটি স্বেচ্ছায় বেলুড়মঠ মিশনের হাতে তুলে দিয়ে এখানে এসে নূতন করে এই আশ্রমটি প্রতি ষ্ঠা করেন তিনি। পূজা-পাঠ, ভজন-কীর্ত্তন, আরতি-অর্চ্চনা এখানেও নিয়মিত হয়। প্রয়ই বহু ভক্তের সমাবেশ ঘটে। সহর থেকেও অনেক ভক্ত বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে সেখানে ছুটে যান।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের অসীম কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে ইতিমধ্যে ত্রিপুরার সর্ব্বত্র শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজীর নামে বহু আশ্রম গড়ে উঠেছে। ধর্ম্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত এমন কোন জনবহুল স্থান নেই এখন যেখানে ঠাকুর -মা-স্বামীজীর ভাবধারা প্রচার হচ্ছে না। যে ছোট্ট বৃক্ষ অতি যত্নে কৈলাসহরে রোপিত হয়েছিল, সে আজ বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়েছে এবং সমগ্র ত্রিপুরা এখন তার ছত্রচ্ছায়ায়।

এবার বলছি শুধু শ্রীমায়ের নামে গঠিত দুটি সংঘ-সমিতি সম্পর্কে। প্রথমটি - 'সারদা সমিতি'। প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৯ ইং। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পরম ভক্তিমতী বিভা বসু, নিতা ঘোষ, ঊষা চৌধুরী, ছায়া চ্যাটার্জ্জী প্রমুখ। দ্বিতীয়টিব নাম -"সারদা সঙ্ঘ'। প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৬৯ ইং। অন্যতম উদ্যোক্তা - পরমভক্তিমতী মীরা মিত্র, মিনু ভৌমিক, মুকুল ধর, মুকুল চক্রবর্ত্তী, রত্না দাস প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, "সারদা সঙ্ঘ" নামটিই বেলুড় মঠ মিশনের অনুমোদিত নাম। সঙ্ঘ-সমিতি দুইটিই এখনও চালু আছে। তবে এদের কোন নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা নেই।

----- o -----

মরমীয়া সাধকের রচনায় ভারতচিন্তা

ডঃ প্রণব বর্ধন

ভারতবর্ষে আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রন ঘটেছে দীর্ঘকাল ধরে। আর্যদের এদেশে আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে যারা বসবাস করত,তারাই অনার্য নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে সে সময় বিভিন্ন অনার্য জনগোষ্ঠী বাস করত। তাদের মধ্যে দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতিই বিশেষ উন্নত ছিল।

পশ্চিম থেকে পূর্বে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ভারতে আর্যবিজয় সম্পন্ন হতে লেগেছিল দীর্ঘকাল। এই সুদীর্ঘকালের আর্যবিজয়ে আর্য জনগোষ্ঠী অনার্য জনগোষ্ঠীর সাথে মিশ্রিত হয়েছে, পড়েছে আর্যসভ্যতা ও কৃষ্টিতে অনার্য সভ্যতার ছাপ। এ ভাবেই উভয় জাতি ও সভ্যতার দীর্ঘ সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে ভারতবর্ষে একটি সুউন্নত আর্যসভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে নানা জাতি এসে বসবাস করেছে। এদের ভাষা ছিল আলাদা আলাদা। এখনও আছে। তেমনি আলাদা আলাদা ছিল এদের জীবনযাত্রার প্রণালী,এদের ধর্ম,এদের সামাজিক রীতি নীতি। এক কথায় এইসব জাতের জগৎ ছিল আলাদা আলাদা। ভারতে যত রকমের জাত এসেছে,এসে এখানকার অধিবাসী হয়ে গিয়েছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে যে প্রবর্ধমান জীবনস্রোত বয়ে চলেছে তার সঙ্গে মিশে একাঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে এমনটি খুব কম দেশেই হয়েছে। ভারতের আদিমতম অধিবাসীরা নামহীন,পরিচয়হীন। তারপরে কোল, দ্রাবিড, আর অন্য জাতি; হিন্দু আর্য্য,ভোট-চীন জাতি, ঈরাণী আর্য্য,যবন বা গ্রীক, শক, হুণ, তুর্ক, আরব, থাই বা অহম, মুসলমান পরসীক, পাঠান, ইহুদী,সিরীয়,পোর্তুগীজ আর আধুনিক ইউরোপের ইংরেজ- সবাই ভারতে স্থান পেয়েছে। দিনের পর দিন ভারতে বুদ্ধিশীল জীবনে সকলেই অংশ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারততীর্থ নামে বিখ্যাত কবিতায় উদাত্ত ছন্দে ভারতে মহামানবের মিলনের কথা বলেছেন । তাঁর এই কবিতা ভারতের হিন্দুর সমন্বয়-প্রয়াসী চিত্তের,যে চিত্ত সকলকেই গ্রহণ করতে চায়, কাউকে বর্জন করতে চায় না, তার এক আবাহন গীতি। ....সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীর দিয়েই ভারতবাসী তার ভারত সংস্কৃতির অভিষেক করে এসেছে।

ভারতের মণীষীদের মধ্যে চিন্তানায়কদের মধ্যে ভারতের আদিম আর পরবর্তীকালে আগত নানা জাতির সভ্যতা আর চিন্তাকে নিয়ে একটি বিরাট সমন্বয় করবার চেষ্টা চলেছে। প্রথমটায় ভারতের অন্ধ তমিস্রাচ্ছন্ন প্রাগৈতিহাসিক যুগে হয়তো

আপনা আপনি কালধর্মের ফলে নানা জাতির মানুষের প্রতিবেশ প্রভাবে মানুষের কোনো সচেতন বা প্রবুদ্ধ উদ্দেশ্য না নিয়েই এই সমন্বয়ের বীজ উপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বেদের সময় থেকেই যখন ঋষি তাঁর এই ঋক্ মন্ত্র রচনা করেছিলেন-একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি (যা আছে তা এক, ধীমান লোকেরা তাঁকে বহু বলে) - তখন থেকেই এই সমন্বয়ের একটা সচেতন প্রয়াস আমরা দেখতে পাই। মহাবীর, বুদ্ধ, রাম, কৃষ্ণ, বাসব, রামানন্দ, রবিদাস, কবীর, নানক, চৈতন্য, দাদু প্রভৃতি প্রাচীন যুগের সব যোগসাধক মহাপুরুষের দল এ কাজই করে গেছেন- এযুগেও অজস্র মহাপুরুষ এই কাজই করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন । যুগগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাতে এইটেই হল মর্মকথা।

প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুধর্ম ভারতের নানা সাধনার সমন্বয় সাধন করেছে। খুব উদার বলেই হিন্দুরা স্বভাবতই চিহ্নিত, কেননা, দক্ষিণ ভারতে যখন খ্রীষ্টানেরা এলেন তখন দক্ষিণের হিন্দু রাজারা সেই সব খ্রীষ্টীয় সাধকদের ব্রহ্মোত্তরের মতো ভূমিবৃত্তি দিয়ে খ্রীষ্টধর্ম সাধনার পথ সহজ করে দিয়েছেন -- আপন ধর্মরক্ষার জন্য পারসীরা পারস্য দেশ ছেড়ে গুজরাটে এলে যদুরাণা তাদের ভূমি ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। জৈনদের প্রাচীন প্রবন্ধ গ্রন্থে আছে মুসলমান ভক্তদের জন্য দেবী অনুপমা ৮৪টি মসজিদ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। মুসলমান জয়ের আগে মুসলমান সাধকদের জন্য হিন্দু রাজাদের ভূমিদানের বহু প্রমাণ প্রাচীন লেখা গ্রন্থে পাওয়া গেছে। কাজেই রাজ্য জয় করেই মুসলমান ধর্ম ভারতে স্থান পেয়েছে- তা ঠিক নয়। আসলে ভারতে এই উদার আতিথ্যের দ্বার চিরদিনই খোলা ছিল। হিন্দু সংস্কৃতি এভাবে নুতন নুতন সংস্কৃতিকে হাতের কাছে পেয়ে তাদের অস্বীকার না করে বা নষ্ট না করে তাদের সংস্কৃতিগত প্রাচুর্য্যকে গ্রহণ করে ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যকে বর্ধন করে চলেছিল। দ্রাবিড়, শক, হূন, গ্রীক বহু সভ্যতা এ ধারাতে সাদরে গৃহীত হয়েছে। তারপর মুসলমানেরা ভারতে এল। কিন্তু তখনও তাদের ধর্ম আলাদা- ফলে একটা সমন্বয়ের কাজ শুরু করতে হল ।কবীরের গুরু রামানন্দ এ কাজের পূর্ব পথিক বলা যেতে পারে --সাধক কবীরের ভূমিকা আরও ব্যাপক।তবে রামানন্দেরও আরো আগে মনিরামসিংহের 'পাহুড দোহা'য় কবীরের সত্যগুলো বিবৃত আছে দেখা যায়। তবে সমন্বয়ের চেষ্টা এ সময়েই হতে থাকে। জৈনদের ধর্মেও 'পাহুড দোহা'র পরিনতিই লক্ষ্য করা যায়।

কাজেই ভারতের সাধনার মধ্যযুগের সব সম্পদ বহুকাল থেকেই চলে আসছিল। মুসলমান সাধনা এই দেশে এলে সাধকেরা আবার নুতন করে সেই সব আদর্শকে সকলের সামনে তুলে ধরলেন। কাজেই স্বাধীন বিচারে সব সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার অতীত যেসব মহাসত্য ছিল তার আলোচনা ভারতে যুগের পর যুগ

চলে এসেছে। মুসলমান সাধকেরা এলে ভারতের সাধকেরা এই তত্ত্ব তাদের দেখালেন- তখন হতে সাধারণ লোকদের মধ্যেও এই সব তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া চলতে লাগল। জয়দেব, বামদেব,রামানন্দ প্রভৃতি এই কাজে প্রবৃত্ত হলেন। তারপর এলেন কবীর, রবিদাস, নানক প্রভৃতি মধ্যযুগের গুরুর দল।

ভারতের আদি সাধক হলেন মুখদুম সৈয়দ আলি অল্ হুজবেরী। তিনি ছিলেন গজনী প্রদেশের লোক। তিনি নানা দেশ পর্যটন করে পরে লহোরে বসবাস করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কশ্‌ফ্ অল মহজুব' সাধনা শাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থ। হিন্দু,মুসলমান উভয়েরই সম্মানিত তাঁর সমাধিস্থল। ভক্তিতে ভরপুর তীর্থস্থান। তবু হিন্দু মুসলমানের মিলন পণ্ডিতদের দ্বারা সাধিত হল না। কেননা পণ্ডিতরাতো কেউ নিজ নিজ গোঁ ছাড়বেননা। ফলে সব সহজ সাধকের দল সেতু রচনার কাজে এগিয়ে এলেন।

ভারতে মুসলমান সাধকদের বাদশা-খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তী। ফরীদ উদ্দীন সাকর তাঁর শিষ্য। তাঁর শিষ্য নিজাম উদ্দীন ঔলিয়া। বহাউদ্দীন জাফারিয়া- তাঁর নাতি সাধক মখদুম জাহানিয়া-তাঁর নাতি বরহানুদ্দীন কুতব-ই-আলী। সাধক সৈয়দ মহম্মদ, এই সময়েরই কিছু আগে পূর্ববঙ্গাগত বিখ্যাত সাধক শাহজলাল পরলোক গমন করেন। এঁদের অনেকেই কবীরের পূর্ববর্তী সাধক।

কবীর ঃ - রামানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ- মুক্তপুরুষ।রামানন্দ বাহ্য আচার ছেড়ে সবাইকে সাধনার দীক্ষা দিলেন। তাঁর প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে রবিদাস ছিলেন মুচি। কবীর ছিলেন জোলা। সেবা ছিলেন নাপিত । ধন্না ছিলেন জাঠ, পীপা ছিলেন রাজপুত । ভক্তিবাদ দ্রাবিড় দেশ থেকে রামানন্দ উত্তর ভারতে নিয়ে আসেন । আর উত্তর ভারতের মহাগুরু হলেন কবীর। এই ভক্তির ধর্ম প্রচারে নামদেব ও সদনার নাম উল্লেখযোগ্য । নামদেব ছিলেন দরজী ও সদনা ছিলেন কসাঈ। হিন্দু মুসলমান উভয়কে মেলাবার চেষ্টাই ছিল কবীরের প্রধান ব্রত। কবীরের জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে । তবে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় তাঁর জন্ম ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। কবীরের নামকরণ করেছিলেন একজন কাজি । তিনি "কুরাণ" খুলতেই "মহান" অর্থবাচক এই "কবীর" নামক আরবী শব্দটি তাঁর চোখে পড়ে। কবীর তাঁর একটি দোহায় বলেছেন ।

"মহান তুমি, প্রভু,কবীর তুই ও সেই, মহান্ নাম তোর ভবে।
শরীর মায়া আগে ত্যাজিতে পার যদি রামরতন লাভ হবে।"

রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেও কবীর পুঁথিগত বিদ্যালাভের জন্য সময় নষ্ট করেননি। পুঁথিগত বিদ্যায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। এক জায়গায় তিনি বলেছেন-

"মসি কাগজ ছুয়ো নঁহী/ কলম সহি যো নহি হাত।"

কবীরের জীবনের কথা আবুলফজল আল্লামীরের 'আইন-ই-আকবরী' তুকারামের 'অভঙ্গ'

অনন্তদাসের 'শ্রীকবীর পরিচয়ী', পঞ্চম শিখগুরু অর্জুনদেবের সঙ্কলিত গুরু গ্রন্থসাহেব' এবং কবীর নিজের 'দোহা' ও 'সাখী'- তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন 'কবীর কে পদ'- ভক্তদের মুখ থেকে শুনে সংগ্রহ করেছেন। ফলে ভাষা কিছু পাল্টেছে বটে কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ভাবের বিশুদ্ধতা গ্রহণযোগ্য। সেনের সংগৃহীত পদগুলোর মধ্যে বলা হয় অন্তত ১০০ টি পদ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। ঐ পদগুলো রবীন্দ্রনাথের গোচরেও এসেছিল। কবির কাছে এগুলো এতই উচ্চমানের মনে হয়েছে যে তিনি নিজে এগুলোর ইংরেজী অনুবাদ করে বিশ্বের দরবারে পৌছে দিয়েছেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে কবীরের বাণীসমূহ সমগ্র মানব সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা দান করবে। ভারতে হিন্দু মুসলমান উভয়কে এক সূত্রে গ্রথিত করবার চেষ্টাই ছিল কবীরের মহান ব্রত। তিনি বলেন -

"জৌর খুদাই মসীত বশত হৈঁ উর মুলিক কিসকেরা ।
তীরথ মুরতি রাম নিবাসা দহুধম কিন হুন হেরা ।
পূরিব দিশা হরী কা বাসা পছিম অলহ মুকামা ।
দিল হী খোজী দিলৈ দিল ভীতরি ইহা রাম রহিমানা ।"

-খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন তবে আর সব মুলুক কার । তীর্থে মূর্তিতে রামের বাস, এই দ্বৈত ভাবের মধ্যে সত্য কোথায় । হায় পূর্ব দিকে হরির বাস, আর পশ্চিমে আল্লার মোকাম। আর খুঁজে দেখো হৃদয়ের মধ্যে, সেখানেই রাম রহিমান।

কবীর সকল রকম সাম্প্রদায়িক এবং সঙ্কীর্ণ ধর্মমতের ও দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা করে ভারতের জনগণকে একসূত্রে গ্রথিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন-

"ব্রাহ্মণ নহেকো উচ্চ জাতি নীচ জাতি শূদ্রে কেবা বলে ?
কেন ঘৃণা করো পরস্পরে? ঘৃণা আসে মূঢ়তার ফলে।"

বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান নিরর্থক। শরীরে ভস্মমাখা, শাস্ত্রানুযায়ী ত্রিসন্ধ্যা স্নান করা, ব্রতোপবাস পালন,তীর্থভ্রমণ, লোকদেখিয়ে জপমালা ঘোরানো, উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ এবং দেহকে নির্যাতন করা- এইসবই কবীরের তীব্র বিদ্রূপের লক্ষ্য ছিল।

কবীর শুধু একজন মরমীয়া সাধক --পাগল করা জনতার ভীড় থেকে বহু দূরে দর্শন শাস্ত্রের পাহাড়চূড়াবাসী মানুষ ছিলেন না। ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত বহু প্রতারণা এবং মিথ্যাচার দেখেছিলেন এবং তা দেখে কবীর বোবা কালার মত নীরব থাকার লোক ছিলেননা। যা সত্য বলে জেনেছেন তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন- সে যুগে যা করতে যথেষ্ট দুঃসাহসের প্রয়োজন ছিল।

<u>নানক ঃ</u> - আধুনিক শিখ ধর্মমতের প্রবর্তক - লাহোরের নিকটবর্তী তালবন্দী গ্রামে ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে গুরু নানক জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম কালু মাতার

নাম ত্রিপতা। পিতা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। কুল - পুরোহিত, জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ হরদয়াল এই শিশুর ভবিষ্যৎ মহত্ব গণনা করে নানক নামকরণ করেন। নানক,চৈতন্য, শংকরাচার্য্য - এর সমসাময়িক। নানক অতি অল্প বয়সে বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত এবং কুতুবুদ্দিন মোল্লার নিকট ফার্সী ও উর্দূ ভাষা শিক্ষা করেন। বাল্য কালে পাঠশালায় অধ্যয়নের সময় নানক প্রত্যেক বর্ণমালার আদ্য অক্ষর দিয়ে অতি মনোহর বৈরাগ্যব্যঞ্জক কবিতাবলি রচনা করেন। বালক বয়সে সন্ন্যাসী, ফকির দেখলেই তাদের উপদেশ কথোপকথন শুনতেন । মাত্র ২৭ বছর বয়সে স্ত্রী, শিশু সন্তান , আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। সর্বত্রই ধর্মের ব্যহ্য আড়ম্বর দেখে এবং প্রকৃত আন্তরিকতা না পেয়ে মন বেশ ক্ষুন্ন হয়ে উঠে। তিনি আরবের মরুভুমি পার হয়ে মক্কা নগরী পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। নানক বিশুদ্ধ গুরুবাদী ছিলেন। তার মতে হিন্দু মুসলমান ভেদ নেই। তার পূত চরিত্র , সরল অমায়িক ব্যবহার এবং সৎ উপদেশে মুগ্ধ হয়ে তার শিষ্য অনেকে হলেন। ধর্মের বাহ্য আডম্বর ত্যাগ করে কায়মনবাক্যে ঈশ্বর সাধনা করতে তিনি সকলকে উপদেশ দেন। মানুষে মানুষে ভেদ তিনি মানতেন না - সকলের প্রতি সমান আচরণ করতেন তিনি। তাঁর শিক্ষা ছিল --

১) হিন্দুও নেই, মুসলমানও নেই, আছে কেবল মানুষ। এক ধর্মের প্রতি অপর ধর্মের ঘৃণা বা অসহিষ্ণুতাকে তিনি কোনদিন সমর্থন করতে পারেন নি।

২) পরপীডন করে, অপরকে শোষণ করে যে অর্থ বা খাদ্য সংগ্রহ কবা হয তা খাঁটি হতে পারেনা। মানুষ বড হয় তার নিষ্ঠাপূর্ণ শ্রমের বিনিময়ে।

৩) তাঁর মতে ভগবান এক - তাঁর আকৃতি নেই, তিনি সর্বত্র বিরাজিত। তাঁর মন্দিব হচ্ছে মানবের হৃদয়।

৪) তিনি সতীদাহ প্রথার নিন্দা করেন-- করেন বিধবাবিবাহকে উৎসাহিত। পুরুষের সাথে নারীর সমান অধিকার স্বীকার করেছেন তিনি।

৫) তাঁর মতে নামের মাধ্যমে ভগবানের সাথে একাত্ম হওয়া যায়। শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' শিখ, হিন্দু, মুসলিম সাধকের রচিত কিছু স্তোত্রের সংকলন।

৬) শিখ ধর্মে দৃঢভাবে জাতিভেদ প্রথা নিন্দনীয় হয়েছে। সকলের জন্য মন্দিরে প্রবেশাধিকার এবং পবিত্র শাস্ত্রপাঠের অধিকার দেওয়া হল নানকের প্রচেষ্টায়।

ভারতের নানা ভেদ বিভেদের মধ্যে যোগস্থাপন করে এক ঐক্যবদ্ধ ভারত এবং ভারতবাসী গডে তোলার প্রচেষ্টায় গুরু নানক ছিলেন এক অগ্রগণ্য পথিক।

শ্রীচৈতন্য ঃ- এই মহাজীবনের দিব্য প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। তিনি সর্বশ্রেণীর মানুষকে বিতরণ করেছিলেন কৃষ্ণপ্রেমামৃত স্বাদ। তাঁর মহাজীবনের অমর্ত্য জ্যোতি সর্বত্র বিচ্ছুরিত হয়ে মানুষের সুপ্তপ্রায় আত্মার

নবজাগরণ ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের সমাজজীবনে ছিল নানা অনাচার ব্যাভিচার-. হিন্দু সমাজ কৌলিন্য প্রথা এবং আরো অনেক সংস্কারের চাপে পড়েছিল পঙ্গু হয়ে - মানুষে মানুষে বিরাট ব্যবধান রচিত হয়েছিল। চৈতন্যপ্রভু সহজভক্তির পথে সর্বশ্রেণীর মানুষকে কাছে টেনে আনলেন। প্রচার করলেন- চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ । বলে উঠলেন ঃ

"চন্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।

বিপ্র নহে বিপ্র যদি অন্য পথে চলে।"

এই অভিনব মন্ত্র মাহাত্ম্যে বিচ্ছিন্ন ধ্বংসোন্মুখ মানবকে এক অবিচ্ছিন্ন আদর্শের সূত্রে বেঁধে দিতে পেরেছিলেন। চৈতন্যের নতুন ধর্মবাণী সমকালীন সামাজিক অসাম্যের বৈষম্যের শিকড় উৎপাটিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতের প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ধুয়ে মুছে গেছে তাঁর দিব্য জীবনের প্রভাবে। তাঁর বিনয়,দয়া,সৌজন্যবোধ প্রভৃতি যথার্থ শিক্ষা সঞ্চারিত হয়েছিল সমাজে। শ্রীচৈতন্য নিজের জীবনাদর্শের মধ্য দিয়েই যথার্থ মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর আপন সন্তান। তাঁর বৈষ্ণবধর্মের মানবতাবাদ সমগ্র দেশ ও জাতিকে সত্যকার মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত করতে পেরেছিল। তাইতো চৈতন্যোত্তর কবিরা বিশ্বপ্রেমের গান শুনিয়েছেন-- চন্ডীদাস মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখেন-- সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

বাসব : লিঙ্গায়েতরা দ্রাবিড় এবং শিবের উপাসক। বাসব লিঙ্গায়েতদের একজন ধর্মগুরু। তাঁর মতে মানুষমাত্রই পবিত্র-কেননা মানবদেহ মন্দিরে আত্মারূপী ভগবান বাস করেন। প্রত্যেকের সমান অধিকার। মনে হয় সে সময়ে সকলে সকলের সমান অধিকার স্বীকার করতেন না- আর সাধক বাসবের তাই প্রতিবাদ। কানাড়ী ভাষায় বাসবের নাম হচ্ছে ষাঁড । আবার এই ষাঁড় হচ্ছে শিবের বাহন। মাত্র ৮ বছরেই বাসব ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের বিরোধিতা করেন এবং নিজেকে শিবভক্ত বলে দাবী করেন, এবং সগর্বে প্রচার করেন জাতিভেদ ধ্বংস করার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তখন কল্যাণ রাজ্যে বিজন বাজা ছিলেন-- বাসব পরে এই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

তুকারাম : মারাঠী ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ মানুষ ভক্ত তুকারামকে ভগবদ্ভক্ত বলে ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে। মহীপতির 'তুকারামের জীবনচরিত' প্রামান্য পুস্তক। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ভক্তি ভয় ১৭৬২, ভক্তি লীলামৃত ১৭৭৪ সালে প্রণয়ন করেন। আজ পর্যন্ত তুকারামের যত লেখা সংগৃহীত হয়েছে তার সকল লেখাই তাঁর কিনা তাতে

সন্দেহ আছে। এক সময় ৮৮৪১টি কবিতা হস্তলিখিত পুঁথি মিলিয়ে ঠিক করা হয়। তুকারামের জীবনীতে অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে। তাঁকে অবতার বলে স্বীকার করা হয়েছে। তুকারাম প্রচারক বা সংস্কারক ছিলেননা। তিনি যথার্থ একজন একনিষ্ঠ সরল বিশ্বাসী ভক্ত ও সাধু। তিনি জাতিভেদ মানেন না-- সর্বধর্ম সমন্বয় মানেন। তুকারামের সম্বন্ধে এখনো ভাল গ্রন্থ পাওয়া সম্ভব হয়নি । তবুও জে.এন্. ফ্রেদার, কে. বি . মারাঠী :শতেরও উপর অভঙ্গের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। অশেষ দুঃখে কষ্টে সংগ্রামী জীবন কাটিয়েছেন তবুও নিজের কথা বিশেষ কিছুই বলেন নি। শুধু নিজের পাপের কথার স্বীকারোক্তি আছে- আর আছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা-- ভক্তিতে দয়া, ক্ষমা, শান্তি পাওয়া চাই- যেখানে তা আছে সেখানেই ভগবান। সর্বধর্ম সমন্বয়ের সুর তিনি এভাবেই খুঁজে পেয়েছিলেন সুদূর অতীত ভারতে। হিন্দু ও মুসলিম দুই আলাদা ধর্ম সংস্কৃতির মধ্যে মেল বন্ধন ঘটিয়েছিলেন তিনি আপন প্রতিভায়।

দাদু ঃ- রাজপুতানাতে ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দাদু জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দাদুর ভক্ত রয়েছে। ভারতের জনগণকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন--

সব ঘট একে আত্মা ক্যা হিন্দু মুসলমান। সব ঘটে একই আত্মা -- হিন্দু মুসলমান আবার কিসের !

অলহ রাম ছুটা ভ্রম মেরা
হিন্দু তুরক ভেদ কুছ নাহি।
আল্লা রামের ভ্রম আমার ছুটেছে , হিন্দু তুরুক কোন ভেদই নেই ।
কৈ পথ রহিত পংখ নহি পুরা
--সাম্প্রদায়িক ভেদরহিত যে পথ তাই হল পূর্ণ পথ ।
হিন্দু মারগ কহৈঃ হমারা তুরক কহৈ রাস্ত্ মেরী ।

-- হিন্দু বলে আমার পথই পথ; মুসলমান বলে আমার পথই সাচ্চা দাদু বলেন - ব্রহ্মকে এমন করে খণ্ড খণ্ড করে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নিয়েছে ভাগ করে, পূর্ণ ব্রহ্মকে ছেড়ে সবাই বদ্ধ হল ভ্রমের পাঠে। দাদুর মতে দুইই ভ্রম । হিন্দু মুসলমান এইসব ভেদবুদ্ধি গ্রাম্যতা।

কবীরের ছয়পুরুষ পরে ভক্ত দাদু এইসব কথা আরো সোজা ভাষায় বলে গেলেন -- আল্লরাম সব ভ্রমই এখন আমার ছুটেছে। হিন্দু মুসলমানে নেই কোনো ভেদ, সর্বত্র এখন তোমার লীলাই দেখি। সেই একই প্রাণ, সেই একই দেহ, সেই একই রক্তমাংস, সেই একই নয়ন, নাসিকা, সেই কানে একই রকম শব্দ বাজে।

আলাওল :- বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে

প্রচারিত নাম সৈয়দ আলাওল। আরাকান রাজসভার প্রধান কবিই শুধু নন তিনি এক শ্রদ্ধেয় কবি ব্যক্তিত্ব। ১৫৯৭ থেকে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে কোন এক সময়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৬৭৩ থেকে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পরলোক গমন করেন।
বিভিন্ন শাস্ত্র ও সাহিত্যে আলাওলের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। ইসলাম ধর্মের গভীর বোধ তাঁর ছিল, হিন্দুধর্ম ও তাঁর কাছে ছিল মহৎ। বৈষ্ণব ধর্ম তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। আলাওলের কাব্য সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি সৃষ্টি করে বলেই তিনি সে যুগে বিশেষভাবে সমাদৃত হন। তাই তাঁর রচনার মাঝে হিন্দু মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্মিলিত এক ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়।
কবি আরবী, ফারসী, ভাল জানতেন- অধিকন্তু জানতেন হিন্দুদের পুরাণ কথা ও অলংকার শাস্ত্র।

রাজা রামমোহন রায় :- রামমোহনের জীবনী রচয়িত্রী সোফিয়া ডবসন কালেট বলেছেন "ইতিহাসের পথে রামমোহন এক জীবন্ত সেতু বা অবলম্বন করে ভারতবর্ষ তার সুদুর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। প্রাচীন বর্ণাশ্রম ও আধুনিক মানবতা, কুসংস্কার ও বিজ্ঞান,স্বৈরাচারী শাসন ও গণতন্ত্র, অনড রীতি ও ধীর অগ্রগতি, একেশ্বরবাদ ও বহু দেবতাদের দূরবিস্তৃত পার্থক্যকে সঙ্কীর্ণ করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। নিঃসঙ্গ দঃখবরণের পথে দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের বহু বিরোধী ধারা ও অনিবার্য জ্ঞানদীপ্তি নিজের সত্তার সমন্বিত করে তিনি তার দেশবাসীর প্রতিভূ হয়েছিলেন। বহু জাতি, বহু মতাদর্শ ও বহু সভ্যতার মিলনে যে নতুনশক্তির উদ্ভব, তিনি ছিলেন তারই প্রতীক।"

বাল্যকাল থেকেই রামমোহনের অসাধারণ স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা, আর্তের প্রতি সহানুভূতি এবং আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া বক্তৃতা শক্তি বহু ভাষা জ্ঞান ও তাঁর ছিল।

রামমোহনের সময়ে সমাজে একদিকে সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, কৌলীন্য নামক সামাজিক নিষ্ঠুর প্রথা, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল । আবার অন্যদিকে উৎকট জাতিভেদ ধর্মের নামে ভণ্ডামি আর আচার সর্বস্বতা- অশিক্ষা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত বাঙালী জীবন -- রাজা রামমোহন এই ঘোর অন্ধকারে উষার অরুনোদয়ের মত আবির্ভাব হলেন।

আধুনিক ভারতবর্ষে সমাজসংস্কারক রূপেই তিনি সবচেয়ে বেশি স্মরণীয়। নারী সমাজের প্রতি অসীম সহানুভূতিতেই তিনি 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠিত করে তা থেকে পুস্তিকা বের করে তৎকালীন সমাজের বর্ব্বরতম সতীদাহ প্রথাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ

করেন। অন্তঃপুরে নারী নির্যাতন,সমাজে রাষ্ট্রে নারীর অধিকার লোপের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। স্বজাতি,স্বধর্ম ও স্বদেশের কল্যাণে তাঁর কর্মপ্রয়াস বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে আধুনিকতার সূচনা করেছিল । তবে রামমোহন শুধু আধুনিক ভারতের রূপকারই ছিলেন না তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদার ছিল । তিনিই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন- কবির ভাষায় --

জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানুষজাতি ।

মহাত্মা লালনফকির ঃ- বাংলাদেশে সর্বাগ্রগণ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ বাউল কবি লালনশাহ ফকির বা লালন সাঁই। লালন কথার অর্থ প্রিয়পুত্র । বাউল সূফী সম্প্রদায়ের তিনি পূর্বসূরী। লালনের জীবন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত- সবই জনশ্রুতি। অনুমিত হয় ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়ায় তিনি আবির্ভূত হন। লালন দীর্ঘায়ু ছিলেন । মৃত্যু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে । ১১৬ বছর বেঁচেছিলেন। লালন প্রথাগত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন বলে মনে হয় না । তিনি ছিলেন জাতপাতের বাইরে। বিশ্বকবির আশ্চর্য্য আবিস্কার কবি বাউল লালন ফকির। তিনিই প্রথম বাউল লালনের গান সম্পর্কে কৌতূহলী হন। তিনি লালনের ২০টি গান সংগ্রহ করে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। গানের মিষ্টিক ভাব কবিকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর উদার, অসাম্প্রদায়িক সহজিয়া মরমী গীতিগুলি বাংলাসাহিত্যের দুর্লভ সংগ্রহ।

'সমঝে সব সাধন করো
নিকটে ধন পেতে পারো
লালন কয় নিজ মোকাম ঢোঁড
সাঁই বহু দূরে নাই।'

এ গান বিবাগী বৈরাগী বাউলের গান।

লালনের যে গুণটি সবচাইতে বেশী করে আকর্ষণ করে তা হচ্ছে তাঁব সম্প্রদায়িকতাহীন জাতিভেদ-বিরোধী মনোভাবটি-

ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে তাঁর কাছে
জাতের বিচার নাই।

লালনের গানে রয়েছে এক সার্বজনীন ধর্মীয় উদারতার আদর্শ-- যে আদর্শ দ্বারা তিনি ভারতের আপামর জনসাধারণকে হৃদয়ের কাছাকাছি আনতে প্রয়াস পেয়েছিলেন-- এ বিষয়ে লালনের একটি গান অবিস্মরণীয়--

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম তা এ নজরে

কেউ মালা কেউ তছবি গলায়
তাইতেরে জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়ার কিংবা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কার রে।

রামমোহনের প্রভাব বর্তেছে মূলতঃ উচ্চকোটি ও মধ্যবিত্ত সমাজের ওপর। আর লালনের প্রভাব পড়েছে গ্রামে গাঁথা বাংলাদেশের আপামর জনগণের মধ্যে। প্রতিটি মানুষের কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে তাঁর গানঃ-

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সেকি আর জপে মালা
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা
কাছে রয়, ডাকে তারে
উচ্চস্বরে কোন পাগেলা।

অন্নদাশংকর রায় বলেছেন--
বাংলার নব জাগরণে রামমোহনের যে গুরুত্ব, বাংলার লোকমানসের দেওয়ালী উৎসবে লালনেরও সেই গুরুত্ব ।

রামকৃষ্ণ ঃ- পৃথিবীতে যিনি প্রচলিত সব ধর্মমতের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছে তার একক উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর বিচিত্র সাধনালব্ধ নিগূঢ় অনুভূতির সার নির্যাস হচ্ছে 'যত মত তত পথ' -- বিশ্বের ধর্ম ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি তাঁর উপলব্ধিগত মহানুভূতি দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করলেন অশ্রুতপূর্ব মহা সমন্বয়ের দুর্লভ আদর্শ। তিনি ঘোষণা দিলেন - যে 'যেভাবেই তাঁকে ডাকুক না কেন আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলে তিনি দেখা দেবেনই দেবেন'। আমার ধর্মটাই ভালো, আর সব খারাপ, এরকম মত আর বুদ্ধি কোরো না ।''সব নদীই শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়ে মিশবে'' ইত্যাদি কত অমৃতময়ী বাণী, যা বিধৃত হয়ে আছে 'কথামৃতের' পাতায় পাতায় । ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে এর জনপ্রিয়তা অতি উচ্চে।

দুটি ছোট বাণী - যার মাধ্যমে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বেও আলোড়ন তুলে ছিলেন তিনি তা হল -'খালি পেটে ধর্ম হয় না' ও জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবে সেবা' । পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র,পাপী-পূণ্যবান -- নানা জায়গা থেকে অগনিত মানুষের স্রোতধারা সাধকের দিকে -- সবাই চরণে আশ্রয় পেয়ে ধন্য হল -- বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে -- যার লক্ষ্য হল জগতের হিত সাধনের মাধ্যমে নিজের মুক্তি সাধন। ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রামকৃষ্ণ তথা বিবেকানন্দের ভাবধারায় অগনিত মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দের অবিস্মরনীয় উক্তি-

"তিনি নারীজাতির উদ্ধারকর্তা, ইতর সাধারণের উদ্ধারকর্তা, উচ্চ-নীচ সকলের উদ্ধারকর্তা,ভক্তি করে যে তাঁর পূজা করবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে "।

বিবেকানন্দ ঃ- স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ভারতে নবযুগের সূচনা করেছে। এক জাতিভেদহীন বলিষ্ঠ ভারত গঠন করাই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। সমগ্র ভারতবর্ষকে সেবাধর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে এবং অস্পৃশ্যতাবোধ নিশ্চিহ্ন করে ও দেশপ্রমের আদর্শ দ্বারা ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করে, সর্বোপবি জাতীয় সংহতি পূর্ণ মাত্রায় বজায় বেখে এক নূতন ভারত গঠনে তিনি সংগ্রাম করেছেন। তিনি পরিব্রাজক হিসেবে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে ভারতের প্রকৃত মর্মবাণী উপলব্ধি করেছেন । তিনি বুঝলেন, মানুষের মধ্যে ঈশ্বব আছেন, এবং মানুষের সেবা দ্বারাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করা যায়।

মূলত বিবেকানন্দ ছিলেন সমাজসংস্কারক এবং স্বদেশপ্রেমিক। ভারতে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম স্মরণীয়। তাঁর দেশপ্রেমের বাণী -- "সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী ,দরিদ্র ভারতবাসী , ব্রাহ্মণ ভারতবাসী , চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। বল ভাই, ভাবতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ,ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" তাঁর আশা ছিল -- সমগ্র ভারতকে "মহামানবের তীর্থক্ষেত্রে" পরিণত করা। "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্ নিবোধত "-- এই বাণী বিবেকানন্দ তাঁর জীবন ও কর্মে বহন করে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঃ-এক সময় রবীন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়কে 'ভারতপথিক' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন -- কিন্তু আজ বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্য রবীন্দ্র সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে -- চিরন্তন ভারত সংস্কৃতি যুগে যুগে বিবর্তিত হয়ে। কবি চিরন্তন ভারতে মহাপথের শ্রেষ্ঠ যাত্রী । তিনি নিজেও ছিলেন "ভারত আত্মার বাণী মূর্তি"।

কবির উক্তি-"যথার্থ পুরাতন ভারত, যে ভারত চির নূতন -- যে ভারতের বাণী আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি -- তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি। আমার চিত্ত মহা ভারতের অধিবাসী =- এই মহাভাবতের ভৌগোলিক সীমানা কোথাও নেই"।

ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানা জাতি ও নানা শক্তির সমাগম হয়েছে তাদের সকলের সম্মিলিত ঐক্যের মধ্যেই ভারত ইতিহাসের নবতর ও উজ্জ্বলতর উদবোধন ঘটবে। সেই প্রদীপ্ত প্রভাতের আশাতেই কবি বিশ্বের সমস্ত জাতিকে ভারতবর্ষের মহামানবের মিলনতীর্থে আহ্বান করেছেন।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান।

বিশ্বের তথা ভারতবর্ষের এক যুগ সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। আমাদের দেশের অজস্র সমস্যার দিনে কবি জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে এসে হাজির হলেন। কবিকে নানা সময়ে নানা দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল -- অবশেষে ভারতভর্ষের সার্থকতা লাভের পথকে 'ভারত পথ' নামেই তিনি অভিহিত করেছেন। এ পথের পরিচয় আছে-'গোরা' উপন্যাসে, পূর্ব ও পশ্চিম প্রবন্ধটিতে, 'ভারততীর্থ' নামে বিখ্যাত কবিতাটিতে।

কবি বলেছেন -- "বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই আমরা আছি । মহা ভারতবর্ষ গঠনের এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে । একদিন যে ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ "।

গোরায় আছে,"আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমাব জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন"।

রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁর লক্ষ্য-

পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ভারতবর্ষের মধ্যে মিলিত করে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়া।

তাই শিক্ষা-গুরু রবীন্দ্রনাথ 'দেশহিত' প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন --
আমাদের সকল অমঙ্গলের মূল কোথায় ? যেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন। অতএব আমাদের দেশে বহুকে এক করিয়া তোলাই 'দেশহিতের সাধনা'।

আধুনিক কালে যাঁরা মরমীয়া সাধকের বাণীকে নিজস্ব করে নতূন করে ব্যাখ্যা করেন তাঁরা প্রচলিত অর্থে হয়ত মরমীয়া সাধক নন। কারণ তাঁদের ক্ষেত্র ছিল আলাদা ও স্বকীয় যাতে হয়ত ধর্মসাধনাটা মুখ্য স্থান অধিকার করেনি- সেখানে প্রত্যক্ষ হয়েছে জীবনের বৃহত্তর জীবনসাধনা। সেখানে কত সঙ্কল্প, কত টানা পোড়েন,কত দরবার, কত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড। কিন্তু সেখানেও লক্ষ্যণীয় ভারতীয় মরমীয়া সাধকের অন্তঃচেতনাকেই তাঁরা জীবনের মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করেছেন। ফলে বলা যায় এঁদের মধ্যেই ঘটেছে মরমীয়া সাধকদের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার স্বাভাবিক কাল ও জীবনোপযোগী পরিণতি।

----- ০ -----

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়, সমাজ জীবনে তার প্রভাব

ডাঃ প্রদীপ আচার্য

পাশ্চাত্যের সমাজ বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের মতের সঙ্গে ভারতের মুনি ঋষিদের ধ্যান ধারণার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে যা ধারণ বা পালন করা হয় সাধারণ অর্থে তাহাই ধর্ম। ভারতীয় মুনি ঋষিদের মতে বিশেষ করে বৈবশ্বত মনু ধর্মের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো - যা সত্য, শাশ্বত, তাই ধর্ম। এর বিপরীত কর্মকেই ভারতীয় মুনি ঋষিগণ অধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। কালের প্রভাবে ধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে ধর্মের বিচার করা শুরু হয়েছে এবং ভারতীয় সমাজ জীবনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মের এবং অধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত সহ বিভিন্ন পুরাণে ২৮তম ব্যাসদেব কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ধর্ম ও অধর্মের সৃষ্টি থেকে শুরু করে জগৎ এবং প্রাণী সৃষ্টির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ধর্ম এবং ধর্মীয় মতবাদ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। বৈদিক যুগে প্রত্যেক রাজাই মুনি কিংবা ঋষিকে ধর্মীয় উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করে বৈদিক অনুশাসন অনুসারে প্রজা পালন এবং রাজ্য শাসন করতেন। বৈদিক যুগে যে সকল মানুষ বৈদিক বিধানকে অমান্য করতেন তাদের অনার্য কিংবা অসুর নামে অভিহিত করা হতো। আর যারা বেদের বিধান মানতেন তারাই আর্য নামে পরিচিত ছিলেন।

ম্যাক্স মুলার বেদ মহাগ্রন্থের অনুবাদ করিয়েছিলেন। বেদ মহাগ্রন্থেব অনুবাদ করাব পাশাপাশি তিনি বৈদিক ধর্মাবলম্বীদের ভারত আক্রমণকারী হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতবাদকে তিনি পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন আলোচনা সভায় খন্ডন করেছেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে আর্য কোন জাতি নয়। আর্য শব্দটি উপাধি হিসেবে ব্যবহার কবা হতো। আঠার পুবাণ এবং আঠারো উপপুরাণে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

বৈদিক ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং সনাতন ধর্ম এক বিষয়েরই তিনটি নাম। প্রজাপতি ব্রহ্মা দৈববাণী শুনে একটি ঋক্ রচনা করেছিলেন। সেই ঋক ব্রহ্মা দিয়েছিলেন সূর্যকে। সূর্য থেকে সেই ঋক্ প্রাপ্ত হয়েছিলেন ভৃগুপুত্র দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য। তিনি সেই ঋক্‌কে অবলম্বন কবে তা বিস্তৃত আকারে জগতে প্রচার করেন। জগতে তিনি হলেন প্রথম ব্যাসদেব। শুক্রাচার্যের স্তবে বলা হযেছে - সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং, প্রণম্যাহং। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন কবিদের মধ্যে তিনি উষণা কবি। অর্থাৎ ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য।

আধুনিক যুগের ভারতীয় দার্শনিকগণ বৈদিক ধর্ম তথা হিন্দু ধর্মকে প্রাচীন বট গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রাচীন বট গাছের যেমন শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হয় তেমনি কালেব প্রবাহে বৈদিক ধর্মের মূলস্রোত থেকে বেরিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের। ঐসব ধর্মকে সমাজ বিজ্ঞানীগণ ধর্ম না বলে মতবাদ বলে অভিহিত করেছেন। বৈদিক যুগে বিভিন্ন মুনি ঋষিগণ তাদের লব্ধজ্ঞান

অনুসারে যে দর্শন রচনা করেছেন তা সংহিতা নামে পরিচিত। বৈদিক যুগে ২০৬টি সংহিতা ছিলো। উপনিষদ ছিল ১২৬টি। কালক্রমে বিশেষ করে বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট, ইসলাম, শিখ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের আর্বিভাবের এবং প্রভাবের ফলে মুনি ঋষিদের অধিকাংশ রচনা এবং গ্রন্থ বিনষ্ট হয়ে গেছে কিংবা ধ্বংস করা হয়েছে।

বৈদিক ধর্ম ত্রিশটি মহৎ গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী কালে যেসব ধর্মীয় মতবাদের আর্বিভাব ঘটেছে তাদের দর্শনেও ঐ ত্রিশ মহৎ গুণের অন্তর্ভুক্ত গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে ধর্মের সাধারণ ব্যাখ্যা হিসেবে যা আচরণ ও অনুসরণ করা হয় তাকেই যদি ধর্ম নামে অভিহিত করা হয় তা হলে বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা এবং দার্শনিকদের মতবাদ তথা দর্শন অনুসরণ করে চলেছে সেগুলিও ধর্ম পদবাচ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু, তা কখনো হতে পারে না।

ভগবান গৌতম বুদ্ধ আবির্ভুত হয়েছিলেন শাক্য বংশে। শাক্য বংশ সূর্য বংশীয়দেরই একটি উপশাখা। তিনি গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন বৈদিক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে। তার অনুগামীগণ সনাতন ধর্মের চিরন্তন ধারা থেকে সরে এসে সহস্র ধারায় পরিবর্তে একটি ধারা অনুসরণ করে জ্ঞান তথা বুদ্ধত্ব লাভের মতবাদ প্রবর্তন করেন। নিরাকার উপাসনা ভারত সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করায় মন্দির বিগ্রহ শূন্য হতে থাকে। ভারতের বিখ্যাত মন্দিরগুলো বিগ্রহ শূণ্য হয়। সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করে। মন্দির মঠে পরিবর্তিত হয়।

মহারাজ কণিস্কের সময় থেকে শুরু হয় নিরাকার উপাসনার পাশাপাশি সাকার উপাসনা। বৌদ্ধদেবের বিগ্রহ তৈরী হতে থাকে। বৌদ্ধগণ দুটো মতবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হীনযান ও মহাযান নামে ঐ দুই মতবাদ পরিচিতি লাভ করে। অষ্টম শতক থেকে ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং প্রসার শুরু হয়। গান্ধার রাজ্য এক সময় সনাতন ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত ছিলো। গান্ধার রাজ্যের অন্তর্গত হিন্দু কুশ পর্বতমালার এক গুহাতে বসেই ব্যাসদেব আঠার পুরাণ এবং আঠার উপপুরাণের অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন। হিন্দুকুশ পর্বতমালায় ঐ সব গ্রন্থ এবং বেদ বিন্যাস করা হয়েছিলো বলে সেই ধর্ম বা মতবাদকে বৈদিক ধর্ম তথা হিন্দু ধর্ম নামে অভিহিত করা হয়। এক সময় সারা বিশ্বব্যাপী যে সনাতন ধর্ম প্রচলিত ছিলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে তা জানা যায়। মক্কার মক্কেশ্বরের মন্দির কাবা মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। মক্কেশ্বর শিবলিঙ্গ খন্ডিত অবস্থায় সেই মসজিদের অন্দরে বিরাজমান।

অষ্টম শতকে মুসলমানদের দ্বারা গান্ধার রাজ্য অধিকৃত হয়। পরবর্তী কালে ধাপে ধাপে ভারতে ইসলামের প্রসার হতে থাকে।

একাদশ শতকে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরী পৃথ্বিরাজকে পরাজিত এবং নিহত করে দিল্লী দখলের পর থেকে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন তরান্বিত হয়। ইসলামিক যুগে হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ মঠ, হিন্দু ও বুদ্ধ বিগ্রহ ধ্বংসের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। মুঘল শাসনকালে ভারতে প্রথম খ্রীষ্টান বণিকদের আগমন ঘটে। ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লার

পরাজয় এবং নিহত হবার পর বাংলায় বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হয়। ভারতে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রসার লাভ করতে থাকে।

মুসলমান শাসকগণ ইসলাম ধর্ম প্রচারে তলোয়ারের সাহায্য নিয়েছিলেন। ইংরেজ বণিকরা ধর্ম প্রচারে কৌশলগত ব্যবস্থার সঙ্গে তলোয়ারের সাহায্যও নিয়েছিলেন। তারা ধর্ম প্রচারে সেবা এবং শিক্ষাকে সামনে রেখে ধর্মান্তরিত করার কাজ শুরু করে। নোবেল জয়ী মাদার টেরেসাও খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন সেবা এবং শিক্ষাকে সামনে রেখেই। তিনি তার ঐ মহান কাজ শুরু করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মতিঝিল এলাকা থেকে। পঁচিশ ঘর হিন্দুকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করে সেখানে একটি সামাজিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মাদার টেরেসা সেবা ও শিক্ষা প্রসারে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রায় ষাট হাজার হিন্দু খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন।

পূর্বাঞ্চলে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসার সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। ১৯০১ সালের জনগণনা অনুসারে পূর্বাঞ্চলে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে পূর্বাঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যার হার কমেছে। সরকারী তথ্য অনুসারে ১৯৫১ সালে সিকিমে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল প্রায় দু হাজার। ২০০১ সালের জনগণনায় তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৬ হাজারে। মেঘালয়ে ১৯৫১ সালে ছিল প্রায় দু লাখ খ্রীষ্টান। ২০০১ সালে হয়েছে প্রায় ১৬ লাখ। নাগাল্যান্ডে ১৯৫১ সালে ছিল প্রায় তিন লাখ আর ২০০১ সালে খ্রীষ্টানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় আঠার লাখ। মনিপুরে ১৯৫১ সালে ছিল প্রায় এক লাখ খ্রীষ্টান আর ২০০১ সালে হয়েছে প্রায় নয় লাখ। ত্রিপুরায় ১৯৫১ সালে খ্রীষ্টানের সংখ্যা ছিল ১০৩৪ জন আর ২০০১ সালে হয়েছে ১,০২,৪৮৯ জন।

১৯৮১সালের ধর্মভিত্তিক জনগণনায় ত্রিপুরায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৮৯.৩৪ শতাংশ। মুসলমানের সংখ্যা ৬.৭৫ শতাংশ। মুসলমাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েচে ৮.০ শতাংশ আর খ্রীষ্টানদেব সংখ্যা ১.২১ শতাংশ। গত কুড়ি বছরে ত্রিপুরায় হিন্দুর জনসংখ্যা ৮৯.৩৪ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৮৫.৬ শতাংশ আর খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.২ শতাংশ। সারা ভারতেও হিন্দুর সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাংশ কমেছে। মুসলমান এবং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেড়েছে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই হ্রাস বৃদ্ধির ফলে পূর্বাঞ্চলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়েছে। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হচ্ছে অনুপ্রবেশ। পূর্বাঞ্চলে প্রায় দু কোটি মুসলমান অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে দু-তিনটি রাজনৈতিক দলের সহায়তায় অবৈধভাবে নাগরিক এবং ভোটার হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। আর খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হচ্ছে ধর্মান্তরকরণ। পূর্ব ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠিকে ব্যাপক হারে ধমান্তরিত করার ফলে তাদের চিরাচরিত ধর্ম ও কৃষি সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটতে চলেছে।

সৃষ্টির শুরু থেকেই সনাতন ধর্ম তথা বৈদিক ধর্মের আবির্ভাব ঘটে ছিল। এ জন্য সনাতন

ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম তথা হিন্দু ধর্মের মুল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র জীবের কল্যাণ। পক্ষান্তরে পরবর্তীকালে সনাতন ধর্ম ছেড়ে যেসব নূতন ধর্মের সূত্রপাত হয়েছে সে সব ধর্মের ধর্মগুরুগণ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় তাতে সমগ্র জীবের কল্যাণের সুর ধ্বনিত হয় নি। ঐ সব ধর্মীয় মতবাদকে নিজ নিজ সাম্প্রদায়ের লোক বা অনুগামীরা শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করে সনাতন ধর্মের উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে ঐ সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধিতে তৎপর রয়েছে।

মাদার টেরেসা সেবা ও শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে হিন্দুদের খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ নীতি অন্যান্য খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ অনুসরণ করেন নি। পূবাঞ্চলে উগ্রপন্থার পেছনে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং বেসরকারী সংস্থা মিশনারীদের প্রতি অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছেন। মিশনারীগণ এবং খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারকগণ ঐ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবু কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। বিশেষ করে ত্রিপুরায় উপজাতি এলাকার কথাই যদি ধরা যায় তা হলে দেখা যাবে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য সরকারী শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীগণ যেতে পারছেন না। উন্নয়নমূলক কাজ উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শতাধিক সরকারী স্কুল উগ্রপন্থার কারণে বন্ধ হয়ে আছে। অথচ মিশনারী স্কুল বিনা বাধায় চলতে পারছে।

প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখতে ত্রিপুরা সরকারকে বেসরকারী মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে সাহায্যের হাত বাড়াতে হয়েছে। মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের আধিকাংশই খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। সরকারী খরচে উপজাতি ছাত্র -ছাত্রীদের পড়াশুনা, পোযাক পরিচ্ছদ এবং থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো ঐ সব মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল ধর্মের ও বর্ণের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরিচালন কর্তৃপক্ষ সমদৃষ্টি পোষণ করছে না বলে অভিভাবকগণ অভিযোগ করছেন। খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণকারীদের প্রতি সহানুভূতির মাত্রা অধিক থাকায় অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত চিন্তা করে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হচ্ছেন। সরকারী প্রতিষ্ঠান যেখানে উগ্রপন্থীদের হামলার ভয়ে চলতে পারছে না সেখানে মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জাঁকজমকের সঙ্গেই চলতে পারার পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে তার উত্তর কিন্তু মিশনারী কর্তৃপক্ষগণ দিতে পারছে না। সরকারও সে রহস্য জানার চেষ্টা করছে না।)

১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল ও ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়ের পর থেকে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। ঐ সব অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে বিদেশী শক্তির বন্ধুত্ব থাকায় ভারতে শান্তি, শৃংখলার অবনতি ঘটেছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের একটা অংশ ভারতের ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং সমাজ জীবনের উপর আঘাত করতে শুরু করেছে। এর পেছনে রয়েছে এক শ্রেণীর তথাকথিত রাজনৈতিক নেতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট রাত বারোটার আগে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতের

অঙ্গচ্ছেদ করে তৈরী করা হয়েছিল পাকিস্তান নামক একটি নূতন রাষ্ট্রের। প্রায় চার কোটি মানুষ দেশ বিভাগের বলি হয়েছিলেন। হত্যা করা হয়েছিলো প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষকে। ভারতের নেতারা ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে ঘোষণা করলেও ভারতের মৌলিক অধিকারের সুফল একশ্রেণীর নাগরিকগণ ভোগ করেতে পারছেন না। সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং মুসলমানদের জন্য ইসলামিক দেওয়ানী তথা শরিয়তি আইন প্রণয়ন করে সকলের জন্য সমান অধিকার নামক মৌলিক ধারাটিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

ভারতে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ভারতে যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে লড়াই করেছে তাদের মধ্যে একদলীয় শাসনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলও রয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীগণ সমাজে দু ধরনের সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। ঐ দুই সম্প্রদায় হলো ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায়। ভারতীয় মুনি ঋষিগণ সনাতন ধর্ম তথা হিন্দু ধর্মকে সম্প্রদায়িক বলেন নি। কারণ সনাতন ধর্ম শুধু মানব সমাজের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি হয় নি। সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র প্রাণী জগতের কল্যাণের জন্য। সে জন্য সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে "যত্র জীব, তত্র শিব" অর্থাৎ জীব অমৃতের সন্তান। ভগবানের অংশ। অন্যান্য ধর্ম প্রচারকগণ তাদের সম্প্রদায়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের প্রচারিত ধর্ম প্রচার এবং প্রসারের জন্য বিধর্মীদের হত্যা করার কথা বলেছেন। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে যেসব ধর্ম সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের কথা বলেনি সে সব ধর্মমতকে সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করা যেতে পারে। সনাতন ধর্ম সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে।

সনাতন ধর্মে মানুষকে অমৃতের সন্তান বলা হলেও আটশো বছরের মুসলিম শাসন কালে মুসলমান শাসকদের আজ্ঞাবহ হয়ে পুরোহিত সমাজের একটি অংশ সনাতন ধর্মে বিভেদ নীতি চালু করেছিল। এক শ্রেণীর মানুষকে অচ্ছুৎ বানিয়ে তাদের জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিম্ন বর্ণের মানুষের অংশ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করেছিল। মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে যারা ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন সে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের অপমানজনক কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। যেমন চৌহান, ধানুক এরা দিল্লীর সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর বিশ্বাসঘাতকতায় পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত হবার পর তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তার সৈন্যদলের সকলকেই মুসলমান সেনাবাহিনীর দাস হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ঐ সব বীর যোদ্ধাদের একটা অংশকে হত্যা করা হয় এবং বাকী অংশকে মুসলমানদের মল পরিস্কার সহ বিভিন্ন অপমানজনক কাজে বলপূর্বব নিযুক্ত করা হয়। ঐসব সম্প্রদায়কে যাতে মন্দিরে ঢুকতে না দেওয়া হয় তার নির্দেশও হয়তো মন্দিরের পুরোহিতদের দেওয়া হয়েছিলো। মুসলমান শাসকেরা এভাবেই ভারতের বৈদিক সভ্যতাকে বিনষ্ট করে হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল যার রেশ এখনো বর্তমান।

ভারতে রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে গান্ধীবাদী সম্প্রদায়, মার্কসবাদী সম্প্রদায়, লেনিনবাদী সম্প্রদায়, মাওবাদী সম্প্রদায় সহ আরো প্রায় চল্লিশটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় নির্বাচনে

অংশ গ্রহণ করছে। ঐসব রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলো নিজ দলীয় মত এবং আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে সব রকমের কৌশল এবং কোথাও কোথাও বলপ্রয়োগ এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিরুদ্ধ মতবাদীদের নিজেদের মতবাদে আসতে বাধ্য করছে।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চেয়েও রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলো সমাজের পক্ষে বেশী মাত্রায় ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচনের পরে যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস শুরু হয় গত ত্রিশ বছরে তার ফলে কয়েক হাজার নিরীহ ভারতবাসীর মৃত্যু হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। যে সব দল ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছে সে সব দলই নির্বাচনী সন্ত্রাস বেশী করে সংঘটিত করে বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ এবং সাধারণ ভোটারের ভোট দানে-বাধার সৃষ্টি করছে।

কোন কোন রাজনৈতিক সম্প্রদায় তথা দল শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে ঐ দলের মতবাদ ঢুকানোর চেষ্টা চালানোর ফলে ভারতের মতো বিভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে ঐক্যের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। যার ফলে পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ রাজ্যে এবং জম্মু ও কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রচন্ডভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কোন কোন রাজ্যের কোন কোন এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সমান্তরাল প্রশাসন কায়েম করেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো প্রভাবশালী হওয়ায় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়ায় জনপ্রতিনিধিদের সকলকেই এমন নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যে চলাফেরা করতে হচ্ছে।

ভারতের স্বাধীনতালাভের উনষাট বছর পর প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দিতে হচ্ছে নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারসমুহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্বাধীনভাবে ভারতের সর্বত্র চলাফেরা করার অধিকার। ভারতের সর্বত্র বসবাস করার অধিকার। যার যার ধর্ম প্রকাশের অধিকার। পরিহাসের বিষয় হলো রাজনৈতিক সম্প্রদায় বা মতবাদীদের একাংশের বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্য ভারতের একজন নাগরিক এখন স্বাধীনভাবে ভারতের সর্বত্র চলাফেরা করতে পারছেন না। স্বাধীনভাবে ভারতের সর্বত্র বসবাস করতে পারছেন না।

রাজনৈতিক সম্প্রদায় বা মতবাদীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের মতবাদ ঢুকানোর চেষ্টা চালানোর ফলে বিশেষ করে দু-তিনটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের মতবাদ কিশোর কিশোরীদের মধ্যে প্রচার করার ফলে ভারতের আগামী দিনের নাগরিকদের একটা বড় অংশই বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে বড় হবে। ভারতের পক্ষে সেটা বিরাট ক্ষতির কারণ হবে।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে প্রচারিত সংবাদ অনুযায়ী মৌলবাদী মুসলিম নেতারা সারা বিশ্বের প্রায় বিশ কোটি ছাত্র-ছাত্রীকে মাদ্রাসায় মৌলবাদী শিক্ষার পাশাপাশি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের খতম করার নীতি শিক্ষা দিচ্ছে। কোরাণের কয়েকটি সুরায় পৌত্তলিক ও কাফেরদের হত্যা

করলে বেহেস্তে গিয়ে হত্যাকারী তথা জেহাদী মুসলমান বাহাত্তর জন সুন্দরীর সেবা লাভের সৌভাগ্য লাভ কররার কথা উল্লেখিত হয়েছে। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান যদি কোরাণের সব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করেন তা হলে তাকেও পৌত্তলিক ও কাফেদের রক্তে হাত রাঙ্গাতে হবে যা মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে কলংকজনক ঘটনা বলেই অভিহিত হবে।

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসা ও ধ্বংসের কথা উল্লেখ থাকায় মানব সভ্যতার বিকাশে এক ভয়ংকর প্রাচীর সৃষ্টি করে রেখেছে।

বৈদিক ধর্মে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের এবং সকল জীবের মধ্যেই যে ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে তার যে বিরাট দর্শন বেদ, উপনিষদ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত ও গীতা গ্রন্থের শ্লোক এবং ঋক্‌(মন্ত্র) সমুহে বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৃটিশ শিক্ষাবিদ এবং পন্ডিত উইলিমামস্ মনিয়র, উইলসন হোরেস হেম্যান, আর্থার বেরিডল ,জামনীর ডয়সেন, আটোফন, বৃটেনের আর্থার এ্যান্টনি, জার্মানির রুডলফ্, চার্লস রকওয়েল, মার্টিন, হুইটনি বেদ, উপনিষদ বিভিন্ন পুরাণ অধ্যয়ন করে পান্ডিত্য লাভ করেছেন এবং বিশ্বের দরবারে বেদ ও উপনিষদ সহ বিভিন্ন গ্রন্থেব অনুবাদ উপহার দিয়েছেন। তাদের সকলেই বেদ গ্রন্থকে বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডার তথা লাইব্রেরী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। বেদ ও উপনিষদের ভূমিকা হিসেবে ত্রিপুরাশংকর সেন শাস্ত্রী, ডঃ হেম চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং রমেশ চন্দ্র মজুমদার ঐসব বিশ্ব বিখ্যাত পাশ্চাত্য পন্ডিতদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন।

মনিয়র সাহেবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সংস্কৃত-ইংরেজী ভাষার সুবৃহৎ অভিধান প্রণয়ণ। হোরেস হেম্যান সাহেবের প্রধান কীর্তি সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান রচনা, কালিদাসের মেঘদূতের ইংরেজী অনুবাদ এবং ঋক্‌বেদ এর ইংরেজী অনুবাদ। লন্ডনের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্থার বেরিডল কীথ সাহেবও বেদ এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

জার্মানীর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডয়সেন বেদান্ত দর্শনেব বিভিন্ন বিষয় জার্মান ভাষায় অনুদিত করেছেন। জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অটোফন পানিণীর ব্যাকরণ জার্মান ভাষায় অনুদিত করে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য সূচীর অন্তভুর্ক্ত করেন।

বৃটিশ দার্শনিক অধ্যাপক আর্থার এ্যান্টনি বেদ গ্রন্থের বিভিন্ন মন্ডল ইংরেজীতে বিশদ ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করেন।

হরফ প্রকাশনীর কর্ণধার আবদুল আল আজিজ আমান বেদ ও উপনিষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রকাশনী থেকে খুব কম দামে বেদ, উপনিষদ, ভাগবত সহ বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে বৈদিক ধর্ম মানুষের কাছে উপহার দিয়েছেন। বেদ্ মহাগ্রন্থে সব বিষয়ের সুন্দর সমাবেশ থাকার জন্যই পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ বেদকে বিশ্বের জ্ঞানভান্ডার তথা লাইব্রেরী বলে বর্ণনা করেছেন। বৈদিক ধর্মে নারীর অধিকার এবং মর্যাদা পুরুষের সমানই ছিলো। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর প্রাধান্য পুরুষের চেয়েও বেশী লক্ষ্য করা যায়। যেমন দেবতা মন্ডলীতে তিন

প্রধান দেবতা রয়েছেন। আর প্রধানা দেবী যাদের পরমা প্রকৃতি বলা হয় তাদের সংখ্যা পাঁচ জন। ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং রাধা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই আটজনকে আধুনিক ভাষায় সভাপতিমন্ডলী বলে অভিহিত করা যায়। প্রধান দেবতা তথা ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি এবং কালী, ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, মঙ্গলচন্ডী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকাকে সম্পাদকমন্ডলী বলে অভিহিত করা যায়। জগৎ পালনের জন্য প্রধান প্রধান দপ্তর যেমন অর্থ, বানিজ্য, কৃষি, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সব কিছুই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দেবীগণের হাতে।

বেদ রচনায় ঋষিপত্নী ও কন্যাগণ অংশ নিয়েছেন। ঋক্ বেদ এর প্রথম মন্ডলের ১৭৯ সুক্তের কয়েকটি ঋক্ বা মন্ত্র রচনা করেছেন অগস্ত্য পত্নী লোপামুদ্রা। ঋক্ বেদ এর ৫ম মন্ডলের ২৮১ নং সুক্তের ছয়টি ঋক্ বা মন্ত্র রচনা করেছেন অত্রি ঋষির কন্যা অপালা। ঋ ক্ বেদ এর দশম মন্ডলের ৩৯ ও ৪০ নং সুক্তের ২৮টি ঋক্ রচনা করেছেন কক্ষিবৎ ঋষির কন্যা ঘোষা। ১০ম মন্ডলের ৮৫ নং সুক্তের ৪৫টি ঋ ক্ এর রচয়িতা সাবিত্রী। ১২৫ নং সুক্তের মন্ত্রগুলোর রচয়িতা অম্ভৃণ কন্যা বাক্। ১৪৫ নং সুক্তের মন্ত্রগুলোর রচয়িতা দেবী ইন্দ্রানী।

মধ্য যুগে মুসলমান শাসকদের নির্দেশে বেদ পাঠের অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করা হয়। ঋক্ বেদ এর দশম মন্ডলের শতাধিক মন্ত্র সাতজন নারী রচনা করলেও কেন বেদ পাঠে নারীর অধিকার থাকবে না এর কোন উত্তর ব্রাহ্মণদের জানা নেই। ঋক বেদ এর দ্বিতীয় মন্ডলের ১৭ নং সুক্তের সাত নং ঋক্ এ পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

আধুনিক যুগে এক শ্রেণীর লোক যারা দেশ ও সমাজে নেতা ও শিক্ষাবিদ রূপে পরিচিত তারা বৈদিক যুগে নারী শিক্ষা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল বলে ভাষণে ও বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করছে। একে ইতিহাসের বিকৃতি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ইতিহাসের এমন অনেক বিকৃত রূপ সমাজে প্রচলিত যাতে সমাজে মানুষে মানুষে বিভেদের ভাবনাকে জীবিত রাখতে সহায়তা করছে।

কোরাণের কয়েকটি সুবায় কাফের ও পৌত্তলিকদের হত্যা ও ধ্বংস করাব কথা বলা হয়েছে। নিষ্ঠাবান কোন মুসলমান কোরাণের নির্দেশ মেনে চলতে চাইলে হিন্দুদের সঙ্গে কোনদিন সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন না। হজরত মহম্মদেব চিন্তাধারা ও আচরণ বিশ্লেষণ করলে কোরাণের ঐ সুবাগুলোর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কেউ কেউ মনে করেন হজরত মহম্মদের পরবর্ত্তী কালে ঐ সব সুরা ঢুকানো হয়ে থাকতে পারে। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষাই ছিল মূল উদ্দেশ্য

ধর্মকে বাদ দিয়ে রাজনীতি ও সমাজের উন্নয়ন যে সম্ভব নয় তা এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা এখনো সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সাত-এর দশকে রাজনীতিতে ব্যপকহারে মাফিয়া ও মস্তানের অনুপ্রবেশের ফলে রাজনীতিতে নীতি ও আদর্শ গভীর সংকটের মুখোমুখি। ফলে সমাজে অরাজকতা এবং অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে।

ধর্ম নিরপেক্ষ নামধারী কিছু নেতা বৈদিক ধর্মকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলে আখ্যায়িত করার

ফলে বৈদিক ধর্মের সার্বজনীন মতবাদ সমাজে ক্রমশই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। ধর্ম মানুষকে মহান করে, সহিষ্ণু করে, পরোপকারী ও অহিংস করে তোলে।

রাজনৈতিক সম্প্রদায়কে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গতি এবং সুসম্পর্ক রজায় রেখে চলার নীতি গ্রহণ না করলে সমাজ থেকে হিংসা, লোভ এবং পরের অনিষ্ট করার মানসিকতার অবসান ঘটবে না। আশা করা যায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হবে এবং মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হবে। সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধি ফিরে আসবে। সবাই সুখে থাকুন। ভাল থাকুন। সনাতন ধর্মের মূল মন্ত্র এটাই।

—— ০ ——

মানবতা - মূল্যবোধ- মনুষ্যত্ব প্রসঙ্গে

জ্ঞানানন্দ রায়

"মূল্য নিষ্ঠ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রের আধ্যাত্মিকতার ভূমিকা অসীম" শীর্ষক বিষয় প্রসঙ্গে কবে যেন এক খবরের কাগজে পড়েছিলাম। ঐ প্রবন্ধের একটি অনুচ্ছেদ দিনলিপিতে লিখে রাখি। অনুচ্ছেদটি আজ চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে কিছু লিখতে তাই উদ্বুদ্ধ হচ্ছি। আমি লেখক নই। কিন্তু, 'মানবতা', 'মূল্যবোধ', 'মনুষ্যত্ব'- এই বিমূর্ত শব্দগুলি আমার মনে সর্বদা ওলট-পালট খাচ্ছে।। তাই ভাবছি, মনের কথা কিছু প্রকাশ করতে পারলে মনটা কিঞ্চিৎ প্রশান্ত হবে। এই পটভূমিকায় আজকের আলোচনার অবতারণা।

কোটেশনটি 'আজ মানুষ শুধু পশু নয়, পশুরও অধম হয়ে গেছে। পশুর মধ্যে যে সব গুণাবলী যথা সন্তান স্নেহ, প্রভুভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তা আজ মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। মানুষ মূল্যবোধহীন অর্থ সর্বস্ব অদ্ভুত এক পরিতৃপ্তির পেছনে ছুটছে। অন্যকে কষ্ট দেবার প্রবণতা, সন্দেহ পরায়ণতা, জটিলতার, আবিলতার আবর্তে পড়ে মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে।

মূল্যনিষ্ঠ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে বিদগ্ধজনদের লেখালেখির অন্ত নেই। রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীরাও আমজনতার উদ্দেশ্যে আকছাড় বক্তব্য রাখছেন। হিতোপদেশ দিচ্ছেন। সমাজে প্রতিষ্ঠিত গুণিজনরাও প্রসঙ্গক্রমে বলছেন। শব্দ ব্রহ্ম বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রচার মাধ্যমের প্রচারেও ঘাটতি নেই। আমরা যারা সাধারণ মানুষ ব্রাত্যজন এসব লেখাপড়ি, বক্তব্য শুনি, কিছু না কিছু ভাবিয়ে তোলে তো বটে।

মুনি, ঋষি, মনীষীগণের হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা লব্ধ চিন্তার ফসল - মানবতাবোধ, মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ববোধের উত্তরাধিকারী - আমরা। প্রশ্ন জাগে, সত্যি কি মানুষের চেতনা থেকে সত্যনিষ্ঠ গুণাবলী উবে যাচ্ছে? এটা ঠিক যে জেলির মত অমাদের নরম মনটি আর তত দরদী নয়। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবুও বলতে হয় মানুষের মনুষ্যত্ব একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। লোকচক্ষুর অগোচরে মনুষ্যত্বের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। আরাধনা লব্ধ মানবীয় গুণাগুলি মানুষের হৃদয়ে বিরাজমান। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাস্তবায়ণ হচ্ছে তা বিমূর্ত থাকছে। অসুস্থ বাতাবরণের আবহে সদগুণের বাস্তবায়ণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সত্যনিষ্ঠ মূল্যায়ণেব সুযোগ কোথায়।

ব্রহ্মাণ্ডের অংশ সৌরজগতের সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্ট বলয়ের মধ্যে জীবজগৎ বিশেষ করে মানুষ ও মানুষের আত্মজগৎ বেঁচে ও বেড়ে উঠছে। আধ্যাত্মিকতার ভূমিকা এই বাঁচা-বাড়ার ক্ষেত্রে অসীম, নিঃসন্দেহে। আধ্যাত্মিকতা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়ে আমার জ্ঞান শূণ্যের কোঠায়। বোধোদয়ের গণ্ডিও সীমাবদ্ধ।

পৃথিবীতে মনুষ্য সৃষ্ট মন্বন্তর, যুদ্ধ বিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা, ধর্মের নামে হিংসা দ্বেষ, সন্ত্রাস আছে এবং এইসব থাকবে। কালের প্রবাহে এর শেষ আছে কিনা আমার জানা নেই।

এর নীটফল কেবলমাত্র প্রাণহানি ও সম্পত্তি ধ্বংস নয় এক কথায় বলতে হয় - মানবতা ও মনুষ্যত্বের হত্যার উম্মাদনা ছাড়া আর কিছুই না।

মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী এই গ্রহে নেই। অন্যকোন সৌরলোকে এরি প্রতিরূপ মিলবে কিনা কে জানে? বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। আমরা সভ্যসমাজের সদস্য - আমরা সভ্যতাভিমানী। মানবিক মূল্যবোধ, মনুষ্যত্বের মাপকাঠি কালের নিরিখে মূল্যায়ণ করা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই কঠিন। এক কঠিন কঠোর জটিলতম অবস্থা ও ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। বর্তমান যুগে অর্থাৎ বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, মুক্তবাজারের যুগে সবকিছুর মূল্যায়ণ হয় অর্থ বিত্ত ও ক্ষমতার নিরিখে। অভিজ্ঞতা তাই বলে।

মানবিকতা, মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ ব্যক্তি বিশেষের ঐশ্বরীয় সম্পদ। এ পণ্য নয় যে অর্থের বিনিময়ে কিনে গুদামজাত করা যাবে এবং যখন খুশি তখন ব্যবহার করা যাবে। প্রতিভা ও মেধা কেনা যেতে পারে, এমন কি মানুষও কেনা যায়। কিন্তু মনুষ্যত্ব? নিয়ত মন্থন, চর্চা, অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা বংশ পরম্পরায়, উত্তরাধিকার সূত্রে এসব ঐশ্বরীয় গুণাবলী অর্জিত হয়ে থাকে। পরবর্তী প্রজন্মের অন্তরে এই সত্বা সঞ্চারিত হোক কামনা করি। যে জন্যে চাই - প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে অনুসরণ যোগ্য দৃষ্টান্ত। সুদৃষ্টান্ত স্থাপনের দায়িত্ব আমার, আপনার সকলের । সমস্ত ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার সুযোগ থাকলেও স্থানাভাবে করা যাবে না। তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে আরাম -আয়েশ, আমোদ-আহ্লাদ, ভোগ-বিলাস এর অফুরন্ত উপাদন আজ আমাদের কাছে অনায়াসলব্ধ। সেই জন্য চাই অর্থ, প্রচুর অর্থ, অর্থের বিনিময়ে সবই মেলে। যেন তেন প্রকারেণ অর্থোপার্জনে বর্তমান যুগ -ধর্ম। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টি ভঙ্গী যেন তাই। বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে অনেক। বিজ্ঞান মানসিকতায় কতজন পূর্ণতালাভ করেছি বা করতে পারছি, ভাববার বিষয়। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য 'খাও দাও পিও, আরাম আয়েশ কর।' আধুনিক জীবন ধারণের সমানুপাতিক অর্থ নয়, প্রচুর অর্থ উপার্জন কর। উপার্জ্জন করে বিত্তশালী' হও। চিত্তশালী হওয়ার জন্য আমরা ভাবিত নই। এ এক অশনি সঙ্কেত ।

আমাদের সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা -অর্থোপার্জনের জন্য 'বিদ্যা' শিক্ষা। বিপণন বাণিজ্য। অর্থের প্রয়োজন প্রতি পদে পদে। তাই অর্থ উপার্জন চাই। আমার আপনার দারিদ্রতা দূর ক রতে কোন এন.জি.ও বিনামূল্যে সেব' নিয়ে আসবে না। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে না। অর্থ না পেলে তারাই বা সেবাব্রতী হবে কি করে। সদুপায়ে উপার্জন সকল পিতামাতারই কাম্য।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে পড়ে রয়েছে বৃহৎ জগৎ, প্রকৃতি ও সমাজ। জীবনের চলার পথে পথে আমরা শিক্ষা লাভ করি এবং করতে পারি। এই জন্য আবশ্যিক কৌতুহলী সংবেদলশীল একটি নির্মল বিস্তৃত মন। গতির যুগে চারপাশ নিরীক্ষণ কররার সময়ের অভাব। শৈশব থেকে

বাস্তু বন্দী। এক গাদা বই নিয়ে স্কুলে যাওলা আসা। তারপর গানের মাষ্টার, আঁকার মাষ্টার, আর ও কত কি? কারণ তাকে যে একপায়ে হতে হবে। আর দশজন থেকে আলাদা হতে হবে। সবাই কৃতকার্য হবে এমন নিশ্চয়তা নেই। পিতামাতারাও আপ্রাণ চেষ্টা করবেন নিজের আত্মজকে প্রতিষ্ঠিত করতে। খুবই স্বাভাবিক। কিছু হোক বা না হোক, একটা জিনিষ প্রায়ই লক্ষ্য করে থাকি। টাই পরে ধোপ দুরস্ত হয়ে স্কুলের বাসের জন্য অপেক্ষা করে থাকা ছেলে বা মেয়ের দৃশ্য। তারই পাশ দিয়ে যাওয়া সাধারণ স্কুল পড়ুয়া বন্ধু বা বান্ধবীকে দেখেও না দেখার ভান করে থাকাই যেন তাদের আদব-কায়দা। এ ছেলে খুব বড় হলেও কতটা সমাজের কাছে দায়বদ্ধ হবে, সেই সন্দেহ থেকে যায়।

আদিকাল থেকে মানুষ প্রকৃতির কোলে বড় হয়েছে। প্রকৃতিকে জেনেছে এবং প্রকৃতি থেকে শিখেছে অনেক। আজও শেখার অন্ত নেই। শেখার অফুরন্ত ভান্ডার প্রকৃতিতে সর্বদাই বিরাজমান আমাদের চারপাশেই। বছর পাঁচেক আগের কথা। আমি অবাক হয়ে দেখি একটা নারকেল গাছের দুইডালে দুটি পাখি। উভয়েই ভিন্ন প্রজাতির পাখি। একটি বড় অপরটি ছোট। শক্তিমান পাখিটি ভাব ফুটো করে ঠোঁট দিয়ে জল খেল এবং সরে দাঁড়াল। ছোটটি এসে জল খেল এবং সরে দাঁড়াল। বড়টি এসে আবার জল খেল ও সরে দাঁড়ালো। চার পাঁচ বার জল পান করেছে। ছোটটি চলে গেল। বড়টি সবশেষে প্রাণ ভরে জল খেয়ে উড়ে গেল। সহমর্মিতার এমন মনোহর নিদর্শন দেখে আমার আত্মদর্শন হল।

আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। পেয়েছি বহু রক্ত ও বহু প্রাণের বিনিময়ে। এখন আমরাই আমাদের নিয়ন্তা। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি । গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। উনষাট বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। গণতান্ত্রিক বোধের কতটা উন্মেষ হয়েছে আমাদের মধ্যে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। রাষ্ট্রীয় স্তরে, রাজ্যস্তরে, জেলা ও গ্রাম স্তরে কত নির্বাচনই হল। আমরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছি। সরকার প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদেরই নির্বাচত প্রতিনিধিরা সরকার চালাচ্ছেন। মানবিকতা, মনুষ্যত্বের অবমাননা ও মূল্য বোধেব অভাব হবার কথা নয়। কিন্তু হবে। আসলে আমাদের নির্বাচন ও রাজনীতিতেই গলদ । অবনমনের জন্য প্রধানত দায়ী - বাগনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তির প্রভাব আর কতটুকু । কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রভাব সর্বব্যাপী, সর্বক্ষেত্রে। প্রাক স্বাধীনতার যুগে বাজনীতির ও রাজনীতি বিদগণের একটাই লক্ষ্য ছিল - যায় যাক প্রাণ, দেশ স্বাধীন করতেই হবে। নিখাদ দেশপ্রেম। দেশের মানুষের জন্য প্রেম। এ বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ করার অবকাশ ছিলনা। পথ ও মত ভিন্ন হতে পারে। লক্ষ্য ছিল সবার এক জায়গায় নিবদ্ধ। স্বাধীনতা। আর স্বাধীনোত্তর কালের রাজনীতি? চলমান রাজনীতির হালচাল রীতিনীতি, মূল্যনিষ্ঠা দেখে মনে হয় - দেশ সেবাটা গৌণ, উপজীবিকাটা মুখ্য। ক্ষমতাটা মূল লক্ষ্য। নির্বাচনে আদর্শ কর্মসূচী, কাজের তুল্য মূল্য বিচার বিশ্লেষণ জনসমক্ষে তুলে ধরে জনগণের মন জয় করে ভোট সংগ্রহ করা অনায়াস সাধ্য। তার চেয়ে সহজ পন্থা অনৈতিক অশোভন শ্লোগান, সাম্প্রদায়িক জিগীর তুলে ভোটের হাওয়া নিজের পক্ষে টানা। হাওয়া ভোয় কর্মসূচী ও আদর্শের উপর আস্থা

রেখে ইতিবাচক ভোট হয়না, হতে পারে না । হাওয়া ছাড়া আছে মারদাঙ্গা, হত্যা, ভয়, সন্ত্রাস ।

আমার মত সাধারণ মানুষের আচার আচরণ যতটা না ক্ষতি করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবক্ষয় সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। এখানে নীতির লড়াই অনুপস্থিত। তারই সুযোগে দুর্নীতি জাঁকিয়ে বসেছে সর্বত্র। সর্বাগ্রে স্বীয় স্বার্থ বিবেচ্য। পরে গোষ্ঠী বা দল এবং সবশেষে দেশের হিতের কথা। এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতি অনিবার্য। তাই দেখি মন্ত্রী থেকে প্রশাসনিক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত পদাধিকারী সমেত নীচের তলা পর্যন্ত দুর্নীতির ঢল বয়ে চলেছে। ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ঐশী নয়, পেশী.নির্ভর। আশার কথা, দুর্নীতির দায়ে মন্ত্রীকেও জেল ঘাটতে হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সনটা আমার ঠিক মনে নেই। পনের ষোল বছর আগে হবে। দেখলাম একটি ছেলের গায়ে পরা গেঞ্জীতে লাল রং দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা 'I AM A BAD BOY গেঞ্জীটি পরে সে সারা শহর ঘুরে বেড়িয়েছে দেখে আমি বললাম তোমাকে যদি পুলিশ ধরত? সে অবলীলায় বলল পুলিশের কাছে জানতে চাইব - হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি আমি খারাপ। আপনি স্বীকার করবেন কি আপনি যে ঘুষ খান?" পুলিশ এখানে প্রতীকি মাত্র। আমার মনে হল - ছেলেটির মনের ধারণা সর্বত্রই খারাপ জিনিষ ছড়িয়ে আছে। ভাল কিছুর নিদর্শন সে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। মারাত্মক!

এই বয়সের যুবক যুবতীদের মন জুড়ে আছে মিনিষ্টার , ফিল্মস্টার, স্পোর্টসস্টার। দুঃখের বিষয় এদের গুণাবলী স্বকীয়তা যতটা না প্রচারিত হয় জীবনের ব্যক্তিগত কেচ্ছা কাহিনীটাই মিডিয়ায় সবচেয়ে বেশী মুখরোচক করে প্রচারিত হয়। বর্তমানে সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, আদর্শহীনতাই যেন রাজনীতির ভূষণ। ফলে দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ হাতে গোনা যে কয়জন শ্রদ্ধাভাজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আজও স্বমহিমায় আছেন তাঁরাও আজ যথাযোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এদের বিশাল অবদান সমাজে কোন রেখাপাত করে না। দেশের চরম দুর্ভাগ্য। স্বভাবত খুবই শঙ্কিত হচ্ছি এই ভেবে যে সমাজে কী বার্তা যাচ্ছে রাজনীতির নির্যাস থেকে।

আমরা সমাজের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, অভিনেতা, অভিনেত্রী। আমরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বমহিমায় মহিমান্বিত। আমাদের অঢেল টাকা আছে। আমরা যা খুশি করতে পারি। সমাজের প্রতিআমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই। আমরা বিত্তবান। তাই আমরা ক্ষমতাবান। অমরা অকাশে উড়ে বিবাহ অনুষ্ঠান করি। তাতে কার কি এসে যায়।

সমাজের কোন অনুশাসন নেই। সমাজের সেই মেল বন্ধন নেই। আপন লক্ষণ রেখায় সমাজ আবদ্ধ । রাজনৈতিক ভাবে বিভক্ত। বিভক্ত জাতি, উপজাতি, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে। সামাজিক পুনর্বিন্যাস ও পুণর্গঠন আবশ্যাক। সেই জন্য চাই এক বৈপ্লবিক জোরদার অন্দোলন।

এতক্ষণ পর্যন্ত নেতিবাচক দিকটিই তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতি চলেছে ভারসাম্য রক্ষা করে। আর আমরা সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছি। পরিবার, নিয়েই সমাজ। পরিবারগুলি অর্থনৈতিক চাপে ভেঙ্গে যাচ্ছে। যৌথ পরিবার আর নেই বলা চলে। যেখানে সন্তানেরা পরস্পর ভালবাসা, পরস্পর সহযোগিতা, একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার, বড়দের স্নেহচ্ছায়ায় নিজেদের

সুকুমার বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট করার সুযোগ পেত, সেই প্রারম্ভিক মানসিক বিকাশের সুযোগ আর নেই। এখন ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। কতটা সুখী ভবিষ্যতে হয়ত গবেষকরা গবেষণা করে দেখবেন। দেখবেন প্রাচুর্য্যের মধ্যে একাধিপত্য ঘটিয়ে শিশুটির মানসিকতা কতটা পূর্ণতা পেয়েছে ইত্যাদি।

কাল প্রবাহে যুগে যুগে মানবিকতা, মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়ে আসছে। আগে যা অবশ্য করণীয় ছিল। আজ সেটা করণীয় নয়। বরং নিন্দনীয়। নতুন করে মূল্যবোধের সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত। তার মাপকাঠি কি। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, প্রযুক্তির উন্নতিই কেবলমাত্র সভ্যতার নিদর্শন হতে পারে না। এ সবই তো সমবেত প্রচেষ্টার ফসল। বিচ্ছিন্ন ভাবে তো আমি একজন মানুষ। আমাকেই 'মানুষ হতে হবে মানুষ যখন।' মানবতা, মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হলেই হবো - একজন পূর্ণ মানুষ a complete man

---- o ----

এত রক্ত কেন

শঙ্খশুভ্র দেববর্মণ

আগরতলায় দুর্গাপুজোর আনন্দই আলাদা। কাজের প্রয়োজনে পরবাসে আছি বলে বেশ ক' বছর আগরতলার শারদ উৎসবে সামিল হতে পারি নি। পূজোর সময়টা এবার এই শহরে কাটাবো বলে আগে ভাগেই ঠিক ঠাক করে নিয়েছিলাম। ছুটি ম্যানেজ করে ফিরে এসেছিলাম নিজের জন্ম-শহরে।

দেখলাম শহরটার বহিরাঙ্গে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। পরিচিত শহরটাকে আর চেনাই যায় না যেন। শহরটার অনেক কিছুই বদলে গেছে। একেই হয়তো বলে সময়ের চাহিদা। পরিবর্তন তো সব সময়ই কাম্য। পুরনো শহরের এই পরিবর্তন নিশ্চয় দরকার ছিল।

কিন্তু সব কিছুই কি পাল্টেছে! ...... অবশ্যই নয়। দুর্গা পূজোয় নবমীর দিন দুর্গাবাড়ি গিয়েছিলাম। তখনই কত ভীড়। পূজোর সময় ভীড়বাট্টা হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে সাত সকালে এত ভীড়! ..... কী ব্যাপার। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, এখন মোষ বলি চলছে। বলি দেখার জন্য এত ভীড়। সবার ধারণা, বধ্য মোষের রক্ত কপালে লাগালে নাকি পূণ্য হয়।

একদিকে পূণ্যলোভী জনতার সহর্ষ উল্লাস, আর একদিকে হাঁড়ি কাঠে লাগানো ভীত মোষের মরণ চীৎকার। রাম দা'এর কোপে মোষের গলা থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায় যখন, জনতার উল্লাস যেন আরও বাড়ে। ছটফট করতে থাকা গলা কাটা মোষের দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয়। সেই রক্ত কপালে লাগানোর জন্য সবার মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়।

দৃশ্যটা আমার কাছে নারকীয় লেগেছিল। কোনও মতে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে বুক ভরে দম নিই। ভাবতে লাগলাম এই পরিবর্তনের যুগেও পশুবলির মতন একটি আদিম ঘৃণ্য প্রথা আজও আগরতলায় কীভাবে চলছে। .... এই নিদারুণ প্রত্যক্ষ দৃশ্য দূষণের পরও নিস্তার নেই। সন্ধে বেলায় স্থানীয় টেলিভিশনের চ্যানেলে বলির সেই অসহ্য দৃশ্য বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হচ্ছিল। গোটা ব্যাপারটাই মানুষের সেন্সিবিলিটি'র ওপর চরম অত্যাচার। দুর্গাপূজো তো শান্তি সম্প্রীতির উৎসব। এতে হিংসার স্থান নেই। তবে কেন এই রক্তপাত!

নবমীর সেই সকাল বেলায় দেখেছিলাম, অনেকের সঙ্গেই রয়েছে বাচ্চা ছেলেমেয়ে। রক্তপাতের এই শিহরিত দৃশ্য তাদের সবুজ মনে বিচ্ছিরি ক্ষত তৈরী করতে পারে। ভাবী নাগরিকদের সামনে এই ধরণের কলঙ্কিত নেতিবাচক দৃশ্য সজ্জা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

দিনকাল পাল্টেছে। পরিবর্তনের ঢেউ বইছে চারদিকে। পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেও। তবু কেন পশুবলির মতন একটি অর্থহীন প্রথাকে আজও আমরা জিইয়ে রেখেছি। দুর্গাবাড়ির পূজোর মোষ বলি নাকি ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ঐতিহ্যের অঙ্গ। ঐতিহ্যের দোহাই পেড়ে পশুবলির মতন নৃশংস প্রথাকে গ্লোরিফাই করার মানে হয় না। পুরনো সব কিছুই ভাল নয়। ত্রিপুরায় এক সময় নর বলি হতো। নরবলি বন্ধ হয়েছে। এখন পশুবলিও বন্ধ হওয়া দরকার।

এক সময় পৃথিবীর সর্বত্র বলি প্রথা চালু ছিল। হিন্দু ও ইহুদিকের মধ্যে বলি প্রথা চালু ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। ঈদের সময় পশুবলি দেয় মুসলিমেরা। মাংস ছাড়া বেশির ভাগ অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ হয় না খ্রিস্টানদের। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে পৃথিবীর প্রায় সব ধর্ম ও সংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বলি প্রথার সমর্থন পাওয়া যায়। এমন কী সেই প্রাচীনকালে হরাপ্পান সভ্যতায়ও বলি প্রথা ছিল বলে অনুমিত হয়। হরপ্পার শীল মোহরেও নরবলি এবং পশুবলির দৃশ্যাদি রয়েছে।

বৈদিক যুগে বলির বিরুদ্ধে কিন্তু সবার আগে সরব হয়েছিলেন উপনিষদ রচয়িতা ঋষিরা। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারকেরা বলির বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার চালিয়েছিলেন। মজার কথা হল, হিন্দুদের প্রাচীন মন্দির গাত্রে বলির দৃশ্য বলতে গেলে দেখাই যায় না।

'বলি' শব্দটার মধ্যেই জড়িয়ে আছে এক উৎকট নিষ্ঠুরতা। হাঁড়ি কাঠে বেঁধে পশুদের বলি দেওয়া হয়। বলির জন্য বেঁধে রাখা বাকী ভয়ার্ত পশুরা সেই দৃশ্য দেখে। ওদের চীৎকারে বিষাদাচ্ছন্ন হয় পরিবেশ। রক্তে ভেসে যায় চারপাশ। পূণ্যার্থীরা পরম ভক্তিতে সেই রক্ত কপালে ও সারা শরীরে লাগায়। অনেকে সেই রক্ত পানও করে। মৃত পশুর নাকি ভুঁড়ি মালার মতন গলায় ঝুলিয়ে লয় পুরোহিত। কাটা পা ঢুকিয়ে রাখা হয় সেই পশুর মুখেই। এও দেখা গেছে, বলির জন্য প্রদত্ত পশুটিকে এক লহমায় না মেরে তাকে তিল তিল নারকীয় যন্ত্রণায় দগ্ধ করে মারা হচ্ছে। প্রথমে তার পা কাটা হচ্ছে; তারপর তার পেট। ..... প্রেম ও করুণার আধার ভগবান কীভাবে তাঁরই সৃষ্ট জীবের এই যন্ত্রণাময় মৃত্যুতে পিশাচসিদ্ধ আনন্দে উল্লসিত হন!

সভ্যতার প্রাক্ লগ্নে বলি প্রথার মাধ্যমে আদিম মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতো। বন্যা, ভূমিকম্প, দাবানল বা ঝড়ঝঞ্ঝা হলে মানুষ ভাবতো প্রকৃতি অর্থাৎ ভগবান রুষ্ট হয়েছেন। তাকে শান্ত, সংহত করার জন্যই জীবিতের প্রাণনাশ করা। ভগবানকে এটাই বোঝানো যে, প্রয়োজনে তোমার জন্য জীবনও উৎসর্গ করা যায়। প্রাণের বিনিময়ে তুমি আমাদের করুণা করো। অসুখ বা মহামারির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল একই কথা। মানুষ মনে করতো কোনও রক্তপায়ী অশুভ শক্তির কোপানলেই কালান্তক অসুখ বিসুখ হচ্ছে। অতএব তাকে তুষ্ট করো। বলি দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা মহামারী আজও হয় ঠিকই। তবু হাজার বছর আগের মতন এক বুক অনিশ্চয়তা আর নেই। বিজ্ঞান আজ মানুষের জীবন উন্নতকর করে তুলেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা হচ্ছে বিজ্ঞান সম্মত ভাবেই। অসুখ বা মহামারীতেও চিকিৎসা বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হচ্ছে। একথাও ঠিক, এই সব পরিষেবার সুযোগ সবার কাছে ঠিকভাবে পৌঁছায় না। এর জন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়। দায়ী সরকারের পরিচালন ব্যবস্থা।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, মানুষ এখন বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা মহামারীর মোকাবিলা করার মতন সামর্থ অর্জন করেছে। এক বিংশ শতকের এই সময়ে তাই পশুবলির মতন অন্ধ বিশ্বাসকে আঁকড়ে রাখার কোনও মানে নেই।

ধান রোপণ ও নবরাত্রি উৎসবের সময় ভারতের সর্বত্র পশুবলির সংখ্যা বেড়ে যায়।

আর বালির জন্য যে পশুর কদর সবচেয়ে বেশি সেটি হল মোষ। বলির জন্য পাঁঠার চেয়েও মোষের বাজার দর ভারী। সমৃদ্ধি ও উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে নাকি মোষ বলির সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ মোষ বলি দিলে সুখ সমৃদ্ধি সবই হবে।

বলার কথা, দেবী দুর্গা ও মহিষাসুরের দ্বন্দ্ব আসলে সেই টোটেমিক সময়ের প্রতীক। এই দ্বন্দ্বে টোটেম সভ্যতা পরাভূত হয়। সে কতকাল আগের কথা। কিন্তু মোষ বলির মাধ্যমে সেই বিস্মৃত প্রায় দ্বন্দ্বকেই আজও প্রতিভাত করা হচ্ছে।

পুরুষ শাসিত সমাজে বলি কিন্তু লিঙ্গ বৈষম্যেব ও প্রতীক। পুরুষ দেবতারা সবাই ভালো, ত্যাগ তিতিক্ষায় শ্রেষ্ঠ, মঙ্গলকামী। 'শক্তি'র প্রতীক দেবীরা বেশির ভাগই স্বভাবে উগ্রচণ্ডী, নিষ্ঠুর এবং রক্তপায়ী। কালীর গায়ের রঙ মসীকৃষ্ণ, শ্বদন্ত চেপে সে তার রক্ত লাঞ্ছিত জিভ যেন সবাইকে দেখায়। এক হাতে ঘড়গ আর এক হাতে মানুষের মাথা। তার গলাতেও ঝুলছে মানুষের মাথার মালা। পেছনেই রয়েছে বীভৎস চেহারার ডাকিনী, যোগিনী ও প্রেতিনী। সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ দৃশ্য। এই মহাকালীকে তুষ্ট করার একমাত্র উপায় নাকি 'বলি'।

তাই কালীপূজোর দিন সারা দেশে অগুণতি পাঁঠা ও মোষ বলি হয়। কালী ছাড়া আরও একজন ভয়ঙ্কর দেবী রয়েছেন। তিনি 'মারী', গুটি বসন্তের দেবী। (সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে এঁকে শীতলা দেবী বলা হয়) জনগণ এই দেবীকেও খুব ভয় পায়। বঙ্গদেশ ও উত্তব পূর্বাঞ্চলে মনসা পূজোর চল রয়েছে। দেবী মনসা হচ্ছেন সর্পদেবী। মানুষ তাঁকেও কম ডরায় না। গ্রাম ভারতের সর্বত্র এই রকম কত ভয়ঙ্কর দেবী যে পূজিত হন- তার গোনাগুণতি নেই।

ভাবতে দেবীর যে সস্ত মাতৃকার ধারণা করা হয়- তাতে তারা প্রায় সবাই ভয়ানক, নিষ্ঠুর, রক্ত তৃষ্ণায় চঞ্চল এবং আমিষ ভোজী। ভারতীয় মানসিকতায় এই ভাবেই আবহমান কাল ধরে 'নারী' সম্পর্কে ভয়ঙ্কর ইমেজ গড়ে তোলার চেষ্টা চালানো হয়েছে। এ দেশে পুরষ দেবতাদের জন্য নির্মিত মন্দিরগুলি দেখলে বোঝা যায় কত যত্ন নিয়ে তৈরী করা হয়েছিল এগুলি। কোনারকের সূর্য মন্দির কিংবা গুজরাতের সূর্য মন্দিরই হোক না কেন - পুরুষ দেবতাদেব জন্য নির্মিত মন্দিরগুলির স্থাপত্য শিল্প, সৌকর্য দেখবার মতন। সুপ্রশস্থ মন্দিরের পরিবেশও কেমন শান্ত, সমাহিত। এই সব মন্দিরে গেলে মনে একটা পবিত্র ভাব আসে। কিন্তু দেবীদের মন্দিরগুলির নির্মাণ এমন ভাবেই করা হয়েছে যেখানে প্রবেশ করলেই গা ছমছমে ভয়ের ভাব উদ্রেক হয়। মন্দিরগুলি অপ্রশস্থ, ভেতরে গমোট ছায়ান্ধকার শীতল পরিবেশ। এসব মন্দিরও তৈরী করা হয় শহর থেকে বহু দূর জনমানবহীন প্রান্তরে। মা কালী কিংবা মারী'র সহচর নাকি অশুভ আত্মারা। তাই লোকালয় থেকে দূরেই তৈরী করা হয় এইসব দেবীদের মন্দির। পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে এই রকম প্রতিমূর্তি গড়ে তোলার পেছনে নারীকে ব্রাত্য রাখার মানসিকতা তো কাজ করছেই; এতে জড়িয়ে রয়েছে পুরুষদের চিরন্তন নারী নিষ্পেষণের মানসিকতাও।

পশুবলির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বাইরেও রয়েছে আর একটি দিক। সেটি হল অর্থনৈতিক। গ্রাম ভারতে নিরক্ষর মানুষ সহজে কুসংস্কারের শিকার হয়। গ্রামে প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বা অসুখ বিসুখ হলে সুদখোর মহাজনেরা সুকৌশলে প্রচার চালায়, দেবতা রুষ্ট হয়েছেন বলেই এত অঘটন ঘটছে। দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য 'বলি' দিতে হবে।

এরপর গরীবগুর্বোরা মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ধার দেনা করে। সেই টাকায় কেনে পাঁঠা কিংবা মোষ। ব্রাহ্মণকেও ভালো পরিমাণ টাকা দিতে হয় প্রণামী হিসেবে। পূজো আচার পর বলি দেওয়া পশুর মাংস প্রসাদ হিসেবে বিতরণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় অন্যান্য গ্রামবাসীদের। এতে আরও কিছু পয়সা বেরিয়ে যায়। কেননা মাংসের সঙ্গে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীও পরিবেশন করতে হয়।

এত কিছুর পরও দরিদ্র মানুষের দুর্দশা শেষ হয় না। মহাজনের হিসেবের খাতায় চক্র বৃদ্ধি হারে সুদের টাকা বাড়তে থাকে। এক সময় দেনার দায়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে ওরা। মহাজন তখন ওদের বাড়িঘর দখল করে নেয়। গ্রাম ভারতে তাই পশু বলি চালু রাখার পেছনে সক্রিয় রয়েছে মুনাফা লোভী অসাধু ব্যবসায়ীর দল।

পশু বলির বিরুদ্ধে এখন সোচ্চার হওয়ার সময় হয়েছে। এই জঘণ্য প্রথার বিরুদ্ধে সবারই প্রতিবাদ জানানে প্রয়োজন। রাজন্য আমলে ত্রিপুরার রাজ পরিবারে দুর্গাপূজোর সময় মোষ বলি হতো। ত্রিপুরার সেই রাজা মহারাজা ও নেই, রাজত্বও নেই। দুর্গা বাড়ির পূজোতেও আজকাল ত্রিপুরার রাজপরিবারের কোনও সদস্য সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন না। কিন্তু ফী বছর দুর্গাপূজোর সময় দুর্গাবাড়িতে মোষ বলি হয়। অর্থাৎ 'সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলিতেছে।' দুর্গাবাড়ির পূজোর মূল আয়োজক এখন রাজ্য সরকার। যে রাজ্য সরকার জনগণকে প্রগতিশীল করে তোলার জন্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রচার চালায়, তারই উচিত এখন আইন প্রণয়ন করা যাতে রাজ্য থেকে পশুবলির মতন প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়।

রচনাকাল ঃ ২৫ শে অক্টোবর, ২০০৫

----- o -----

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বিতীয় মত ও পথ

নিধু ভূষণ হাজরা

সূর্য গেল অস্তাচলে ঃ- ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজ উদ দৌলার সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্লাইভ পরিচালিত সৈন্যদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের নেট ফল ক্লাইভের জয় আর নবাবের পরাজয়। যদিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ঐ যুদ্ধের সময় পলাশীর পাশে হাজার হাজার লোক খোল, করতাল সহযোগে কীর্তন ও খিচুড়ি ভোজে নিয়োজিত ছিলেন। এতে দুটো দিক প্রতীয়মান হয় - এক, নবাবের জনসংযোগ ছিল না। দুই, জনগণের কাছে বাংলার সিংহাসনে কে এল, কে গেল তাতে তাদের কিছু এসে যায় না। সাম্রাজ্যবাদ ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই।

সিরাজের পতন ও হত্যা বা দেশীয় নবাবের পরাজয়ের পশ্চাতে গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। ঈর্ষা -লোভ-জাতিবৈরিতা মান অভিমান এবং যুব নবাবের ঔদ্ধত্যের বাড়াবাড়ি মনোবিশ্লেষণের বিচারে ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়নে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। দস্যু চুড়ামনি ক্লাইভ দক্ষিণ ভারতে ধনতান্ত্রিক উপনিবেশিক বিস্তৃতির অভিজ্ঞতা এ কাজে লাগিয়েছেন বাংলার উর্বর ভূমিতে। মিরজাফরকে সিংহাসন, জগৎ শেঠকে অর্থ, গোপাল ভাঁড়ে খ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বাংলার হিন্দু মুসলিম ধনী অদূরদর্শী সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৈদেশিক ইংরেজ শক্তিকে সাহায্য করেছিল। পলাশীর যুদ্ধের এটা যেমন নেতিবাচক দিক তেমনি তার ষোল বৎসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন বাংলার নবজাগরণের প্রাণ পুরুষ রাজা রামমোহন রায়। একটি ইতিবাচক ঘটনা।

বাংলার জনগণের হঠাৎই এই অনীহা দেখা দেয় নাই। মোগল আমলেও বাংলার বার ভুঁইয়ার সময় যে বাংলা ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ সেই বাংলাই পরবর্তীকালে জমিদার জোদ্দার ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শোষণে পীড়নে মৃতপ্রায় হয়ে উঠে। সৃজনশীল কৃষক ও কারিগর শ্রেণী মর্যাদাহীন জড়ের মত স্রোতহীন নিয়তি তাড়িত হয়ে পড়ে। তারা অবস্থার স্রষ্টা না হয়ে অবস্থার দাসে রূপান্তরিত হল। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভুমির গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, বাটিভরা দুধের মুল অধিকারী ছিলেন রাজা নবাব, সামন্তগণ, জমিদারগণ এবং তাদের সেবা দাস মোড়ল ও হিন্দু মুসলমান পুরোহিত শ্রেণী। কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষক কারিগর তাঁতী ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত দারিদ্র লাঞ্ছিত বেকারী ও ভিখারী বৃত্তি নিয়ে বিড়ম্বিত। পলাশীর যুদ্ধের মাত্র তের বৎসর পর বাংলার ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে তিন কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে এক কোটি মারা যায়।

সিরাজের পরাজয় ও বাহাদুর শাহের সিংহাসন চ্যুতির ব্যবধান একশ বছর ঃ- ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত একশ বছর চললো কোম্পানীর পুরো ভারতকে গ্রাস করে নিতে।

১৮৫৭ সালে লর্ড কেনিং কোম্পানীর এজেন্ট। কোম্পানীর অতিলোভ এমন কি দেশীয় ও কোম্পানীর কর্মচারীদের শোষণ (যিনি কোম্পানীকে বেশী অর্থ আদায় করে দিতে পারবে তিনিই জমিদার) এই সকল নীতি সমাজের মূল চালিকা শক্তিকে আঘাত করতে থাকে। মানুষ অত্যাচার সমূহ সহজে মেনে নেয় নাই, বার বার বিদ্রোহ করেছে। সেই সময়ের কৃষক বিদ্রোহ, উপজাতি বিদ্রোহ তার ভুরি ভুরি নজীর বহন করেছে। বিদ্রোহীগণ ব্যর্থ হয়েছে সত্য কিন্তু বীরের মত মৃত্যুবরণ করছে।

অন্তবিহীন নয়ত অন্ধকার ঃ- ১৮৫৭ সারে ২৯শে মার্চ বাংলার ব্যারাকপুর ছাউনি থেকে মঙ্গল পান্ডে কোম্পানীর দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়লো। পলাশীর শতবর্ষে মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। কোম্পানী ও দেশীয় সৈন্যদের সম্মিলিত শক্তির কাছে পরাজিত হল মহাবিদ্রোহ। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই মহাবিদ্রোহই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ।

ভারতে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রতাপাদিত্য রূপ নিচ্ছে তখনই পৃথিবীর অন্যত্র ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার কঠিন কঠোর বজ্র সুতীব্র যন্ত্রণায় মাতৃ গর্ভ থেকে ভুমিষ্ট হয়েছে। এইটি সত্য যে এই মহাবিদ্রোহের যথার্থ মূল্যায়ণ কবার সামর্থ ভারতের ও বিদেশে খুব একটা ছিল না। এমনকি ঋষি বঙ্কিম ২০ বৎসর বয়সে বি এ পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী নিয়েছেন, ৩৭ বৎসবেব বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত, রবীন্দ্র বিবেকানন্দের জন্ম হয় নাই। চট্টগ্রাম থেকে পলায়নবত বিদ্রোহী সৈন্যদের সামন্ত প্রভুরা ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কার পেলেন। এটা খুব একটা দোষের কথা নয়, কারণ সে সময়েব সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবে ইহাই ছিল স্বাভাবিক। ওই তাদেব উপর মিথ্যা ক্ষোভ প্রকাশ করা, তাদের মূর্তিভাঙ্গা বামপন্থা নয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ত্রিপুরার মহারাজা ছিলেন ঈশান চন্দ্র মাণিক্য (১৯৪৯-৬২)। বর্তমান আগরতলা শহবের তখন সূচনা পর্ব। তারও একশ বৎসর আগে পলাশীর যুদ্ধের সময রাজা কৃষ্ণ মাণিক্য উদয়পুব থেকে সমসের গাজী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পুবাতণ আগবতলায় বাড় পাট গড়ে তোলেন। গরু চরানো কৃষক পুত্র সমসেব কিনা হবে নবাব? সেটা মুর্শিদাবাদের হারেমী শ্রেণী চরিত্রে ছিল অসহ্য। তাই মীরকাশিমের তোপের মুখে উড়ে গেল সমসেরের স্বপ্ন। জাতপাত নয, শ্রেণী বৈযম্য ও শ্রেণী সমঝোতাই আসল কথা।

সিপাহী বিদ্রোহে উল্লসিত হয়ে বৃটিশ মিউজিয়ামে গভীব মনোনিবেশে অধ্যয়নরত ৩৯ বৎসরের এক যুবক চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন - "ভারত জাগছে, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক"। যথার্থ বামপন্থা কি তাহা জানতে হলে এই যুবকের আদর্শ কি তা জানতে হয়, জনগণের উপর বিশ্বাস রাখতে হয়। ইনিই - **কার্লমার্কস**।

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে বাধা দেওযা, পুনরুদ্ধাব ও উপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রাম পৃথিবীর অন্যান্য ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রাচীন রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ইত্যাদির ধ্বংস ও ধনতন্ত্রের প্রসার এবং তাঁর আগ্রাসী নীতির বাস্তব রূপই সাম্রাজ্যবাদ।

সাম্রাজ্যবাদের মূল নীতি হল শোষণ ও বঞ্চনা। সে বিভিন্ন ভাবে শোষন ও বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু টিকে থাকতে পারে না। কারণ টিকে থাকা বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিরুদ্ধ। পুঁজির প্রসারণ সাম্রাজ্যবাদ, নিরসন সমাজতন্ত্রবাদ।

১৯৪৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়াবী ভারত ভ্রমণকারী বৃটিশ পার্লামেন্টারি দলেব নেতা অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক রিচার্ডস বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীকে রিপোর্ট দিয়ে জানান আমাদের শীঘ্রই ভারত ছাড়তে হবে, যদি তা না করি তো ওরা আমাদেব লাথি মেরে বের করে দেবে (অমৃতবাজার পত্রিকা ২৩শে ফেবুরারী, ১৯৪৬)।

তার প্রায় একশ বৎসর আগে ১৮৪৮ সালে সাম্রাজ্যবাদের এই করুণ পরিণতির কথা উল্লেখিত হয়েছিল - শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক 'ইস্তেহাবে' (কমিউনিস্ট ম্যানো ফেস্টো)। সর্বহারা মানুষের হাতে এই অস্ত্র তুলে দিলেন- সেই বৃটিশ মিউজিয়ামে অধ্যয়ণবত যুবক কার্লমার্কস। তিনি বললেন-"সর্বহারা জনগণ সংগ্রামে সামিল হও। শৃঙ্খল ছাড়া তোমাদের হারাবার মত কিছু নেই, পাবার মত আছে সারা দুনিয়া।"

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হল বলা যায় না। দেশ প্রেমিকদের আত্মত্যাগ দিয়ে গেল এক অমূল্য সম্পদ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্সী বিলুপ্ত হল। সে স্থানে এল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। নতুন কায়দায়, নতুন পোষাকে ভারতের বুকে তুলে দিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ পতাকা, শ্বেত, শুভ্র হাতে সুশাসনের অভিজ্ঞানপত্র, গণতন্ত্রের সোনালী মাদুলী (গণতন্ত্র জলীয় পদার্থ। তার নিজের কোন আকার নেই। যে পাত্রে থাকে সে আকার ধারণ করে), নেটিভদের জন্যে খেতাব, মেডেল, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, পরকালের জন্যে বাইবেল, জাতি সত্তাব ক্ষেত্রে ভেদনীতি। এমন সব ছেলে ভুলানো খেলনা, এটা ছিল বাইরের জন্যে। বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতবাসীকে কিছু সুযোগ দেবার কথাও ভাবলেন। অবসর প্রাপ্ত বৃটিশ কর্মচারী মিঃ হিউমের নেতৃত্বে আলাপ আলোচনার পর ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। প্রথম সভাপতি হলেন উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৮৫ সালে অরুণোদয় - স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে? ঃ- পুরো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময় ও বৃটিশ পার্লামেন্টের সময় দেশীয় ধনীক বণিক ও সওদাগরী শ্রেণী ছিল অসন্তুষ্ট। তারা ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদের ধনের ঝন ঝন শব্দ শুনতো কিন্তু হাতাবার সুযোগ না পাওয়াই ওদের প্রধান অসন্তুষ্টির কারণ। কথায় আছে ভারতের দু'টাকার কাঁচামাল সাগর ঘুরে এসেই দুশ টাকা হত। ওরা পেত সামান্য মাত্র। দেশীয় রাজা, মহারাজা, জমিদার সুবেদার যারা মূলতঃ দিল্লীর বাদশাহের অর্থ মিটিয়ে দিয়ে স্বাধীন সত্বা ভোগ করতো এরাও শ্রেণী স্বার্থের প্রয়োজনে জাতীয় কংগ্রেসের চারপাশে এসে ভীড় জমালো। এসব কথা পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর বক্তব্যের রকমফের মাত্র (আত্মচরিত - জহরলাল নেহরু)।

জাতীয় কংগ্রেসের মূলপ্রবাহকে যারা নিয়ত তাজা রক্ত সরবরাহ করে এগিয়ে চললো- তারা হল মধ্যবিত্ত তরুণ সমাজ। বেশীর ভাগ ছিলেন ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবি ও

বুদ্ধিজীবী মানুষ। বৃহত্তর জনসংযোগ তখনও ঘটে নাই।

জন্ম থেকেই কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন হয়ে এসেছে। এই সম্মেলনে দুই বিপরীত মুখী স্রোত ধারা চলতো। ইতিহাসে যারা নরমপন্থী ও চরমপন্থী নামে পরিচিত। নরমপন্থীদের সম্পর্কে বাংলার তেজস্বী নেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত মডারেট (নরমপন্থী)দের সম্মেলনকে "তিন দিনের তামসা" বলে উল্লেখ করেন। স্বরাজ সম্পর্কে ওদের হাত কচলানো দেখে তিলক বললেন - "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার"। বিপিনচন্দ্র পাল ও লালা লাজপৎ রায় লিখলেন যে, "নরম পন্থীদের সঙ্গে বৃহত্তর জনগণের কোন সম্পর্ক নাই।"

১৯০৫ - বঙ্গভঙ্গ ও বন্দেমাতরম মহামন্ত্র ঃ- ভারতবর্ষ, স্বাধীনতা সংগ্রাম বন্দেমাতরম বড় প্রিয় নাম, বুক ফাঁটা উচ্চারণ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রক্রিয়ার বিবর্তনের কয়েকটি মাইলস্টোন গভীর তাৎপর্য বহন করে চলছে। সেগুলো হল - ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯১৯ এর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড, ১৯৪২ এর আগষ্ট বিপ্লব।

১৯০৫ সালে ১৯শে জুলাই ইংরেজ সরকার ঘোষণা করেন বাংলা ভাগ হবে। কারণ প্রশাসনিক সুবিধা। এটা উপরের কথা আর ভেতরের কথা ছিল - বাংলার লৌহ সুদৃঢ় ঐক্য, সংহতি, চেতনা বোধকে চিরদিনের মত শেষ করে দেওয়া। সুতরাং উত্তাল আবেগে আন্দোলনে এবং সুতীব্র প্রতিবাদে ভেঙ্গে পড়েছিল বাংলার গ্রামগঞ্জ-শহর।

কোলকাতা ৭ই আগষ্ট টাউন হলে প্রতিবাদ সভা ডাকা হল। বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে মিছিল ছুটে চলছে টাউন হলেব দিকে। কলেজ স্কোয়ারের মিছিল ছিল দীর্ঘ। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে হাতে ফ্ল্যাগ বিভিন্ন শ্লোগানের প্লেকার্ড। তার মধ্যে বন্দেমাতরমও ছিল। হঠাৎই একটি যুবক আবেগ মথিত হয়ে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, ব-ন্দে-মা-তরম্। একটি কণ্ঠ থেকে শত কণ্ঠ,শত থেকে হাজার, হাজার থেকে লক্ষ - কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হল বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম বলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা যায়। বন্দেমাতবম্ গান ১৮৭৫ সালে বঙ্কিম চন্দ্র প্রথম লেখেন আনন্দমঠের জন্য। প্রথম সুরারোপ করেন ১৮৮৬ সালে বিখ্যাত গায়ক 'যদুভট্ট'। তার পর ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়ে কোলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে পরিবেশন করেন সেই গান যার সভাপতি ছিলেন মোঃ রহমত উল্লা।

স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্র নাথ দত্ত) ছোট ভাই ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত। প্রথমে কংগ্রেসী পরে মার্কসবাদী তাত্বিক নেতা গবেষক উল্লেখ করেন যে একদা কংগ্রেসের প্রচার কার্যে জনসভায় বক্তৃতা দেবার জন্যে এক জমিদার বাড়ীতে যান। সকালবেলা হাঁটতে হাঁটতে প্রজাদের কাছে গিয়ে জনসভার আমন্ত্রণ জানালে - এক বৃদ্ধ প্রজা বিনীতভাবে বললেন - 'ইংরেজ তাড়াবো' আগেত এই জমিদার বাবুর অত্যাচাব থেকে কিভাবে বাঁচি সে কথা বলুন। এই ঘটনা ভূপেন্দ্র নাথকে এতই আলোড়িত করে যে ১৯৬৩ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বামপন্থী তাত্বিক নেতা অধ্যাপক ও লেখক রূপে সক্রিয় থাকেন।

১৯১৭ সালের সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর মত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ভারত ইতিহাসে এক বিশেষ ঘটনা।

মানব সভ্যতার দশ হাজার বৎসরের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক উজ্জ্বল দিক দর্শন রূপে চিহ্নিত হয়ে রইল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের উত্থান পতন দিক পরিবর্তন ও ভুল ত্রুটি যাই থাক না কেন, কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী।

১৮৮৫ সালে জন্ম নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বে তার আভ্যন্তরীণ ত্রুটি যুক্ত নেতিবাচক শক্তি কাজ করলেও তার ইতিবাচক দিক ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ। বাংলা পাঁচালী সাহিত্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়- "তোমাকে বধিবে যে গকুলে বাড়িছে সে" নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে।"

একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণ পুরুষ ছিলেন মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)। ১৮৯৩ সালে আফ্রিকায় আবদুল্লার আইনজীবী প্রতিষ্ঠানে ব্যারিষ্টারের চাকুরী নিয়ে যান। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস বিকৃত রূপ দেখে গান্ধী চমকে উঠেন। সেই থেকেই তিনি আফ্রিকায় ১৯১৬ সাল পর্যন্ত নিপীড়িত জনগণের হয়ে অহিংস সত্যাগ্রহ করে বহুলাংশে কৃতকার্য হন। গান্ধীজী দেশে ফিরে চম্পারণের নীল চাষী ও বোম্বের সূতাকল শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী নিয়ে লড়াই করেন।

এদিকে ১৯১৭ সালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হয় এবং বিশ্বে শ্রমজীবী মানুষের নতুন দিগন্ত খুলে যায়। ডঃ কমল কুমার সিংহ তার গান্ধীজীর 'আন্দোলন ও রাশিয়া" বইটিতে যথার্থভাবেই আলোচনা করেছেন যে "মহাত্মা গান্ধী রাশিয়ার পূর্ববর্তী ১৯০৫ ও ১৯১৩ সালের বিপ্লবগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশুনা করেন ও সোভিয়েত লেখক লিউটলষ্টয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।"

বিশ্ব ধনতন্ত্র চরম সংকটের মুখে পড়েই বিশ্ব যুদ্ধ বাঁধায়। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ বৃটিশ ভারতের নেতৃবৃন্দকে বোকা বানিয়ে ছাড়ে। জাতীয় কংগ্রেসের বৃটিশের প্রতি সমর্থন, দমনরূপে মাত্রারিক্ত হয়ে ফিরে এল। ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতায় সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ভীত হয়ে পড়ে। ভারতে তার জোরজুলুম অত্যাচার বাড়িয়ে দেয় এবং ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে মর্মান্তিক হত্যাকান্ড সংঘটিত করে।

১৯১৭ সাল উদ্ভাসিত সকাল ঃ- এই সময়ের কিছু পরে ১৯২০ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু ছাত্র নেতা ও কর্মী কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

এই সকল কমিউনিস্ট মতাদর্শের ব্যক্তিরা ছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাভাষী জাতি ধর্ম ও বর্ণের শ্রেণী স্বার্থের উর্দ্ধে উঠা মানুষ। বাংলায় ছিলেন মানবেন্দ্র নাথ রায়, (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) গোলাম কিব্রিয়া, অবনী মুখার্জী ও সরোজিনী নাইডুর ভাই রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুজাফফর আহমদ, আব্দুল হালিম, আবদুর রেজ্জাক এবং কিছু পরে কবি নজরুল ইসলাম প্রমুখ। নজরুল

নিয়মিত সময়াভাবে সদস্যপদ নেন নাই। অঞ্চলগুলো ছিল কোলকাতা, বোম্বে ও এলাহাবাদ। বোম্বের নেতা ছিলেন শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত আইন সম্মত কমিউনিস্ট পার্টি সৃষ্টি হয় নাই। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর (রুশ কেলেন্ডারের মতে ২৩শে অক্টোবর) সমাজ বিপ্লব সমাধান হলে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠে ঐ সকল দেশের নাম দিয়ে। যেমন সি পি সি (কমিউনিস্ট পার্টি অফ চীন)১৯২৩ সালে গড়ে উঠে। ১৯২০ সালে মধ্যপ্রাচ্যের আফগানিস্থানে ভারতের কিছু দেশপ্রেমিক সমাজতন্ত্রী গড়ে তোলেন সি.পি.আই সংগঠন। এই সংগঠন বহিঃ ভারতে গড়ে উঠায় ১৯২৫ সালে ২৬শে ডিসেম্বর কানপুর সম্মেলনেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম। লক্ষ্য করার বিষয় হল এবং উহা বিজ্ঞান সম্মত যে দিবা রাত্রি আলো অন্ধকার, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া এবং মানুষ ও তার ছায়া পাশাপাশিই বর্তমান। পরের বৎসরে দিল্লীতে রাম নবমী উপলক্ষ্যে গঠিত হয় রাষ্ট্রিয় স্বয়ং সেবক সংঘ নামে একটি আধা সামরিক স্বেচ্ছা সেবী প্রতিষ্ঠান যার পরবর্তী পূর্ণ সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টি। এই সংঘ পরিবারের রহস্যের জন্যে ভিন্ন বইর দরকার। গান্ধী হত্যা, বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং পোখরান তাঁর উৎকৃষ্টতম কাজ।

শত্রু মিত্রের ঠিকানা ঃ- ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনেল প্রতিষ্ঠা হয়। রাশিয়ার সমাজ তান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হবার তৃতীয় বৎসব ১৯২০ সালে বিপ্লবের প্রধান পুরুষ লেনিনের ঐতিহাসিক ক্যালোনিয়্যাল থিসিস গৃহীত হয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনেলের দ্বিতীয় কংগ্রেসে। এই মহা সম্মেলনে বিশ্বের হাজার হাজার দেশ প্রেমিকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভারতের কয়েকজন সমাজতন্ত্রী ও উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো দেশের স্যোসালিষ্ট পার্টির স্রষ্টা মানবেন্দ্র নাথ রায়।

ইনিই ভারত ইতিহাসে এম এন বায় নামে পরিচিত। পূর্বেকার নাম ছিল - নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য। ১৯০৮ সালে শতাব্দীর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসীর পর কংগ্রেসের যুব সংগঠনের একটা বড় অংশ সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দেয়। নরেন্দ্র নাথ সেই দলের কর্মী ও সেবক ছিলেন। তার বিপ্লবী গুরু ছিলেন বাঘা যতীন মুখোপাধ্যায়। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। এই অস্ত্র সংগ্রহের জন্যেই নরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে এম এন রায় ছদ্ম নামে জার্মানীতে পাঠানো হয়। এম এন রায় জার্মানীতে পৌঁছে জানতে পারেন যে বাঘাযতীন উড়িষ্যার বুড়ি বালামের তীরে সশস্ত্র যুদ্ধে প্রথম শহীদ হয়েছেন। হতাশ হয়ে এম এন রায় জার্মান থেকে আসেন রাশিয়ায় এবং এখানে তিনি মার্কসবাদের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। তারপর চলে যান মেক্সিকো দেশে। সেখানে একজন ইংরেজ মহিলার সঙ্গে বিবাহ হয়। তার সাহায্যে এম.এন.রায় প্রথম স্যোসালিস্ট পার্টি অফ মেক্সিকো গঠন করেন।

১৯২০ সালে ভারতীয় দলের সঙ্গে এম এন রায় মস্কো মহা সম্মেলনে উপস্থিত হন। এম এন রায় পরবর্তী কালে 'মাই মেমোরিয়াস' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সেই মহাসম্মেলনের প্রধান পুরুষ ছিলেন মহামতি লেনিন। মানবেন্দ্র রায় উল্লেখ করেন যে জীবনে এমন ব্যক্তিত্ব

সম্পন্ন মানুষ পূর্বে দেখেন নাই। সেই সম্মেলনেই এম এন রায় লেনিনের থিসিসের ভারতীয় অংশে লিখিত বক্তব্য রাখতে উল্লেখ করেন যে ভারতীয় কংগ্রেস দল মূলত সর্বহারা ভারতীয় শ্রমিক কৃষক ও নিম্ন ব্যক্তি বর্গের প্রতিনিধিত্ব করে না। উহা সম্পূর্ণ ভাবেই ধনী বনিক ও রাজা-মহারাজা -সামন্ত শ্রেণীর দল। লেনিনের বক্তব্যের প্রায় বিপরীত একটি বক্তব্য রাখতে এম এন রায়ের সাহস ছিল। এম এন রায় 'মাই মেমোরিয়াসে' উল্লেখ করেন যে এই মহান নেতা বিন্দুমাত্র রাগ না করে আমার বক্তব্য শুনেন। এম এন রায় আরও উল্লেখ করেন যে লেনিন অবলীলা ক্রমে বলতে পারতেন, কোথা থেকে কে হে লেনিনের বিরোধিতা করছ? লেনিন ছিলেন অনেক অনেক বড় মাপের লোক। লেনিন বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদই প্রধান শত্রু। দেশীয় রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক এবং দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে থেকেই কমিউনিস্টদের কর্মসূচী ও কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করা শ্রেয়। ইতিহাসের কি চমৎকার উপস্থিতি যে ১৯২০ সালের লেনিনের সেই বক্তব্য ১৯৯৮ সালে ৩রা আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং সি পি আই (এম)- এর পলিটবুরোর সদস্যদের বক্তব্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ''লন্ডনেও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কংগ্রেসের প্রতি সি পি এমের মনোভাবের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন - তিনি বলেন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকাব গড়লে সি পি এম সেই সরকারকে সমর্থন কববে।'' (আজকাল ৪ঠা আগষ্ট, ৯৮ইং)। আর ২০০৫ সালে চতুর্দশ লোকসভা নির্ব্বাচনের পর কেন্দ্রীয় সরকারে ভারতের কমিউনিষ্ট দল ও বাম পন্থীগণ ইউ-পি-এতে ন্যুনতম কর্মসূচীর প্রশ্ন তুলে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে চলছে। এন-ডি-এ কে ঠেকাতে এটি অপরিহার্য।

মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের হাল ধরেন ১৯১৬ সালে এসে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপামর জনগণের সমর্থন খুবই কম। গান্ধীজী নিজস্ব কিছু ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা, যেমন- সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি এবং অন্য দিকে বর্ণাশ্রমের আশ্রমিক জীবন, পোষাক পরিচ্ছদসহ ব্যক্তিগত জীবনে কৃচ্ছ্র সাধন ইত্যাদি এবং ধর্ম সম্পর্কে সমন্বয়ী মনোভাব গ্রহণ করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষা, গ্রামীণ স্বনির্ভবতার ক্ষেত্রে সমবায়ও সূতাকাটা ইত্যাদি জনগণকে আকৃষ্ট করেছিল সন্দেহ নাই। সবরমতী আশ্রম ছিল এসব ট্রেনিং - এর কেন্দ্র।

মূলতঃ মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেসকে হিমালয়ের চূড়া থেকে মহামানবের সাগর তীরে নিয়ে এলেন। গান্ধীগবেষক মাত্রই জানেন যে এই স্রোত ধারার সীমাবদ্ধতা ছিল যাহা পরবর্তী সংগ্রামের মুখোমুখী হয়ে গান্ধীজীর বক্তব্য ও সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়।

কংগ্রেসের দীর্ঘ ষাট-বাষট্টি বৎসর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ''ভারতের জন্যে স্বরাজ চাই'' স্বাধীনতা চাই' একথা মুখ ফুটে বলতে পারে নাই।

এদিকে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কমিউনিষ্ট ভীতি তীব্র ভাবে বেড়ে উঠে। ইংরেজ গোয়েন্দা সেসিল রিপোর্ট দেন যে 'উত্তরপ্রদেশ ও বাংলাদেশের কৃষাণ সভা' ও ' রায়তসভা 'গুলি স্বাভাবতই কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে ঝুঁকছে। (বলশেভিজম ইন ইন্ডিয়া - নয়া দিল্লী, ১৯১৯)

কংগ্রেসী নেতা বিপিন চনদ্র পাল- ১৯১৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর লিখলেন 'সারা বিশ্ব জুড়ে এক নূতন শক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, জনগণের শক্তি। এরই নাম কমিউনিজম। যদিও ভারতে তখনও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠে নাই।

১৯২১ সালে আমেদাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক সভা হচ্ছে। সভায় কংগ্রেস সদস্যদরে হাতে হাতে ভারতের অপ্রকাশ্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ঘোষণাপত্র দেওয়া হল। সেই ঘোষণায় সই করেছিলেন মানবেন্দ্র নাথ রায় ও অবনী মুখার্জী। ঐ ঘোষণায় বলা হয়েছিল 'ভারতের জাতীয় দাবী হ'ল - পূর্ণ স্বাধীনতা। কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের কিছু নেতা এর সমর্থনে বক্তব্য রাখলেন জোরালো ভাষায়। কিন্তু ভোটাভুটিতে স্বাধীনতার পক্ষে পড়েছিল ৯ ভোট মাত্র। কমিউনিস্টদের এই দাবী শুধু "ছেলে মানুষী" বলে প্রত্যাখ্যাত হয় নাই, পেয়েছিল গালিগালাজ। এই সব কথা লিখে গেছেন কংগ্রেসের নিজস্ব ঐতিহাসিক ও নেতা পট্টভী সীতা রামাইয়া।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দলিলের প্রবক্তারা 'রাশিয়ার দালাল'ইত্যাদি নামে ভূষিত হলেও একথা সবাই জানে যে পরবর্তী কালে জাতীয় কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বাধীনতা', 'স্বরাজ' ও 'ভারত ছাড়' এই সকল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল কমিউনিস্ট রণ নীতির জন্যেই।

মহাত্মা গান্ধী তথা জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার আন্দোলনকে ছোট করে দেখার কোন হেতু নেই। পরন্তু তার যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া দরকাব। আমার প্রিয় অধ্যাপক ও বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত প্রভাত কুমার গোস্বামী বলেছিলেন - তাঁর ছাত্র জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাহুল সংস্কৃত্যায়ন এসেছিলেন বক্তৃতা দিতে। এই বিখ্যাত পন্ডিতকে - লেনিন ও গান্ধীজী সম্পর্কে পার্থক্য কি জিজ্ঞাসা করলে তিনি মাত্র একটি বাক্য ব্যবহার করে বলেছিলেন- 'গান্ধীজী ছিলেন নিরাকার স্বরাজের প্রবক্তা আর লেনিন ছিলেন সাকার স্বরাজের প্রবক্তা। যারা ছোট করে দেখেন তারা ইতিহাস বেঝেনা না। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা অনুভব করবেন কি করে?

ভারতের মত রাশিয়ার জনগণের সংগ্রামও দীর্ঘদিনের। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর বিপ্লব সমাধা হলে ৯ই নভেম্বর বলশেভিক নেতৃবৃন্দ যে ঘোষণা দিয়েছিল - তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, দেশীয় ক্ষেত্রে সকল জমির মালিক কৃষক। সকল শ্রমশিল্পের মালিক শ্রমিক ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে কোন জাতি স্বাধীনতাব জন্যে ও সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদে ব্রতী হবে, সোভিযেত তার পাশে থাকবে ইত্যাদি। ১৯৭১ সালে ভারত সোভিয়েত ২০ বছরের চুক্তি তারই ইতিহাস বহন করে এনেছে। ১৯৯০ সালে মহাপতন পর্যন্ত ৭৩ বৎসর এই নীতি রক্ষা করে গেছে।

সুতরাং বর্তমান ভারতের চল্লিশ বৎসর বয়সের যুবক-যুবতী যাঁদের কাছে কিছু সংখ্যক মতলববাজ, মুরুব্বী এবং তাদের পত্র পত্রিকা ও সাহিত্যের উর্বর জমির কৃতদাস লেখকগণ বলছেন- স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের অবদান নেই, বিরুদ্ধাচরণ করেছে, এমন সব অসত্য অর্ধসত্য শোনাচ্ছে, তাদের তৈরী থাকা দরকার যে এই সকল মানুষ যখন সত্য জানবে ও বুঝবে তখন তাদের ক্রোধ ও ক্ষোভ এদের মুখোশ খুলে দেবে। বামপন্থীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবস্থান এবং রণকৌশল কম বেশী সুস্পষ্ট ও সঠিক ছিল।

একথা সত্য যে ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুইটি ধারা পাশাপশি এগিয়েছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের প্রবাহ দু'কুল ফুলে উঠে ছিল। লবণ আন্দোলন শুধু শুল্কের বিষয় নয়, সাধারণ মানুষের গলাধঃকরণের সঙ্গে গান্ধী উদরে গিয়েছিল। ডান্ডি পদযাত্রার ঠুক ঠুক শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। আর একটি ধারা তার স্রোত কম হলেও প্রবাহিত হয়ে চলছিল মার্কসীয় পথে, শ্রেণীহীন সমাজতন্ত্রের দিকে। অর্থনৈতিক শ্রেণী বিলুপ্তি যার দর্শন। এটা বৈপ্লবিক আপোষহীন ধারা।

বামপন্থীরা জানত এই জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম আখেরে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করে। শুধু কায়দা ও কৌশল পল্টায়ে চলতে হয়। এভাবে বুর্জোয়া বিপ্লব সমাধা হয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মুখ খুলে দেয়। এ জীবনে যেমন কিছুই ফেলা যায় না, তেমনি মানব সভ্যতার স্রোত মহামিলনের উৎসে পৌঁছে। গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে বামপন্থীরা ছোট করে দেখে নাই। মার্কসীয় দর্শনের প্রবক্তা হীরেন মুখার্জী বলেছেল- আমরা বিপ্লবীরা কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেশীও নয়, কমও নয় গান্ধীর ভাব শিষ্য। ই এম এস নামবুদ্রীপাদ বলেছেন - সেই সময়ে গান্ধীজী অন্য সকল মানুযের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন, তাদের সমস্যার কথা জানতেন। ডাঙে বলেছেল - গান্ধী মানুষ থেকে শিখতেন ও তাদের পরিচালনা করতেন। কবি সুকান্ত গান্ধীজীর উপর দীর্ঘ প্রণতি কবিতা লিখেছেন। হো-চি-মিন বলেছেন - গান্ধীজী থেকে শিখেছি, শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি। ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট হবার পর হো-চি-মিন তখন এক জনসভায় বলেছিলেন - ব্যক্তিগত সম্পদ বলতে আমার দু'প্রস্থ পোষাক আব স্নানের গামছা ছাড়া কিছুই নেই। এসব কথা নৈতিক অধঃপতিত ভোগবাদী নেতাদের কানে গরম লৌহদন্ডেব মত মনে হবে। এদের উন্মুক্ত করার দায়িত্ব নিতে হবে কর্মীদের।

আগেই বলা হয়েছে গান্ধীজীর সংগ্রামে সীমাবদ্ধতা ছিল। সেই জন সংযোগ বিচিত্র পথে গেলেও সর্বত্রগামী হয় নাই। বামপন্থীরা স্বাধীনতা আন্দোলনকে মাটিব কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। ভি.টি.রণদিভে উল্লেখ করেছিল- যে ইংলন্ডের ম্যানচেষ্টাব গার্ডিযান পত্রিকায় (১৯২১ আগষ্ট) লিখে ছিল "বিগত দুই বৎসরের ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে বিবেক বর্জিত কমিউনিস্ট সংগঠকদের হাতে শিল্প শ্রমিকরা নমনীয় উপাদান।"

১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতি দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলে দেখা যায় - ১৯২৫ সালে ২৬শে ডিসেম্বর কানপুরে জন্ম নেওয়া কমিউনিস্ট পার্টির উপর বৃটিশের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। উল্লেখ থাকে যে ঐ একই বৎসর ভারতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘেরও জন্ম। বৃটিশ কমিউনিস্টদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে দিয়ে বছরের পর বছর আবদ্ধ করে রাখত। পুরো বৃটিশ সময়টায় মাঝে মধ্যে ছাড়া, পার্টি অধিকাংশ সময় ছিল বে-আইনী ঘোষিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন করলে পুনরায ছাড়া পায়।

১৯৪১ এর ২৩শে জুন হিটলার ও ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ

করার পর জাতীয় কংগ্রেস এক জরুরী সভায় প্রস্তাব নেয় যে - সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সব মানবিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতীক যদি এই সব উদ্যম ও সাফল্য বিনষ্ট হয়, তবে মানব সভ্যতার পক্ষে তা হবে চরম ক্ষতিকর। একই সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বলল যে সোভিয়েত উনিয়নের উপর আক্রমণ মানে সামজতন্ত্রের দুর্গের উপর আক্রমণ। মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ তখন মৃত্যু শয্যায়। গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখেন - যে দিন কবিকে অপারেশন করা হয় তার আধ ঘন্টা আগে কবি উদগ্রীব হয়ে বলেন - রাশিয়ার খবর বল। গৌতমবাবু লিখলেন - একটু ভাল মনে হচ্ছে। হয়ত একটু ঠেকিয়েছে, কবির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো , বললেন- হবে না ? ওদের হতেই হবে। পারবে ওরাই পারবে। এটাই ছিল কবির শেষ আশীর্বাদ । সেই শয্যা থেকে কবি আর উঠেন নাই। এই সময় মহাত্মা গান্ধী বললেন,- 'এই যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটলে বিশ্বের সর্বহারা মানুষের হয়ে কথা বলাব কেউ থাকবে না'। গান্ধীর রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই, কিছু রাম ভক্তরা এখন হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন। সৎ ও সত্যবাদী দূরদর্শী গান্ধীজীর সোভিয়েত মূল্যায়ন ছিল সঠিক তাহা আমরা ২০০০ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশের মধ্য প্রাচ্যের ধ্বংসালীলায় অনুভব করতে পারি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্লিন ধ্বংস হল। সমাজতন্ত্রের জয় হলো। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ। বিংশ শতাব্দী মানব মুক্তির শতাব্দী হলেও দুটি বিশ্ব যুদ্ধ তার শ্রেষ্ঠ কলঙ্ক।

ভারতে বামপন্থীগণ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছিল, তাই বৃটিশের চোখে কমিউনিস্টরা ছিল এক নম্বরের শত্রু। এই যুক্তির পক্ষে বামপন্থীরা অসংখ্য দলিল হাজির করতে পারে।

গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি বাংলার বিপ্লববাদ ব্যর্থ হবার পর বৃটিশ জেল প্রত্যাগত বন্দীদের কমিউনিস্ট পার্টিতে অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে । উল্লেখ থাকে যে এবং আগেও বলা হয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থকতায় গর্ভাব চিন্তিত হয়ে ভারত উপনিবেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়। তাদের ধারণা জন্মে, যে বিষয় ও বিষয়ীগতগুলি (Subjective and objective condition) বিপ্লবের সহায়ক শক্তিরূপে উপাদান তার সবটাই ভারতে বর্তমান। তাই এখানে দ্রুত বিপ্লবী পরিস্থিতি তৈরী হবে, এমন কি তাকে কৌশলে বাঁধা দেওয়া গেলেও একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠবেই। অন্যদিকে ইটালীর ফ্যাসিস্ট ও জার্মানীর নাজিবাদী শক্তির বিশ্বগ্রাসী আস্ফালন দেখে বৃটিশ শক্তি গভীরভাবে ভীত হয়ে পড়ে। এই দো-মুখো অস্তিত্ব রক্ষাব সংকটে বৃটিশ কূটনৈকিতগণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা গড়ে তুলতে মার্কসীয় দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠার জন্যে এবং তারই ফলশ্রুতিকে নিয়মিত মার্কসবাদী দর্শন ও সাহিত্য দিয়ে ভারতের জেলখানাগুলোকে মার্কসবাদী পাঠাগারে রূপান্তরিত করে ফেলে। তার জন্যেই বাংলা ও ভারতেব স্বদেশীগণ জেলে প্রবেশ করলেন, বিপ্লবী রাজবন্দী হয়ে বের হয়ে এলেন কমিউনিস্টমতাদর্শীরূপে। এভাবেই ছোট কমিউনিস্ট পার্টি অনেকটা কর্মসূচীহীন বিক্ষিপ্ত প্রাথমিক পর্যায়ে হঠাৎ বড় হয়ে উঠে।

এখানে একটি ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ত্রিপুরায় কয়েক বৎসর আগে ১৯৮৮ সালে কংগ্রেস টি ইউ জে এস জোট সরকারের সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সম্পাদক প্রয়াত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পরে পার্টি থেকে বহিঃস্কৃত নৃপেন চক্রবর্তী। তিনি উল্লেখ করেন যে ১৯৩৫ খ্রীঃ জেল প্রত্যাগত হয়ে যখন তিনি কলেজ স্কোয়ারে রাজনৈতিক মতাদর্শে হতাশ ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন সেই সময় সদ্য প্রয়াত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় নিজে যেমন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তেমনি শ্রী নৃপেন চক্রবর্তীকেও যোগদান করার জন্যে পরামর্শ দেন। এভাবেই এক সময়ের বাংলার বিপ্লবী অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর পার্টি ও ঢাকার শ্রীসংঘের অনেক সদস্যই পরবর্তী কালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং অন্য একটি বড় অংশ কংগ্রেসে মিশে যায়। আবার কেহ কেহ বিপ্লববাদ, গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদের ঘুর্ণিপাকে পড়ে উষ্ণ রাজনীতি ছেড়ে সাধুসন্ত কালী সিদ্ধা ও অবশেষে নিশ্চিন্ত "স্বাধীনতা সংগ্রামী" পেনশন ভোগী হয়েছেন।

আমরা আর একটু পেছনে গিয়ে দেখতে পাই যে গান্ধীজী যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্লাবন আনেন তাতে কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থীগণ একটি মঞ্চে এসে পড়ে এবং হিন্দুয়ানীর (গো রক্ষা, অবতারবাদ বর্ণাশ্রমিক জাতপাত) বাড়াবাড়ি সংখ্যালঘু মুসলমানদের মনঃক্ষুন্ন করে এবং তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথ ধরে মুসলীম লিগকে পুষ্ট করে। চরম পন্থীর একটি অংশ গান্ধী প্রবর্তিত পথ ছেড়ে বিপ্লববাদের পক্ষে চলে যায়। বৃটিশরা তাকে সন্ত্রাসবাদী বলতো। এই সকল বিচ্ছিন্ন বিপ্লববাদীদের দেশপ্রেম সম্পর্কে জনগণের গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও বিপ্লবীগণ জনসমর্থন লাভ করে নাই। বিক্ষিপ্তভাবে তারা বৃটিশকে বিব্রত করলেও বিপ্লবীগণ ব্যর্থ হন। সূর্য সেনের মত লোকের উজ্জ্বল দেশপ্রেম সম্পর্কে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। থানা লুট করে অস্ত্র লাভ করলেও সেই অস্ত্র বহন করার মত লোক ছিল না। পরন্তু দেশের লোকেরা এই সকল বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিত। পরবর্তীকালে এই সকল ব্যর্থ বিপ্লবীগণ প্রায় সকলেই বামপন্থী রাজনীতিতে এসে পড়েন।

বর্তমান শতাব্দীর শেষে বামপন্থীগণ যেমন, বিশ্ব শান্তির প্রশ্নে আমেরিকার নয়া সাম্রাজ্যবাদকে শত্রু মনে করে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতপাত ও সাম্পাদায়িক শক্তিকে দেশের সংহতির পক্ষে বিপদজনক মনে করে এবং তাকে শক্ত মোকাবেলা করার জন্য জনগণের দরজায় নিয়মিত কড়া নেড়েই চলছে, তেমনভাবেই প্রাকযুদ্ধ কালে জার্মানীর হিটলার, ইতালীর মৌসুলিনি ও জাপানের তোজোকে মানবতার চরম শত্রু বলেই ঠিক নিশানা করেছিল। কমিউনিষ্টদের "জাপানকে রোখো" যদি দেশদ্রোহিতা হয় তাহলে সেই সময় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ ও জহরলাল নেহরু আরও অনেক বেশী শক্তভাবে বিবৃতি দিয়েছেন। সেই বেলা কি হবে? ১৯৪২ সালে এপ্রিল মাসে আজাদ বললেন - "যারা মনে করেন জাপান, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে, তাদের মনোবৃত্তি ক্রীতদাসের।" নেহরু বললেন, আমাদের এরকম ভ্রান্ত ধারণা নেই যে

হিটলার আমাদের স্বাধীনতা দেবে।" ঐ সময় উগ্র হিন্দুত্ববাদীগণ বাংলার গ্রামে গঞ্জে "চেতাবানী বই এর মাধ্যমে হিটলার ও তার স্বস্তিকা বাহিনীকে নরনারায়ণ ও কল্কি অবতার ঘোষণা করেছিল। বামপন্থীগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণে নিয়োজিত ছিল। ১৯৪৬ সালে সারা বাংলায় প্রসিদ্ধ তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত করে "নাঙ্গল যার জমি তার" শ্লোগান তোলা হয়। দেশের শ্রমিক কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার পক্ষে আনা কি দেশদ্রোহিতা?

যেভাবে কমিউনিস্ট পার্টি ৩১শে অক্টোবর, ১৯২০ সালে বোম্বের এম্পায়ার থিয়েটার হলে এ আই টি ইউ সি সংগঠন করে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে স্বাধীনতার পক্ষে সংগঠিত করেছিল, তেমনিভাবে সারা বাংলাব্যাপী "তেভাগা আন্দোলন করে" কৃষক শ্রেণীকেও ঐক্যবদ্ধ করেছিল। বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে তখন দেশের কৃষক কূল অস্থি চর্মসার হয়ে উঠে।

১৯৩৭ সালে অবিভক্ত বাংলার কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক, প্রধানমন্ত্রীর (মুখ্যমন্ত্রী) সময় ঋণশালিসী বোর্ড গঠন করে মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের সাময়িক রক্ষা করে ছিলেন।"গরীবের বন্ধু হক সাহেব" এমন একটি কথাও তখন মুখে মুখে চলতো। ১৯৪০ সালে ভুমিরাজস্ব কমিশন বর্গাদারদের দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদিত ফসল দেবার ন্যায্য দাবী গৃহীত হয়। এই আইন বিধানসভায় পাসও হয়। কিন্তু সুরাবর্দ্দি মন্ত্রিসভা তাহা প্রয়োগ করতে শ্রেণী স্বার্থে গড়িমসী করেন। সে সময় কৃষকদের মধ্যে ৪১ শতাংশ ছিল বর্গাদাব। বামপন্থী কমিউনিস্টরা কৃষকসভা গঠন করে তাদের ন্যায্য দাবীর পক্ষে সংগঠিত করে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বের বৎসর ১৯৪৬ সালে সারা বাংলায় "তে-ভাগা আন্দোলন" ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর কৃষক বামপন্থী নেতৃত্বের অধীনে আসছিল তাদেখে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ শঙ্কিত হয়ে উঠে। ১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ জ্যোতি বসু বক্তৃতা দিতেগিয়ে বলেছেন - " আমি নিশ্চিত যে দিনাজপুরের সমিরুদ্দিন এবং শিবরামের (সাঁওতাল) মত মানুষেরা যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাদের এই প্রাণদান ব্যর্থ হবে না। পুলিশের বুলেট যখন তাঁদের দেহকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তখনও তাঁবা 'তেভাগা চাই' জান দেবো তবু ধান দেবো না, বলে লুটিয়ে পড়েছেন।'

বর্তমানে পশ্চিবঙ্গের ভূমিসংস্কার নিয়ে আমরা যে গর্ব করি এবং যাহা সারা ভারতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে এবং প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কারের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন তার মূল গোড়া ছিল ১৯৪৬। ৪৭ সালে বাংলার তেভাগা আন্দোলনের গবীর কৃষকদের রক্ত ঋণ শোধ করার দায়বদ্ধতার মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের ২৮ বৎসর শাসন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সফলতাও তেভাগা আন্দোলনের ফলশ্রুতি। যদিও পশ্চিমবঙ্গে এখনও কৃষক রমনীদের দু'বেলা দু থালা গরম ভাত, দুটা শাড়ী দু'টা ব্লাউজ, মাথার উপর ছাদ, শিক্ষা স্বাস্থ্য সবার জন্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

বাংলার কৃষকদের দুরবস্থা ও আন্দোলন কয়েকদিন বা কয়েক বৎসরের নয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বাংলার কৃষক" এবং সিপাহী বিদ্রোহের তিন বৎসর আগে সাঁওতাল সিন্দু-কানুর জমি-ক্ষুদার বিদ্রোহ অনেক দিনের। উক্ত শতাব্দীতেই সিপাহী বিদ্রোহের আগে মহাজনদের জমির

উপর হিংস্র থাবার বিরুদ্ধে তারা আটবার বিদ্রোহ করেছিল।

"আগ ডোম বাগ ডোম ঘোড়া ডোম সাজে" সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মৃতি। সুতরাং এটা সত্য যে স্বাধীনতাই হোক আরা বিপ্লবই হোক তার পূর্বশর্ত সাংস্কৃতিক জীবন চর্চা। ভারতের বামপন্থীগণ ১৯৩৫ সালে বাংলা দেশে ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রগতি লেখক সংঘ গঠন করে। এই সংগঠনে যুক্ত ছিলেন জহরলাল নেহরু, রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু সহ বাংলার প্রগতিশীল লেখক ও বুদ্ধিজীবিগণ। তারাই গণনাট্য সংঘ সহ সাহি[illegible]তির নবযুগের সৃষ্টি করেছিল। বুর্জোয়া ধনত[illegible]ন্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের এই রণনীতি স্বাধীনতা সংগ্রামে [illegible]শেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক অধ্যাপক সুশোভন সরকার ছদ্ম নামে এক প্রবন্ধ লিখলেন, "রাসবিহারী বসু সম্ভবত জাপানের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তারা দেশ ভক্ত কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তাদের চোখ অতীতের দিকে। বর্তমান জগতের অবস্থা তারা বুঝতে চাননি। হয়তো তাদের বিশ্বাস যে, জাপানকে দিয়ে শুধু কার্যোদ্ধার করে নেবেন। আমরা যেন না ভুলি তার দাম দিতে হবে সাধারণ লোকদেরই।"

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন - ১৯৪৬ সালে বোম্বাইর নৌ-সেনারা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। বামপন্থীগণ এই বিদ্রোহের সমর্থনে দেশব্যাপী ধর্মঘট করেছে। তিন শতাধিক কমিউনিস্ট প্রাণ দিল। ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী বললেন - "এই বিদোহে কংগ্রেস নেতৃত্বের সমর্থন নেই। একে সমর্থন করছে, কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ ও কমিউনিস্টরা।"

যে নৌ-সেনাদের বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতাকে এক বৎসরের মধ্যে ত্বরান্বিত করে আনলো এবং তাকে সমর্থন করে তাজা রক্ত বৃটিশের গুলির মুখে ঢেলে দিল তারা হল স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী, আর যারা অলস হয়ে বসে রইল তারা হল সাচ্চা "দেশপ্রেমিক"। তার জবাব দেবে ইতিহাস।

কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে যে অভিযোগগুলি প্রায়ই মুখ রোচক হয়ে শুনা যায় তার জবাব দেওয়া দরকার। ১৯৪১ সালে জুন মাসে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' হঠাৎ 'জনযুদ্ধে রূপান্তরের সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়। ওটা ছিল সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট দায়বদ্ধতার প্রশ্ন এবং সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক। ঐ সময় ভারতেব জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ, ভাববাদী সাহিত্যিক, কিছু কিছু ধর্মীয় ব্যক্তি সম্পর্কে পার্টির সাহিত্য সমালোচনায় যথার্থ মূল্যায়ণ হয় নাই এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়েছে তাহা পরবর্তীকালে জনসাধারণের কাছে স্বীকার করা হয়েছিল।

বামপন্থীদের ভুলত্রুটি হয় নাই এমন নয়। তারা সেই ত্রুটিব কথা স্বীকার করেছে, সংশোধন করে নুতন কর্মপন্থা নিয়েছে। কিন্তু আজ একথা অস্বীকার করার কি আছে যে স্বাধীনতা সংগ্রামে দগদগে ভুলত্রুটিগুলোই এখন স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুলছে।

ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়নের বিষয় আজও অভিযোগ শুনা যায়। তার যথার্থতার জন্যে দেশবাসীকে আরও কুড়ি বৎসর অপেক্ষা করে শ্রীমতী গান্ধীর "গরীবী

হটাও'' শ্লোগান শুনতে হয়েছিল?

ভারতের স্বাধীনতা উত্তর যুগে কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম দশ বৎসরেই ১৯৫৭সালে কেরালায় বামপন্থী সরকার গঠন করে। কিন্তু সেই সরকাবকে পরিপূর্ণ স্থায়ী হতে দেওয়া হয় ন'ই। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার স্থায়ী হতে পারে নাই। এদিকে ভারতের বাজনৈতিক পরিমন্ডলে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটেছে যথেষ্ট এবং একদলীয় সরকার গঠনেব সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। তাই 'হ্যাং পার্লামেন্ট' নামে একটি সুন্দর রাজনৈতিক শব্দ দ্রুত পরিচিতি লাভ কবছে। ১৯৯৭ সালের ভারতের সংসদ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে ভারতে প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করার আহ্বান এসেছিল। কিন্তু সি পি আই (এম) পার্টি এই প্রশ্নে সর্বসম্মত হতে পারে নাই বলে ''ঐতিহাসিক ভুল'' কি ''শুদ্ধ' তার বিচার করবে মানুষ ও তার ইতিহাস। ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ১৯৯৯ সালের ৩রা অক্টোবরের নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে এলো।

ভারতের এই রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিচ্ছে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নয়া নূতন কৌশল। তার মুখোমুখি হতে পারে বামপন্থীদলসমূহ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিকদল ও দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলো। তার বিকল্প অবশ্যই কোন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি নয়। অতীতের শক্তিশালী মুসলীম লীগ মুছে গেছে।

সাম্প্রতিক ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে আনন্দ বাজার লিখছে মাদ্রাজে শঙ্করাচার্য পীঠস্থানের মঠাধ্যক্ষ জ.য়চন্দ্র সরস্বতী মনে করেন - মঠকে চার্চ ও মসজিদের মত রাজনীতি সচেতন করতেই হবে। ত্রিপুরা দর্পন ৮৬'র এক সংবাদে জানা যায়, আগরতলায় ১৪টি আশ্রম প্রতিষ্ঠান বলছে ভোগারতি দিয়ে আর চলছে না''। এসব কিসের ইঙ্গিত? স্বর্ণ মন্দির খালিস্থানের পীঠস্থান হয়েছিল।

বিচ্ছিন্নতাবাদ চরমভাবে জনস্বার্থে আঘাত করছে। সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থীর পথ, আতঙ্কবাদের পথ বেছে নিয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র দেশের কুটির শিল্পের রূপ নিচ্ছে। ১০ কোটি শিক্ষিত বেকার, দ্রব্য মূল্য ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে সাধারণ লোকের নাভিশ্বাস। এ সকল প্রশ্নের সরল সমাধান না করে শুধু লাল দূর্গ ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও এই শ্লোগান কয়টা ভোট এনে দিতেপারে। কিন্তু এই কমিউনিস্ট ভীতি কাদের গোপন ইচ্ছাকে চরিতার্থ করবে। আব তার মূল্য দিতে হবে সাধারণ মানুষের নয় কি? একদা ইউরোপের জার্মান ও ইতালীতে কমিউনিস্ট ভূতের আতঙ্কে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল। তার মূল্য সেই দেশকে কড়ায় গন্ডায় হিসেব করে দিতে হয়েছিল। এটা ইতিহাসের শিক্ষা। ভারত ইতিহাসের পক্ষে থাকবে না উলটো দিকে যাবে এই নীতি নির্দ্ধারিণের কাল উপস্থিত।

এই প্রবন্ধ যখন লিখা হচ্ছে তখন ভারতেব সি পি আই, সি পি আই (এম) দলের প্রতি তিন বৎসর অন্তর ১৭তম কংগ্রেস সেপ্টেম্বব ও অক্টোবর মাসে হ'য়ে গেছে। বর্তমান জটিল ভারত ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই সম্মেলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশবাসী অবশ্যই পার্টিদ্বয়ের কাছে রাজনীতির ক্ষেত্রে নূতন মাত্রা, কর্মসূচী ও নির্দেশিকা কামনা করে। এটা অপ্রত্যাশিত যে একই

দেশে দুটি কমিউনিস্ট পার্টির সমান্তরাল অবস্থান ১৯৬৪ থেকে চলে আসছে। তারা কাছাকাছি আসছে অথচ মিশে যাচ্ছে না। মার্ক্সবাদের বিকল্প এখনও নেই। উভয় দল সম্মেলনে বামগণতান্ত্রিক শক্তি দেশপ্রেমিক শক্তি ও অমৌলবাদী শক্তি সমূহের ঐক্যের কথা আরও বৃহত্তর পটভূমিতে ডাক দিয়েছে। কিছু কিছু দল নিয়ে গত ৩০ বৎসর সরকার গঠনের অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তার নূতন করে মূল্যায়ণ দরকার। এটা শুধু ভোটের ঐক্য না হয়ে যথার্থ সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের ক্ষেত্রেও শ্রেণী সংগ্রামের সূত্রগুলোর নিচুতলা পর্যন্ত প্রসারণ অবশ্যই প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপ থেকে আমেরিকায় পট পরিবর্ত্তন করে এসেছে। দু'টো বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপীয় দেশ সমুহকে বিধবস্ত করলেও আমেরিকা ছিল অক্ষত। এই নয়া সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ও ইউরোপের তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিশ্বায়ন সহ নয়া উপনেবেশিকতার হিংস্র থাবা নিক্ষেপ করে চলছে। তার নির্গলিতার্থ ফলশ্রুতি হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ সাম্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাকে উসকে দিয়ে নবমাত্রায় বিশ্ব শোষন পদ্ধতি কায়েম করা।

ভারত বর্ষ প্রাচীনতম ঐতিহ্যসম্পর্ন সম্পদ শালী দ্বিতীয় বৃতত্তম গণতান্ত্রিক বাষ্ট্র। সাম্প্রতিক কুড়ি মাস আগে ২০০৪ সালে চতুর্দ্দশ লোকসভা নির্ব্বচনে মৌলবাদী বাজনৈতিক সংগঠন বি-জে-পি প্রাধান্যতায় এন-ডি-এ কে পরাস্ত করে জাতীয় কংগ্রেস ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দল সমুহকে নিয়ে এবং সি.পি.আই, সি.পি.আই(এম) আব-এস-পি ও ফরওয়াড ব্লকের মত বামপন্থী দলের সঙ্গে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ইউ.পি এ (ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ এল্যায়েন্স) সবকাব গঠন করেছে। জাতীয় করণসহ আভ্যন্তরিন কিছু কিছু প্রশ্নে এবং বৈদেশিক নীতিব ক্ষেত্রে মতানৈক্য হলেও ভারতের এই রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতিতে সরকার এগিয়ে যাবে এটাই দেশবাসীর কাম্য। বর্ত্তমানে এমন সম্ভবনা দেখা যাচ্ছে যে দুই বিশেষ ধরণের সংযুক্ত মোর্চার মাধ্যমে ভাবত যেন দুই দলীয় শাসন ব্যবস্থার দিকে ছুটে চলছে- একদল ক্ষমতা হারালে অন্য দল প্রতিশ্রুত দিয়ে ক্ষমতা লাভ কববে। জনগণ শ্রোতা ও ভোট দাতার নির্মিত্ত মাত্র। কংগ্রেসেব এমন ধাবনা ও হতে পারে ক্ষমতা লাভেব জন্যে বামপন্থীদের দ্বারস্থ হ'য়ে পাঁজি বানায়ে ছাড়বেন, এসব ভ্রান্ত চিন্তা।

শতাব্দী প্রাচীন প্রায় শোয়াশ বৎসরেব জাতীয়তা বাদী রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেসেব গত ২২শে জানুযারী, ২০০৬ সালে ৮২ তম হাযদ্রাবাদ প্লেনাবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পনের হাজার প্রতিনিধি সহ এই দল অবশ্যই ভারতেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সংগঠন। এই সম্মেলনে -নেহরু-গান্ধীব পরিবারতন্ত্রে সোনিয়া গান্ধীব তনয় রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক অভিষেকেই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে। ভারতের বামপন্থী প্রশাসিত তিন রাজ্যে বিরোধিতা কবাব পক্ষে কোন যুক্তি না দেখায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দুর্ভাগ্যজনক। একটি জাতীয় শ্রেষ্ঠ দলেব পক্ষে এসব বেমানান। জন্মলগ্ন থেকেই কংগ্রেসের সংগঠনে ব্যক্তিতন্ত্র, গোষ্ঠিতন্ত্র, দাদা তন্ত্র, ধর্ম তন্দ্র আঞ্চলিকতা এসবের জ্বরে ভুগে এসেছে। একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতিতে এসব অচল। কংগ্রেসেব সেই ট্রেডিশন অবিরাম সমান তালে সম্মুখের দিকেই চলছে। কেন্দ্রে দোস্তি রাজ্যে কুস্তি যুক্তিহীন

শ্লোগান। এতদসত্ত্বেও কংগ্রেসের মধ্যে একটি প্রগতিসীল বাম পন্থী চিন্তা সচল ছিল ও আছে। এই প্রগতিশীল চিন্তার উত্তর সাধক হোক ৩৪ বৎসর বয়স্ক নব প্রজন্মের নেতা ও কংগ্রেসের কর্ণধার রাহুল গান্ধী - ''হে বীর পূর্ণ কর শূর্ণ আসন''। তোমাকে অভিনন্দন। মেধা ও যোগ্যতার পরিচয়ই শেষকথা।

গত ২৮শে জানুয়ারী,২০০৬ এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টীর সাধারণ সম্পাদক, এ.বি.বর্দ্ধনের একটি মিডিয়া চ্যানেলকে দেওয়া বিবৃতি প্রণিধানযোগ্য —

এই নিউজ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষ্যতকারে এ.বি বর্ধন বলেছেন, ''এবার কেবল বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়, দরকার পড়লে আরও কিছু কড়া পদক্ষেপ নেওয়া থেকে পিছপা হবে না তারা। তাঁর মতেযদি সকরারের ওপর থেকে সম্পুর্ণ বাম শিবির সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে পরের দিনই সরকার পড়ে যাবে। তাছাড়াও তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চার বিরুদ্ধে ন্যুনতম কর্মসুচীর চুক্তি ভাঙ্গার অভিযোগ এনেছেন। বলেছেন নবরত্ন শিল্পের বিলগ্নিকরণ, খুচরা শিল্প নিয়ে এমন অনেক পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে যা ন্যুনতম কর্মসুচীর বিরুদ্ধে যায়। তাছাড়াও তার প্রধান অভিযোগ বিদেশ নীতি নিয়ে। বিশেষ করে আগামী দুই ফেব্রুয়ারী ইরান পরমাণু কর্মসূচী সংক্রান্ত আই এ ই এর বৈঠকের আগে তিনি সককারকে মনে করিয়ে দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে নতি স্বীকার না করতে। ইতিমধ্যেই বাম দলগুলি ইরানের বিরুদ্ধে ভারতের ভোটদানের প্রবল সমালোচনা করে সরকারকে এই ভুল শোধরাবার পরামর্শ দিয়েছে। এ বি বর্ধন বলেছেন, সকরার যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গুলি হেননে চলার চেষ্টা করে তাহলে ভবিষ্যতে তাদের পস্তাতে হবে। সি.পি.আই সাধারণ সম্পাদকের মতে, এটা কেবল প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী বনাম বামশিবির বলে দেখা উচিত হবে না।''
(দৈনিক সংবাদ , ২৮শে জানুয়ারী, ২০০৬)

----- o -----

সমবায়

চিরব্রত রায় বর্মণ

সমবায় একটি পাশ্চাত্য আদর্শ। মানুষের সাধনার ফসলকে কোনও একটি দেশ বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত কবে- সমবায় আন্দোলনের কোন তথ্য নির্ভর সঠিক দিনপঞ্জী না থাকলেও সমবায়ের উদ্যোগের কথা জানা যায় - মার্গারেট বিগবীর "দি ওয়াল্ড কো -অপারেটিভ মুভমেন্ট "গ্রন্থে। এই গ্রন্থে প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমের সমবায় ভিত্তিক কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৬০ সালে উলভইক ও চ্যাথাম ডকের কর্মচারীগণ সমবায় ভিত্তিতে শস্য পেশাইয়ের কল খুলেছিলেন। স্থানীয় মিল মালিকদের এক চেটিয়া মুনাফার প্রতিবাদে-র এই তথ্যটি পাওয়া যায় - জি.ডি.এইচ এব সেঞ্চুরী অব কো -অপারেশন গ্রন্থে।

ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমবায় একটি বক্ষা কবচ-এই চিবসত্য উপলব্ধিব কথাটি প্রথম বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলেন - ইংলন্ডের রবার্ট আওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) ও ফান্সের চার্লস ফোরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭)।

সমবায় সংগঠন সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতির কথা তাঁরা উভয়েই উল্লেখ করে গিয়েছেন - সংঘবদ্ধতা, স্বেচ্ছা প্রনোদিত সহযোগিতা, গণতান্ত্রিক পরিচালনা ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন। আজও এগুলি সমবায়ের নীতি মালার অন্তর্ভূক্ত। এঁদের দু-জনকে পৃথিবীর সমবায় আন্দোলনের পথিকৃত হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৮৪৪ সালের ২৪ শে অক্টোবর ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারের কাছে রচডেল পল্লীর উডলেনে ২৮ জন শ্রমিক মিলে "দি রচডেল ইক্যুইটেবল পাইওনিয়ার্স সোসাইটি" নামে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমেই আধুনিক পৃথিবীতে সমবায় আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত করেন। সমিতিটি ছিল ক্রেতা সমবায় ভান্ডারের মত, যা আজও স্বমহিমায় সক্রিয়।

সমবায় একটি স্বয়ং শসিত সংস্থা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক স্বতঃপ্রনোদিত ভাবে মিলিত হয়েছিলেন নিজেদের সাধারণ অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে। সমবার সম্মিলিতভাবে গড়ে উঠা এবং গণতান্ত্রিক পন্থা পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত একটি উদ্যোগ বলা চলে। ঐক্য, সংহতি, সমতা, স্বাবলম্বন, আত্মসচেতনা হলো এই উদ্যোগের স্তম্ভ স্বরূপ। এবং সমতা, মুক্ত মনের আলোচনা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, সবার জন্য সচেতনার নৈতিক মূল্যবোধের উপর অগাধ আস্থাশীল।

সমবায় আন্দোলন - দেশের দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের এক নিশ্চিন্ত নির্ভরযোগ্য সোপান। সমাজের প্রতিটি উৎপাদন কেন্দ্রে শ্রম এবং শ্রমের উদ্বৃত্তের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। প্রতিটি অর্থকরি উৎপাদনে গ্রামের উদ্বৃত্ত যৌথ মালিকানায় যা সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক।

সমবায় আন্দোলনের আদর্শ -আর্থ-সামাজিক সমস্যার উত্তরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা -

সমবায় আন্দোলনের আদর্শ আজ সারা পৃথিবীময় প্রতিটি দেশের দুর্বল আর্থ-সামাজিব অবস্থার পরিবর্তনে জনকল্যাণমুখী করার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিব উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিকাশের এক বিশ্বব্যাপী দর্শন।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং শিল্প বিপ্লবের ফলে এক নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। পরিণতিতে সমাজে এক ব্যাপক সমাজ বিন্যাসে পরিবর্তন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে এক বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি হয়। নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রম শোষণের মাত্রা দুর্বল অংশের জনগণকে ব্যাপকভাবে উৎপীড়িত করে তুলেছে।

মার্কস বলেছিলেন - ''জন গোষ্ঠীর সমস্ত শ্রেণীর বিলোপ ঘটে গিয়েছিল - এর পরিবর্তে এক নতুন পরিপ্রেক্ষিতে, অস্তিত্বের প্রয়োজনে নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে গেল এবং চাহিদার বাস্তবতা দেখা দিল।''

আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোণে এক নতুন বুর্জোয়া এবং এক নতুন শ্রমিক শ্রেণী বা সর্বহারা সৃষ্টি হল। ফলে, নতুন সম্পদ সৃষ্টিতে নতুন ভাবে শোষণ করার এবং নতুন ধরনের সংগ্রামের রূপ দেখা দিল।

তখন উদ্ধত ধনতন্ত্র - যন্ত্রপাতি ও শিল্প উৎপাদনে ব্রিটেন সমৃদ্ধ হলো এবং পৃথিবীর সমস্ত বাজার দখল করে নিল। এ-হেন পরিস্থিতিতে নতুন শ্রমিক শ্রেণী বা সর্বহারা শ্রেণীর কাছে সমবায় সমিতি গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প ছিল না।

বিশ্বের প্রথম সমবায় সমিতি - রচডেল ইকুইটেবল পাইওনিয়ার্স সোসাইটি।

মহামতি লেনিন বলেছিলেন - সমবায়ের উপর নির্ভর না করলে আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে পারব না। সমবায় সংস্থা সমূহের এক ব্যাপক সংগঠন ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব।

জার শাসন থেকে মুক্ত হয়ে সোভিয়েত রাশিয়া যে এতটা আর্থিক বিকাশ ঘটাতে পেরেছিল তার মূলে ছিল সেখানকার সমবায়িক চিন্তা ধারা - যৌথ খামার, অনেকে মিলে চাষ বাস ইত্যাদি।

সমবায় আন্দোলনের চিন্তা ধারা এবং প্রয়োগ যে আমাদের স্বয়ম্ভরতার সোপান হতে পারে - এই উপলব্ধিটা জাতীর পিতা গান্ধীজীরও ছিল। এবং পাশা পাশি আমাদের জাতীয় নেতাদের বিশেষভাবে পন্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু সমবায় আন্দোলনকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

১৯২৮ সালে সুভাষ চন্দ্র বসুই ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ প্রচারিত এক ইস্তাহারে ঘোষণা করেছিলেন - সমবায়ের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হবে এবং সুদের উচ্চতম হার বেঁধে দিয়ে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ করা হবে। উৎপাদক এবং ব্যবহারিক উভয়ের স্বার্থেই সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

পন্ডিত জওহর লাল নেহরুও ছিলেন সমবায়ের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি বিশ্বাস করতেন

ভারতবর্ষের উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রেই সমবায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আর্থিক শক্তিকে তৃণমূলস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য সমবায় হবে উপযুক্ত মাধ্যম।

বিশ্বকবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ১৯০৪সালে কলকাতার টাউন হলে - হিন্দুস্থান ন্যাশানাল কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তার মূল্যবান ভাষণের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে সমবায়ে উজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি রাশিয়া গিয়ে যখন সেখানকার কৃষি খামার গুলোর কাজ দেখলেন, তখন আনন্দে আপ্লুত হয়ে তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে, ভারতে যে কাজ যেভাবে শুরু করার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তার সফল রূপায়ণ ঘটেছে সোভিয়েত রাশিয়ায়। তিনি অনুভব করেছিলেন বিদেশী সরকার তার সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এ দেশকে শাসন এবং শোষণ করছে। তারা স্থায়ী উন্নয়নের কথা কখনও ভাবে নি।

১৯৩৯ সালে আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইসলাম সমবায়ীদের উদ্দেশ্যে প্রেরণার বাণী হিসাবে কবিতা লিখেছিলেন।

এছাড়া সুভাষ চন্দ্র বসু, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, মানবেন্দ্রনাথ রায়, জওহরলাল নেহরু, জয়প্রকাশ নারায়ণ, বৈকুণ্ঠ লালু ভাই মেহতা, দেওয়েত্রা গোপাল কার্ভে, ধনঞ্জয় রাও গ্যাড্‌গেলি সমবায় আন্দোলনকে শহর-শহরাঞ্চলে, গ্রামগঞ্জে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছিলেন।

ভারতবর্ষ ও সামাজিক অবস্থান -

সমবায় একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পুঁজিবাদের বিকাশের উদ্ভব। কিন্তু ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক পাশাপাশি চলছে। পুঁজিবাদের বিকাশ সম্পূর্ণ না হলেও এদেশে এক চেটিয়া পুঁজি জন্ম হয়েছে ঠিকই। খোলা বাজার অর্থনীতিতে পুঁজির মালিকরা অবশ্যই লাভবান হবে। পণ্যের বাজার, টাকার বাজার ও পুঁজি বাজারের উপর - সরকারী নিয়ন্ত্রণ কম হলে, পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে এ বাজারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

পণ্যের দাম বাড়লে বা মুদ্রাস্ফীতি হলে পুঁজিপতিদের লাভ, সাধারণ মানুষের ক্ষতি। এই শিথিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলেই অর্থনীতিতে দেখা দেয় কালো টাকার দাপট। আরও দেখা যায়, প্রত্যক্ষ কর কমছে এবং পরোক্ষ কর বাড়ছে। দেশীয় এবং বৈদেশিক ঋণ বাড়ছে। বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। পরিণতি একটাই -ভারতবর্ষে গবীর মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। দারিদ্রকরণ প্রক্রিয়া খুব দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে চলেছে। মাঝারি কৃষক-ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক চাষী, বর্গাদারেরা ভূমিহীনে পবিণত হচ্ছে। ওরা সব কিছু হাবিয়ে শহবে কাজের জন্য ভিড় করছে। বস্তিতে জীবন-যাপন করছে । গ্রাম এবং শহরের মধ্যে পার্থক্য বাড়ছে। এই সবের ফল হচ্ছে - দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জন সংখ্যা বৃদ্ধি। বর্তমানে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশ। সারা দেশের এই পটভূমিকায় সমবায় একটি শক্তিশালী এবং বলিষ্ঠ হাতিয়ার গ্রামীন অর্থনীতি পরিবর্তনে।

নয়া অর্থনীতি ও সমবায় -

জন্মলগ্ন হতেই, ভারতের দুর্বল অর্থনীতিতে পরিকাঠামোগত এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তন

ঘটিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জন করাই ছিল প্রথমকার সময়ের জাতীয় সরকারের একাংশের লক্ষ্য। সেইভাবেই, খাদ্যে স্বয়ংভর হওয়ার তাগিদে, কৃষিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তাতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়েছিল। পাশাপাশি, রাজস্বনীতি, আর্থিক নীতি, শিল্প ও বাণিজ্যনীতিতে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সরকারের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী অংশের লক্ষ্যটা ছিল নঞর্থক। জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের দিগদর্শন নির্ণয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে পাথেয় করে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। এই জন কল্যাণমুখী কার্য্যক্রমে সমবায় ছিল মাধ্যম।

আন্তর্জাতিক স্তরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর অগ্রগতির দ্বারাও রাষ্ট্রনায়কেরা প্রবাহিত হয়েছিলেন। প্রথম প্রধান মন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর কথা বলা চলে এবং তিনি যে সমবায় আন্দোলনকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন, তার নিদর্শন হিসাবে পঞ্চাশ দশকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত গরওয়ালা কমিটির রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা যায়। এ রিপোর্ট ভারতের সমবায় আন্দোলনের সীমিত সাফল্যের কারণ হিসাবে গ্রামাঞ্চলের মহাজন, ব্যবসায়ী ও শহরের পুজিঁপতি শ্রেণীর মিলিত বাঁধাকে প্রতিরোধ করার মত উপযুক্ত সরকারী সাহায্য ও সমর্থন সমবায় সংগঠনগুলো পায়নি। এ সত্যের স্বীকৃতির মধ্যে এবং পরবর্তী কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা সরকারের সদিচ্ছার আভাস পাওয়া যায়।

মুক্ত অর্থনীতির জোয়ারে সেই সব উদ্যোগ, উৎসাহই কোথায় হারিয়ে গেল। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে অবাধ বিচরণের প্রবেশিকার ফলে, দেশজ অর্থনীতি প্রচন্ডভাবে অস্বিত্বের লড়াইয়ের সম্মুখীন হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে স্বনির্ভরতা।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের রাস্তা খোঁজার প্রয়োজনে মোহন ধারিয়া, ডক্টর ক্যারিয়ান, অধ্যাপক জে.সি.জৈন সহ অন্যান্য সমবায় নেতারা গড়ে তুলেন কো-অপারেটিভ ইনিশিয়েটিভ প্যানেল এবং এদের চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্য্যন্ত সমবায় আন্দোলনের গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন এবং আদর্শ আইনী ব্যবস্থার রূপরেখা রচনা করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯১৯ সালে সমবায় সমিতির কার্য্যাবলী পরিচালনার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার ভুক্ত হয়। এটি করা হয়, ভারত শাসন সংস্কার বিধি অনুসারে। ভারতের মধ্যে মুম্বাই প্রদেশে সর্বপ্রথম সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে। এর সাত বছর অতিবাহিত হবার পর, ১৯৩২ সালে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজে সমবায় আইন প্রণয়ন করা হয়।

আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সমবায় আন্দেলনের জোয়ার আসে অনেক পরে। দেশ বিভাজনের ফলে, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ব্যাপক সংখ্যক উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় চলে আসার ফলে, রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর প্রচন্ড প্রভাব পড়ে। আগত উদ্বাস্তুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য সমবায় ভিত্তিতে সমবায় সংস্থা গঠন করা হয়।

১৯৪৯ সালে, ত্রিপুরায় সমবায় সমিতি সম্পর্কীয় আইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের

অধীনে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর এলাকায় রাজ্যের প্রথম সমবায় সমিতি গঠিত হয়- স্বস্তি সমিতি।

মুম্বাই সমবায়-১৯২৫ এর ধারা অনুধাবন করে ত্রিপুরা রাজ্যে আইন প্রনীত হয় ১৯৫৮সালে এবং পরবর্ত্তী সময়ে ১৯৭৪ সালে ত্রিপুরা সমবায় সমিতি আইন বিধিবদ্ধ ভবে গৃহীত হয়। উক্ত আইনের অধীন ত্রিপুরা সমবায় সমিতি বিষয়ক নিয়মাবলী রাজ্য সরকার প্রণয়ন করেন।

বর্ত্তমান সময়ে, এই সমস্ত আইনের ধারা -উপ ধারা সমুহগুলি নানাহ ক্রুটিপূর্ণ হওয়ায় সময়ের চাহিদা পূরণে সম্পুর্ণ ব্যর্থ, তাই সমবায়ের আদর্শকে সঠিক দিশায় সার্থকভাবে চাহিদা পূরণে সক্ষম হওয়ার লক্ষ্যে উক্ত আইন গুলোর সংযোজন, বর্জন ও পরিমার্জিত হওয়া জরুরি ভিত্তিতে আবশ্যক।

প্রয়োজনে জাতীয় স্তরে কমিশন গঠন করে কমিশনের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হউক- সমবায়ের সমস্ত দিক খঁতিয়ে দেখার এবং দুর্বল দিকগুলি খুঁজে বেব করে সমবায়ের গণতান্ত্রিক চরিত্র পূনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সঠিক পথের নিশানাব পথ নির্দেশ জ্ঞাপন করুক। পববর্ত্তী সময়ে ১৯৫৪ সালে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটা সম্পূর্ণ সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল। ১৯৫৭ সালে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটেভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ সালে ত্রিপুরা ভূমি বন্ধক ব্যাংক স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে এটা ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারেল এন্ড রুরাল ডেভলাপমেন্ট ব্যাংক হিসাবে পরিচিত।

এইভাবে সমিতির সংখ্যা বাড়তে থাকেএবং বহুমুখীকরণ ঘটতে থাকে ।

১৯৬০-৬১ সালে সমিতির মোট সংখ্যা ছিল ৫৭০ ।

১৯৭৭-৭৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯২৮।

১৯৮০-৮১ সালে দাঁড়ায় ১২১২।

বর্ত্তমানে সক্রিয় সমিতির সংখ্যা ১৫৫১।

১৯৫৮ সালে মোম্বাই সমবায় আইন ত্রিপুরায় সম্প্রসারিত হয়। পরে ১৯৭৪ সালে ত্রিপুরা সমবায় সমিতি আইন বিধিবদ্ধ এবং ১৯৭৬ সালে ত্রিপুরা সমবায় নিয়মাবলী প্রণীত হয়।

১৯৭৮ সালে ভাওয়া কমিটির সুপারিশ কার্য্যকরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

জাতি - উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে ল্যাম্পস্ গঠনের সিদ্ধান্ত হয় (লার্জ সাইজড্ এগ্রিকালচারেল মালটি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি)

অনুরূপ ভাবে ১৯৭৯ সালে অনুপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গবীব কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে প্যাক্স বা প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে রাজ্যে ল্যাম্পস্ -৫৬টি, প্যাক্স - ২১৩টি

প্রাথমিক বিপনণন সমিতি - ১৪টি, শীর্ষ সমিতি -১২টি।

এছাড়াও মৎস্যজীবী, দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতি, চর্ম শিল্প, চা শিল্প, বাঁশ বেত্, তাঁত শিল্প, রেশম

শিল্প, রিক্সা চালক ও পরিবহন ইত্যাদি সমিতিগুলো সক্রিয় আছে।

অসংখ্য কমিটি ও কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও ত্রিপুরায় সমবায় আন্দোলন স্থানীয় সমস্যা উত্তরণে ব্যর্থ। সত্তর দশকের "ভাওয়া কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পার্বত্য অঞ্চলের জাতি-উপজাতির সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে লার্জ সাইজড় এগ্রিকালচারেল মাল্টি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি (ল্যাম্পস্) বা বৃহদাকায় কৃষি সর্বাথ সাধক সমবায় সমিতি গঠিত হয়। পার্বত্য অঞ্চলের জনবসতি, উৎপাদন এবং বাজার ব্যবসার প্রতি লক্ষ্য রেখে সেখানকার অধিবাসীদের সকল চাহিদা যাতে একটি স্থান হতে মিটানো সম্ভব হয়, তারজন্য প্রাথমিক স্তরে ল্যাম্পস্ সংগঠিত হয় ত্রিপুরায়। যেমন হয়েছে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, বিহার, আসাম, কর্নাটক, মনিপুর, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশে।

ত্রিপুরায় ষাটের দশকের শেষার্ধে তখনকার চালু সমবায় সমিতিগুলোকে নিয়ে ল্যাম্পস্ গঠন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবায়িত হয় নাই । পরবর্তী সময়ের ১৯৭৬ ইং সালে, ত্রিপুরায় ল্যাম্পস, স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৯৭৮ সালে জুন মাসে কার্য্যকরী করা হয়।

১৯৭৯ ইং সালে সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের পরামর্শ অনুসারে সাব প্ল্যান এলাকার বাইরে, গ্রামের দুর্বল, শোষিত ও বঞ্চিত কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত এলাকার পুরানো ঋণদান সমিতিগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করে বা নতুনভাবে প্যাক্স্ বা প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়।

ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ স্থাপনে স্বাভাবিক ভাবেই পুরাণো সমস্ত ধরণের সমবায়গুলোকে ঢেলে এই দুই সংখ্যার মধ্যে নিয়ে আসাই সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এই বিষয়টি দপ্তরের আধিকারিকগণের ধারণা স্পষ্ট না থাকায় পুরাণো সমিতিগুলো পূর্বাবস্থায় থেকে যায় এবং প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন হলো - সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য আধিকারিকগণের সম্যক জ্ঞান স্পষ্ট না থাকার দরুন বা অত্যন্ত জ্ঞাত সারে এই আন্দোলনকে কৌশলে স্থবিরতার দিকে ঠেলে দিয়ে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্য।

সমবায় আন্দোলনের সাফল্য, আর্থ সামাজিক সমাজ ব্যবস্থায় বিকাশ ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিকাশের পথকে প্রশস্ত করা।

সমবায় আন্দোলনের সাফল্য- গ্রামস্তরে ঘুষখোর মহাজনের অস্তিত্বের অবসান অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকুর অবলুপ্তি ঘটিয়ে শ্রম এবং শ্রমের উদ্বৃত্ত সার্থক প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

তাই সমবায় আন্দোলন অবশ্যই একই উৎপাদন কেন্দ্রীক হওয়া আবশ্যক এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক সমস্ত পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হওয়া আবশ্যক।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিকাশে, শোষণের অবসান ঘটিয়ে গ্রামীন অর্থনীতিতে, সমাজের

সমস্ত শ্রমজীবি মানুষকে উৎপাদন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করে এক ব্যাপক কর্মযজ্ঞ ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু এই উপলব্ধিটুকু ধনতান্ত্রিক শিবিরের পৃষ্ঠপোষকবর্গ অবগত। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক স্তরেই এই আন্দোলনের সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টিতে সক্রিয়। তাই লক্ষ্য করা যায় দেশ, স্বাধীনতার লগ্নে, জাতীয় নেতাদের দ্বারা, দেশ গঠনে সমবায় আন্দোলনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ১৯৬৪ সালের পরবর্তী সময় কাল থেকে, অর্থাৎ পণ্ডিত নেহরুজীর প্রয়াণের পর থেকে ধীরে ধীরে সমবায় আন্দোলনকে একদম পিছনের সারিতে ঠেলে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দের মধ্যে দিয়ে তা স্পষ্ট। ধনতান্ত্রিক তল্পি বাহক কতিপয় আমলাকুলের শুভেচ্ছায় সমবায় আন্দোলন আজ গুরুত্বহীন। আর যেটুকু সমবায়ের ছায়া অবশিষ্ট আছে তা-ও রাজনৈতিক দলীয় হস্তক্ষেপের ফলে সমবায়ের আজ নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ হওয়া আবশ্যক। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জটিল অবস্থা থেকে দেশকে এর নিজস্ব অর্থনীতির মজবুদ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, পৃথিবীর সমস্ত সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ সমুহের পাশে দাঁড়াতে হবে ভারতকে -অভিভাবকের মত পশ্চিমী খবরদারীর বিরুদ্ধে। সমবায় আন্দোলন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের একমাত্র নির্ভরশীল শক্তিশালী মাধ্যম।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন -

সমবায় আন্দোলন কখনও সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে না, যতক্ষন না, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা যায়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় রাজনৈতিক সুবিধাব জন্য কিছু কিছু রাজনৈতিক দল, সরাসরি সমবায়ের উপর প্রভাব খাটিয়ে, সমর্থন আদায়ের অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে বিভিন্ন স্কীমের দেয়া বিরাট পরিমাণ ঋণের টাকা মুকুব করে দেওয়ায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করা হয়। এবং পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঋণের টাকা মুকুব করে দেওয়ার উদাহরণ সৃষ্টি করে, সমবাযের মূল উদ্দেশ্যকে অর্থহীন করে ফেলা হয়।

সমবায় আন্দোলনকে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য উদ্যোক্তাদের অবশ্যই এলাকা ভিত্তিক নির্দিষ্ট জন বসতি নির্ব্বাচনে, পরিকল্পিত সমবায় উৎপাদন উপযোগী হওয়া আবশ্যক। সমবায়ের প্রতিটি সদস্য পরিবারকে উৎপাদেনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত করে সমগ্র গ্রামটি বা এলাকাকে সমবায় গ্রাম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

পাশাপাশি প্রতিটি সদস্যকে সরাসরি উৎপাদনের সাথে জড়িত করা যায় এমন বিষয় নির্ব্বাচন করে, সমবায় সমিতি গঠন করার মাধ্যমে। তাতে প্রত্যেক সদস্যগণই সমবায়ের সুফল চাক্ষুস করতে সক্ষম হবেন এবং একটা ব্যাপক সংখ্যক কর্মজীবি মানুষকে কাজের সংস্থান যুগিয়ে দেওয়াও সম্ভব হবে।

প্রাথমিকভাবে, দুগ্ধ, মৎস্য, কৃষি, বাগান, স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর গড়ে উঠা শিল্প ইত্যাদি ভিত্তি করে সমবায় সমিতিগুলি এবং সমিতির সকল সদস্যকে উৎপাদেন অংশীভূক্ত করে সরাসরি সাফল্য অর্জনে অবশ্যই সক্ষম হওয়া সম্ভব। এবং লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যাতে করে

যৌথ উদ্যোগ সমবায়ের দ্বারা উৎসাহিত হয় এবং মোট একটি নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক উৎপাদন কেন্দ্র হয়।

সমবায় আন্দোলনকে সাফল্যের জোয়ারে পৌঁছাতে হলে প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। পুরাণো কাঠামোকে সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কার করে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সাফল্যের মাপ-কাঠির উপর গুণগত মান বেঁধে দিয়ে কর্মী নিয়োগে আবশ্যক এবং সমবায় আইন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী প্রশিক্ষন শিবিরের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং কর্মীদের কাজের মুল্যায়ণ হওয়ার এবং তার উপর ভিত্তি করে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

স্বাধীনোত্তর সময়ে জাতীয় অর্থনীতিকে আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে জনকল্যানমুখী করার লক্ষ্যে সমবায় দপ্তরকে জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে কৃষি দপ্তরের সাথে জড়িয়ে মেজর দপ্তর হিসাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এবং বাজেট বরাদ্দও সেই অনুসারে সমানুপাতিকভাবেই করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সমবায় দপ্তরকে গুরুত্বহীন করে বরাদ্দ কমিয়ে মাঝারি এবং শেষ পর্য্যন্ত সমবায় দপ্তরকে গুরুত্বহীন করে মিসিলেনিয়াস ক্যাটাগরি পর্যায়ে আনা হয়। এবং সেই অনুসারে বাজেট বরাদ্দ জাতীয় স্তরে এবং রাজ্য স্তরে কমাতে কমাতে প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়।

সমবায় আন্দোলনকে গুরুত্বহীন করে, এই পর্যায়ে নিয়ে আসার পিছনে যে মানসিকতা ক্রিয়া করেছে, তাকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন। এই অবস্থাটা অবশ্যই ধনতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের পরিকাঠামোকে স্থায়িত্ব দিতে সর্বদা সচেষ্ট। এটা একটা বিশ্ব পরিসরে ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। সমবায় আন্দোলন যে জনগণের মধ্যে গ্রামীন স্তরে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সক্ষম এ চেতনাকে প্রসারিত করার জন্য বাম এবং গণতান্ত্রিক জাতীয় নেতৃত্বের উচিত এগিয়ে এসে, জাতীয় স্তরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা। কেননা, সমবায় আন্দোলন দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার এক দর্শন।

সমবায় আন্দোলনই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয় সম্পদকে আধুনিক প্রযুক্তিকরণের মাধ্যমের সমন্বয় ঘটিয়ে বিপুল শিল্প সম্ভার গড়ে তুলে এই বিশ্বায়ণের যুগে উদার অর্থনীতি ও বেসরকারী করণের উদ্যোগকে প্রতিহত করতে সক্ষম।

(সূত্র ঃ- ত্রিপুরা সরকারের সমবায় দপ্তর হতে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা অবলম্বনে)

----- o -----

রক্ত তঞ্চন আর্শীবাদ না অভিশাপ ?

ডঃ অশোক কুমার ভট্টাচার্য

কেউ কেউ বলেন যে 'রক্ত তঞ্চন আর্শীবাদ' আর তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরতেও তারা পিছিয়ে নেই। তাদের বক্তব্য হল যে সাধারণ কাটা চেরায় রক্ত ক্ষরিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই রক্ত জমাট বাঁধে। আবার আকস্মিক দুর্ঘটনা জনিত ক্ষত যদি গভীর হয় তাহলে রক্ত ক্ষরণ বন্ধের জন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে বাড়ীঘরে সময় সময় গাঁদা পাতা থেঁতো করে লাগিয়ে কাপড়ের পট্টি দিয়ে রক্ত ক্ষরণ বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অর্থাৎ রক্ত তঞ্চিত না হলে একটি জীবনের রক্তক্ষরণ জনিত মৃত্যু ঘটবে। তাই রক্ত তঞ্চন আশীর্বাদ।

কেউ কেউ আবার রে রে করে তেড়ে আসবেন। বলবেন, - "রক্ত তঞ্চনকে আশীর্বাদ বল না, হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত সর্বঅঙ্গে ছড়ানো ধমনীপথ বেয়ে রক্ত অবিরাম সঞ্চালিত হচ্ছে এবং হৃদয়কে সহৃদয় রাখছে। কিন্তু হৃদযন্ত্রের সংযোগস্থলে ধমনীতে কোথাও যদি রক্ত তঞ্চন ঘটে, যদি মস্তিষ্কে রক্ত তঞ্চন ঘটে- তাহলে? তাহলেই হয়েছে। হৃদযন্ত্র সহৃদয়তা হারায়, স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয় এবং এমনকি একটি জীবনকে মৃত্যুর পথেও ঠেলে দেয়। রক্ত তঞ্চন তাই অভিশাপ।

বস্তুতঃ নিঃশর্ত আশীর্বাদ বা অভিশাপ বলে কিছু নেই। সবই যেন শর্তাধীন। হাসিব সঙ্গে কান্না, সুখের সঙ্গে দুঃখ, আনন্দের সঙ্গে বিষাদ, আলোর সঙ্গে আঁধার, মিলনের সঙ্গে বিরহ, দিনের সঙ্গে রাত, আশীর্বাদের সঙ্গে অভিশাপ যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। একের অস্তিত্বই যেন অন্যকে অর্থবহ করে তোলে। আরেক দল লোক বলবেন, "তোমরা আশীর্বাদ -অভিশাপ নিয়ে মেতে আছ। আগে রক্ত তঞ্চন ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে দাও। বুঝতে দাও রক্ত তঞ্চনে কারা সহায়তা করে, কারা বিরোধিতা করে ইত্যাদি।" বিজ্ঞানীরা জানালেন যে রক্তের প্লাজমায় অর্থাৎ জলীয় ভাগে সরল রেখাকৃতিবিশিষ্ট একটি প্রোটিন গোত্রীয় পদার্থ, ফাইব্রিনোজেন বর্তমান, যা দ্রাব্য হবার সুবাদে রক্তের তরল অবস্থা বজায় রাখে। দেখা গেছে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে সরলরেখাবিশিষ্ট দ্রাব্য ফাইব্রিনোজেন আড়াআড়ি বন্ধনবিশিষ্ট অদ্রাব্য ফাইব্রিনে পরিণত হয়। ফলে রক্ত তরল অবস্থা হারায় এবং কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় রক্ত তঞ্চন। (Blood Coagulation)। রক্ত তঞ্চনের ক্রিয়া কৌশল অত্যান্ত জটিল এবং এখনও তা সঠিক জানা যায়নি। তবে বলা হয় এ প্রক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতি এক অপরিহার্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে রক্তে প্রায় ত্রিশ রকমের পদার্থ বর্তমান। এদের কেউ কেউ রক্ত তঞ্চন কারক বা Blood Coagulant. আবার কেউ কেউ রক্ত তঞ্চনে বিরোধিতা করে। এদের

বলা হয় রক্ত তঞ্চন প্রতিরোধক বা Blood Anticoagulant। এই দুটি শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে অনবরত প্রতিযোগিতা চলে। বলা যেতে পারে 'দড়ি টানাটানি' যুদ্ধ (Tug of War), 'যেন কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান।' তাই স্বাভাবিক অবস্থায় এদের মধ্যে একটি সাম্যবস্থা বিরাজ করে এবং রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকে। সাধারণ কাটা চেরায় রক্ত তঞ্চনকারী পদার্থ তঞ্চন বিরোধীদের হারিয়ে রক্ত তঞ্চন ঘটায়। দেহের বর্হিভাগে রক্ততঞ্চন তাই আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে অনুরূপ ঘটনাই মারাত্মক অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে। হৃৎপিন্ডে রক্ত সঞ্চালক শিরায় রক্ত তঞ্চন ঘটলে (Coronary thrombosis) বা মস্তিস্কে রক্ত তঞ্চন ঘটলে (Cerebrat thrombosis) চিকিৎসগণ রক্ত তঞ্চন প্রতিরোধক হেপারিণ প্রয়োগের নির্দেশ দেন। অবস্থা বিবেচনায় জমাট বাঁধা রক্ত অপসারণেরও ব্যবস্থা করা হয়। হেপারিণ হচ্ছে মিউকো পলিস্যাকারাইড বা গ্লাইকোস্যামিনো গ্লাইকান শ্রেণীর 'কার্বোহাইড্রেট'।

মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রাথমিক আবশ্যকীয় উপকরণ হচ্ছে - খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। তারপরেই আসছে শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। আমাদের প্রধান খাদ্য চাল। কোন কোন অঞ্চলে চালের জায়গা দখল করে নিয়েছে গম ও ভুট্টা। চাল, গম ও ভুট্টার প্রধান উপাদান হল শ্বেতসার বা ষ্টার্চ; সুতী বস্ত্র প্রস্তুত হয় সেলুলোজ তন্তু থেকে। আবার বাসস্থান তৈরীর উপকরণ ছন, বাঁশ, কাঠ ও সেলুলোজ সমৃদ্ধ পদার্থ। বিভিন্ন আসবাবপত্রও বাঁশ, কাঠ, বেত থেকে তৈরী হয়। আজকাল অবশ্য কৃত্রিম বস্ত্র বাজারে এসেছে এবং বাসস্থান তৈরীতে ইট, সিমেন্ট, টিন, প্লাস্টিক ইত্যাদি প্রবেশ করেছে। শিক্ষার প্রধান বাহন হচ্ছে বই-পুস্তক। যার জন্য প্রয়োজন কাগজের। কাগজের মূল উপাদান সেলুলোজ। শ্বেতসার ও সেলুলোজ হচ্ছে পলিস্যাকারাইড শ্রেণীভুক্ত কার্বোহাইড্রেইট।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা যায় যে একটি কার্বোহাইড্রেট অণুতে একাধিক হাইড্রোক্সি মূলক বর্তমান, সঙ্গে আছে অ্যালডিহাইড বা কিটোন মূলক। কোন কোন ক্ষেত্রে কার্বোক্সিলেট মূলক, সালফেট বা সালফোনেট মূলকও বিরাজ করে।

ভুপৃষ্ঠে উৎপাদনের দিক থেকে এবং প্রয়োজনের মাপকাঠিতে কার্বোহাইড্রেটের স্থান অদ্বিতীয়। উদ্ভিদ জগৎ সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তি রূপে কার্বোহাইড্রেটে বন্দী করে রাখে। প্রাকৃতিক কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত প্রণালী আয়ত্ত করার জন্য বিজ্ঞানীরা নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আজও এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ রহস্যমুক্ত হয়নি। বলা হয় ভুপৃষ্ঠে দিনে তৈরী হচ্ছে দশের সঙ্গে আরও আটটি পূণ্য জুড়ে যত হয় তত টন কার্বোহাইড্রেট।

কার্বোহাইড্রেটকে মূলতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায় - যেমন শর্করা ও অশর্করা বা পলিস্যকারাইড। শর্করা শ্রেণীর কার্বোহাইড্রেট স্ফটিকাকার, জলে দ্রাব্য এবং মিষ্টি স্বাদযুক্ত। শর্করার মধ্যে আছে মনোস্যাকারাইডভুক্ত গ্লুকোজ বা গ্রেইপ সুগার, ফ্রুকটোজ বা ফ্রুটসুগার, গ্যালাকটোজ বা ব্রেইন সুগার, আছে ডাইস্যাকারাইডভুক্ত দুগ্ধ শর্করা ল্যাকটোজ, ইক্ষু-শর্করা সুক্রোজ বা টেবিল সুগার ইত্যাদি।

বহু মনোস্যাকারাইড অণুর সমবায়ে গঠিত হয় পলিস্যাকারাইড। এরা স্বাদহীন, জলে অল্প

দ্রবণীয় বা অদ্রবণীয় এবং আপাত দৃষ্টিতে অস্ফটিকাকার। আচরণের ভিত্তিতে পলিস্যাকারাইডকে বলা হয় সঞ্চিত পলিস্যাকারাইডবা Storage Polysacharide এবং গঠনসংক্রান্ত পলিস্যাকারাইড বা Structural Polysacharide.

যখন শারীরবৃত্তির চাহিদা মিটিয়ে গ্লুকোজ উদ্বৃত্ত হয় তখন উদ্ভিদজগৎ গ্লুকোজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শ্বেতসারের আকারে জমা রাখে, যেমন ধান, গম, ভুট্টা, আলু প্রভৃতিকে বলা যেতে পারে শ্বেতসারের 'গুদাম ঘর'। প্রাণীজগৎও উদ্বৃত্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনের আকারে যকৃৎ ও পেশীতে সঞ্চয় করে রাখে। অনেকে আবার গ্লাইকোজেনকে নাম দিয়েছেন 'প্রাণীজ শ্বেতসার'। শ্বেতসার হচ্ছে সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড।

বৃক্ষ জগতের গঠন কাঠামো মূলত সেলুলোজ দিয়ে তৈরী। কাঁকড়া, চিংড়ি জাতীয় প্রাণীর খোলাস কাইটিন নামক পরিস্যাকারাইড দিয়ে তৈরী। মিউকো পলিস্যাকারাইড প্রাণীদেহের বিভিন্ন কোষকলায় উপস্থিত থেকে, শারীরবৃত্তিয়, বিভিন্ন ভূমিকা পালন করছে। সেলুলোজ, কাইটিন, গ্লাইকোস্যামিনো- গ্লাইকান হচ্ছে ট্রাকচারেল পলিম্যাকারাইড।

জোঁকের রক্তশোষণে সহায়তা করে তার লালানিঃসৃত একটি রক্ততঞ্চন বিরোধী পদার্থ হিরুডীন। হিরুডীনই মানুষের জানা প্রথম রক্ত তঞ্চন প্রতিরোধক। জোঁকের রক্ত শোষণে, রক্ত তঞ্চন যাতে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে তারজন্য, জোঁকের লালা থেকে নির্গত হয় হিরুডীন। প্রকৃতির এ এক অত্যাশ্চর্য ব্যবস্থা! আপনারা দেখে থাকবেন যে জোঁক কামড়ালে রক্ত ক্ষরণ সহজে বন্ধ হতে চায় না । আর হিরুডীনের উপস্থিতিই এর জন্য দায়ী।

দেহের অভ্যন্তরে রক্ততঞ্চন জনিত রোগের চিকিৎসায় ইনজেকশনের মাধ্যমে রক্ত তঞ্চন নিরোধক হেপারিণ প্রয়োগ করা হয়। হেপারিণ রক্তের সঙ্গে মিশে কাজ করে বলে, রক্ত তঞ্চন প্রশমনক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

বিজ্ঞানীরা কোমারিণ গোত্রীয় কিছু যৌগ প্রস্তুত করেছেন যা রক্ত তঞ্চম নিরোধকের কাজ করে। কিন্তু এগুলি মুখ দিয়ে গ্রহণ করতে হয় ফলে এক্ষেত্রে ক্রিয়াবিলম্বিত হয়।

হেপারিণের উৎস হচ্ছে প্রাণীজগৎ এবং এর আহরণ ব্যয়বহুল। উদ্ভিদ উৎস থেকে হেপারিণের ধর্মসম্পন্ন কোন পলিস্যাকারাইড পাওয়া যায় কিনা বা ঐ রকম পলিস্যাকারাইডকে হেপারিণের ধর্মাবলম্বী করা যায় কিনা তা নিয়ে গবেষণা করেছেন সশিষ্য এই প্রবন্ধের লেখক।

বেল ফলের আঠা, বেল গাছের আঠা, তাল ফলের আঠালো 'বিষজল' নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে উৎসাহজনক ফল প্রত্যক্ষ করা গেছে।

বেলের মহিমা সর্বজনবিদিত। পূজাপার্বন থেকে শুরু করে বেল আমাদের বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। 'বিল্বপত্রাঞ্জলী'র মাধ্যমে হিন্দুরা দেবদেবীর আরাধনা করেন। যাগযজ্ঞতে বেল কাঠের ব্যবহার দেখা যায়। বলা হয় বেল পাতা ও কাঠের গন্ধ মনকে শান্ত সমাহিত করে, ভজন পূজনের পরিবেশ তৈরী করে। বলা হয় বেলের শিকড় (মিষ্টি স্বাদযুক্ত) জ্বর, তলপেটের ব্যাথা, হৃদ্‌যন্ত্রের ধড়পড়ানি প্রভৃতির উপশম ঘটায় এবং বায়ু. পিত্ত, কফ প্রশমিত

করে। পাতার নির্যাস ক্ষুধাবর্ধক ও রেচক। ফুল পিপাসা ও বমন ইচ্ছা দূর করে এবং আমাশয়ের উপশম ঘটায়। কাঁচা ফল তৈলাক্ত, তেতো, ক্ষুধাবর্ধক ও রেচক। কাঁচা ফল ফালি করে কেটে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয় এবং পাকস্থলী সক্রিয় রাখার জন্য এর জলীয় নির্যাস সেবন করা হয়। পাকা ফল মিষ্টি, ক্ষুধাবর্ধক, পেট ঠান্ডা রাখে এবং হৃদযন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে সহায়তা করে।

তালের মহিমাও কম নয়। তালের শিকড় কুষ্টরোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ফুল প্লীহাবৃদ্ধির উপশম ঘটায়। কচি ফলের শাঁস ঠান্ডা এবং গ্রীষ্মকালে খুবই উপাদেয় হিসেবে গণ্য হয়। পাকা ফল মিষ্ট, নেশাকারক, কৃমিনাশক, রেচক। তালের পিঠা ও তালক্ষীর ভোজন রসিক ব্যক্তিদের রসনা তৃপ্তির একটি বড় উপকরণ। তালের বীজ মূত্রবর্ধক ও রেচক।

বেল ফলের বীজবেষ্টিত আঠা থেকে এবং বেল গাছের আঠা থেকে পলিস্যাকারাইড গোত্রীয় পদার্থ আহরণ করা হয়েছে এবং এদের গঠন প্রকৃতি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। তালের পিঠা তৈরীতে পাকা তালফলের শাঁস আহরণ করে কাপড়ে বেঁধে প্রায় বার ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখতে আপনারা দেখে থাকবেন। উদ্দেশ্য হল এর থেকে তেতো জলীয় ভাগ, বলা হয় 'বিষহল' ঝড়তে দেওয়া। এই তথাকথিত 'বিষহল' থেকেও একটি পলিস্যাকারাইড পদার্থ আহরণ করা হয়েছে এবং এর গঠন প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেখা গেছে যে ভৌত রাসায়নিক আচরণে এবং রক্ত তঞ্চন প্রশমন ধর্ম বিচারে এই পলিস্যাকারাইডগুলি হেপারিণের অনুগামী। আরও দেখা গেছে যে বেল ফলের আঠা এবং বেল গাছের আঠা থেকে আহরিত পলিস্যাকারাইডগুলিকে 'সালফেশন প্রক্রিয়ার' মাধ্যমে সালফেট গ্রুপ সংযোজিত করে পাওয়া সালফেটেড পলিস্যাকারাইডগুলি ভৌত রাসায়নিক আচরণে এবং রক্ত তঞ্চন প্রশমণে হেপারিণের ধর্ম অনেকাংশে ধারণ করেছে।

ক্যালসিয়াম দেহের অস্থি ও দাঁতের প্রধান উপাদান এবং রক্ত তঞ্চনের একটি অপরিহার্য উপকরণ। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দৈনিক ক্যালসিয়াম চাহিদা ১.০ গ্রাম। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও শিশুদের দৈনিক চাহিদা ১.৫ গ্রাম আর পয়স্বিনী মায়েদের ক্ষেত্রে দৈনিক ক্যালসিয়াম চাহিদা ৩.০ গ্রামের মত। দুধ, পনির, ডিম, সবুজ শাক্‌সব্‌জি, খর জল ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস। মাছ মাংসেও সামান্য পরিমানে ক্যালসিয়াম বর্তমান। ক্যালসিয়ামের ঘাটতিতে দাঁত ও অস্থি বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ব্যাহত হয় রক্তের তঞ্চন ক্রিয়া। আবার অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম গ্রহণও নিরাপদ নয়। কারণ অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম দেহের অভ্যন্তরে রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে পারে।

হেপারিণ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রক্ত তঞ্চন নিরোধক সঠিক মাত্রায় এর প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। কারণ মাত্রাতিরিক্ত হেপারিণ প্রয়োগ দেহের অভ্যন্তরে রক্ত ক্ষরণ ঘটাতে পারে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাই অবস্থা বিবেচনায় কমশক্তিসম্পন্ন রেভিপারিণ প্রয়োগের পরামর্শ দেন।

গ্রহণ বর্জন কোন ক্ষেত্রেই তাই বেহিসেবী হলে চলবে না। কারণ আশীর্বাদ আর অভিশাপ তো হাত ধরেই চলেছে।

তথ্যপঞ্জী ঃ

1. " The Wealth of India" - A Dictionary of Indian Raw Materials and Industrial Products, C.S.I.R., Vol-I , New Delhi.
2. " Indian Medicinal Plants "
   K.R.Kirtikar and B.D.Basu, Vol-I & IV, Basu, Allahabad.
3. " Mucopolysaccharides"-
   J.S Brimacombe and J M Webber, Elsevier, Amsterdam
4. " Best and Taylor's Physiological Basis of Medical Practice"- J R.Brobeck. The Williams & Wilkins Company, Baltimore.
5. "Physico-Chemical Studies of some Natural and Modified Polysaccharides and their Anticoagulant Properties" Thesis submitted to the Calcutta University in 1984 byAsok Kumar Bhattacharyya

----- o -----

আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে

সুপ্রিয় ভৌমিক

স্বামী বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথ দত্তের ভারতীয় তথা বাঙ্গালী জীবন ধারার রূপরস গন্ধের স্পর্শ সন্ন্যাসী জীবনে বজায় রেখেছিলেন এবং তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, গুরুপত্নী শ্রীমা সারদা দেবীর শিষ্য প্রশিষ্য সমুদয় আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে আলোকিত হচ্ছেন, অবগাহন করছেন। তাদের পূণ্যময় জীবন ধারণ রসসিক্ত হয়ে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের কোটি কোটি ভক্ত পরিজন এই আনন্দের মহা সাগরে ভাসছেন এবং সারা বিশ্বকে এই আনন্দের ভাগীদার করছেন। প্রশ্ন হল, সেই চির আনন্দের রহস্য বা উৎস কি? উত্তর হলো বেদ বেদান্ত উপনিষদ গীতার জীবনাদর্শ ,অর্থাৎ ভারতীয় জীবনধারা। যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার পূর্বের গুরুকূল আশ্রমে মুনি ঋষিদের জীবনধারা। ভোগবাদ না ত্যাগবাদ। ভোগে প্রকৃত সুখ নেই ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। দীয়তাম ভুজ্যতাম। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীয়া।শৃন্যন্তু বিশ্ব অমৃতস্য পুত্রাঃ। অমৃতস্য পুত্রা বয়ম্। আমরা মানুষেরা দেবতাদের মত অমৃতের সন্তান।সুতরাং সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। চন্ডীদাসের এই অসাধারণ অমর উক্তি প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্র শিষ্য বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার শ্রী অতুল প্রসাদ সেন গান লিখেছেন

সবারে বাসরে ভাল নইলে মনের কালো ঘুচবেনা
আছে তোর যা ভালো ফুলের মত দে সবারে।

কবি সম্রাট "বিশ্বকবি" কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের সার্বজনীন ভালবাসার ক্ষেত্রে সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন। তাঁর সংগীত সাহিত্য মূলক রচনা গীতবিতান,সঞ্চয়িতাতে তিনি ভূরি ভূরি প্রমাণ রেখেছেন। ১৮৬১ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম বৎসর) ও ১৮৬৩ (বিবেকানন্দের জন্ম বৎসর) হচ্ছে বিশ্ব মানবসভ্যতার ধারক বাহক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে নরেনের চার দাদা আর নরেন একসংগে মিলে বা এককভাবে রবিঠাকুরের গান গাইতেন।

বিশ্বকবি আর বিশ্বসন্ন্যাসী এই দুই জনের জীবনাদর্শ সংগীত সাহিত্য শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালনা সবই কিন্তু বাংলা ভাষা চর্চার ফসল।

"মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা

তোমার কোলে তোমার বোলে
কত শান্তি ভালবাসা।"

১৮৯৩ সালে শিকাগোতে বিশ্বধর্ম মহাসম্মলনে স্বামীজী বিবেকানন্দ তাঁর পাঁচ মিনিটের বক্তৃতায় অর্ধেক সময় অর্থাৎ আড়াই মিনিট বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। এটা যে নিছক পাগলামি নয় পরমুহূর্তে তিনি যখন বাংলা বক্তৃতাটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে দেখালেন,মাই ডিয়ার সিস্টার্স এন্ড ব্রাদার্স অব এমেরিকা, তখন জোড় হাততালি স্থায়ী হয়েছিল আরো পাঁচ মিনিট। পাশ্চাত্য জীবন ধারায় জড়বাদ ভোগবাদ ছাড়া আর কি আছে ? তাই স্বামীজী বলতেন ওয়েষ্টার্ণ সিভিলাইজেশন ষ্টেন্ডস অন এ ভলকেনো। "A western civilization stands on a volcano". তিনি সারা জীবন পাঁচটা স্লোগান মন্ত্রের মত উচ্চারণ করতেন। ওঁ তৎসৎ,সোহহম, আতানং বিদ্ধি, চরৈবেতি, গুরবে নমঃ। উপনিষদের মূলমন্ত্র সংস্কৃতে রচিত যা ভারতের প্রায় শতাধিক ভাষা সহ পৃথিবীব সব ভাষার জননী। প্রবাদ আছে "স্যান্সকৃট ইজ দি মাদার অব অল ওয়ার্লড ল্যাঙ্গোয়েজেস। "Sanskrit is the mother of all world languages" বাংলা ভাষা সংস্কৃতের খুব কাছিকাছি। প্রমাণ দিচ্ছি। সংস্কৃত - মাতৃ, বাংলা মাতা, ল্যাটিন-মেটার (mater), ইংরেজী মাদার।সংস্কৃত -পিতৃ, বাংলা পিতা, ল্যাটিন- পেটার (Pater),ইংরেজী ফাদার।এবকম অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে ইংরেজী ভাষার জন্ম বাংলা ভাষার অনেক অনেক পরে। ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা। একমাত্র ফরাসী ভাষা সাহিত্য সংসদে ভোকাবুলারীতে Vocabulary শব্দ ভাণ্ডারে বাংলার কাছাকাছি আসতে পারে।

বাংলা ভাষা যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষা বিবেকানন্দের পরেই তা প্রমাণ করলেন ১৯১৩ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজের মাধ্যমে। তার শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে চীনা ভবনেও বাংলা ঢুকল। কয়েক ডজন সাহেব,মেম, চীনম্যান, জাপানী বাংলা ভাষা শেখার জন্য আকুল হল। সেটাতো ইতিহাস। আর বর্তমানে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমেরিকা জয় করেছেন বাংলা ভাষার মাধ্যমে। প্রায সমগ্র ইউরোপ,আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা গান্ধীজীর চেয়ে রবীন্দ্রনাথের সংগীত সাহিত্য কার্য্য নিজেদের জীবনধারায় গ্রহণ করেছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম,শরৎ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল প্রসাদের মত তুখোড় বাংলাভাষী ইংরেজী পণ্ডিতদের সবাইকে মাত করে দিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সাহিত্য জীবনের শেষ দশ বছর তিনি মেঘনাদ বধ কাব্য থেকে শুরু করে বুড়ো শালিকের ঘাড়েরো পর্য্যন্ত যে অমর সাহিত্য কাব্য রচনা করলেন সবই বাংলা ভাষায়। তাঁর "আত্মবিলাপ" ইংরেজী ভাষা ত্যাগ করে বাংলা ভাষা চর্চার

মূর্ত রূপ। তাঁর অমর কবিতা বঙ্গভাষা

> "হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
> তা সবে (অবোধ আমি)অবহেলা করি
> পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ,
> পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি দুঃখকে আচরি
> কাটাইনু বহুকাল ঘুম পরিহরি,
> অনিদ্রা, নিরাহারে যাপি কায়মন,
> মজিনু বিফল তপে অরণ্যে বরি,
> স্বপ্নে তব কুল লক্ষ্মী করে দিলা পরে
> ওরে বাছা! মাতৃ কোষে রতনের রাজি
> এ ভিখারি দশা তবে কেন তোর আজি?
> যা ফিরে অজ্ঞান তুই যারে ফিরে ঘরে,
> পালিলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে,
> মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণ মনিজালে।"

দেড় শত বছর আগে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সিলেবাস আনলেন। সেটাও ইতিহাস।

এবার দেখুন ভারতের দিকে তাকিয়ে। সমস্ত ভারতবর্ষ মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের প্রভাবে আঞ্চলিক ভাষাকে রাজ্যভাষা রূপে গ্রহণ করেছেন। দিল্লী থেকে চেন্নাই পর্য্যন্ত গুজরাট থেকে আসাম পর্য্যন্ত একই চেহারা মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ। দিল্লীতে হিন্দী চেন্নাইতে তামিল,গুজরাটে গুজরাটি, আসামে অসমীয়া - কোথাও ইংরাজী নেই। এই তো সেদিন ত্রিপুরার একজন বাংলা ভাষী পিতার ছেলে চেন্নাই এ জন্ম হয়েছে। তার বার্থ সার্টিফিকেট কিন্তু তামিল ভাষাতে হয়েছে। নবজাত পিতার কাতর অনুরোধেও অত চেষ্টা সত্বেও তিনি ইংরেজীতে বার্থ সার্টিফিকেট আদায় করতে পারেননি। এ সব কাহিনী, গল্প নয়। গল্প কাহিনী হচ্ছে পশ্চিম বাংলায়। পশ্চিম বাংলায় বাংলা মায়ের সুসন্তান রূপকার বিধান চন্দ্র রায় বাংলা ভাষা সরকারী ভাষা করে দিয়ে গেছেন ১৯৬১ সালে। আর ত্রিপুরার প্রথম হিন্দুস্থানী অবাঙ্গালী মুখ্যমন্ত্রী মণীষী বাংলা ভাষা প্রেমী বাংলা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ দিয়ে গেছেন ১৯৬৪ সালে বাংলা ভাষা ত্রিপুরার সরকারী রাজ্যভাষা রূপে। আর এক মনীষী অধুনা প্রয়াত, বাম ফ্রন্টের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী গদীতে বসেই অমর কীর্তি স্থাপন করেছিলেন বাংলা ভাষার সংগে সহযোগী ভাষা ককবরক ভাষা পাহাড়ীদের ভাষা বলে। সব শেষে প্রায় সাত বৎসর আগে বর্তমান

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার জাবী করলেন ত্রিপুরার আইনসচিব (ল সেক্রটারী) বি.বি.সেনাপতির মাধ্যমে তদানীন্তন গভর্নরের একটি আদেশ:-

"In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 2 of the Tripura Language Act 1964 (Act No. 5 of 1964) the State Government hereby appoints 1st day of May 1999 as the date from which Bengali language and the kokborok language shall be the language to be used for all or any of the official purpose of the State of Tripura.

By order of the Governor

Copy to all Departmental Heads
Govt. of Tripura

Sd/- Illegible,
B.B. Senapati
29.4.99

অস্যার্থ ১লা মে ১৯৯৯ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সবকাবী প্রশাসনের ভাষা ইংরেজী উঠে গেল। তার বদলে বাংলা এবং ককবরক অবশ্যই বসবে।ইংরেজী গ্রামারে 3rd person এ "shall" মানে ' must'. অতিঅবশ্যই চালু থাকবে। লক্ষ্য করুন পশ্চিম বাংলা আর ত্রিপুরায় একই ধবনের সরকাব অথচ বাংলার বদলে ইংরেজী ভাষা জগদ্দল পাথরের মত সরকারী প্রশাসনে জনজীবনে গেড়ে বসে আছে। WBCS, TCS, IAS অফিসারদের চাকুবী শর্ত কিন্তু ছয়মাস, উর্ধে একবছরের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা বাংলা/ককবরক শিখতে হবে নইলে চাকুবীতে ছেদ পডবে, প্রমোশন বন্ধ হবে। এই ডেমোক্লিসের খাডা (Democles's sword) ঝুলছে দেখেও অফিসাররা তাদের অধস্তন কর্মচারীদের কেরানী ছোট অফিসারদের এমনকি ইংরেজীতে ৯৯ ভাগ অজ্ঞ জনসাধারণকে ইংরেজী দরখাস্ত লিখতে বাধ্য করছেন। ট্যাক্সের বিল দেওয়া, বিদ্যুতের বিল, জলের বিল দেয়া প্রভৃতি জরুবী কাজগুলো সব ইংরেজীতে করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ইংরেজী ভাষা অত্যাবশ্যকীয নয় জেনেও সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে শিশু জন্মালো বা যে বুড়ো মরল তাঁর সার্টিফিকেটটা বিদেশী ভাষায় অজ্ঞ অভিভাবকদের রীতিমত পয়সা দিয়ে ঘুষ দিয়ে যোগাড করতে হচ্ছে। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এ দেশ! আমাদের মান সম্মান চুলোয় যাক। আমরা এখনো ইংরেজীতে বাড়ীর ট্যাক্স দেব,জন্ম মৃত্যুর সার্টিফিকেট নেব আর আমাদের জনপ্রতিনিধি বা পঞ্চায়েত সদস্য, গাঁও প্রধান, কাউন্সিলার, এম. এল. এ, এম পি রা এই সকল ইংরেজীনবীশ অফিসারদের হাতে

তামাক খাব। বাংলা দরখাস্তে ইংরেজীতে সই দেব। চিঠি চালাচালি সবই ইংরেজীতে করব কারণ ইংরেজীতে লিখলে ২ নংই করতে সুবিধে।কোরামাদান টেবিলে টেবিলে চালু থাকবে। ইংরেজী তুলে দিলে গিন্নীর কাছে মুখই দেখাতে পারবনা আর পিওন ব্যাটা তো আমাকে মানবেই না। অথচ এই বাংলা ভাষার আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ সাত বার ত্রিপুরা তথা আগরতলা এসেছিলেন আর তিন তিনটে অমর নাটক 'মুকুট','বিসর্জন','রাজর্ষি' লিখেছেন। কর্নেল বাড়ীতে, লক্ষীনারায়ণ দীঘির পাড়ে,দূর্গা বাড়ী,জগন্নাথ দীঘির পাড়ে বসে অসংখ্য অমৃতসংগীত রচনা করেছেন রবিঠাকুর। ত্রিপুরার বীরচন্দ্র,'বীরেন্দ্র',রাধাকিশোর, 'বীরবিক্রম', কাঞ্চন প্রভা প্রভৃতি মহান রাজন্যবর্গ প্রায় চারশত বৎসর ত্রিপুরার প্রশাসনে জনজীবনে বাংলাভাষা চালু রেখেছেন। এখন ত্রিপুরা সরকারের সবচেয়ে জটিল দপ্তর সার্ভে, সেটেলমেন্ট এন্ড ল্যান্ড রেকর্ডস অর্থাৎ ভূমি আলেখ্য হলকা দপ্তর সেই রাজন্য আমল থেকে এখনও বাংলাতে পরিচালিত হয়। তাহলে সমস্যা কোথায় ইংরেজী থেকে বাংলা সুইস ওভার করতে ? পরিবর্তন করতে কি শনি মঙ্গলবার আর পাঁজী দেখতে হবে ? মোটেই না। এই কম্পিউটার ইলেকট্রনিক্সের যুগে যেখানে দিল্লীর পার্লামেন্টে এম.পি.রা বাংলা ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় বক্তৃতা দেন ভাষন দেন সেটা মুহূর্তের মধ্যে হিন্দী ইংরেজী হয়ে যায় তবে ভাবের ঘরে চুরি কেন? বলব বাংলা, ককবরক আর লিখব ইংরেজীতে এ কেমন ভাষা সংস্কৃতির ধারা? এটা মানুষ মারা সমাজনীতি না কি ? যেখানে ত্রিপুরার চৌত্রিশ লক্ষ লোক বাংলা বোঝেন সেখানে সব কিছু বাংলাতে লিখলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে ? আর যেখানে ইংরেজীর বদলে বাংলা /ককবরক ভাষার আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে লাগু করতে অসুবিধাটা কোথায় ?

এবার একটু আন্তর্জাতিক জগতে আসুন। ইংল্যান্ডে, অষ্ট্রেলিয়ায়, কানাডায়, আমেরিকায় ইংরেজী যার যার তার তার। যার যার মাতৃভাষা ব্যবহার করছে। সব চাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে চীন জাপানের জীবন ধারা । জাপানীরা ইংরেজী চর্চা ছাড়াই ইলেকট্রনিক্স জগতে সেরা । চীনও ইংরেজী ছাড়া আমেরিকার বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি গুলি একে একে খরিদ করছে। চীনে সেই হাজার বছরের পূর্বের মহা পুরুষ কনফুসিয়সের প্রবাদটা এখনও চালু আছে।যে মাতৃ ভাষায় কথা বলে অথচ লেখে বিদেশী ভাষায় সে মানুষ নয় সে অসভ্য বর্বর ।সেই নিরিখে আমরা ত্রিপুরা পশ্চিম বাংলার লোকেরা প্রশাসনে জনজীবনে ইংরেজী ব্যবহার করে আর মানুষ থাকছি কি ? জনগণের ভাষা বাংলা,ককবরককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ইংরেজী নবীশ পন্ডিত সেজে আমাদের ভবিষ্যৎ আর আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে ইংলিশ মিডিয়াম

স্কুল কলেজের দিকে অর্থাৎ সোনার পাথর বাটি,সোনার হরিণের পিছনে ধাবিত করতে সাহায্য করছি। ফলে প্রায় প্রতিটি বাঙ্গালী পাহাড়ী পরিবারে ইংলিশ মিডিয়াম ক্রেইজ পাগলামী দিনে দিনে বাড়ছে। চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত বই গোল্ড রাশ (Gold Rush) অনুকরণে ইংলিশ মিডিয়াম রাশ প্রবল গতিতে চলছে। এই সেদিন আগরতলা শহরের এক লব্ধ প্রতিষ্ঠ তরুণ ডাক্তারের কাহিনী শুনলাম। তিনি নার্সিং হোম ব্যবসা বন্ধ করে গান্ধীগ্রামে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুলেছেন। তাঁর মন্তব্য শুনুন : আমার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এক হাজার টাকা ইনভেষ্ট করে আমি ৯০০(নয় শত টাকা) পকেটে ভরতে পারি এতবড় ব্যবসা নার্সিং হোমে নেই, কোথাও নেই।

এ তরঙ্গ রোধিবে কে ?রোধিব মোরা । আমরা নাগরিকরা। আবার চীন জাপানে যাই সেখানে ভাষা শিক্ষার জন্য আলাদা Institute of Foreign language আছে। সেখানে যে কোন বিদেশী ভাষা ইংরেজী সবই শেখানো হয়। এই সত্তর বছরের বৃদ্ধ প্রতিবেদকের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রাবস্থায় হো চি মিন (ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট) আর চৌ এন লাই (চীনের প্রধানমন্ত্রী)এর সংগে দুচার মিনিট কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাদের সামাজিক জীবনধারা আমাকে এখনো আকৃষ্ট করে। রাজভবনে হো চি মিনের রাত্রে শোবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় পঞ্চাশের দশকে ঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর. চৌ এন লাই এই প্রতিবেদককে রীতিমত পরিষ্কার ইংরেজীতে বকুনি দিয়েছিলেন এই বলে "Why are you talking with me in English-a foreign language ? Cannot you speak in Bengali your mother tongue? I am speaking in my mother tongue, Chinese. You should also speak in your mother tongue, Bengali. Every civilized citizen should use his or her mother tongue in spoken as well as in written form"

আরও আশ্চর্য্যের ব্যাপারে তিনি আমাকে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, সুপ্রিয় ভৌমিক মহাশয় আপনি জেনে রাখুন, আমি (চৌ এন লাই) শান্তিনিকেতনে ছিলাম । আমার বাবাও ছিলেন । আমরা দুজনেই রবীন্দ্রনাথের শিষ্য । আমরা শান্তিনিকেতন এসে রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা শিখেছিলাম যেমন করে পিয়ার্সন,এনড্রুজ ইত্যাদি মনীষীরা বাংলা শিখেছেন ।তবে প্রতিবেদক কি ইংরেজীর বিরুদ্ধে ? মোটেই নয়। ইংরেজী থাকবে প্রশাসনের বদলে চীন জাপানের অনুকরণে Institute of Foreign languages প্রতিষ্ঠানে ওখানে সরকারী পয়সার বদলে স্বনির্ভর স্বাবলম্বী হবার জন্য নিজের পয়সায় ভাষা শিখে চাকুরী বাকুরীর কম্পিটিটিভ একজাম আর থাকবে সাহিত্যের ক্লাসে।

প্রশাসনে নৈব নৈব চ। কারণ প্রশাসনের খরচ,অফিসার কর্মচারীদের বেতন সাধারণ জনগণের পয়সায় চলে । জনগণ বাংলা ভাষী/ককবরক ভাষী। সুতরাং তঁদের পয়সায় আমার রোজি রোজগার পেনশন আমি কিছুতেই ইংরেজীতে করবনা। বরং বাংলা ভাষা/ককবরক ভাষা প্রচার প্রসারের জন্য সরকারকে আইন মানতে বুঝাব। প্রয়োজনে বাধ্য করব। এটা আমার মৌলিক নাগরিক অধিকার।মাতৃভাষা মাতৃ দুগ্ধ পৃথিবীর সব সভ্য দেশে চালু আছে। ত্রিপুরাতে বাংলা ভাষা/ককবরক ভাষা আইনটি অনতিবিলম্বে চালু করতে হবে । আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। অর্থনাশং সমুপস্থিতম। বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলো ছাত্রাভাবে ধুঁকছে। নেতাজী, উমাকান্ত,তুলসীবতী পর্য্যন্ত ছাত্রাভাবে ভুগছে। এটা চলতে থাকলে সরকারী আইনানুযায়ী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে ২০:১ আর প্রাইমারী স্কুলে ৪০:১ অর্থাৎ ২০ জন ছাত্র ১ জন শিক্ষক প্রাইমারী আর ৪০ জনে ১ একজন শিক্ষক মাধ্যমিক,উচ্চ মাধ্যমিকে। ছাত্রাভাবে প্রাইমারী, সেকেন্ডারী,হায়ার সেকেন্ডারী শিক্ষক নিয়োগ একদম বন্ধ হয়ে যাবে।

এই সর্বনাশা ইংলিশ মিডিয়াম ক্রেইজ পরিবার গুলোকে শেষ করে দিচ্ছে। এখন উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত,এমনকি কামলা,রিক্সাওয়ালা, পান দোকানদার, মুদী দোকানদার তার সন্তানকে হোলিক্রশ, ডনবস্কোতে ভর্তি করছে। ৫ থেকে ১২ জন টিউটার রেখে মাসে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে। অথচ তার ছেলেকে বাংলা স্কুলে দিলে বেতন লাগে না । অন্যান্য সরকারী পরিষেবাও আছে । টিউটার লাগবেনা যদি গার্জেনরা সজাগ থাকেন। আর সবচেয়ে ক্ষতি হচ্ছে, ইংলিশ মিডিয়ামের অনেক ছাত্রই হয় চরম স্বার্থপর। এক একটা সেলফিস জায়েন্ট । (Selfish Giant) তারা মা,বাবার আবাধ্য হয়ে কাকা,কাকী,জ্যাঠা জ্যেঠী, পিসী,মাসী ঠাকুর্দা,দিদাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। ইংরেজীতে বকুনি ঝাড়ে। মাম্মী,ড্যাডী,আন্টি বলে। আর এমন কম্পিটিশনের রোগে আক্রান্ত হয় যে পাশের ছেলেটাকে বা মেয়েটাকে বন্ধুর বদলে শত্রু ভাবে। ক্লাশের পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাবার জন্য যে কোন অসঙ্গতা কাজ করতে দ্বিধা করেনা। ককবরক লিপি বাংলার বদলে রোমান হরফে দিতে হবে কারা বলেছেন ? এই ইংরেজী ওয়ালাদের একাংশ। এই করে করে জুম চাষী সরল পাহাড়ি অনেক ছেলেমেয়েরা সব ভিড় করছে অস্ত্র ব্যবসাতে,অপহরণ বানিজ্যে, যেখানে বাটখারা দিয়ে অর্থের পরিমাপ হয়। আমরা কোথায় চলেছি ? মাতৃভাষা,মাতৃ দুগ্ধের বন্যা ছাড়া এ সর্বনাশা ইংরেজী জুয়া বন্ধ হবে না। এটা সবাইকে বুঝতে হবে । ইংরেজরা একসময়ে এই ভাষা দিয়ে চীনাদের আফিঙ্গের যুক্ত ব্যুয়রের যুদ্ধ সংঘটিত করেছিল চীন জাপানকে আমাদের প্রায় দুইশত বছর পদানত রেখেছিল। সেই চীন জাপান ঘুরে দাঁড়িয়েছে । মাতৃভাষার বলে

বলীয়াণ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী বুশ-ব্লেয়ারের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

সুতরাং আমাদের ত্রিপুরার সন্তানদের আগামী প্রজন্মকে বক্ষা করতে হলে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের ভাষা,সংস্কৃতি নীতির ধারা বহাতে হবে, অর্থাৎ,

"মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাংলা ভাষা
তোমার কোলে তোমার বোলে
কত শান্তি ভালোবাসা "

----- 0 -----

জীবনে সঙ্গীত ও সাহিত্য

প্রাণতোষ কর্মকার

সঙ্গীত ও সাহিত্য এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। একটি অন্যটির পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। মানব সভ্যতার মুলধারক এই সঙ্গীত ও সাহিত্য একই বৃন্তে দুটি ফুলের মতই অবস্থান করে। মানব জীবনে এ দুয়ের প্রভাব অপরিসীম। এ সত্য জানতে হলে এ দুয়ের মূল গভীরে প্রবেশ করতে হবে। প্রথমে সঙ্গীত কি - এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা যাক্। তালবদ্ধ মনোরঞ্জক রচনাকে বলে সঙ্গীত। নাচ, গান ও বাজনা তার তিনটি শাখা। সঙ্গীত চৌষট্টি কলার অন্যতম চারুকলা। মানুষের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক প্রাণের সম্পর্ক বা আত্মার সম্পর্ক। মানুষ প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। বিশাল প্রকৃতির প্রাণ সঙ্গীত ভিন্ন ভিন্ন রূপে সর্বদাই গীত হয়ে চলেছে। মানুষের সঙ্গীত সেদিক দিয়ে বলা যায় প্রকৃতির সঙ্গীত। বাতাসের শন শন শব্দ, নদীর কুলুকুলু ধ্বনি, সাগরের তরঙ্গরাশির আবেগময় উত্তাল গর্জন, মেঘমালার প্রচন্ডরবে হাসি যেমন প্রকৃতির সংগীত; নাইটিংগল, স্কাইলার্ক, কোকিলের মধুর কণ্ঠধ্বনিও যেমন প্রকৃতির সঙ্গীত; প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের সঙ্গীত সেরূপ প্রকৃতিরই সঙ্গীত, সর্বত্রই আত্মার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। এরূপে বলা যায় সঙ্গীতের মাঝে মানবতার শ্বাশ্বত ক্রন্দন প্রকাশ পেয়েছে। সঙ্গীত মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে মনের গোপন সঞ্চিত যে ভাবাবেশের উত্তাল তরঙ্গ নৃত্যরত - সেই ভাবতরঙ্গ সুর ও বাণীর মাধ্যমে মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের সৃজন করে। " For Music is the most clhereal vehicle of the deepest emotion. The psychic"?

সঙ্গীতের মহৎলাভ বা গুণের সন্ধান মেলে এক পরম সত্যের মাঝে। সঙ্গীত মানব হৃদয় দ্রবীভূত ও প্রসারিত করে। ইহা সকল দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, গ্লানির কবল থেকে শ্রোতার হৃদয় কে মুক্ত করে এবং শ্রোতাকে তন্ময় সাগরে ভাসিয়ে দেয়। সঙ্গীতই পরমা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভূত করে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে। একদিন সৃষ্টির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সুরে যে ঝংকার শুরু হয়েছিল তার অনুরণন সঞ্চারিত হয়েছিল জাগতিক পৃথিবীর সব কিছুতে। ঝর্ণার ধারায়, সাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, পর্বতের নিস্তব্ধতায়, মেঘের গর্জনে, পাখীর কলতালে, পাতার মর্মরেব আজ সেই সুরেরই রেশ ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তাই সুরনির্ঝরিণীর পাশে থেকে সে প্রভাবকে অস্বীকাব করার সাধ্য মানুষের কখনই হয়নি। তাই আমরা দেখি মুনি, ঋষিগণ থেকে আধুনিক যুগ অবধি সকল মহাপ্রাণ সাধক সংগীতের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, কি জনচিত্ত অভিভূত করতে, কি নিজের হৃদয়ের আকুল আবেশেই নির্ঝরকে মুক্ত করতে। জাগতিক গুণাবলীর দিক থেকে বলা যায় যে সঙ্গীত ভাব, উদ্দীপনা ও প্রীতির সঞ্চারী। বলা হয়, সঙ্গীতই ভগবানের কাছে পৌঁছোবার শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতমুখর জীবনধারাই তার পরম ও চরম সত্য। তিনি দেশে- বিদেশে সর্বত্র উদাত্ত কণ্ঠের মধুর সুর প্লাবনে শ্রোতাবর্গ আত্মবিস্মৃত করে যাদুকরের মত নিজের দিকে আকৃষ্ট করতেন। গীত গোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব ও তার সহধর্মিনী পদ্মাবতী, প্রেমের

ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব, সাধিকা মীরাবাঈ প্রভৃতির স্মৃতি এখনও মানুষের মনে জাগরিত। এরা সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। যথার্থ আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন মানুষ হতে গেলে সঙ্গীতের সাধক বা রসগ্রাহী অবশ্যই হতে হবে।

এজন্য গ্রীক মনীষী Pluto বলেছেন 'Music for soul' খাদ্য যেমন দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে শরীরের পুষ্টিসাধন করে সঙ্গীত তেমনি আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্ত করে চিত্তকে সমুন্নত করে। Walter Peter বলেছেন 'Art struggles after the law of music' জীবনে পূর্ণপ্রজ্ঞ শিক্ষা পেতে হলে সঙ্গীত একান্ত প্রয়োজনীয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বলেছেন - "সঙ্গীত একটি প্রাণধর্মী জিনিষ এবং প্রাণের বিকাশ তার মধ্যে আছে।" মানব জীবনে বিশেষত মানবমনের ওপর সঙ্গীতের প্রভাব অপরিসীম। অস্থির অশান্ত মনকে সঙ্গীত সহজেই শান্ত করতে সক্ষম হয়। এজন্য দেখা যায় মাতা তার শিশুকে ঘুম পাড়াবার জন্য গান গেয়ে থাকেন। রোগ যন্ত্রণায় কাতর অসুস্থ ব্যক্তিও গান শুনতে শুনতে সাময়িকভাবে তার যাতনা বিস্মৃত হয়। সঙ্গীতের সাহায্যে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থার উল্লেখ বাইবেলে আছে। সঙ্গীত ভীরু দুর্বল চিত্তকেও সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ ও সবল করে তোলে। ভেরী -নির্ঘোষ ব্যতীত সেনানী চালনার ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না। আবার সন্তোষ প্রকাশ করতে, আনন্দদান করতে এবং উপভোগ করতে সঙ্গীতই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বস্তুতপক্ষে শোকে, দুঃখে, আনন্দে, সুখে জীবনের সর্ব অবস্থায় সঙ্গীতের ব্যবহার সত্য সকল মানব সমাজেই হয়ে থাকে। সংবেদনহীন অসাড় চিত্তের ওপর সঙ্গীত ক্রিয়াশীল হয় না। যে ব্যক্তির চিত্তে দযা , মায়া, স্নেহ মমতা, প্রীতি ভক্তি ইত্যাদি মানবিক গুণ লুপ্ত, সে ব্যক্তিকে সঙ্গীত সামাজিক কবে তুলতে পারে না। এজন্য ইংরেজ মহাকবি সেক্সপিয়র বলেছেন, " The man that hath no music ın himself, let no such man be trusted" তবে উল্লিখিত মানবিক গুণগুলো লুপ্ত না হয়ে চিত্ত মধ্যে যদি সুপ্ত অবস্থায় থাকে তবে সঙ্গীতের দ্বারা তাদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক প্লুতার্কের কথায় সঙ্গীত নিষ্ঠুর শাসকের পাষাণ প্রায় চিত্তকেও জয় করতে সক্ষম। কথিত আছে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন সঙ্গীত দিয়ে ডাকাতদের মন জয় করেছিলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে সঙ্গীত চিত্তকে হিংসা, দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা, নীচতা প্রভৃতি মালিন্য থেকে মুক্ত করে। এজন্যই দেখা যায় যে, সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধকগণ তাদের চিত্তকে অহমিকাবোধ থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরাভিমুখী করবার জন্য সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মানুষের জীবনদর্শন, মানবাত্মার উদাব প্রার্থনা, মানবিকতার জয়গান সকলই একীভূত হয়েছে সঙ্গীতের মাঝে।

সঙ্গীতের ভাব থেকে এসেছে সাহিত্য। মানব জীবনের কাহিনীই সাহিত্যের মূল উপাদান। তবে প্রকৃতিকেও অনেক কবি সাহিত্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ। ওয়ার্ডসওয়ার্থকে তো মূলতঃ প্রকৃতিরই কবি বলা হয়। এখন দেখা যাক্ সাহিত্য কি। Literature is the idealised imitation of life. বিশাল প্রকৃতির প্রাণ রসে সমৃদ্ধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিহার করেন। Art is nature seen through a tempera-

ment. The fact seen by a particular mind. Mathew Arnold বলেছেন Literature is the criticism of life". বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুবোধ রায়ের মতে " Literature is by far the most popular form of art and is most widely enjoyed. The primary function of literature is to provide entertainment to the mankind and as such it has a close and tangible bearing on human mind.

তাহলে দেখা যাচ্ছে উভয়ের কাজ হলো মানব মনে অনাবিল আনন্দ দান করা এবং উভয়ই মহান কলা। যথার্থ দরদী ও মরমী সাহিত্যিক হতে গেলে তাকে উপরিউক্ত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। সঙ্গীতজ্ঞের বেলাতেও তাই। অমৃতের পুত্র মানবের সাধনা নিহিত হয়েছে যুগ্মকলার মাঝে। উভয়ের মধ্যে মিল ও অমিল লক্ষণীয়। সঙ্গীতের রস সাহিত্যের রস অপেক্ষা আপাত দৃষ্টিতে সূক্ষ্ণ বলে মনে হয়। পুনরায় সাহিত্য সঙ্গীতে অপেক্ষা বাস্তব বলে মনে হল। সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের জাগতিক দিকটা সঙ্গীতের চেয়ে কিছু বেশী। তবে যেখানে পাঠক ও শ্রোতা রস সাগরে চরম আস্বাদ পেতে চান সেখানে উভয়ক্ষেত্রেই কোন পার্থক্য নেই।

রামায়ণ মহাভারতের আখ্যায়িকা বিভিন্ন সুরের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে কথকরা শুনিয়ে চলেছেন শ্রোতৃবর্গকে। জয়দেবের গীত গোবিন্দ বিভিন্ন রাগের মাধ্যমে গীত হয়। সুতরাং ভাব রসে সমৃদ্ধসম্পন্ন উৎকৃষ্ট সাহিত্য ব্যতীত উৎকৃষ্ট গীতের সৃষ্টি করা যায় না। সমগ্র পদাবলী কীর্ত্তণ ও ধ্রুপদ গানের পদ তার সাক্ষ্য ।

শিল্পী যেখানে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন নিঃশেষে শিল্পের মধ্যে, সেখানে গায়ক শিল্পী ও লেখক শিল্পী সমান । কিন্তু সুরের মাধ্যমে যেখানে আহ্বান, লেখনী সেখানে বেশ কিছুটা অপারগ। সঙ্গীতের প্রতি এই আকর্ষন মানুষের স্বভাবজাত। সাধারণভাবে ক্ষেত্রবিশেষে রসাস্বাদনের জন্য ব্যাখ্যাকার বা কিছু তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হলেও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা হয় না।

পরিশেষে বলা যায় সুখশ্রাব্য সঙ্গীত ও উৎকৃষ্ট সাহিত্য মানব মনকে অনাবিল আনন্দ দান করে ও মানুষের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে।

----- o -----

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

সুবিমল রায়

যখন একলা থাকি, জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকাই, তখন অনেক স্মৃতির সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তেজক বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলোও স্মৃতিতে ভেসে উঠে। সুদীর্ঘ প্রায় নয়টি মাস ধরে আমরা আগরতলাবাসীরা ছিলাম এক সর্বনাশা ঘুর্ণী ঝড়ের আবর্তে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল আমাদের সমস্ত চেতনায় পরিব্যাপ্ত। ছিল যুদ্ধের উন্মাদনা এবং যুদ্ধজয়ের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। মনে হতো এ যেন আমাদেরই যুদ্ধ। যেমন করেই হউক জিততে হবে। আবার অন্যদিকে বুকে ভয়ও ছিল। নিরাপত্তাহীনতার ভয়। কী জানি কি হবে। আগরতলাটা যুদ্ধক্ষেত্রে রূপান্তরিত হবেনা তো? আমরা বাঁচবো তো? এই ধরনের দুই বিপরীতমুখী অনুভুতিতে ক্রমাগত দোল খেয়েছি দীর্ঘ প্রায় নয়টি মাস ধরে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলার আগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ প্রেক্ষাপটটি একটু স্মরণ করে নিই সংক্ষেপে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশনে দেশ ভাগ করার এবং পাকিস্তান গড়ার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, যে সব ভারতের এলাকা একান্ত ভাবেই মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকা এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল, প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানা অদলবদল করে ঐ সকল এলাকাকে ভৌগোলিক দিক থেকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা হোক যাতে এগুলো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র স্টেটস্ এর রূপ পরিগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ইউনিট দুটো স্বশাসিত ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদালাভ করতে পারে।

এই অধিবেশনে পূর্ববাংলার মুসলীম প্রতিনিধিরাও ছিলেন এবং এঁরা পরবর্তীকালে উত্তর -পশ্চিম সীমান্তের মুসলীমদের সাথে মিলিত হয়ে একসাথে 'পাকিস্তান'নামক রাষ্ট্র গড়ার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। সেই আন্দোলন রূপান্তরিত হয়েছিল উন্মত্ততায়। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ার উন্মাদনা ছড়িয়েছিল তীব্র জাতি-বিদ্বেষ। সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসের ঘৃণ্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং বাংলায়। লক্ষলক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছিল। ভিটেমাটি ফেলে সর্বস্বান্ত হয়ে দেশ ছেড়েছিল কোটি কোটি মানুষ। এই হতভাগ্যদেরই একটি অংশ আশ্রয় নিয়েছিল ত্রিপুরায়। আমিও তাদেরই একজন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত দ্বিখন্ডিত হল। মুসলীম লীগ পেল দ্বিজাতিতত্বের ভিত্তিকে গড়া তাদের সাধের পাকিস্তান। নূতন দেশের দুটি অংশ। একটি পূর্ব পাকিস্তান, অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। তখনকার মুসলীম লীগের নেতারা দেশের দুটি অংশকেই বেঁধে দিলেন শক্তিশালী এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে।

স্বাধীনতা পাওয়ার দুই তিন বছরের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশ বুঝলেন যে এঁরা প্রতারিত হয়ে গেছেন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ঠিক ঠিকভাবে

কার্যকর হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান যথাযথ স্বাধিকার এবং স্বায়ত্ব শাসন পায়নি। এমনকি পায়নি সমান অধিকার। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমের পাঞ্জাবীদের কুক্ষিগত। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ। পূর্ব পাকিস্তানের সব সম্পদ চলে যাচ্ছে পাকিস্তানে। সম্পদ কাজে লাগছে ওদের উন্নয়নে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ শুধু উপেক্ষা, বঞ্চনা, অপমান আর নিপীড়ন। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা অনুভব করলেন যে, ধর্মের ঐক্যের বুলি ফাঁকা আওয়াজ হয়ে গেছে। ওদের চোখে এঁরা ব্রাত্য মুসলমান-রূপান্তরিত হিন্দু। একাসনে বসার অনুপযুক্ত। ভাষার ক্ষেত্রে ওদের মনোভাব হয়ে উঠল একই রকম। বাংলা ভাষা ব্রাত্যদের ভাষা। এই ভাষার উন্নতি ঘটাতে হলে উর্দু শব্দের ব্যবহার বাড়াতে হবে। অর্থাৎ বাংলা ভাষার উর্দু - আয়ন ঘটাতে হবে। বাংলা লিপির পরিবর্তে নিতে হবে রোমান লিপি।

পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের ধীরে ধীরে মোহভঙ্গ হতে লাগল। এঁদের এক বৃহৎ অংশ ভাবতে লাগলেন, ধর্মের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গণতান্ত্রিকঅধিকার, আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার, মাতৃভাষার সম্মান, জাতীয়তাবোধ এবং আত্মমর্যাদা। বস্তুত স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ধর্মকে অতি প্রাধান্য দিয়ে এঁরা ভুল করেছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণের সুত্র ধরেই বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিবর্তে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটতে থাকে। ১৯৪৮ সাল মার্চ মাসে ঢাকার কার্জন হলে পাকিস্তানের জনক মহম্মদ আলী জিন্না সাহেব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুব নাম উচ্চারণ করতেই বাঙালি মুসলমানরা প্রতিবাদী হয়ে উঠেন। সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠে। কারণ এঁরা জানেন যে সমগ্র পাকিস্তানে বাংলা ভাষা-ভাষীর সংখ্যাই বেশি এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে বাংলা ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্য। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকার এক জনসভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করার সাথে সাথে দেশজুড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। সরকার বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করে নির্বিচারে গুলী চালিয়ে। শহীদ হন বরকত, সালাম, রফিক, জব্বর এবং আরও অনেকে। এঁদের আত্মদানের ফলে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পায় পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে।

ভাষা সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাফল্য পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের মনে জাগিয়ে তোলে দুরন্ত জাতীয়তাবোধ এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। এঁরা ধর্মীয় গোঁড়ামি ছেড়ে ধীরে ধীরে বাঙালি হতে থাকেন। ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করে রাজনৈতিক-আর্থিক-সামাজিক স্বাধিকাব অর্জনের জন্য। স্বায়ত্ব শাসন লাভের দাবীকে জোরদার করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন।

পুর্ববাংলার অধিকাংশ বাঙালিব মানসিক পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি দেখে পাকিস্তানের পাঞ্জাবী শাসকবর্গ চিন্তিত হয়ে পড়েন। গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণ করলে এঁদের বিপদ হবে ভেবে এঁরা গুপ্তহত্যার মাধ্যমে দেশের নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করে সামরিক শাসন কায়েম করার যড়যন্ত্র করলেন। ১৯৫১ সালের এক জনসভায় লিয়াকত আলী আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। ১৯৫৪ সালে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়ী হয়েও মাত্র ছাব্বিশ দিনের মাথায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধান ফজলুল হক তাঁর গদি হারালেন। তাঁকে অপবাদ দেওয়া হল ভারতের দালাল

বলে। পূর্ব পাকিস্তানে চালু করা হল সামরিক শাসন। বাঙালিরা প্রতিবাদী হওয়ায় গভর্ণর ইস্কান্দার মির্জা হুঁসিয়ারী দিলেন, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজন হলে হাজার বাঙালী হত্যা করা হবে সৈন্যবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে।

১৯৫৮ সালের শেষের দিকে জেনারেল আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করলেন। প্রবর্তন করলেন "মৌলিক গণতন্ত্র" নামে মধ্যযুগীয় জঙ্গী আইন। সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন টুটি টিপে স্তব্ধ করে দেওয়া হল। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে চালালেন অত্যাচার আর লুণ্ঠন।

শেখ মুজিবর রহমান-এর জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে। গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে চলে আসেন কলকাতায়। ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি এ পাশ করে ১৯৪৭ সালে ফিরে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলকাতায় থাকতেই তিনি ছিলেন ছাত্র নেতা। বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষতায়, জাতীয়তাবাদে, গণতন্ত্রে এবং স্বাধীনতায়। হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ এবং দ্বন্দ্ব তাঁর ছিল অপছন্দ।

মুজিবুর ক্রমে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করেন। ধীরে ধীরে পূর্ববাংলার প্রগতিশীল সমাজকে সংহত করেন আওয়ামী লীগের পতাকাতলে। আন্দোলন সংঘটিত করতে থাকেন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সোচ্চার হয়ে উঠেন স্বাধিকার, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে পূর্ব বাংলাকে গড়ে তুলতে। সামরিক শাসন তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখে বছরের পর বছর, অভিযোগ আনে দেশদ্রোহিতার। কিন্তু জনগণের মরণপণ সংগ্রামে, স্বৈরাচারী শাসকরা বার বার পিছু হাটতে বাধ্য হয়। ১৯৬৯ সালে আয়ুব খাঁ ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। কিন্তু এত আন্দোলন এবং জীবনাহুতির পরেও পাকিস্তানে গণতন্ত্র এলো না। পূর্ববাংলা পেল না স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের কাঙ্ক্ষিত স্বাদ। গদীতে বসলেন নতুন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খাঁ। তিনি চতুর মানুষ। ক্ষমতা ছাড়ার ভান করে ঘোষণা করলেন ১৯৭০ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানে নির্বাচন করা হবে। এর ফলে যে জাতীয় সভা সৃষ্টি হবে, তার হাতে তুলে দেবেন দেশের নতুন সংবিধান রচনার এবং দেশ শাসন করার ভার। গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্বভার নেওয়ার পর সামরিক শাসন তুলে নেওয়া হবে।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমান ছয় দফা দাবী পেশ করলেন পূর্ববাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার জন্য। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকবর্গ সেই দাবীকে আমল দেয়নি। মুক্তি সংগ্রামের পেক্ষাপট জানার জন্য এই ছয় দফা দাবীগুলোর সাথে পরিচিত হওয়ার দরকার।

১. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন রূপে গড়তে হবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন প্রাপ্ত বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভা সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২. ফেডারেশন সরকারের অধীনে কেবল দেশ রক্ষা এবং পররাষ্ট্র দপ্তর থাকবে।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। অথবা একই মুদ্রা থাকবে, কিন্তু দুই অঞ্চলে থাকবে দু'টি আলাদা ব্যাঙ্ক, যাতে এক অঞ্চলের টাকা অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে।

৪. খাজনা, কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হাতে থাকবে।

৫. পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের পৃথক হিসাব রাখতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এক্তিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এক্তিয়ারে থাকবে।

৬. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের নিয়ে একটি পৃথক মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন করা হবে।

সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খাঁর ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নির্বাচনে লড়ল তাদের ছয় দফা দাবীকে সামনে রেখে। এতে অভূর্তপূর্ব সাফল্য এলো মুজিবুর রহমান পরিচালিত আওয়ামী লীগের। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩১৩ টি। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিদ্ধারিত ছিল ১৬৯ টি আসন। হিসেব করে দেখা গেল আওয়ামী লীগ পেয়েছে প্রদত্ত ভোটের মোট ৮০ শতাংশ।

এই অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে আওয়ামী লীগই জাতীয় স্তরে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবীর প্রতি পূর্ববাংলার মানুষের পূর্ণ সমর্থনের চিত্রও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ-র কাছে দাবী জানালেন ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার জন্য, যাতে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব সমাপ্ত করা যায় এবং তাদের ছয় দফা দাবীভিত্তিক সংবিধান রচনার কাজ হাতে নেওয়া যায়।

কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁ মুজিবর রহমানের প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে অধিবেশন ডাকলেন ৩রা মার্চ। উদ্দেশ্য কালক্ষেপ করা। এতে পূর্ববাংলার মানুষ ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠল। এরা বুঝল যে, পশ্চিমী শাসকরা আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। তবু ওরা শান্ত রইল শান্তিপূর্ণভাবে, গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা পাওয়ার আশায়। কিন্তু পূর্ববাংলার জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল যখন ইয়াহিয়া খাঁ ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি বলে ঘোষণা করল। লক্ষ লক্ষ মানুষ উত্তেজিত হয়ে পথে নামল। এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ জানাতে লাগল ইয়াহিয়া খাঁ-র স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে। কোথাও কোথাও প্রতিবাদ গণবিদ্রোহের রূপ নিল। আওয়ামী লীগের সমর্থকরা মুজিবরের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য। কিন্তু চাপের মুখেও মুজিব গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। জনগণের কাছে আবেদন করতে থাকেন অহিংসা পথে অসহযোগ আন্দোলন চালাবার জন্য।

জনগণের সর্বাত্মক আন্দোলনের মুখে সামরিক শাসকরা হয়ে উঠে প্রতিহিংসা পরায়ণ।

২রা এবং ৩রা মার্চ সামরিক বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে গুলী চালিয়ে হত্যা করল কয়েক হাজার নিরস্ত্র আন্দোলনকারীকে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে করল গৃহহীন। এরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আশ্রয় নিতে লাগল ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে। ত্রিপুরাতেও প্রবেশ করল হাজার হাজার শবণার্থী। এমন অভাবনীয় জাতীয় বিপর্যযের মুখে দাঁড়িয়েও মুজিব হাল ছাড়লেন না। চেষ্টা করতে লাগলেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করতে। তিনি ৭ই মার্চ বিকাল তিনটেতে ঢাকার রমনা রেস কোর্সে অনুষ্ঠিত জনসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনগণকে বললেন, শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য। বললেন সরকারকে সব দিকে থেকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য এবং নুতন এক প্রশাসনের জন্ম দেওয়ার জন্য। তিনি জনগণকে মনে রাখতে বললেন, ''এই সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এই সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।''

বিদ্রোহী পূর্ব্ববাংলাকে শান্ত করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ একতরফাভাবে ঘোষণা করলেন যে, ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে। এর উত্তরে মুজিব জানালেন, তিনি অধিবেশনে যোগ দেবেন যদি তাঁর চার দফা দাবী মেনে নেওয়া হয়। দাবীগুলো হলো, (১) সামরিক আইন তুলে দিতে হবে, (২) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, (৩) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে, (৪) গণহত্যার তদন্ত করতে হবে।

মুজিবের দাবীর ভিত্তিতেই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ইযাহিযা খাঁ। ভাবটা দেখাচ্ছিলেন এমন যে, দাবীগুলো মেনে নিতে তাঁব আপত্তি নেই। শুধু পথ খুঁজছেন সিদ্ধান্তগুলো কিভাবে কার্যকর করা হবে।

২৫শে মার্চ রাত ১১ টায় ইয়াহিয়া খাঁ'র প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হল। ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ওঁৎ পেতে বসল সৈন্যবাহিনী। পূর্ব নির্দ্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী এরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী চালাল নিরীহ, নিরস্ত্র, ঘুমন্ত , শান্তিপ্রিয় মানুষের উপর। সংঘটিত হল ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা। নিহত হল প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ। ঢাকা পরিণত হল মহাশ্মশানে। সেদিন রাতেই মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে পাঠানো হল পশ্চিম পাকিস্তানে। ইয়াহিয়া খাঁ নিজেও সেদিনই মধ্য রাতে ঢাকা ত্যাগ করলেন। পরদিন তিনি বিশ্ববাসীকে জানালেন, আওয়ামী লাগ নিষিদ্ধ, মুজিব দেশদ্রোহী, ''জয় বাংলা'' শ্লোগান বে-আইনী।

এবার স্বায়ত্ব শাসনের দাবীর রাজনৈতিক গণআন্দোলন রূপান্তরিত হল সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে। ২৬শে মার্চ, শুক্রবার সকাল ৯টায় কোন এক অজ্ঞাত স্থান থেকে বেতার যন্ত্রে ভেসে এলো মুজিবের বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা, ''বাংলাদেশকে তাবে আনবার জন্য আমাদের শত্রু পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাঙালি সৈন্য, পুলিশ, জনগণ বীরের মতো লড়াই করছে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করছে। আমি সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কথা ঘোষণা করছি, বাংলাদেশ সার্বভৌম স্বাধীন। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করুন। জয় বাংলা।''

এবার শুরু হল সত্যিকারের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম। একদিকে লক্ষাধিক সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত পাক্ সৈন্য, অন্যদিকে কিছু অসংগঠিত বাঙালি সৈন্য, পুলিশ আনসার, ই পি আর

এবং লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র এবং সামরিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ আওয়ামী লীগের সমর্থক।

যুদ্ধের শুরুতেই ঢাকা, যশোহর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজসাহী ও রংপুর প্রভৃতি শহর ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। মুক্তাঞ্চলে এরা আওয়ামী লীগের জেলা নেতৃত্বের সহায়তায় গড়ে তুলে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা। এরা ভেবেছিল কয়েকদিনের মধ্যেই পাক সেনারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। পাক্ সৈন্যরা একের পর এক শহর দখল করে নিতে থাকে। এগিয়ে আসে ভারত সীমান্তের প্রায় কাছাকাছি। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা এবং লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় নিতে থাকে ভারতে। একমাত্র মার্চ মাসেই ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল প্রায় ৮ লক্ষ শরণার্থী। আগষ্ট মাসের শেষের দিকে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১৪ লক্ষে।

আগরতলা রাজ্যের রাজধানী হওয়ায়, বন্যার মতো শরণার্থী আসছিলেন এখানে। এরা আশ্রয় নিচ্ছিলেন আগরতলার এবং আগরতলার আশেপাশে আত্মীয় -স্বজনের , বন্ধু পরিচিতের, অপরিচিতি সহৃদয় ব্যক্তির বাড়িতে এবং সরকারী আশ্রয় শিবিরে। আগরতলা শহরে ভীড় জমালেন পূর্ব বাংলার অগণিত বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদ, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবীরা। রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত তৎপরতা শুরু হয় সমস্ত শহরজুড়ে। খবর সংগ্রহ করার জন্য দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেশ কিছু সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিক ছুটে আসে আগরতলায়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগরতলায় ছুটে আসেন আমাদের দেশের কেন্দ্রের ও রাজ্যের মন্ত্রীরা, উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক অফিসাররা, কূটনীতিবিদরা, রাজনীতিবিদরা এবং আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা। শহরের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ যায় পাল্টে। চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠে প্রতিটি শহরবাসীর জীবনে। মুক্তিযুদ্ধ আচ্ছন্ন করে রাখে তাঁদের সমস্ত চেতনা।

আমি তখন সপরিবারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর বর্মনের বাড়ির পূর্বদিকের বাড়িতে ভাড়া থাকি। তিনটি ঘর আর রান্নাঘর নিয়ে পশ্চিমমুখী বাড়ি। সামনে বাঁধানো চিলতে উঠোন। পেছনে ঝরিয়া পরিবারের বড় বড় গাছ গাছলিতে ভরা বাগান। রান্নাঘরের দক্ষিণে ছোট একখন্ড জমি। অনেকটা ডিমের মতো। জমিটি শেষ হয়েছে একটি পুকুরে। পুকুরের জল আমরা ব্যবহার করতাম বাসন মাজা ও কাপড় কাচার কাছে। উঠানের পশ্চিম পাশে বেড়ার সীমানা। তার ওপারে একটি বড় তরজার ঘর। বর্মণরা তখনও ঐ বাড়িতে আসেনি। এটি ভাড়া দেওয়া ছিল জ্যাম -এয়ার কোম্পানীর কাছে। তরজার ঘরটিতে কোম্পানীর কর্মীরা থাকতেন।

এখনকার মিষ্টির দোকান 'অপরূপা'র পূব পাশের সরু পথ দিয়ে আমরা বাড়িতে ঢুকতাম। পথের পাশে বাঁ দিকে ছিল অসমাপ্ত একটি দোতলা দালান এবং একটি বড় গোদাম ঘর।

পূর্ব বাংলায় সামরিক বাহিনীর গোলাগুলী শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই লক্ষ্য করলাম বাড়িতে ঢোকার রাস্তার মুখে বড় রাস্তার অপরিচিত মানুষের ভীড়। বাঁ পাশের খালি ঘরগুলোতে লোকের চঞ্চল চলাফেরা। উদ্বিগ্ন মানুষগুলোর মুখে চোখে ক্লান্তি। বুঝতে অসুবিধে হল না যে,

এরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা মানুষ। আশ্রয়ের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করছে। খবর নিয়ে জানলাম ঘরগুলো পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীরা ভাড়া নিয়েছে। এখানে খুলেছে একটি অস্থায়ী অফিস। শরণার্থীদের সাহায্য করাই এদের কাজ। শরণার্থীরা আসে যায়। কেউ কেউ দুই একদিন অস্থায়ী ক্যাম্পে থেকেও যায়।

নবাগতদের স্বাস্থ্য, চেহারা এবং পোশাক-আসাক দেখে মনে হত এরা সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত সমাজের মানুষ। এদের কেউ কেউ টয়েটা এবং অন্যান্য বিদেশী গাড়ি চেপে আসত। সঙ্গে থাকত বিদেশী ব্যাগ ও স্যুটকেস। ওরা অফিসে গিয়ে কাগজপত্র তৈরী করে চলে যেত তাদের আশ্রয়স্থলে।

২৫শে মার্চের পর থেকেই বাংলাদেশ ইস্যু চিন্তায় এবং চেতনায় প্রধান হয়ে উঠেছিল। রাস্তাঘাটে এবং বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে অগণিত বিপন্ন ও বিপর্যস্ত আবাল- বৃদ্ধ- বণিতা শরণার্থীদের দেখে ভারাক্রান্ত হয়ে যেতাম। এদের জন্য একটু কিছু করার আকুল আগ্রহ জাগত মনে। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ নাগরিক কতটুকুই বা করতে পারি। তবু প্রাণের টানে শুধু সহানুভূতি এবং নৈতিক সমর্থন জানাবার জন্যই ৩০ শে মার্চ আগরতলার বুদ্ধিজীবীদের আয়োজিত ধিক্কার মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যোগ দিয়েছিলাম ৩রা মে-তে আগরতলার পোষ্ট অফিসের সামনে আয়োজিত সংহতি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে। মনে প্রাণে চেয়েছিলাম এঁদের জীবনে মুক্তি বা স্বাধীনতা আসুক। এঁরা আবার ফিরে যাক তাদের বাড়িঘরে শান্তিতে জীবন কাটাতে।

পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠার সময় থেকেই সেখানকার খবরের জন্য আগ্রহী হয়ে থাকতাম। সংবাদ মাধ্যমগুলোর দিকে একটু বাড়তি নজর রাখতাম। মাঝে মাবে দৈনিক সংবাদের সম্পাদকের ছোট ঘরে গিয়ে বসতাম বাড়তি কিছু খবরের আশায়। সন্ধ্যায় দপ্তরে থাকতেন সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিক, সাহিত্যিক ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, শিক্ষক সাংবাদিক বিপুল মজুমদার, অধ্যাপক মিহির দেব এবং আরও কিছু সাংবাদিক ও লেখক। উৎফুল্ল আড্ডা হতো অনেক রাত পর্যন্ত। এর মধ্যেই সংগ্রহ করা হত নানা উত্তেজক সংবাদ। আবেগের বন্যায় ভেসে গিয়ে তেজোদীপ্ত ভাষায় লেখা হত সেই সব সংবাদ। লেখক বিকচ চৌধুরী তখন দৈনিক সংবাদে প্রাণবন্ত দুঃসাহসিক তরুণ সাংবাদিক। তাঁর লেখনীতেও মূর্ত হয়ে উঠত পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতাকামী মানুষের হৃদয়াবেগ।

২৬ শে মার্চ সন্ধ্যায় দৈনিক সংবাদে গিয়েছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ সংবাদ জানার ঔৎসুক্য নিয়ে। আড্ডার ফাঁকে অধ্যাপক মিহির দেব-ই একটি প্রায় ভাঙা ছোট ট্রানজিষ্টারের নব ঘোরাতে ঘোরাতে প্রথম ধরেছিলেন খুব দূর্বল ট্রান্সমিটারে থেকে প্রচারিত শেখ মুজিবুর রহমানের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। আমি সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কথা ঘোষণা করছি। বাংলাদেশ সার্বভৌম স্বাধীন। বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রামে সহায়তা করুন। জয় বাংলা। ঘোষণা শুনে আমরা আনন্দে মেতেউঠেছিলাম। পরদিন সকালে দৈনিক সংবাদই সম্ভবতঃ প্রথম এই ঐতিহাসিক এবং সুঃসাহসিক ঘোষণার কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিল। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে উদ্বেল আনন্দরাশি প্লাবিত করেছিল আগরতলার জনজীবন।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শরনার্থী ত্রিপুরায় প্রবেশ করায় যুদ্ধ কালীন দ্রুততায় নির্মাণ করা হয়েছিল বেশ কিছু শরণার্থী শিবির। আগরতলায় এবং এর আশে পাশে ছিল কয়েকটি শিবির। সংগ্রামের প্রথম পর্বে কৌতুহল মেটাতে দেখতে গিয়েছিলাম কিছু শিবির। বিপন্ন, বিপর্যস্ত, অসহায় মানুষের করুণ অবস্থা দেখে খুবই বিচলিত বোধ করেছিলাম। বিধ্বস্ত মন নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। তখনই আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল আরও একটি অতীতের ঐতিহাসিক বিপন্নতার বীভৎস চিত্র। ১৯৫০ সালের কথা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান শিখা সারা পূর্ব বাংলায়। মানুষ জন্তুর মতো মরছে। ঘর বাড়ি পুড়ছে। লক্ষ লক্ষ বিপন্ন মানুষ পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটে আসছে কলকাতায় প্রাণ বাঁচাতে। শিয়ালদা স্টেশনের চত্বরে ভীড় জমাল অগণিত ছিন্নমূল, অসহায় মানুষ। স্বজন হারানোর করুন আর্তনাদে স্টেশনের চত্বরের বাতাস হয়ে উঠল ভারী। খোলা আকাশের নীচে সংসার পেতে খাদ্যের আন্বেষণে জন্তুর মতো ছোটাছুটি করতে লাগল হাজার হাজার মানুষ। এ যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক খন্ডচিত্র।

আমরা তখন স্কুলের উঁচু ক্লাশের ছাত্র। শিক্ষকদের নেতৃত্বে দল বেঁধে শিয়ালদা স্টেশনে যেতাম সেবার কাজ করতে। ছোট ছোট বাক্স রেলযাত্রী এবং পথচারীদের সামনে মেলে ধরে সাহায্য চাইতাম। সাধ্যমত সেবার কাজ চালাতাম। রোগীকে হাসপাতোলে নিয়ে যেতাম। শরাণার্থীদের পানীয় জল এনে দিতাম। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ব্লিচিং পাউডার ছড়াতাম। প্ল্যাটফর্মে সেবামূলক কাজ করার সময় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ট্রেনের রক্তমাখা বগিগুলো দেখে ভয়ে আঁতকে উঠতাম। নারকীয় বীভৎসতার চেহারা দেখে শিউরে উঠতাম।

আগরতলায় এবং এর আশেপাশের শরণার্থী শিবিরগুলো থেকে বেরিয়ে আমার মনে হয়েছিল, বোধহয় একটি অতীত ঐতিহাসিক ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করছে সমগ্র পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যদি এরা ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় না দিত, মিথ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের আবেগে গা না ভাসাতো, শুধু ধর্মকে অবলম্বন করে দেশকে ভাগ করার দাবী না জানাত, পূর্ব বাংলাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তাক্ত না করত, বিনিময়ে যদি আশ্রয় করত ধর্মনিরপেক্ষতাকে, জাতীয়তাবোধকে এবং গণতন্ত্রকে, তবে দরকার হতো না ১৯৭১ সালে নতুন করে স্বাধীনতার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। ১২ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হল মুজিবনগরের আম্রকুঞ্জে। বাংলাদেশ গণ পরিষদের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করলেন মহঃ ইউসুফ আলী। ১৮ই এপ্রিল কলকাতায় অবস্থিত পাকিস্থানের ডেপুটি হাইকমিশনের ভবন শীর্ষে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে তোলা হল স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। ভারতের লোকসভায় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করে গ্রহণ করা হল সর্বসম্মত প্রস্তাব। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৫ই মে ত্রিপুরায় এসে দেখে গেলেন শরণার্থী শিবির ও প্রশাসনিক কাজকর্ম। সুদূর আমেরিকা থেকে ছুটে এলেন সিনেট সদস্য এডোয়ার্ড কেনেডি। আগরতলায় ঘুরে গেলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সামরিক ও

অ-সামরিক অফিসারবৃন্দ। ভাবলাম, শীগ্‌গিরই ভারতীয় সৈন্য ঢুকে যাবে পূর্ব পাকিস্তানে। পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাজিত করে স্বাধীন বাংলাদেশকে তুলে দেবে বাংলাদেশের জনগণের হাতে। শরাণার্থীরা ফিরে যাবে তাদের ঘরে। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলাম, সমস্যাটা জটিল। সহজে মিটবার নয়। এতে জড়িয়ে আছে বিশ্ব রাজনীতি, সমরনীতি এবং আন্তর্জাতিক আইন-কানুন। সময় দরকার পূর্ব বাংলার বিদ্রোহী মানুষদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্যও। এতএব যুদ্ধজয়ের তাৎক্ষণিক বাসনা এবং উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ত্রিপুরায় আসায় এবং ত্রিপুরার বুকে সমরায়োজন পুরো উদ্যমে শুরু হওয়ায় অফিসের কাজ গিয়েছিল বেড়ে। কিছু কর্মী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরে চলে যাওয়ায় তাঁদের শূন্যতাটা পূরণ করতে হয়েছিল আমাদের। ফলে অফিস থেকে ফিরতে অনেক সময় সন্ধ্যে গড়িয়ে যেত। ফিরে এসে সংসারের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ঘোরাঘুরি করার খুব একাট সময় পেতাম না। অধিকাংশ সময় বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বসে গল্পগুজব করতাম। মাঝে মাঝে যেতাম দৈনিক সংবাদে, সুমুদ্রণ প্রেসে, দুলাল রায় চৌধুরীর দোকানে, ক্লিক স্টুডিওতে, বন্ধুবর তপন ভট্টাচার্যের বাড়িতে, বটতলাব আড্ডাখানায় এবং বন্ধুবর মৃণাল কর-এর বাড়িতে।

দৈনিক সংবাদের অফিসে গেলে প্রচুর তাজা এবং নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওযা যেত। ভুপেন দত্ত ভৌমিকের সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনদের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। দুইপক্ষই তাঁর কাছে নিয়মিত আসত। সংবাদ আদান-প্রদান করত। ফলে রণাঙ্গনের সর্বশেষ খবর তাঁর কাছেই বেশি পাওয়া যেত। সংবাদ নেওয়ার জন্য তাই দেশের জাতীয় পত্রিকাগুলির এমনকি বিদেশী পত্রিকার সাংবাদিকরাও ভুপেনের কাছে আস তেন বা ফোনে কথা বলতেন। শুনেছি কোন কোন সুচতুর সাংবাদিক আগরতলায় বসে ভুপেন দত্ত ভৌমিকের কাছ থেকে সংবাদ নিয়েই "রণাঙ্গন থেকে" লেখা বলে চালিয়ে দিতেন। সে যা-ই হোক, মুক্তিযোদ্ধা, ভারতীয় সামরিক বাহিনী এবং পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে আগরতলার ছোট্ট চার পাতার "দৈনিক সংবাদ" দারুণ বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল। প্রতিদিন হাজার হাজার কপি বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে যেত। কখনও কখনও দৈনিক সংবাদ দিনে দুবারও ছাপাতে হতো চাহিদা মিটাবার জন্য। দৈনিক সংবাদ তখন পূর্ব বাংলার মানুষের মনোবল ধরে রাখতে দারুণভাবে সাহায্য করেছিল।

আখাউড়ার আওয়ামী লীগের নেতা এবং কর্মীদের সাথে সুমুদ্রণ প্রেসের মালিক নেপাল দে'র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আড্ডা দেওয়ার জন্য সুমুদ্রণ প্রেসে গেলেই দেখতাম বাংলাদেশী মানুষরা যাতায়াত করছেন ঘন ঘন। ২৫শে মার্চের পর এদের আনাগোনা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। ওরা আসতেন, প্রেস থেকে নানা বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র ছাপিয়ে নিয়ে যেতেন। শ্রীযুক্ত দে মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীদের সাহায্য করতেন সাধ্যানুসারে। থানায় টেলিফোন করে, মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চপদে আসীন অফিসারদের টেলিফোন করে অথবা ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে শরণার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নানা সমস্যার সমাধান করে দিতেন। নেপাল দে-র কাছে শুনেছি আগরতলা -আখাউড়া সীমান্তে

উড়াবার জন্য বাংলাদেশের প্রথম বিশাল পতাকাটি তিনিই দান করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সৈনিক ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিনের সাথে নেপাল দে-র গভীর আন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়েছিল। রণাঙ্গন থেকে ফিরে ক্লান্তে ও অবসন্ন আইনুদ্দিন প্রায়ই সুমুদ্রণ প্রেসে এসে বসতেন। নিজেকে হাল্কা করার জন্য গল্পগুজব করতেন। চা-বিস্কুট খেতেন। মাঝে মাঝে তাঁকে আমরাও আড্ডায় পেতাম। তাঁর কাছে যুদ্ধের বিচিত্র কাহিনী শুনতাম। আড্ডায় থাকতেন বন্ধুবর সাংবাদিক ও কবি মৃণাল কান্তি কর-ও। আড্ডার ফাঁকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতাম আইনুদ্দিন সাহেব কেমন যেন আনমনা হয়ে যেতেন। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত হতেন। তিনি তাঁর স্ত্রীবে ফেলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্ত্রীর বিরহ তাঁকে মাঝে মাঝে উন্মনা করত। এই সব সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে দেখতাম দেশকে শত্রুমুক্ত করার অমিত মনোবল।

বাড়ির আড্ডায় মাঝে মাঝে সামনের ক্যাম্প থেকে কেউ কেউ এসে যোগদান করতেন। বুঝতে পারতাম যে., এরা প্রবাসে একাকীত্ব ঘোচাতে চান স্থানীয় লোকের সাথে আলোচনা করে। মনের দুঃখ ও যন্ত্রণা ভুলতে চান কথার আদান প্রদান করে। আমাদের দিক থেকেও এঁরা ছিলেন কাঙ্খিত অতিথি। কেননা, ওদের সাথে কথা বলে জানতে পারতাম পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরকার নানা ঘটনাবলী। দেশটি আমার জন্মভূমি। কৈশোর কেটেছিল পূর্ববাংলার শান্ত, স্নিগ্ধ, ছায়াঘেরা গ্রামে। দেশ ভাগের পর চলে এসেছি। আর যাইনি। গ্রামটি মাঝে মাঝে স্বপ্নে ধরা দেয় তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য নিয়ে। সরল, সহজ, ভালবাসায় ভরা মানুষগুলোকে নিয়ে। আগন্তুকের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করি, এঁরা আমার গ্রামটিকে চেনে কি না। মাঝে মাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করতাম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে কেন একজন অংশীদার হিসেবে ভাবি। যে দেশের মানুষগুলো একদিন আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল নির্মমভাবে, অন্যায়ভাবে, অমানবিকভাবে, তাদের প্রতি কেন এমন আকর্ষন অনুভব করি। কেন ভাবি যে, ওদের মুক্তি আমাদেরও মুক্তি। ওদের প্রাপ্তি আমাদেরও প্রাপ্তি। ওদের শত্রু আমাদেরও শত্রু। এ কি বাঙালি হবার সুবাদে? দেশটা একদা আমারও দেশ বলে? আমরা সবাই গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষী বলে? দেশটাকে আমরা আবার নিজের কাছে পাবো বলে? কিন্তু সঠিক উত্তর পাইনি।

প্রথম দিকে আলাপ আলোচনা করে স্পর্শ পেতাম ওদের দুরন্ত মনোবলের। খুব জোরের সঙ্গে বলতেন জয় তাঁদের হবেই। কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে বুঝতাম তাদের মনের জোর কমে যাচ্ছে। কেমন যেন চুপসে যাচ্ছেন। চোখে মুখে হতাশার ছাপ। কথায় বেদনা ও ব্যর্থতার অভিব্যক্তি। তখন ওদের সাহস দিতাম, উৎসাহিত করতাম। বলতাম, ভারত তো আছে, ইন্দিরা গান্ধী আছেন। ভয় কি?

একদিন এক মধ্যবয়স্ক অধ্যাপক দম্পতি শুনিয়েছিলেন তাদের দুঃখের কাহিনী। এক বস্ত্রেই প্রায় এঁরা দেশ ছেড়েছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন গয়নায় ভরা বাক্সটি লুকিয়ে। ভেবেছিলেন, দু'র্দিনের সম্বল। ভারতে এসে গয়না বেঁচেও জীবনটা রক্ষা করতে পারবেন। প্রথম উঠেছিলেন একটি শরণার্থী শিবিরে। চুরি হয়ে যেতে পারে ভেবে বাক্সটি রাখতে দিয়েছিলেন এক তথাকথিত

শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকের কাছে। তিনি শরণার্থী শিবিরে আসতেন সেবাকার্যে। প্রয়োজনের সময় চাইছে গিয়ে ওরা বাক্সটি আর ফিরে পাননি। সমাজসেবীটি প্রাপ্তি স্বীকার করেননি। কথাগুলো বলতে বলতে ভদ্রমহিলা কেঁদেছিলেন। আমি বিচলিতহয়ে ভদ্রলোকের নামটি জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভয়ে ওরা নামটি বলেননি। শুধু বলেছিলেন, একটি নাম জেনে কি করবেন। অনেক নাম আছে। এখন আমরা চরম বিপদে আছি। এই দুঃসময়ে আপনারা যে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, এটাই তো যথেষ্ট। আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা ছিলাম মুক্তিযুদ্ধের উগ্র সমর্থক, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন দুই-একজনকে পেতাম যাঁরা প্রাকাশ্যে কিছু না বললেও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মাতামাতি পছন্দ করতেন না। আমার এক দূর সম্পর্কিত মামা ছিলেন তাঁদে র দলে। দেশ ভাগের আগে পূর্ববাংলার এক গ্রামে তাঁর জমিজমা, বাড়িঘর, পুকুর সবই ছিল। বেশ সুখেই ছিলেন। দা ঙ্গার সময় তাঁর বাবা খুন হয়ে যান। অন্যান্যরা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে চলে আসেন ত্রিপুরায়। বহু চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারেননি, কোনরকমে বেঁচে ছিলেন পরিবার নিয়ে। যুদ্ধের কথা উঠলে তিনি কর্কশ সুরে বলতেন, এত মাইত্য না। ক্রিতকর্মের ফল কিছুটা ভুগুক। দেশের স্বাধীনতার সময় আমরা মুসলমান, হিন্দুরা কাফের। আবার এখন আমরা বাঙালি, ধর্মনিরপেক্ষ। এত সুবিধাবাদ ভাল না। ওদের খামখেয়ালিতে কত লক্ষ লক্ষ জীবন নষ্ট হইছে কও?

যদি বলতাম, অতীত ঘেঁটে কি হবে মামু। ভুল তো সবারই হয়। ভুলে যেতে হয় অনেক কিছুই। মামু রেগে গিয়ে বলতেন, আমরা ভুলতে পারতাম না। কারণ এই ভুলে আমার বাবা খুন হইয়া গেছে। ভুলতে যদি হয় আমাগো পুলা-মাইয়ারা ভুলব।

মে মাস থেকেই পাক্ বাহিনী মুক্তি বাহিনীকে মুক্তাঞ্চল থেকে হটাতে লাগল ভারী অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে। মুক্তি বাহিনীর সৈনিকরা ভারতে ঢুকে পড়ল এবং মাঝে মাঝে সীমান্ত পেরিয়ে গিয়ে শুরু করল গেরিলা যুদ্ধ। তা সত্বেও পাক সৈন্যরা চলে এল সীমান্তের খুব কাছাকাছি। আগরতলার কাছে আখাউড়া জংশনেও বাঁধল একটি শক্ত ঘাঁটি। সেখানে আগরতলাকে তাক করে বসালো বেশ কিছু দূরপাল্লার কামান।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেতাম ভারী কামানের মুহুর্মুহু গর্জন। একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়ালে আগরতলার পশ্চিমাকাশে দেখা যেত ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক। লাল আলো ছড়িয়ে পড়ত গোটা পশ্চিম আকাশ জুড়ে। গোলাগুলি কোথায় গিয়ে পড়ছে, কিছুই বুঝতে পারতাম না। মাঝে মাঝে দেখতাম পূর্ব পাকিস্তানের আকাশে পাক বিমান বাহিনীর বিমানের ত্রস্ত ছুটে যাওয়া। ভয় হতো, কিছু গোলা আগরতলায় এসে না পড়ে।

জানতাম, মুক্তিবাহিনী যতই গেরিলা যুদ্ধ করুক, আমরা তাদের বীরত্বের যতই জায়গান করি, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী রণাঙ্গনে না নামলে স্বাধীন বাংলাদেশ হবেনা। সেটা ঘটছিল না বলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হচ্ছিলাম।

একসময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকদের আনাগোনা চোখে পড়ল এখানে ওখানে।

আগরতলা শহরের রাস্তায় চোখে পড়ল বিচিত্র সমরোপককরণ সহ সাঁজোয়া গাড়ি এবং ট্যাঙ্কের মিছিল। আকাশে দেখা গেল ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার এবং বিমান। আগরতলা বিমান বন্দরে এসে নামল বিশাল বিশাল মালবাহী বিমান। সেনাদল আগরতলার উপকণ্ঠে ফেলল বাড়তি ছাউনি। আগরতলাকে ঘিরে বসালো হল বেশ কিছু দূরপাল্লার ভারী কামান। রাতের অন্ধকারে এগুলো গর্জন করে উঠতে লাগল মুহুর্মুহু। পাক সৈন্যদের বার্তা পাঠাতে লাগল যে, "আমরা আছি"। এই সব দেখেশুনে আমাদের মনে জাগল আশার আলো।

মাঝে মাঝে শহরে "ব্ল্যাক আউট" কার্যকর করা হত। সমস্ত আগরতলা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে যেত। কেননা, সিভিল ডিফেন্স থেকে নির্দেশ ছিল ঘরের আলো যেন কোনওভাবে বাইরে না আসে। গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে অথবা ঘুমভাঙা চোখে উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে শুনতাম ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি চলার একটানা বিকট ধাতব শব্দ। অজানা আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করত। অদ্ভুত দর্শন ট্যাঙ্ক এবং গাড়িগুলোর দেখে পথের কুকুরগুলো ভয়ে আর্তনাদ করত। তাতে নিশীথের বিভীষিকা আরও ঘণীভুত হতো।

সিভিল ডিফেনস থেকে পেতাম নানা ফরমান। দরজা-জানালার কাঁচে লাগাতে হবে আড়াআড়িভাবে কাগজের মোটা ফিতে। বাড়ির সামনে তৈরী করতে হবে ট্রেঞ্চ। বারান্দায় অথবা উপযুক্ত স্থানে তুলতে হবে বালির বস্তার দেয়াল, ঘুমোতে হবে মেঝেতে। কাছাকাছি রাখতে হবে পানীয় জলের পাত্র, মোমবাতি, দিয়াশলাই, টর্চ, কিছু ওষুধ-পত্র, ছুরি, কাঁচি, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি। বিমান আক্রমণের সময় কি করতে হবে, তারও নির্দেশ পাঠাল সিভিল ডিফেন্স। দুই একটা মহড়াও হয়ে গেল বুক কাঁপানো সাইরেন বাজিয়ে।

শুনতাম, পড়তাম সবই, কিন্তু সিভিল ডিফেন্সকে মান্যতা দিয়েছিলাম কমই। বাড়িতে মাটি নেই। তাই ট্রেঞ্চ কাটা হল না। সমীর বর্মণের বাড়ীতে জ্যাম-এয়ারের কর্মীরা একটি ট্রেঞ্চ কাটল। ভাবলাম বিপদে সেটাই ব্যবহার করব। সীমানার বেড়াটা ফাঁক করে রাখলাম। দরজা জানালার কাঁচে লাগালাম কাগজ এবং আলোর উৎসগুলোকে ঢেকে দিলাম যাতে বাইরে আলো না যায়। ব্যাস্, এতটুকুই। এই গাফিলতির ফল ভোগ করেছিলাম পরে। সেই কথা পরে বলছি।

ঘর থেকে বেরোলেই পুরণো আর.এম.এস.চৌমুহনী। মোড়েই দিলীপ দেবরায়ের "ক্লিক"স্টুডিও। দিলীপ দেবরায় তখন প্রাণচঞ্চল যুবক আলোকচিত্রশিল্পী। মুক্তি-যুদ্ধের ছবি তোলার জন্য সে দুরন্ত বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে। ওকে ভারতীয় সেনাবাহিনীও নিয়ে যেত বিভিন্ন স্থানে ছবি তোলার জন্য। কোনও গোপন ও নিষিদ্ধ স্থানে নেওয়ার আগে তার চোখ বেঁধে দেওয়া হত, যাতে পথের নিশানা না পায়। দিলীপ সেনাবাহিনীর খুব বিশ্বস্ত ফটোগ্রাফার হয়ে উঠেছিল। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সে অনেক ছবি তুলেছিল তখন।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় দিলীপের স্টুডিওতে গিয়ে বসতাম ছবি দেখার জন্য অথবা দিলীপের সাথে গল্প করার জন্য। কথার ফাঁকে ফাঁকে দিলীপ স্টুডিও-র ভেতরে গিয়ে ছবি তুলত। কিছু লোক আসত দল বেঁধে। তাদের পরনে থাকত লুঙ্গি, গায়ে অদ্ভুত ধরনের জামা। কাঁধে থাকত

গামছা, মাথায় টুপি। দিলীপ একজনের পর একজনের ছবি তুলে যেত। ওরা চলে গেলে আমাকে বলত, "দাদা, এরা সব মুক্তিবাহিনীর লোক। এদের মধ্যে ভারতের সৈন্যবাহিনীর লোকও আছে। ওদের গেরিলা যুদ্ধের জন্য পূর্ববাংলার ভিতরে পাঠানো হবে। সৈন্যবাহিনী থেকেই নির্দেশ দিয়েছে এদের ছবি তুলে দেওয়ার জন্য।"

দিলীপ যখন ছবি তুলত, স্টুডিও-র এক কোণে বসে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে দৃষ্টি ফেলতাম নীরবে। অভিব্যক্তিহীন শান্ত মুখ। ঐ মুখগুলোতে পড়ার মতে কোন ভাষা থাকত না। মনে মনে ভাবতাম, বাংলাদেশ তো একদিন স্বাধীন হবেই, কিন্তু সেদিন এদের অনেকেই থাকবে না স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করার জন্য।

সবই চলছিল, কিন্তু যুদ্ধের কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা মানুষগুলো হতাশায় ভুগছিল। আমরা উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, এবং প্রচার মাধ্যমগুলো কল্পিত জয়ের কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু এতে আমাদের মন ভরছিল না একেবারেই।

একদিন রাস্তায় দেখা হল কলেজের এক সহপাঠীর সঙ্গে। ত্রিপুরা সরকারের অফিসার। প্রশ্ন করলাম, কেমন আছিস?

সে এককথায় জবাব দিল, ভাল নেই।

- কেন?

- প্রথমতঃ অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে। অফিস টাইম চুলোয় গেছে। দশ থেকে বারো ঘন্টা অফিসেই থাকি। সংসার চুলোয় গেছে। এরমধ্যে বাড়িতে সাতজন এক্সট্রা মানুষ। শ্বশুরবাড়ির মানুষ। সব ছেড়ে ছুড়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে। ফেলে তো দিতে পারি না। অথচ সামর্থ নেই চালাবার। সঞ্চয়তো গেছেই, এখন ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছি। কি যে হবে ভেবে পাচ্ছি না।

বন্ধুর সমস্যা শুনে সহানুভূতিশীল হলাম, কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে রইলাম।

বন্ধু হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উপর ক্ষেপে উঠল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, এই ভদ্রমহিলা যুদ্ধটাকে খেলাচ্ছে কেন বল তো? এসপার ওসপার তো করা দরকার। দেরি হলে আমরা যেমন মরব, ওরাও মরবে।

এইসব প্রশ্নের জবাব জানা না থাকায় বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলাম।

আর একদিন এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম বিয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। তিনি ত্রাণ ও পূনর্বাসন দপ্তরে কাজ করতেন। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে দেখি রঙীন পাতলা প্লাস্টিকের শিট দিয়ে সুন্দর প্যান্ডেল করেছেন। এই সব সামগ্রী আগে আগরতলায় দেখিনি। আত্মীয়কে প্রশ্ন করলাম, ভারী সুন্দর জিনিস তো? কোথায় পেলেন?

তিনি হেসে বললেন, কেন, আগে দেখনি? বাজারে প্রচুর আছে। আমি তো খুব অল্পদামেই কিনে আনলাম। শরণার্থী শিবির থেকে পাচার করা জিনিস। শুধু এই জিনিস নয়, তাঁবু, গুঁড়ো দুধ, পোশাক-আসাক, ওষুধ এবং আরও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে। যদি কিনতে চাও

বলো, আমি কিনে দেবো।

যুদ্ধ শুরু হচ্ছিল না ঠিক, কিন্তু যুদ্ধের পরিবেশ যে ঘনীভুত হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছিলাম। লক্ষ্য করছিলাম, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে এবং প্রশাসনে অতিরিক্ত তৎপরতা। শহরের লোকজনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। জীবনযাত্রার ঢিলেঢালা ভাবটা যেন উধাও হয়ে গেছে। পরিচিতরা রাস্তায় দেখা হলে দাঁড়িয়ে কথা বলে না। যেন কারো হাতেই সময় নেই। নিরাপত্তার খোঁজে সবাই ছুটে বেড়াচ্ছে।

আমার স্ত্রী তখন শিক্ষকতা করতেন অরুন্ধতীনগরের ক্যাম্পের বাজারের এক সরকারী বিদ্যাল্যয়ে। স্কুলের খুব কাছেই ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁবু ফেলেছিল। মাঝে মাঝে অবসর সময়ে সৈনিকরা আসত স্কুলে। ছাত্রছাত্রীদের আদর করে বিস্কুট, চকলেট, ফলফসারী উপহার দিত। দিদিমণিরাও মাঝে মাঝে পেতেন তাদের আন্তরিক উপহার। এভাবে ইস্কুলের সঙ্গে সৈনিকদের গড়ে উঠেছিলি প্রীতির সম্পর্ক। বিদেশ বিভূই-এ যুদ্ধের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ভারতীয় সৈনিকেরা ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে নিতে চাইত পারিবারিক জীবনের উষ্ণ সান্নিধ্য। শিক্ষিকাদের এরা আশ্বাস দিত, "তোমরা ভয় পেয়ে স্কুল কামাই করো না। ভয় নেই। আমরা তো রয়েছি। বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে আমরাই তোমাদের জানাব।" এ সব কথা স্ত্রী এসে আমাকে জানাতেন। প্রশংসা করতেন জওয়ানদের সুন্দর ব্যবহারের ।

দেখতে দেখতে বর্ষাকাল এসে গেল। সীমান্ত খোলা থাকায় পূর্ব বাংলা থেকে আগরতলায় ইলিশ মাছ এলো প্রচুর। বটতলা এবং গোলবাজারে গেলে দেখা যেত ইলিশ মাছের স্তুপ। দামও বেশ কম। প্রায়ই আস্তো ইলিশ মাছ কিনে আনতাম। সন্ধ্যা আড্ডায় ইলিশ মাছের ভাজা পরিবেশিত হত। পূর্ব বাংলার অতিথি বন্দুদেরও আপ্যায়ন করতাম তাদেরই দেশের মাছ দিয়ে। মাঝে গুজব উঠল যে পাক সেন্যরা মাছে বিষ মিশিয়ে ভারতে পাঠাচ্ছে। এগুলো খেলে বিপদ হতে পারে. গুজব শুনে একটু সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম।

'জয় বাংলা' শব্দ দুটো তখন খুব চালু হয়েছিল। প্রথম প্রথম পরিচিত বাংলাদেশীদের দেখলে সম্ভাষণ জানাতাম 'জয় বাংলা' বলে। পরে নিজেদের মধ্যেও কুশল বিনিময়ের সময় এই দুটো শব্দ উচ্চারণ করতাম। ঐ সময় পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের সাথে চোখের একটি সংক্রামক রোগ এসেছিল ত্রিপুরায়। চোখ লাল হয়ে যেত, পিচুটি জমত। দেখতে কষ্ট হত। রোগটা পাঁচ ছয়দিন খুব কষ্ট দিত। এই রোগটির নাম পড়ে গিয়েছেল 'জয় বাংলা'। নামটি মুখে মুখে ফিরত তখন।

দেখতে দেখতে বর্ষাকালও চলে গেল। বন্ধু-বান্ধব-পরিচিতরা বলল, এবার ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পূর্ব পকিস্তানে ঢুকবে মক্তি বাহিনীকে সাহায্য করতে। কিন্তু তাঁদের কথা সত্য হয়ে উঠে না। শুধু রেডিওতে শুনি এবং কাগজে পড়ি মুক্তি যোদ্ধাদের সাফল্যের কাহিনী, পাক সৈন্যের পাশবিক অত্যাচারের নানা বৃত্তান্ত, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠের উদ্দীপক সংবাদ সমীক্ষা, বিশ্ব রাজনীতির জটিল বিশ্লেষণ, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নানা ঘোষণা। প্রায়

রোজই সন্ধ্যারাত থেকে গভীর রাত পর্যন্ত শুনি কামানের একটানা গর্জন। কিন্তু সব কিছুই যেন হয়ে উঠতে লাগল গতানুগতিক। মার্চ-এপ্রিলের উত্তেজনা এবং উদ্দীপনা হারিয়ে গেছে বলে মনে হতে লাগল।

২৪শে অক্টোবরের সন্ধ্যা। কামান চৌমুহিনী থেকে পোষ্ট অফিস চৌমুহিনী পর্যন্ত প্রধান বাজার জমজমাট। দোকানগুলোতে ভীড়। শত শত মানুষ কেনা-কাটায় ব্যস্ত। আমি গল্প করছিলাম এখনকার সমাজপতি মার্কেটের পাশের স্ট্যান্ডার্ড মার্ট দোকানে বসে। দোকানের মালিক ছিলেন আমার মাতুল দুলাল রায়চৌধুরী। তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের নানা খবর রাখতেন, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবারহ করতেন।

ব্যবসা এবং অন্যান্য কাজে তিনি ঘোরাঘুরি করতেন শরণার্থী শিবিরে, বাংলাদেশ অফিসে, ত্রিপুরা প্রশাসনের নানা অফিসে। তার দোকানে বসলে সংগ্রাম সম্পর্কিত নানা নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যেত। রাত প্রায় আটটা নাগাদ হঠাৎ দুটো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে পৃথিবী কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুকের স্পন্দন গেল বেড়ে। আমরা কোন ভয়ঙ্কর আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কিছু বুঝে উঠার আগেই সমস্ত শহর গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল। এতে ভীতিজনক অবস্থার মাত্রা গেল আরও কয়েকগুণ বেড়ে। চারিদিকে শোনা যেতে লাগল আর্তনাদ আর কোলাহল। বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ছায়ামূর্তির মিছিল ছুটে চলেছে উর্দ্ধশ্বাসে।

সম্বিৎ ফিরে আসতেই বুঝলাম কোথাও কামানের গোলা পড়েছে। কিন্তু কোথায় তা বুঝতে পারছিলাম না। বাড়ির জন্য মন উতলা হয়ে উঠল। ছেলের বয়স তখন মাত্র দেড় বছর। মুহূর্তের জন্যও দেরি না করে অন্ধকারেই হাঁটতে লাগলাম বাড়ির দিকে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় ছুটে চলা মানুষের ভীড়। ধাক্কা-ধাক্কি। মুখে ভয়ার্ত আর্তনাদ, বিলাপ। একজন সহযাত্রী দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে জানাল, সে কামান চৌমুহিনীতে ছিল। বিস্ফোরণের প্রচন্ড আওয়াজ কানে যেতেই শত শত লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাশের ড্রেনগুলোতে প্রাণের ভয়ে। অন্ধকারে লুটোপুটি খাচ্ছে কাঁদায়। জুতো, ব্যাগ আর নানা সামগ্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে চারদিকে। শুধু আর্তনাদ আর ছুটোছুটি। সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। কার যে কি সর্বনাশ হয়েছে কে জানে। কথা বলতে বলতে লোকটা ত্রাসের চোটে আমাকে ছাড়িয়ে গেল। ঘন অন্ধকারে পা টিপে টিপে দুরু দুরু বুকে কোনরকমে বাড়িতে ফিলে এলাম। বাড়ির সবাই ভয়ে জড়োসড়ো। স্ত্রী, শিশু ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। আমাকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে প্রশ্ন করল, কোথায় পড়েছে?

- জানি না। তবে শহরেই এবং খুব দূরে নয়। কথা শেষ হওয়ার আগেই সহকর্মী, অনুজ প্রতিম দুলাল চক্রবর্তী হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। সে জানাল গোলা দুটো পড়েছে বনমালীপুরে। একটা পড়েছে সুখময় সেনগুপ্তের বাড়ির উত্তর দিকে সন্তোষ মুখার্জীদের বাড়ীতে। মুখার্জী বারান্দায় বসেছিল। সে মারা গেছে। অন্য গোলার আঘাতে একজন আহত হয়েছে। মুখার্জীকে চিনতাম। সচিবালয়ে কাজ করত। তার মৃত্যুর দুঃসংবাদ পেয়ে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

এতদিন গুলীগোলা ছিল শহরের বাইরে, সীমান্ত এলাকায়। এবার শহরের ভেতরে চলে

আসায় চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ঘটনা একবার যখন ঘটেছে আরও তো ঘটতেই পারে। ভাবনা হচ্ছিল শিশুটির জন্যই বেশি। কামানের গোলা যদি গায়ে না-ও পড়ে, কাছাকাছি কোথাও পড়লে বিকট শব্দেই ছেলে মরে যাবে। অনেক ভেবে স্থির করলাম ওদের সরিয়ে দেবো শহরের বাইরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর যোগেন্দ্রনগরে বিদ্যাসাগর রোডের শেষ মাথায় ছোট টিলাবেষ্টিত একটি বাড়িতে দুটো মাটির ঘর পাওয়া গেল। ভাবলাম, পাক সৈন্যরা প্রত্যন্ত গ্রাম তাক করে মূল্যবান গোলা নষ্ট করবে না। আর যদি গোলা ছোঁড়েও, সামনের পাহাড়ে আটকে যাবে।

টুকটাক কিছু জিনিষপত্র সহ বাড়ির লোকজনদের নতুন আস্তানায় পাঠাবার জন্য এক বন্ধুর কাছে তাঁর গাড়িটি চাইলাম। তখন অটো ছিল না। ভাড়া নেওয়ার মতো ছোট গাড়িও ছিল কম। বন্ধু প্রথমে বলল গাড়িটা দেবে। কিন্তু যাবার ঠিক আগে দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে, পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে না। সে তাঁর নিজের পরিবারের ব্যবহারের জন্য পেট্রোল কিনে ট্যাঙ্ক ভর্তি করে রেখেছে। অতএব ট্যাঙ্কটা খালি করতে চায় না। অগত্যা রিক্সা করেই বাড়ির সবাইকে নতুন আস্তানায় পাঠিয়ে দিলাম। আমি আর আমার ছোট ভাই সুজয় রয়ে গেলাম আর এম এস চৌমুহিনীর বাড়িতে।

শহরে প্রথম গোলা পড়ার পর থেকেই শহরবাসীর মধ্যে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হল। লোকজনের চোখে-মুখে আবার দেখা দিল উৎকণ্ঠা। চলাফেবায় বিহ্বলতা। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সাথে সাথে দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। রাস্তাগুলো হয়ে যেতে লাগল অনেকটা ফাঁকা। আমাদের আড্ডা-গল্পও গেল কমে। বন্ধু-বান্ধব পরিচিতদের দেখাই পেতাম কম। কে যে কি করছে বুঝতে পারতাম না। তবে এটা বুঝতে পারতাম যে, সবাই নিজের এবং পরিবারের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ব্যস্ত।

যাঁদের সুযোগ আছে, তাঁরা পরিবার পাঠিয়ে দিলেন রাজ্যের বাইরে। কেউ কেউ পাঠালেন রাজ্যের ভিতরে নিরাপদ স্থানে। তবে বেশিরভাগ পরিবারই আশ্রয় নিতে লাগল আগরতলার কাছাকাছি গ্রামগুলোতে। কিন্তু শহরবাসীর এক বড় অংশই রয়ে গেলেন নিজেদের বাড়ি-ঘরে অথবা ভাড়া বাড়িতে। ওদের মনের ভাবটা ছিল, যা হবার হবে, অথবা কী আর এমন হবে। ওদের দেখে আমার মনে হতো, এরা খুবই সাহসী এবং বেপরোয়া অথবা যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে ওদের কোন ধারণা নেই। বন্ধুবর মৃণাল কান্তি করের মধ্যেও তখন দেখেছিলাম এক বেপরোয়াভাব। অবশ্য অবস্থার চাপে পড়েই তিনি বেপরোয়া হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী চাকুরে, তখন তাঁর প্রথমা কন্যাটির বয়স মাত্র ছয়-সাত মাস। নিজে তিনি করেন সাংবাদিকতা। অতএব আগরতলা ছাড়ার কথা তিনি ভাবতে পারেননি। এমনকি বাড়িতে নিরাপত্তারও কোন ব্যবস্থা করেননি। একদিন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ শ্রীকরের বাড়িতে গিয়েছিলেন নবজাতক শিশু কন্যাটিকে আশীর্বাদ করতে। বাড়িতে প্রবেশ করে তিনি অবাক হয়ে যান। না আছে বালির বস্তার দেয়াল, না আছে ট্রেঞ্চ। এমনকি কাঁচের জানাগুলোতে কাগজও সাঁটা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী এসব দেখে বিস্মিত

হয়ে প্রশ্ন করলেন, কী সাংবাদিক, বাড়ির নিরাপত্তা কই?
মৃণাল কর জবাব দিলেন, মুক্তিযোদ্ধার আবার নিরাপত্তা কি? আমিও তো এক মুক্তিযোদ্ধা। মুখ্যমন্ত্রী ফিরে গিয়ে এক ট্রাক ভর্তি বালির বস্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মৃণাল করের বাড়িতে।

অক্টোবরের পর থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৎপরতা একটু বাড়ল। রাতের কারফিউও দীর্ঘায়িত হল। ঘন ঘন হতে লাগল নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা। মধ্যরাত্রির পর থেকে সারারাত ধরে আখাউড়া রোড ধরে যেতে লাগল সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্যাঙ্ক -এর মিছিল। ভয়ঙ্কর শব্দে ভাঙতে লাগল রাতের নিস্তব্ধতা। কখনও কখনও সৈন্যবাহিনীর চলাচল হতে লাগল দিনের বেলাতেও। বিশাল বিশাল কামান টেনে নিয়ে যেতে লাগল সাঁজোয়া গাড়িগুলো। বেশ কয়েকদিন চোখে পড়ল সেনারা আখাউড়া রোড ধরে তাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে গাধার পাল এবং গাড়িতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বানরের দল। এই সব দৃশ্য দেখে এক পরিচিত প্রাক্তন সৈনিক জানালেন, যুদ্ধের আর দেরি নেই। প্রস্তুতির অন্তিম পর্বেই নাকি সৈন্যবাহিনী এইসব জন্তুদের ছাউনির বাইরে আনে।

১৬ই নভেম্বরের মধ্যরাত্রি। আমি এবং আমার ছোট ভাই সুজয় ছিলাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ প্রলয়ঙ্কর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মাটি কেঁপে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠলাম আমরাও। দরজা-জানালাগুলোর ঝন ঝন করে উঠল। ঘোর কাটতেই বুঝলাম, কাছেই কোথাও গোলা পড়েছে। দু'জনেই উঠে বসলাম মেঝেতে। ভাবলাম ছুটে গিয়ে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেবো। উঠে দাঁড়ালাম এবং দরজার দিকে ছুটে গেলাম, অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে। কিন্তু দরজা খুঁজে পেলাম না। ত্রাসে এবং ভয়ে দিকভ্রম হয়েগেছে। চেষ্টা করলাম লাইটের স্যুইচ বোর্ড খুঁজতে কিন্তু পেলাম না। ফিরে এলাম আবার বিছানায়। বালিশের কাছে একটা মোমবাতি এবং দেয়শলাই রেখেছিলাম কিন্তু ফিরে এসে হাতড়িয়ে এগুলো পেলাম না। এরই মধ্যে একটার পর একটা গোলা পড়তে লাগল ধারে কাছেই। ভয়ে এবং উত্তেজনায় গায়ে ঘাম দেখা দিল। জল তেষ্টায় বুক ফেটে যেতে লাগল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। অন্ধকার ঘরে অসহায় ভাবে ঘুরপাক খেতে লাগলাম। অনেক কষ্টে দরজার হদিশ পেয়ে ছিটকিনি খুলে যখন বাইরে এলাম তার আগেই কয়েক মিনিটের ব্যাবধানে প্রায় পাঁচটি গোলা পড়ে গেছে আশেপাশে। আমরা ছুটলাম ট্রেঞ্চের দিকে।
লক্ষ্য রাখলাম আকাশের দিকে গোলার গতিপথ দেখার জন্য। যেতে যেতে দেখলাম আখাউড়ার দিক থেকে আকাশে নীলাভ লাল আলো ছড়িয়ে গোলা ধেয়ে আসছে আগরতলার দিকে। প্রচন্ড শব্দ করে একটি গোলা ফাটল ভিক্ষু ঠাকুরের বাড়ির কাছে। অন্যটি ডঃ বি.দাসের বাড়ির কাছে। আরও গোলা আসতে পারে ভেবে আমরা দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম ট্রেঞ্চে। সেখানে গিয়ে দেখি জ্যাম এয়ার কোম্পানীর গুজরাটি কর্মী চমলজী আগে থেকেই বসে আছেন। তার পাশে বসে আমরা হাঁপাতে লাগলাম। জল তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছিল। চমলজীকে জলের কথা বলতেই তিনি একটি বোতল হাতের কাছে এগিয়ে দিলেন। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল চমলজী আমার জীবন দান করেছেন।

কয়েক মিনিট কাটল। গোলার আর কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না। তবু, ক্লান্ত,

অবসন্ন দেহটাকে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ বসে রইলাম ট্রেঞ্চের ভিতরে। বুকের মধ্যে চলতে লাগল দ্রুত হৃদস্পন্দন। কিছুতেই যেন স্বাভাবিক হতে চায় না। আমাদের বাড়ির পিছনের দিকে ছিল ঝরিয়াদের বাড়ির ফলের বাগান। বাগানে ঘন সন্নিবেশিত বড় বড় ফলের গাছ-গাছালি। এগুলোতে থাকে অসংখ্য বাদুর এবং নানা জাতীয় পাখী। ট্রেঞ্চে বসে শুনছিলাম বাদুরগুলোর পাখা ঝাঁপটানি, পাখীর বিচিত্র কোলাহল, কাকের কর্কশ ডাক। কানে আসলে লাগল কুকুরের ভয়ার্ত ঘেউ ঘেউ শব্দ। বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল কিছু মানুষের চিৎকার।

মিনিট দশেক ট্রেঞ্চে বসে থেকে পা টিপে টিপে উঠে এলাম। চমলজীর কাছ থেকে টর্চটা নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। দেয়শলাইটা খুঁজে নিয়ে মোমবাতি জ্বালালাম। জলপাত্র থেকে আরও খানিকটা জল খেয়ে মোমটা হাতে নিয়ে এলাম বাঁধানো উঠোনে। চেয়ে দেখি, সমস্ত উঠোন কাঁদায় ভর্তি। অবাক হই। এত কাঁদা কোথা থেকে এলো। উৎস সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাই। বুকের ভিতরটা আবার টিপ টিপ করতে থাকে। তবে কি বাড়ির কাছেই গোলা পড়েছে? রান্নাঘরের পেছনে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। একটা গোলা পড়েছে এখানে। নরম মাটিতে বেশ বড় গর্ত হয়ে গেছে। গর্তের কাঁদামাটি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

হিসেব করে দেখি, আমরা যেখানে ঘুমিয়েছিলাম সেখান থেকে মাত্র বিশ ফুট দূরে গোলাটি পড়েছে। মাঝখানে পাকা রান্নাঘরটি থাকায় এবং মাটি নরম হওয়ায় আমরা বেঁচে গেছি। স্প্রিন্টার গায়ে লাগেনি। গোলাটি এত কাছে পড়েছিল বলেই আওয়াজটা আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। বিশাল গর্তটি দেখে বুকের ভেতরটা আবার মোচড় দিয়ে উঠল। শরীর কাঁপতে লাগল। বসে পড়লাম বারান্দায়। বাকী রাতটা অনিদ্রায়ই কাটল। খুব ভোরে খবর পেলাম গোলাগুলো পড়েছে আমাদের বাড়ি থেকে দুইশত গজের মধ্যে। সবগুলোই জনবহুল এলাকায়। পড়েছে তবে কেউ হতাহত হয়নি। গোলাগুলো ছোঁড়ার ধরণ দেখে মনে হল পাক সৈন্যরা তাক করেছিল আমাদের বাড়ির সামনের ক্যাম্পটি অথবা দৈনিক সংবাদ ভবন। আগেই বলেছি যে, ক্যাম্পটি ছিল পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম প্রধান আস্তানা।

এই ঘটনার পর শহরের লোকজনদের মধ্যে সঞ্চার হল প্রচন্ড ভীতির। শহর থেকে সরে যাওয়ার আবার একটা হিড়িক পড়ল। আমাদের যোগেন্দ্রনগরের অস্থায়ী আস্তানায় আশ্রয় নিলেন কিছু আত্মীয়-স্বজন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সারাদিন আগরতলায় কাজ করে সন্ধ্যার পর চলে আসতে লাগলেন আমাদের মাটির ঘরে রাত কাটাবার জন্য। দেখতে দেখতে আবাসিককের সংখ্যা হয়ে গেল দশ-বারোজন। দুটো মাত্র ঘর। তাও খুব বড় নয়। তারমধ্যে চৌকি মাত্র একটি। অতএব শোবার সমস্যা দেখা দিল। স্থির হল, মেয়েরা একটি ঘরে মেঝেতে শোবেন, অন্যটির মেঝেতে শোবেন ছেলেরা। বিছানার অভাব। অতএব খড় পেতে তার উপর কম্বল পেতে নেওয়া হল। দিনের বেলা ঘরের বিছানা খানিকটা গুটিয়ে স্টোভে রান্না করা হত। সংক্ষিপ্ত রান্না। ভাত, ডাল, সবজি, ভাজা। রাতে প্রায়দিনই খিচুড়ি। মুলত আমাদেরও অবস্থা হল শরণার্থীদেরই মতো।

বাড়ির অদূরে টিলা সংলগ্ন খোলা মাঠে ছিল দুটো ছোট পুকুর। সবুজ ঘাসে ঢাকা পাড়।

পাড়ে ফাঁকা ফাঁকা নানা গাছ গাছালি। পুকুরের জলে রোদ লাগে দিনভর। তাই জল স্বচ্ছ। সবাই যেতেন গায়ে শীতের রোদের আমেজ লাগিয়ে পুকুরে স্নান করার জন্য।

দিন ও রাত্রির আকাশে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমান ও হেলিকপ্টারের ঘোরাফেরা বাড়ল লক্ষ্যণীয়ভাবে। বিমানগুলো যেন আকাশ চিরে লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যেত। ধীরে ধীরে পুরো আগরতলা শহরটাই চলে যেতে লাগল সেনাবাহিনীর হাতে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে বসানো হল সামরিক বাহিনীর পাহারাদার। মোড়ে মোড়ে দাঁড়াল সেনাপুলিশ। যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ভার নিয়ে নিল এরা। টেলিফোন এবং বিদ্যুতের পোষ্টগুলোর মধ্য দিয়ে টেনে নেওয়া হল অসংখ্য সামরিক বাহিনীর ব্যবহারের তার। আকাশবাণী ভবন, টেলিফোন ভবন, বিমানবন্দর, সেতু, সচিবালয় ইত্যাদি ঘিরে রাখল সেনাবাহিনীর লোকেরা। বহু বেসরকারী গাড়িকে নেওয়া হল সরকারের নিয়ন্ত্রণে। পেট্রোল, ডিজেলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হল কঠোরভাবে।

নানা ধরনের খবর পেতাম। নভেম্বরের শেষের দিকে খবর পেলাম পাক সৈন্যরা আখাউড়াতে সবচেয়ে বেশি সৈন্য সমাবেশ করেছে আগরতলা আক্রমণ করার জন্য। নির্মাণ করেছে শক্ত ঘাঁটি। কয়েকদিনের মধ্যেই এরা আগরতলাকে গুঁড়িয়ে দেবে। আবার খবর পেলাম, আমেরিকার সপ্তম নৌবাহিনীর অনেকগুলো জাহাজ বঙ্গোপসাগরে অপেক্ষা করছে। এরা পাক বাহিনীকে মদত দেবে ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করলে। এসব উল্টোপাল্টা খবরে মনটা দমে যেত। সংশয় জাগত, তবে কি বাংলাদেশ স্বাধীন হবে না?

১লা ডিসেম্বর যথারীতি অফিসে গেলাম। আমার স্ত্রী গেলেন অরুন্ধতীনগরের ক্যাম্পের বাজারের বিদ্যালয়ে। আমাদের মধ্যে কথা হল, সে স্কুল সেরে আর এম এস চৌমুহনীর বাড়িতে আসবে। আমি বেতন নিয়ে অফিস থেকে একটু আগে বেরিয়ে ওর সাথে মিট করব। তারপর দুজনে মিলে কেনাকাটা সেরে একসঙ্গে যোগেন্দ্রনগর ফিরব এবং রাতে খেয়ে দেয়ে আমি আবার আর এম এস চৌমুহিনীর বাড়িতে ফিরব।

আমি প্রায় তিনটে নাগাদ বাসায় ফিরে দেখি স্ত্রী বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছে। বললাম, কখন এলে?

- অনেকক্ষণ। স্কুলে যেতেই আমাদের পরিচিত যুবক মিলিটারী অফিসার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, বহিনজীরা আজ স্কুল ছুটি দিয়ে দিন। আপনারাও বাড়ি চলে যান। ওর মুখটা গম্ভীর ছিল। অন্যদিনের মতো হাসি ঠাট্টা করল না।

ভয় পেয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন, কিছু ঘটবে?

অফিসারটি আমার কথার সরাসরি জবাব দিলনা। শুধু বলল, আপনারা দেরি করবেন না। পরে হয়ত গাড়ি পেতে অসুবিধে হবে। অফিসারটির চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ দেখে কথা আর বাড়াইনি। স্কুল ছুটি দিয়ে আমরা ছুটতে ছুটতে বাড়িতে চলে এসেছি। আসার সময় দেখলাম চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। রাস্তাঘাটে এবং বাসে লোকজন খুব কম। ঘন ঘন আর্মির গাড়ি যাচ্ছে সীমান্তের দিকে। মনে হচ্ছে আজ কিছু একটা ঘটবে।

আমারও মনের মধ্যে আশঙ্কার দানা বাঁধছিল রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে। স্ত্রীর কথা শুনে আশঙ্কটা আরও বদ্ধমুল হল। ওর হাতে কিছু টাকা তুলে দিয়ে বললাম, তুমি দেরি করো না। ছেলের দুধের কৌটো এবং কিছু দরকারী জিনিস নিয়ে চলে যাও। আমি বটতলা বাজার থেকে চাউল, ডাল, মশালাপাতি, চা, চিনি এসব কিনে যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে যাব।

স্ত্রী যাওয়ার আগে বলল, চাউল, ডাল, চা-পাতা এবং চিনি একটু বেশি করে নিও। যদি যুদ্ধ লেগেই যায়, অন্তত কয়েকদিন তো ঘরে আবদ্ধ থাকতেই হবে।

আমি স্ত্রীর প্রস্তাব মেনে নিলাম।

রিক্সা নিলাম না। একাই আখাউড়া রোড ধরে হাঁটতে লাগলাম বটতলার দিকে। রাস্তার দু'পাশে তাকাই। বাড়িগুলো মনে হল জনশূন্য। সাইকেলে চলা, পায় চলা এবং গাড়িতে চলা লোকজনদের দেখি। সবাই একটু বাড়তি গতিতে যাচ্ছে গন্তব্যস্থানের দিকে। মাঝে মাঝে পরিচিত মানুষের দেখা মেলে। হাত তুলে বিদায় নিয়ে চলে যায়। সৈন্যবাহিনীর গাড়িগুলোতে দুরন্ত গতি। ইঞ্জিনের হুঙ্কার কানে এলেই রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে গাড়িগুলোকে দেখি। সৈন্যবোঝাই গাড়ি। এদের পরনে নক্সা করা জলপাই রঙের প্যান্ট শার্ট। মাথায় ধাতুর গোল টুপি। উপরের দিক জাল দিয়ে ঘেরা। হাতে নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনীতে। রাস্তার এক পাশে দাঁড়ানো কিছু সাঁজোয়া গাড়ি। রাস্তার অন্য পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো কিছু সৈন্য। শীতের বিকেলের পড়ন্ত রোদ তাদের কঠোর কঠিন মুখে। এদের সামনে কিছু পুরুষ ও মহিলা। মহিলাদের হাতে ডিসের মতো ছোট পাত্র। এতে শ্বেত চন্দনের পেষ্ট এবং নানা নকসার সুন্দর রাখী। মেয়েরা একে একে সৈনিকদের কাপালে শ্বেত চন্দনের টিপ পরিয়ে হাতের কব্জীতে বেঁধে দিচ্ছে রাখী। তারপরেই দিচ্ছে সমবেতভাবে উলুধ্বনি। দৃশ্যটা দেখে মুগ্ধ হলাম।

বটতলা বাজারে ঢোকার আগে একটি মিষ্টির দোকানে ঢুকলাম কিছু জলযোগ করার জন্য। এই দোকানটায়ই মাঝে মাঝে বসি। বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিতরা মিলে আড্ডা দিই। সন্ধ্যার পর দোকানটি কথায় গল্পে মুখর হয়ে উঠে।

দোকানে খানিকক্ষণ বসলাম। দোকানদারের সাথে দু'চারটে কথা বললাম দেশ এবং পূর্ব বাংলার হালচাল নিয়ে। কিন্তু অনেকক্ষণ বসার পরও আমাদের দলের কারো দেখা পেলাম না। একাই দুটো মিষ্টি এবং এক কাপ চা খেলাম রসিয়ে রসিয়ে।

একদল সৈন্য হাতে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বটতলার মোড় থেকে নদীর বাঁধের দিকে চলে গেল। দোকানের মালিক বলল, দাদা, ভাবটা ভাল না। সবদিকে কেমন যেন ভারী ভারী ভাব। এখানে বসে না থেকে বাড়ি চলে যান। আমিও দোকান বন্ধ করে চলে যাব। ভেবেছিলাম মাসকাবারের কিছু আমদানী হবে, তা আর হলো না।

বাজারে ঢুকলাম ধীরে ধীরে। উপচে পড়া ভীড় চারদিকে। মাইনে পেয়ে সবাই এসেছে মাসের জিনিস সংগ্রহ করতে। সবার মধ্যেই ত্রস্ততা এবং অস্থিরতা। সবাই চাইছে যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব বাড়ি ফিরে যেতে। দোকানদারও চাইছে খরিদ্দারদের তাড়াতাড়ি বিদেয় করতে। আমার দোকানদার মালপত্র দিয়ে আমাকে তুলে দিলেন রিক্সায়।

বটতলা থেকে সোজা চলছিলাম মোটরষ্ট্যান্ডের দিকে। মোড়ে বেশ কিছু সৈন্য দাঁড়িয়ে। রাস্তার পাশের অনেক দোকানই বন্ধ। ফলে রাস্তা আলো -আঁধারিতে ঘেরা। বেশ রহস্যাবৃত পরিবেশ। লোকজন রাস্তায় কম। সবাই দ্রুত চলছে। একটু অসোয়াস্তি লাগছিল, তাই রিক্সাওয়ালার সাথে নানা গল্প জুড়ে দিলাম।

রাত প্রায় আটটা নাগাদ মোটর ষ্ট্যান্ডে এলাম। হঠাৎ বড় একটা কামান থেকে ছোঁড়া গোলার প্রচন্ড শব্দে সচকিত হয়ে উঠলাম। প্রায় একই সঙ্গে কানে এলো পর পর আরও কয়েকটি ভয়ঙ্কর শব্দ। রিক্সাওয়ালা ভয় পেয়ে গেল। বলল, বাবু, যুদ্ধ। আমি তাকে সাহস দিয়ে বললাম, কোথায় যুদ্ধ। এ তো কামানের গোলার আওয়াজ। এ তো রোজই হয়। কথা শেষ হতে না হতেই শুরু হল অবিরাম গোলাগুলী। কোথা থেকে গুলী এবং গোলা ছোঁড়া হচ্ছে, কোথায় গিয়ে পড়ছে তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু কানে আঘাতকরতে লাগল অবিশ্রান্ত শব্দোচ্ছ্বাস। মনে হতে লাগল এ যেন কোজাগরি বা দীপাবলীর রাত। বিচিত্র ধরনের লক্ষ লক্ষ শব্দবাজী পুড়ছে সমস্ত শহরজুড়ে।

রিক্সাওয়ালা ভয় পেয়ে রিক্সা ছেড়ে পালাতে চাইল। আমি রিক্সা থেকে নেমে তার জামা টেনে ধরলাম। তাকে বুঝিয়ে বললাম, এ সব চলছে বর্ডারে। এখানে কোন ভয় নেই। তাড়াতাড়ি চল। আমি পেছন থেকে রিক্সা ঠেলব। জোরে রিক্সা ঠেলে উঠে এলাম গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলের কাছে। এখান থেকে শহরটা স্পষ্ট দেখা যায়। দেখলাম, পশ্চিম আকাশটা লাল হয়ে আছে। মাঝে মাঝে কামানের গোলা এবং রকেট হাওয়াই বাজির মতো উঠে আসছে আকাশে। বুঝতে পারছিলাম না এগুলো কোথা থেকে উঠছে, কোথায় পড়ছে। একবার মনে হল শহরেই পড়ছে। পরিণাম চিন্তায় গা শিউরে উঠল। সম্ভবতঃ শহরটাকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে । কার যে কী সর্বনাশ হলো কে জানে। মনটা ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠল। কিন্তু এত কিছু ভাবার সময় নেই। আমিও নিরাপদ দুরত্বে নই। যে কোন সময় গোলা এসে পড়তে পারে এখানে। অতএব ছুটে চললাম যোগেন্দ্রনগরের দিকে।

শত শত মানুষ পাগলের মতো ছুটে চলেছে যোগেন্দ্রনগরের রাস্তা ধরে। এই মানুষের মিছিলে স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সব আছে। কানে আসছে তাদের ভয়ার্ত চীৎকার, বিলাপ, কোলাহল। আবার এ সবকে ছাপিয়ে উঠছে, দূরাগত প্রলয়ঙ্কর শব্দরাশি। এক রাশ ত্রাস ও অস্থিরতা নিয়ে কোন রকমে পৌঁছুলাম আমাদের অস্থায়ী আস্তানায়।

সারারাত ধরেই চলল অবিশ্রান্ত গোলাগুলী। আমরা রাত জেগে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম কালরাত্রির অবসানের। পূর্ব আকাশে আলোর আভাস দেখা দিতেই আমরা ঘর ছেড়ে অতি সন্তর্পণে টিলার উপরে উঠে শহরটাকে দেখবার চেষ্টা করলাম। তখনও গোলাগুলী চলছে। তবে তীব্রতা কিছুটা কমে এসেছে। এতদুর থেকে শহরের অবস্থা অনুমান করা গেল না।

শুধু চোখে পড়ল সীমান্তের কাছাকাছি কয়েকটি যুদ্ধ বিমান প্রচন্ড বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে। একটু বেলা বাড়তেই আগরতলার অবস্থা জানার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম। এগিয়ে গেলাম বনকুমারী বাজার পর্যন্ত। ভাবলাম, সুযোগ পেলে শহরের কাছাকাছি যাব। গিয়ে দেখলাম শহর থেকে জল স্রোতের মত মানুষ আসছে। বিপন্ন, বিধ্বস্ত মানুষের মিছিল। ওরা জানাল, শহরে কারফিউ দেওয়া হয়েছে। লোকজনকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তবে যারা বাইরে আসতে চাইছে তাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে না।

আরও একটু বেলা বাড়ার পর বিভিন্ন সুত্র থেকে খবর পেলাম, পাক সৈন্যরা আগরতলায় ঢুকতে পারেনি। কেননা, ভারতীয় জওয়ানরা তাদের সেই সুযোগ দেয়নি। পাক সৈন্যরা অগ্রসর হওয়ার আগেই ভারতীয় জওয়ানরা তাদের ঘায়েল করে পূর্ব পাকিস্তানের অনেকটা ভিতরে ঢুকে গেছে। সেখানে চলছে প্রচন্ড লড়াই। সব জায়গাতেই পাক সৈন্যরা পিছু হটছে অথবা নিস্ক্রীয় হয়ে যাচ্ছে। আগরতলার কিছুই ক্ষতি হয়নি। শহর এখন নিরাপদ।

এরপরের দিনগুলো আমাদের সোনালী সাফল্যের দিন। আনন্দ কোলাহলের দিন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে উপহার দেবার দিন। এবং সব শেষে; নুতন দেশের নাগরিকদের সুখ-সমৃদ্ধি চেয়ে বিদায় জানাবার দিন।

----- o -----

ফিরে দেখা

তুষারকণা মজুমদার

১৯৫৭ সন। আমি বনেদী রক্ষণশীল পরিবারের নবোঢ়া। এক সকালে ট্রেনের হুইসেল শুনে খুব জোরে হেঁটে রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছি। উদ্দেশ্য শিক্ষক পিতাকে গিয়ে বলব পড়াশোনাকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে তালাবন্ধ করে রেখে সারা জীবন আতুঁড় ঘর হতে রান্না ঘরের মধ্যে জীবনটা কাটাতে পারবনা। প্রসঙ্গত ম্যাট্রিক ভাল পাশ করেছিলেম। কলেজেও ভর্ত্তি হলাম। ঠিক সেই সময় এক জমিদার পুত্রের অভিভাবকেরা পড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাবাকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করলেন। বাস্তবে দেখা গেল ঐ বাড়ীতে লক্ষ্মীর পাঁচালী বা ঐ ধরণের ধর্মীয় গ্রন্থ ছাড়া মেয়েরা আর কোন বই পড়ার কথা ভাবতেই পারেনা। ১৯৫৫ ইং -শেষের দিকে বঁধুবেশে যৌথ পরিবারে যখন ঘোমটা দিয়ে প্রবেশ করি, তখন বিভিন্ন বয়সের বাইশ জন বঁধূ। আর আমি কলেজ ফেরৎ। বাজাব থেকে আনা জিনিষেব ঠোঙ্গাগুলিও সযত্নে বেখে পড়ি। উপহাব স্বৰূপ যে কযটি বই পেয়েছি, সেগুলি মুখস্থ হয়ে গেছে। নূতন বৌ বই পড়ার পাগল একথাও কি করে যে- কান হতে কানান্তর হতে হতে গোটা বাড়ীতে জবর খবর হযে উঠে। মরুভুমিতে এক কোষ জলেব মত জীবনদায়ী বইগুলিও কে বা কারা সরিয়ে নিয়েছেন। অনেক খোঁজা খুঁজির পরও না পেয়ে বাগে হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য হয়ে শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে ট্রেন ধরতে চলছি, শুধু জনক-জনকীকে অনুরোধ করব, ওকে আপনারা দেখুন, আমাকে আবার পড়ার ব্যবস্থা করে দিন।

ট্রেন থেমে আছে। যাত্রীরা অতি অল্প সংখ্যক উঠা-নামা করছে। আমি ডান হাতে তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় হ্যান্ডেল ধরে ডান পা-টা বাড়িয়েছি- পেছন থেকে উচ্চস্বরে -বৌদি-বৌদি কোথায় চললেন? চাকুরী করবেন? পা নামিয়ে মুখ ঘুবিয়ে দেখি স্বামীর অনুগামী অনিল সাহা। বলল, বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী দরকার। এই শহবে আপাতত আপনি পাশ করা, আব দুই জন আগেই সবকাবী স্কুলে জয়েন করেছে। নব গঠিত প্রাইভেট বালিকা বিদ্যালযে - আপনাকে প্রয়োজন। সেক্রেটারী বীরেন্দ্র দত্ত গুপ্ত ও প্রধাণ শিক্ষক মহেন্দ্র পাল মহাশয আমাকে পাঠিয়েছে আপনার মতামত জানবার জন্য। দাদাকেও জানিযেছি - তাঁর আপত্তি নেই। এক নাগাড়ে বলে অনিলবাবু আমার দিকে তাকালেন। এই দিকে রেলের ইঞ্জিন ঘুরিয়ে লাগানো হয়। হুইসেল দেয়। শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে দিদিমাব উপদেশ স্মবণ পড়াতে আমি ফিরে চললাম - বিশেষ করে দিদিমার একটি উপদেশ মন্ত্রের মত কাজ করল, যেমন-'শ্বশুর বাড়ীতে উঠান ঝাঁট দিলেও সম্মান আছে।

পবিবারের কর্তা ভাসুর। কোর্টে যাওয়ার সুবিধার জন্য পরিবারের কিছু ছেলে ও মেয়েকে পড়ানোর জন্য ওনার নিজের পরিবারকেও নিয়ে শহরের - বাসাবাড়ীতে আসেন। তিনি শুনে খুব খুশী হলেন। আমিও সংসারের বেশীর ভাগ কাজের দায়িত্ব নিয়ে রয়ে গেলাম। মাসিক চল্লিশ (৪০) টাকা বেতন। বিদ্যালয়ের প্রাক্ ইতিহাস-শহরের কয়েক পরিবারের মেয়েরা বাজ আমলের

ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ৬ষ্ঠশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ে তারপর বি-কে- আই, ছেলেদের স্কুলের একটি রুমে বয়স্ক -শিক্ষক সর্ব্বশ্রী যোগেশ দত্ত, মহেন্দ্র পাল আরও কয়েকজন শিক্ষক পড়াতেন। এই ছাত্রীগুলি প্রাইভেট পরীক্ষা দিত। পরে অভিভাবকেরা আলাদা করে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তখন বর্ত্তমানে যেখানে এখন দ্বাদশ বালিকা বিদ্যালয় এখানেই ছন বাঁশ দিয়ে ঘর করে ৭ম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত ক্লাস শুরু করেন। প্রধান শিক্ষক তারাপদ চক্রবর্ত্তী। অন্যান্য সহকারী শিক্ষকরা ছিলেন যথাক্রমে বিপিন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বরদা সাহা, দীনেশ দাস এবং আনন্দ মজুমদার। ওরা প্রায় সকলেই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।

যাত্রাগান, নাটক করে স্থানীয় যুবকরা আর্থিক সাহায্য করতেন। অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ সমবেতভাবে ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের জয়যাত্রা শুরু। (প্রথম ব্যাচে প্রভাবতী সেনগুপ্তা, জ্যোৎস্না পাল, আরও কয়েকজনকে নিয়ে) সপ্তম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত ক্লাস হ'তো। রুমগুলোও ছোট ছিল। (জায়গাটা খাসের ছিল। এখানে স্থানীয় জনৈকা মহিলা থেকে কিঞ্চিৎ টাকার বিনিময়ে বিদ্যালয়ের জন্য জায়গাটা নিয়েছে বলে কেহ কেহ বলতেন। তার সঠিক তথ্য অফিসই দিতে পারবে। পাশে যেখানে এখন খেলার মাঠ - সেটাতে উদ্বাস্তু ও শরণার্থীরা ছিলেন। বর্ত্তমানে যেখানে বালিকা বিদ্যালয়, সেখানেই ছনের ঘর ও বাঁশ বেতের বেড়া তৈয়ার করে বিদ্যালয় শুরু হয়। যে সমস্ত শিক্ষকবৃন্দ স্বল্প বেতনে শ্রম দান করেন, সকলেই মাঝারি বয়সের এবং কেহ কেহ পঞ্চাশের উর্দ্ধে। নব গঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে আসে যুবকেরা। (ওরা নাটক ও যাত্রা গানের আসর বসিয়ে) বাড়ী বাড়ী গিয়ে অভিভাবকদের বুঝিয়ে অনুরোধ করত মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য। শিক্ষক বরদা বাবু বিদ্যালয়ে আসবার সময় কালীবাড়ীর বেল নিয়ে আসতেন এবং ঘন্টা বাজাতেন। ছুটির পর আবার মন্দিরে পৌঁছে দিতেন। প্রথমে ছাত্রী সংখ্যা অতি অল্প।

১৯৫৭ সালে আমি (শ্রীমতি তুষারকণা মজুমদার) যখন বিদ্যালয়ে যোগ দিই, তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন বি.কে.আই-র অবসব প্রাপ্ত শিক্ষক মহেন্দ্র পাল এবং তারপর নবীন সেন, যতীন্দ্র দেবনাথ, সন্তোষ শূর আসেন। ছাত্রীরা দয়াময়ী মজুমদার, বাসন্তী পাল, দীপালি বৈদ্য, জ্যোৎস্না দাস, চঞ্চলা মল্লিক, বীনাপানী দত্ত। বিদ্যালয়ের কমিটিতে তৎকালীন বিলোনীয়ার এস.ডি.ও ছিলেন। বলাবাহুল্য, প্রতিটি মিটিং এ প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্র পাল বলতেন ম্যাট্রিক পাশ হলে কি হবে বি.এ.পাশ এর জ্ঞান আছে। তিনি আমাকে কন্যার মত স্নেহ করতেন - আর উৎসাহ দিতেন। অমিও আমার সীমিত বিদ্যা যথাসাধ্য উজাড় করে ছাত্রীদের পেছনে পড়ে থাকতাম। প্রসঙ্গত সুনাম ও চাকুরী রক্ষাব জন্য আমি দশম শ্রেণী পর্যন্ত জ্যামিতি ও এলজাব্রা ছাড়া সব বিষয় পড়াতাম। কারণ ম্যাট্রিকে আমার গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও পাটিগনিত ছিল। তাই দুইটি বিষয় ছাড়া 'যাদবের' পাটিগনিতের অংকও আমি ভাল বুঝতাম। আমি ছাত্রীদের থেকে বই এনে রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত তখন লন্ঠন এনে কাগজ দিয়ে আড়াল দিয়ে পরের দিনের শ্রেণী কক্ষের পাঠ মুখস্থ করতাম। মাঝে মাঝে ঘরের গৃহকর্ত্তার কাছে -ইং নবম ও দশম শ্রেণীর দ্বিতীয় পত্র বুঝে

নিতাম। এই ভাবে জ্ঞানের ভান্ডার ও বৃদ্ধি হতে লাগল। পড়ার ক্ষুধা ও অতৃপ্তির অবসান হতে চলল। এই দিকে -মানিক গাঙ্গুলীর পিতাও বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং বিনা বেতনে মাঝে মাঝে পড়াতেন। তাতে অচিরে বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ও বেড়ে গেল। ৪৫(পয়ঁতাল্লিশ) মিনিটের ঘন্টা এক সাথে একা আমি দু'টো ক্লাস করতাম। এক ক্লাসে বোর্ডে লেখা দিয়ে অন্য ক্লাসে মুখে বুঝাতাম। উভয় ক্লাসে কয়েকবার আসা যাওয়া করতাম। এইভাবেঁ প্রতিদিনই দুই ক্লাস করে আমি প্রতি ঘন্টা পড়াতাম। কারণ- একদিকে সেই বয়সে সুনামের আকাঙ্ক্ষাও ছিল, পরিবারের বৌ হিসেবে অন্যেরা যাহাতে অপবাদ না দিতে পারে, অন্য দিকে ৪০ টাকা বেতনের চাকুরীটা রক্ষার ও ভীষণ প্রয়োজন ছিল বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ মন ও শিক্ষার জগতে। শিক্ষক নবীন সেন কেরাণীর কাজেব সাথে পড়াতেনও। অংকে তিনি পারদর্শী ছিলেন। আমার ছাত্রীরা মিশ্রিত ভাষায় কথা বলত। এমনি এখানকার স্থানীয় ভাষা তিনটি ভাষার সমন্বয়ে গঠিত। কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম। তার সাথে উর্দু হিন্দি ইংরেজী ককবরক ভাষাব সমন্বযে গঠিত মিশ্রিত ভাষা। বহিঃবাগত কেহ কেহ খন্ডালি ভাষা বলেও ব্যাঙ্গ কবেন।

প্রথমে আমি অনেক শব্দের অর্থ বুঝতাম না। ঘরে গিযে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু মানে উদ্ধার করি। তবে আমি সব সময় পবিষ্কার বাংলা পড়াতাম।

তবে ইহা স্বীকার্য যে, শিক্ষা বা সামাজিক কোন কাজে আমার স্বামী কোন দিন বাধা দেননি। তাই ঘরে বাইরে অবাধে আমি কাজ করে -আজকের আমিতে পরিণত হয়েছি। প্রাইভেট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষয়িত্রী হিসেবে ৪০ টাকা বেতনও আমার শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

১৯৫৯ ইং প্রথম দিকে কলকাতা থেকে অতসী ভট্টাচার্য্য আসেন। তিনিও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। তার সহযোগিতায় মেয়েদের নিয়ে 'বন উৎসব' করি মেয়েরা মাটির কলসী কাঁখে করে মাঠের মধ্যে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে গান ধরল ঃ

"আয়রে তোরা সবাই মিলে বনোৎসবে আয় আয়,
গাছের ছায়া বসে মোরা শীতল হাওয়া পাই. মবি হায় -হায়!
আমরা সবুজ , বৃক্ষ সবুজ কানন সবুজ ওগো, দুর্ব্বা সবুজ,
সবুজের মিলন হবে গো।
ছোট গাছটি বড় হবে- কত লোকে ছায়া পাবে, কত লোক বসবে এসে-
জুড়াবে পরাণ ...."

সূচনায় স্বল্প সংখ্যক ছাত্রীদের নিয়ে বিদ্যালয়টি যখন ধীরে ধীরে জমিয়ে উঠে তখন ১৯৫৯ ইং -মাঝামাঝি বিধান সভার অধ্যক্ষ উপেন্দ্র কুমার রায়ের তৎপরতায় বিদ্যালয়টি সরকার অধিগ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়। আমি অথৈ জলে পড়লাম কেন না শুধু ম্যাট্রিক পাশের শংসাপত্র নিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী করা যাবে না। আমার পিতৃতুল্য প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রপাল পরামর্শ দিলেন 'তুমি যদি তোমার শিশু কন্যাটিকে নিয়ে শিক্ষা অধিকর্ত্তা চাটার্জ্জীর সঙ্গে দেখা কর, দারোয়ান ঢুকতে না দিলেও দরজা ঠেলে ভেতবে গিয়ে সরাসরি সমস্যাটা বলবে। আশা

করি কাজ হয়ে যাবে। তাঁর উপদেশ অনুসারে আমি আগরতলা গেলাম। শিক্ষা অধিকর্ত্তা চাটার্জ্জির অফিস রুমে ঢুকে আমি মেয়ের হাত ধরে দাঁড়ালাম। চাটার্জ্জী-এই ভাবে প্রবেশ করার জন্য প্রথমে আমাকে ধমক দিলেন জোরে। আমি তখন মুখস্তের মত গড় গড় করে আমার সমস্যা বলে গেলাম। তিনি পাশের রুমের একজনকে ডাকলেন। ভদ্রলোক আমাকে বললেন-"হয়ে যাবে। আপনি একটি দরখাস্ত দিয়ে বাড়ী যান।" প্রধান শিক্ষকের থেকে লিখিয়ে আমি নিয়ে গিয়েছি, তাই সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলাম ওনার হাতে। তারপরও অনেক দিন-দুঃখের, উৎকণ্ঠার রাত পার হয়ে যায়। পরে শুনলাম - আমাকে ঈশাণচন্দ্র স্কুলের প্রাইমারী বিভাগে চাকরির নিযুক্তি-পত্র দিয়েছেন কিন্তু ওখান থেকে চাকুরী করতে হবে বলে-আমার এই শহরের রাজনীতিবিদ্ সুরেশ চৌধুরীকে দিয়ে চাকুরির নিযুক্তি-পত্রটি বাতিল করে দেয়। বুঝলাম আমার স্থায়ী জায়গায় হয়ে যাচ্ছে এই রক্ষণশীল পরিবারের রান্না ঘর হতেআঁতুড় ঘরে। কিন্তু আমি হার মানি নি। আমার মেয়েকে বাড়ীতে শাশুড়ি মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একশ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে চললাম আগরতলায় স্বনাম ধন্য সাংবাদিক দাদা জীতেন পালের বাসায়। আমার জ্বর দেখে দাদা একটি স্লিপ হাতে দিয়ে পাঠালেন ইন্টারভিউতে। বলাবাহুল্য, আমার ডাকপড়ল প্রথমে -

প্রশ্ন ঃ- আপনি কেন চাকুরী করতে চান?

উঃ- জীবনের জন্য, জীবিকার জন্য নয়।

প্রশ্ন ঃ- আপনার স্বামী কি করেন?

উঃ- রাজনীতি - বেকার।

প্রশ্নঃ- আপনাকে বনে জঙ্গলে দিলে চাক্‌রী করবেন?

উঃ- জঙ্গলে থেকে জঙ্গলের যদি মঙ্গল করতে নাই পারলাম তবে কিসের শিক্ষক ?

প্রশ্ন কর্ত্তার টেবিলে তিনদিকে চেয়ার নিয়ে তিন জন বসেছিলেন। এবার মাথায় টাক্‌পড়া মাঝারি বয়সের এক ব্যক্তি হাসতে হাসতে বললেন, আপনার পাঠ্যবই এর একটি ইংরেজী কবিতার চার (৪) লাইন মুখস্থ বলুন।

আমি গড় গড় করে বলার সাথে সাথে ভদ্রলোক টেবিলে থাপ্পড় দিয়ে বললেন-

" I am extremely satisfied"

বাড়ী ফিরে আশা নিরাশার দিন রাত্রি কাটাচ্ছি। সেই বিশেষ সকালে তৎকালীন বিলোনীয়ার সরকারী স্কুলের পরিদর্শক সত্যপ্রিয় চৌধুরী চাকুরির অফার হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে এসে বললেন, নিন, কর্ম্মময় জীবন প্রসারিত করুন।

অফার হাতে নিয়ে মনে হল - নূতন জীবন লাভ করেছি। বিদ্যাপীঠ স্কুলের সকালে প্রথম posting.

ইহা স্বীকার্য্য সত্য যে বিলোনীয়ার প্রাইভেট বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষকদের সান্নিধ্যে থেকে তাদের আদেশ, উপদেশ, প্রেরণা আমার মানসিক শক্তিকে দৃঢ় করেছে।

বিদ্যালয়টি ধীরে ধীরে ছনের ঘরের পরিবর্তে টিনের ঘর, তারপর পাকা দালান সবই

হয়েছে। শত শত ছাত্রী পাশ করে প্রতিবছর বেরিয়ে যাচ্ছে শিক্ষা লাভ করে। সামনে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবে পঞ্চাশ বছর পূর্ত্তি উপলক্ষে উন্নয়ন কমিটি গঠন করেছে। ঐ কমিটিতে আমার পুত্র শ্রীমান ডাঃ তাপস মজুমদারও আছে। আজ অনেক বড় বড় ডিগ্রী ও মেধাবী শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত এই বিদ্যালয়। সবকারী সাহায্যে মেয়েদের বোর্ডিং ও থাকার ব্যবস্থাও আছে। ইতিপূর্ব্বে শান্তি সুধা, পাপিয়া দেববর্মা, রেখা ঘোষের মত প্রধান শিক্ষিকাদের পরিচালিত বিদ্যালয় পড়াশোনা, খেলা-ধূলা, সাংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ রূপ পায। আজ ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যান্ত - ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা মুখরিত বিদ্যালয়। রাস্তার পাশে সেই দিনের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দ্বারা প্রাইভেট বিদ্যালয়টি নবরূপে দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নামকরণে স্ব-মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। আসা-যাওঁয়ার পথে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম কবি। সবই আছে তবু মনে হয় কি যেন নেই।

----- o -----